ঢাকা সমগ্র ২

মুনতাসীর মামুন

সাহিত্যলোক
৩২/৭ বিডন স্ট্রীট। কলিকাতা - ৭০০০০৬

উ ৎ স র্গ

লিলি ফুফু
ও
আব্বু চাচা-কে

ভূমিকা

আমার জন্ম বটে ঢাকার ইসলামপুরের অন্ধকার গলি আশেক লেনে, কিন্তু বাল্য-কৈশোর কেটেছে পাহাড়-সমুদ্রে ঘেরা চট্টগ্রামে। হ্যাঁ, শৈশবের কয়েকটি বছর কাটিয়েছি স্বামীবাগে। সবুজ, খোলামেলা চট্টগ্রাম থেকে মাঝে মাঝে ছুটিতে মা'র সঙ্গে আসতাম ঢাকায়। এই শহরের আকর্ষণ তখন আশেক লেনে জমজমাট আমার নানার বাড়ি। এক ডজন খালা-মামা ও নানা-নানির সস্নেহ প্রশ্রয়ে কাটতো কয়েকটি দিন। মাঝে মাঝে এক আনা বা দুই আনার কুট্টি বিসকুট নিয়ে বসতাম ৬২ ইসলামপুরে নানার ইউনিভার্সেল লাইব্রেরিতে। অবশ্য তখন তার পড়ন্ত অবস্থা। কখনওবা কোন খালার সঙ্গে ঘোড়ার গাড়ি বা রিকশায় যেতাম আত্মীয়ের বাড়িতে। কখনওবা কোন মামার সঙ্গে বাকল্যান্ড বাঁধে ঘুরতাম বা সিরাজউদদৌলা পার্কে ক্রিকেট খেলতে যেতাম। আমার বড় চাচা থাকতেন সেগুন বাগিচায়। মেজ চাচা এস. এম. হলে। তাঁরাও মাঝে মাঝে নিয়ে বেরুতেন। তবে, বেড়াবার চৌহদ্দিটা ছিল ফুলবাড়িয়া রেললাইনের ওদিকটায়ই। একবার কার সঙ্গে যেন, তেজগাঁয়ে অন্যতম দ্রষ্টব্য ছবির মতো বাড়িটা দেখতে এসেছিলাম যার সামনে ছিল শিল্পী নভেরা আহমদের ভাস্কর্য। আরেকবার বড় মামি নিয়ে গিয়েছিলেন মিরপুর মাজারে। জগন্নাথ কলেজের সামনে থেকে বাসে উঠলাম, মুড়ির টিন বলা হতো যেগুলিকে। বাস চলছে তো চলছেই। শেষে লালমাটির এক গ্রামের কাছাকাছি পৌঁছলাম। মাজারের সামনে একটি গাছ। সেখান থেকে বাসে উঠে আবার ঢাকা। আরেকবার মনে আছে দাদার সঙ্গে চট্টগ্রাম থেকে প্রথম বারের মতো প্লেনে চড়ে এলাম ঢাকা। ছত্রিশ টাকা বোধ হয় ছিল টিকেটের দাম। আমার নিশ্চয় অর্ধেক, আঠার টাকা। প্লেন নামল তেজগাঁয়। তারপর আগাছা, জঙ্গল, রেললাইন পেরিয়ে মেঠোপথ দিয়ে পৌঁছলাম ফুপুর বাড়ি। পরে শুনেছিলাম সেটি নাকি মনিপুরি পাড়া। একদম গ্রাম।

১৭তে পা দিয়ে এলাম ঢাকায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে। সেই থেকে ঢাকায় আছি। তখন থেকে ছুটিছাঁটায় গেছি চট্টগ্রাম যেখানে বাবা-মা থাকতেন। ঊনসত্তরের উত্তাল দিন পেরিয়ে পৌঁছলাম 'জয়বাংলা' পর্যায়ে তারপর মুক্তিযুদ্ধ। স্বাধীন বাংলাদেশে যোগ দিলাম সাপ্তাহিক পত্রিকায়। তারপর যোগ দিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। এরি মধ্যে ঢাকার অলিগলি, রাস্তাঘাট চলে এসেছে নখদর্পণে। হেঁটে, সাইকেলে ঘুরে বেড়িয়েছি পুরোটা শহর। ঢাকা হয়ে উঠেছে নিজের এক প্রিয় শহর।

২

বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিলে এক-আধটু গবেষণা করতে হয়। আমার গবেষণার বিষয় ছিল পূর্ববঙ্গ। এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে গুরুত্ব পায় এর প্রধান শহর ঢাকা। এদিক সেদিক পেতে থাকি নানা তথ্য। ঐ সময় কলকাতার ওপর বেশ কিছু বই বেরিয়েছিলো। আমি ছিলাম বিনয় ঘোষের ভক্ত। তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলাম, যোগাযোগও ছিল। তিনি আমাকে উৎসাহিত করেন সংবাদ সাময়িকপত্র গবেষণায়। তখন মনে হয়, কলকাতার মতো ঢাকা নিয়ে আলাদা গবেষণা হবে না কেন? ঢাকা বিষয়ক বই খুঁজতে গিয়ে দেখি আহমদ হাসান দানীর বইটিই সম্বল। সৈয়দ মোহাম্মদ তৈফুরের বইটি দুষ্প্রাপ্য। যতীন্দ্র মোহনের বইয়ের একটি কপি আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে। এসব সম্বল করে এগোই। পুরনো সংবাদ সাময়িকপত্র, (পরে) ব্রিটিশ লাইব্রেরি, কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরি, দিল্লির অভিলেখগারে কাজ করে পেতে থাকি বিভিন্ন সূত্র। ঢাকা বিষয়ক গবেষণার মাল-মশলা

জমতে থাকে।
ঢাকা সম্পর্কে লিখতে গিয়ে প্রাথমিকভাবে কিছু বাধার সম্মুখীন হই। আমি কাদের জন্য লিখব? প্রথম থেকেই আমার লক্ষ্য হয়ে ওঠে সাধারণ মানুষ, গুটি কয় নাক উঁচু পণ্ডিতদেব জন্য লিখতে আমি কখনও আগ্রহ বোধ করিনি। গবেষণা ও পাণ্ডিত্য সম্পর্কে তাঁদেব ধাবণা ছিল অদ্ভুত। যেমন, ইংরেজিতে লিখতে হবে, বই বা সাময়িকী দেখতে হবে অনুজ্জ্বল, ভাষা জটিল ও কঠিন। বাংলায় ভাল গবেষণা হয় না। যদি কোন বই বেশি বিক্রি হয় তাহলে তার মূল্য হ্রাস পায়।
স্বাধীনতার পরপর আমাদের তরুণদের চিন্তাচেতনা ছিল অন্য রকম। মনে হয়েছিল, এদেশের কাছে আমরা ঋণী। তাই এদেশের ইতিহাসের ওপর গুরুত্ব দিয়ে এদেশের সাধারণ মানুষের জন্য লিখতে হবে সে ভাষায় যে ভাষা তারা বোঝে। এটি সামাজিক দায়িত্ব। তাছাড়া একটি বিষয় বুঝতে আমি অক্ষম যে, দলিলপত্রের ওপর ভিত্তি করে গবেষণালব্ধ ফলাফল যদি সাধারণ বাংলায়, পত্রিকায় লিখি তাহলে তা গুরুত্বহীন হবে কেন? আমি তো ফিকশন লিখছি না।
এ বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে আমি লিখতে শুরু করি। বিভাগীয় শিক্ষক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম আমাকে তখন উৎসাহিত করেছিলেন। লেখার বাহন হলো তখনকাব জনপ্রিয় সাপ্তাহিক 'বিচিত্রা'। 'বিচিত্রা'ব সম্পাদক শাহাদত চৌধুরী এ ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন। 'বিচিত্রা' ঢাকা বিষয়ক অনেক 'প্রচ্ছদ কাহিনী'ও প্রকাশ করে। বিষয় হিসেবে ঢাকা জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে।
আমরা অনেকেই এতে উৎসাহিত বোধ করি। অধ্যাপক সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে গঠিত হয় ঢাকা নগর জাদুঘর বাস্তবায়ন কমিটি। শিল্পী হাশেম খান ও আমি আমাদের সংগ্রহের মূল্যবান কিছু চিত্রকর্ম বিক্রি করে শুরু কবি ঢাকা নগর জাদুঘর প্রতিষ্ঠার কাজ। কবি, স্থপতি রবিউল হুসাইনও এক্ষেত্রে পালন করেন বিশেষ ভূমিকা। আমরা ঢাকা বিষয়ক অনেকগুলি প্রদর্শনী করি, 'ঢাকা গ্রন্থামালা' নামে ঢাকা বিষয়ক ১৪/১৫টি বই প্রকাশ করি। ঢাকা বিষয়ে ঢাকাবাসী উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। দশ বছর অক্লান্ত পরিশ্রমের পর সিটি কর্পোরেশনের ছয়তলায় আমাদের প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয় ঢাকা নগর জাদুঘর।
গত দু'দশকে এ পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার নানা বিষয়ে অনেক কিছু লিখেছি। কিছু লেখা হারিয়েও গেছে। নিজের লেখা ও সম্পাদনায় প্রায় তিরিশটি গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে এ সময়। তবে, এখানে বলে রাখা ভালো, আমি যে মৌলিক কিছু লিখেছি বা নতুন আলোয় শহর বিশ্লেষণ করেছি তা নয়। পূর্বসূরিদের রচনা ও খুঁজে পাওয়া তথ্যাবলী দিয়েই সাধারণ কিছু রচনা করেছি। ফলে, সেদিক থেকে বিচার করলে আমার গবেষণা বা ঢাকা বিষয়ক গ্রন্থসমূহ গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়।
আগেই উল্লেখ করেছি গত দু'দশকে ঢাকা বিষয়ক আমার কিছু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এতে পুনরাবৃত্তি আছে। ঢাকা বিষয়ক কোষগ্রন্থ 'ঢাকা : স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী'তে অনেক রচনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যেসব বই ছাপা নেই তার অধিকাংশই আর ছাপা হবে না। অন্যদিকে অনেকে পুরনো বইগুলি এখনও খোঁজাখুঁজি করেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে 'অনন্যা'র স্বত্বাধিকারী মনিরুল হক আগ্রহী হয়ে সিদ্ধান্ত নেন 'ঢাকাসমগ্র' নাম দিয়ে ঢাকা বিষয়ক আমার রচনাগুলি প্রকাশ করবেন।

সূচি

ঢাকার প্রথম

মুদ্রণযন্ত্র

এতদিন পর্যন্ত ধারণা ছিল ঢাকায় মুদ্রণযন্ত্র স্থাপিত হয়েছিল ১৮৫৬ সালে, কারণ তখন ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল ঢাকা তথা বাংলাদেশের প্রথম ইংরেজি সংবাদপত্র— সাপ্তাহিক 'ঢাকা নিউজ' এবং এ কারণেই আমদানি করা হয়েছিল মুদ্রণযন্ত্র। আর পূর্ববঙ্গে বা বর্তমান বাংলাদেশে প্রথম মুদ্রণযন্ত্রটি স্থাপিত হয়েছিল রংপুরে ১৮৪৭ সালে। ঐ সময় রংপুর থেকে প্রকাশিত হয়েছিল বাংলাদেশের প্রথম সংবাদপত্র 'রংপুর বার্ত্তাবহ'। পত্রিকাটি প্রকাশের জন্যই আনা হয়েছিল মুদ্রণযন্ত্রটি।

বছর দশেক আগে লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে কাজ করার সময় ছোট কিন্তু ঝকঝকে ছাপার একটি পুস্তিকা পাই। পুস্তিকাটির নামপত্রে লেখা আছ 'ঢাকা; প্রিন্টেড অ্যাট দি কাটরা প্রেস, ১৮৪৯।' এর অর্থ, ১৮৫৬ সালে নয়, আরও আগে অন্তত আট-নয় বছর আগেই ঢাকায় মুদ্রণযন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল এবং এ সূত্র ধরেই বলা যেতে পারে ১৮৪৮/৪৯ সালে ঢাকার প্রথম মুদ্রণযন্ত্রটি কাজ শুরু করেছিল কাটরায়। এখানে কাটরা বলতে ছোটকাটরা বোঝানো হচ্ছে। মিশনারি অর্থাৎ ব্যাপটিস্ট মিশনারিদের সদর দফতর ও আবাস ছিল তখন ছোট কাটরায়। এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে যেহেতু আর নতুন কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি সেহেতু এই সময়টিকেই সঠিক বলা যেতে পারে এবং সে পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাপটিস্ট মিশন কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকাটিই ঢাকার প্রথম প্রকাশিত মুদ্রিত নিদর্শন।

ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির ডেপুটি ডিরেক্টর ও গবেষক গ্রাহাম শ' সম্প্রতি এ বিষয়ে আরও কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছেন। ১৮৫৩ সালে জার্মান ভাষায় প্রকাশিত একটি রিপোর্ট থেকে তিনি এই তথ্য উদ্ধার করেছেন।

১৮৪৭ সালে, ঢাকায় ইস্ট বেঙ্গল মিশনারি সোসাইটি বা ব্যাপটিস্ট মিশনের দায়িত্বে ছিলেন রেভারেন্ড ড. জোহানেস হেবারলিন। তাঁকে সাহায্য করার জন্য সুইজারল্যান্ডের ব্যাসেল থেকে ইভানজেলিকাল মিশনারি সোসাইটি ম্যানুয়েল বোস্ট ও ফ্রেডারিক লেহম্যানকে পাঠিয়েছিল ঢাকায়। সেই জার্মান রিপোর্টটিতে উল্লেখ করা হয়েছে, 'মিশন ও মুদ্রণযন্ত্রের আড়ত (গোডাউন) হল ঢাকা। এখন শুরু হবে শহরের আশপাশে প্রচার করা এবং অন্যান্য স্টেশনের ক্যাথেকিস্টদের শিক্ষা দেয়া। এ কারণে, ভ্রাতা বোস্ট যিনি কাজ করেছেন আগে মুদ্রণালয়ে এবং ভ্রাতা লেহম্যান যিনি কাজ করবেন শিক্ষক হিসাবে এখন এখানে স্থিতি লাভ করেছেন। ভ্রাতাদ্বয় এখন ভাষা শিক্ষায় ব্যস্ত।' সেই সূত্র ধরে বলা যায়, ঢাকার প্রথম মুদ্রক হলেন সুইজারল্যান্ডের স্যামুয়েল বোস্ট যিনি ২২ জুলাই ১৮২২ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন জেনিভায়।

গ্রাহাম শ'য়ের মতে, বোস্ট ছিলেন একজন অবিবাহিত যুবক। ১৮৪৩ থেকে ১৮৪৬ সাল পর্যন্ত ব্যাসেলের মিশন স্কুলে প্রশিক্ষণ নেয়ার আগ পর্যন্ত তিনি কাজ করতেন একটি মুদ্রণালয়ে। হতে পারে, কৈশোরে তিনি একজন প্রিন্টারের নবিস ছিলেন এবং প্রশিক্ষণের পর ধর্ম প্রচারে দেখিয়েছিলেন আগ্রহ। প্রিন্টার বিধায় ব্যাসেল সোসাইটি তাঁকে লুফে নিয়েছিল। শ' মতে, খুব সম্ভব ১৮৪৭ সালের গোড়ার দিকে বোস্টের দল ব্যাসেল থেকে একটি মুদ্রণযন্ত্র নিয়ে এসেছিলেন বা এমনও হতে পারে ১৮৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে দ্বিতীয় যে দল এসেছিলেন তারাই নিয়ে এসেছিলেন মুদ্রণযন্ত্রটি। শুরুতে বোস্ট ও তাঁর সঙ্গীরা কিছু বাংলা শেখা ও ঢাকার ইংরেজি স্কুল নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। বোস্টকে ত্রিপুরায় পাঠানো হয়েছিল ১৮৪৭ সালে। ঢাকায় ফিরে এসেছিলেন পরের বছর। শ' অনুমান করছেন, কাটরা প্রেসে যে বাংলা পুস্তিকাটি মুদ্রিত হয়েছিল তার অক্ষর হয়তো আনা হয়েছিল কলকাতার সার্কুলার রোডের ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস থেকে। কাটরা প্রেস থেকে প্রকাশিত এ পর্যন্ত তিনটি বইয়ের নাম পাওয়া গেছে। এর মধ্যে দুটি বাংলায়, একটি ইংরেজিতে। ইংরেজি পুস্তিকাটি ব্যাপটিস্ট মিশন সংক্রান্ত রিপোর্ট। বাংলা বইয়ের একটির নাম 'প্রহেলিকা', অপরটির নাম 'প্রার্থনা অনুক্রম'। জোহানেস হেবারলিন রচিত প্রার্থনা পুস্তকের সারসংক্ষেপ 'প্রার্থনা অনুক্রম'। প্রথম বই দুটির খোঁজ পাওয়া গেছে শুধু।

১৮৫৩ সালের গোড়ার দিকে খারাপ স্বাস্থ্যের কারণে বোস্ট চলে যান। সে সময় পর্যন্ত ঢাকায় মুদ্রণযন্ত্র সম্পর্কে তিনিই ছিলেন খুব সম্ভব একমাত্র অভিজ্ঞ লোক।

শ' অনুমান করছেন, কাটরার প্রেসটি টিকে ছিল চার বছর এবং তারপর 'ঢাকা নিউজ' প্রকাশের উদ্দেশ্যে এটি ক্রয় করা হয়েছিল। বোস্ট অসুস্থ হয়ে কলকাতা চলে যাওয়ার পর যন্ত্রটি আর ব্যবহৃত হয়নি। এখানে উল্লেখ্য যে, 'ঢাকা নিউজ' বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর 'ঢাকা প্রেস' থেকেই প্রকাশিত হয়েছিল আরেকটি ইংরেজি সংবাদপত্র 'বেঙ্গল টাইমস' এবং তা টিকে ছিল এ শতক পর্যন্ত। বছর কয়েক আগে বিজ্ঞান জাদুঘরে ভাঙা এবং পরিত্যক্ত অবস্থায় দেখলাম একটি মুদ্রণযন্ত্র। জাদুঘরের তৎকালীন পরিচালক ড. সিরাজুল ইসলাম জানিয়েছিলেন, মিশনারিরা বেশ কিছুদিন আগে এই জাদুঘরে ভাঙা মুদ্রণযন্ত্রটি দান করে গেছেন। যদি কাটরার যন্ত্রটি হস্তান্তরিতই হয়ে থাকে তাহলে তা মিশনারিদের মালিকানায় এলো আবার কীভাবে? তাতে মনে হয় বোস্ট স্থাপিত মুদ্রণযন্ত্রটি কয়েকটি পুস্তিকা প্রকাশের কাজেই ব্যবহৃত হয়েছিল। বোস্ট ঢাকা ছেড়ে চলে যাবার পর খুব সম্ভব অব্যবহৃত অবস্থায়ই পড়ে ছিল মুদ্রণযন্ত্রটি। ১৮৪৭ সালে বোস্ট যে মুদ্রণযন্ত্রটি এনেছিলেন তা 'অ্যালবিয়ন প্রেস'। ঐ সময় এ কোম্পানির যন্ত্রই ছিল চালু। এখন ঐ মডেলের নিখুঁত 'অ্যালবিয়ন প্রেসে'র একটি নিদর্শন দেখতে পাওয়া যাবে ঢাকার নগর জাদুঘরে। ১৯৮৯ সালে ঢাকা নগর জাদুঘর জাতীয় অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাকের দানে এটি সংগ্রহ করে।

প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী ঢাকায় প্রথম মুদ্রণযন্ত্র স্থাপন করা হয়েছিল ১৮৫৬ সালে, ইংরেজি সংবাদপত্র 'ঢাকা নিউজ' ছাপার জন্য। বছর দশেক আগে লন্ডনে ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে কাজ করার সময় ছোট কিন্তু ঝকঝকে ছাপার একটি পুস্তিকা পাই। পুস্তিকার নাম 'The first report of the East bengal Missionary Society MDCC-CXL VIII, with an Appendix etc.' অকটাভো আকারের চল্লিশ পৃষ্ঠার পুস্তিকাটির নামপত্রে লেখা আছ 'ঢাকা; প্রিন্টেড অ্যাট দি কাটরা প্রেস, ১৮৪৯'। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ১৮৪৮/৪৯ সালেই মুদ্রণযন্ত্র ছিল ঢাকায়। ছোট কাটরায় সদর দফতর ছিল তখন ব্যাপটিস্ট মিশনারিদের। এ সূত্র ধরে পরবর্তীকালে ব্রিটিশ লাইব্রেরির উপপরিচালক গ্রাহাম শ' ঢাকায় মুদ্রিত প্রথম বাংলা বইটি খুঁজে বের করেন। এটিও ছাপা হয়েছিল কাটরায়। ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়, প্রথমে ছাপা হয়েছিল রিপোর্টটি, তারপর বাংলা (ইংরেজিসহ) বইটি। কারণ রিপোর্টটি ছিল জরুরি। এ পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে ১৮৪৯ সালে কাটরা প্রেস থেকে ইংরেজি ভাষায় মুদ্রিত ব্যাপটিস্ট মিশনারিদের রিপোর্টটিই হচ্ছে ঢাকায় মুদ্রিত প্রথম বই।

এ প্রসঙ্গে ঢাকা থেকে মুদ্রিত প্রথম পুস্তিকাটির বিষয়বস্তু প্রসঙ্গে কিছু উল্লেখ করছি। ঢাকার আদি মিশনারিদের ইতিহাস রচনার জন্য এ তথ্য গুরুত্বপূর্ণ।

উনিশ শতকের চল্লিশ দশকে পূর্ববঙ্গে মিশনারির সংখ্যা ছিল নগণ্য। এ কারণে ঢাকার কয়েকজন মিশনারি অনুরোধ জানিয়েছিলেন সুইজারল্যান্ডের ব্যাসেলে অবস্থিত জার্মান ইভানজেলিকাল সোসাইটিকে কয়েকজন প্রচারক পাঠাতে। সংস্থা ১৮৪৭ সালে তিনজন মিশনারি পাঠিয়েছিল ঢাকায়। এই তিনজনকে ঢাকায় প্রথমে বাংলা শেখানো হয়েছিল এবং তারপর পাঠানো হয়েছিল সংস্থার বিভিন্ন শাখায়।

১৮৪৭-৪৮ সালে মিশনের শাখা ছিল চারটি—ঢাকা, দয়াপুর, ত্রিপুরা এবং আসামের তেজপুর। ঐ বছর মিশনের বার্ষিক আয় ছিল ৬,৭৮৩ রুপি ও ব্যয় ৬,৩৩৮ রুপি।

মিশনের আটটি নিয়ম-কানুন ও উদ্দেশ্যের মধ্যে দুটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পূর্ববঙ্গে প্রটেস্টান্ট মতবাদ প্রচার করা এবং বিভিন্ন অঞ্চলে বেশ খানিকটা জায়গা নিয়ে মিশন স্থাপিত করা যেখানে চাষবাস করা যাবে, আবার প্রয়োজনে আশ্রয়ও দেয়া যাবে ধর্মান্তরিতদের।

১৮৪৭ সালে ঢাকার মিশনের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সেখানে প্রচারক ছিলেন দুজন—রেভারেন্ড এস বোস্ট ও রেভারেন্ড এফ লেহম্যান। ক্যাটিকিস্ট রত্নেশ্বর দাস। এখানে ঢাকা বিষয়ক রিপোর্টের উল্লেখযোগ্য অংশগুলি উদ্ধৃত করা হলো—

১১. সমাবেশে উপস্থিতির সংখ্যা প্রায় ২৫। আশা করা যাচ্ছে এদের মধ্যে কয়েকজন খুব শীঘ্রই খৃস্টধর্মে বিশ্বাসী হয়ে প্রকাশ্যে ঘোষণা দেবে। তিনজন প্রাপ্তবয়স্ক ও

তিনজন শিশুকে অভিসিঞ্চিত করা হয়েছে। এদের একজন বরিশালের এক তরুণ, দীর্ঘ পরীক্ষার পর ১৮৪৭ সালের সেপ্টেম্বরে তাকে গির্জায় গ্রহণ করা হয়েছে। সে এখন অন্য মিশনারিদের সহায়তা করছে।

১২. ধর্মান্তরিত আরেকজন হলো সন্ন্যাসী, ঈশ্বরের বাণী শুনে সে ঢাকায় এসে ধর্মান্তরিত হয়েছে। তার সঙ্গে ধর্মান্তরিত হয়েছে আরেক জন মহিলা, যাকে বিয়ে করেছে সন্ন্যাসীটি। এখন তারা বসবাস করে তাদের পুরনো জায়গা মুন্সীগঞ্জে। সেখানে সন্ন্যাসী তার পুরনো শিষ্যদের মাঝে প্রচার চালাচ্ছে।

১৩. পূর্বাঞ্চল, বিশেষ করে মেঘনার পুব ও পশ্চিম কূলে গত কয়েক বছর ধরে এক ধরনের ধর্মীয় উত্তেজনা টের পাওয়া যাচ্ছে। অনেকের কাছে সেখানে প্রতিমা পূজা অসার মনে হচ্ছে। বেশ কয়েকটি জায়গায় এক গুরুর অধীনে বিভিন্ন বর্ণের লোকেরা শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে। এই আন্দোলনের গুরুরা খৃস্টধর্মের বেশ কিছু নীতিমালা গ্রহণ করেছে; বর্ণপ্রথা লুপ্ত করা হয়েছে।

১৬. তত্ত্বাবধানের অভাবে, স্কুলটি যা এক বছর ধরে খোলা ছিল, গত মে মাসে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। শিশুদের ও অনাথদের জন্য দু'টি স্কুল খোলার প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। গরীব খৃস্টান পরিবারের তিনটি অনাথ শিশু নিয়ে অনাথ আশ্রমের কাজ শুরু হয়েছে।'

২. দয়াপুর

মিশনারি : রেভারেন্ড আর. বিয়ন

: রেভারেন্ড এফ. সাপার

১৭. শহরের পশ্চিমে প্রায় চৌদ্দ মাইল দূরে দয়াপুর, জে. পি. ওয়াইজের জমিনে এটি অবস্থিত। লম্বা ঘাস, সামান্য নীল আর ধান জন্মাতো এখানে। ওয়াইজ সাহেব দয়াপরবশত মিশনকে একশ' বিঘা জমি বিনা খাজনায় দিয়েছেন। ১৮৪৭ সালে সেখানে একটি বাংলো তৈরি করা হয় এবং অল্পদিনের জন্য মিঃ মের্ক সেখানে ছিলেন। মিঃ মের্ক তেজপুর চলে গেলে মিঃ বিয়ন তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। সুখের বিষয় এই যে, খুব স্বল্প সময়ে এখানে শুধু খৃষ্টানদের নিয়ে ছোট একটি গ্রাম স্থাপিত হয়েছে।

১. প্রতিমা পূজকদের মাঝে গসপেল প্রচার

১. দয়াপুরে যারা মিশনের বাংলো তৈরি করছে তাদের মাঝে নিয়মিত প্রচার করছি। এদের সংখ্যা হবে প্রায় চল্লিশ। খুব শীঘ্রই মনে হলো তাদের মধ্যে ছয়জন ঈশ্বরের বাণী অনুধাবন করছে। অন্যরা একটু ভীতু। আবার আরেক দল তাদের বাধাও দিতে লাগল। একবার এরকম দু'জনকে নিয়ে প্রচার করে জিজ্ঞেস করা হয়, 'কোথায় তোমার যীশু? তোমায় রক্ষা করতে তো এগিয়ে আসছে না?' তারা বলল, আসবেন। পরে তারা পালিয়ে মিশনে চলে আসে। এমনকি যারা মজুর হিসেবে কাজ করতে ইচ্ছুক তাদেরও বাধা দেয়া

হচ্ছে। বিশেষ করে শ্যামপুর, ফুলবাড়িয়া আর মুসুরিখোলার লোকজন ক্রুদ্ধ। আমাকে তারা বলে পাঠিয়েছে দযাপুর ত্যাগ না করলে আমার বাংলো পুড়িয়ে দেবে।

অবশেষে ১৩ জন ধর্মান্তরিত হল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল প্রায় ৫০ জন নেটিভ।

বাংলা ভাষাটি মোটামুটি আয়ত্ত করে নিয়েছি। ডাঃ ওয়াইজের দয়ায় চিকিৎসার কিছু সরঞ্জামাদি পেয়েছি এবং তা ব্যবহারের কারণে বেশ কিছু দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেল।

এপ্রিলে আমি গেলাম শ্যামপুর। চড়কমেলা উপলক্ষে সেখানে তখন প্রচুর জনসমাগম হয়েছিল। আমজনতার মাঝে হঠাৎ আমি উঠে দাঁড়িয়ে প্রচার শুরু করলাম এবং অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম এবার আর আমার বিরোধিতা কেউ করল না। সে থেকে আমার বিরুদ্ধাচরণ আর করা হয়নি। এপ্রিল মাসেই আরো তেরজনকে ধর্মান্তরিত করলাম। আমার ক্যাচেকিস্টসহ শ্যামপুর, সাভার, মাথাপুর, কলাতিয়া, মুসুরিখোলা এবং মীরপুরে গেলাম প্রচারের জন্য।

খামার

বেশ কষ্ট করে ১০০ বিঘা জমি পরিষ্কার করে তুলা চাষ করলাম। ফসল বেশ ভালোই হচ্ছিল কিন্তু গত বছর বন্যায় তা তলিয়ে যায়। আবার চাষ করা হয়েছে। এখন বসে আছি ফলের অপেক্ষায়। এছাড়া লাগিয়েছি ২০০ কাঁঠাল গাছ ও কয়েক হাজার সুপারি গাছ। আলু, তরমুজও লাগিয়েছি।

রিপোর্টের শেষাংশে সংযোজিত হয়েছে রেভারেন্ড বোস্ট এবং বিয়নের প্রচার বিষয়ক সংক্ষিপ্ত জার্নাল।

বাংলা বই

১৮৪৯ সালে ঢাকার কাটরা প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়েছিল একটি ইংরেজি-বাংলা পুস্তিকা। বইট সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় রচিত বা বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত নয়। কিন্তু বইয়ের বেশ বড় অংশ জুড়ে ব্যবহৃত হয়েছে বাংলা অক্ষর। সে হিসেবে বইটিকে বাংলা বই হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। কারণ, পূর্ববঙ্গে এর আগে কোনো মুদ্রিত বইয়ে বাংলা অক্ষর ব্যবহৃত হয়নি। বইটির নাম—

'Scriptural Riddles in Bengali, Rendered into English Verse, with English Notes & c -ধর্ম পুস্তক সম্বন্ধীয় প্রহেলিকা ও ইংরেজি কবিতা ছন্দে অর্থযুক্ত তর্জমা।' এস বারোইরো রচিত পুস্তিকাটির আকার ষোল পৃষ্ঠার ফর্মার, পৃষ্ঠার সংখ্যা ৫১। 'প্রহেলিকা' শুধু ঢাকার নয়, পূর্ববঙ্গে বা বাংলাদেশে মুদ্রিত প্রথম বাংলা বই। এ বইটি খুঁজে বের করার কৃতিত্ব লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির উপপরিচালক, গবেষক গ্রাহাম শ'য়ের।

মূলত খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের জন্যই রচিত হয়েছিল পুস্তিকাটি। চব্বিশটি ধাঁধা (প্রহেলিকা) সঙ্কলিত হয়েছে এ পুস্তিকায়। প্রথমে দেয়া হয়েছে বাংলা ভাষ্য তারপর

ইংরেজি। প্রতিটি 'প্রহেলিকা'র টীকা দেয়া হয়েছে ইংরজিতে, যা ধাঁধাগুলির চেয়েও দীর্ঘ, চার থেকে দশ লাইনের মধ্যে। লেখক লিখেছেন প্রহেলিকাগুলি মূল বাংলা ভাষায় রচিত, তিনি এর ইংরেজি অনুবাদ করেছেন। কিন্তু ভাষা দেখে মনে হয়, তা ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে।

লেখক ভূমিকায় লিখেছেন, 'আদতে কিছু দেশী খ্রিষ্টানের জন্য রচিত হয়েছিলো' এগুলি। এখন সঙ্কলন আকারে তা প্রকাশের কারণ, যাতে তা দেশীয়দের চোখে পড়ে বা তাঁর ভাষায় 'বিধর্মীদের চোখে পড়ে'। কবিতায় ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে সঙ্কলক লিখেছিলেন, এর কারণ দেশীয়দের কবিতার প্রতি আকর্ষণ 'প্রবল' এবং ধাঁধাগুলি যাতে একই ধাঁচের বা বিরক্তিকর না হয়ে ওঠে তার জন্য পাঠকদের আশ্বস্ত করে তিনি লিখেছেন, এর অনেকগুলির সমাধান সহজ।

বারোইরোর পরিচয় জানা যায়নি। গ্রাহাম শ' মনে করেন, তিনি বাঙালি। কিন্তু লেখকের বাংলা ও ইংরেজি দেখে মনে হয় না তিনি বাঙালি। ঢাকায় ঐ সময় এতো ভালো ইংরেজি ও বাংলা জানা দেশী খ্রিস্টান পাওয়া সম্ভব ছিল বলে মনে হয় না। এখানে বারোইরোর রচনার দু'একটি উদাহরণ দিচ্ছি—

শরীর জন্যে শরীর হইল তাতে শরীর
চেতন পাইল
সে শরীর শরীর শিরোমণি।
যদি আপন হইতে শরীর হয় তাতে কেবল
শরীর ক্ষয়
শরীর বিনা শরীর দুঃখিনী ॥

For the Body, behold a
body made,
From it the Body had it
vigour chief;
And that Body became
the Bodys head,
without that Body, this
all weakness, grief!

বা

প্রথম হইতে দ্বিতীয় হইয়া হইল ভিন্ন বাস
তিনেতে চারি হইল ক্ষিতিতে বিশ্বাস।
চতুর্থের বিবরণ আছে কিছু চমৎকার
তৃতীয়তে উদয় হইয়া হইল একাকার।
যদ্যপি কিছুকাল প্রথম ছিল ভিন্ন

শেষকাল একই ভাব একই তিনের চিহ্ন।
চতুর্থে আর এক হইল অস্পষ্ট তাঁর ভাব
দ্বিতীয় জনের স্বভাব বটে ফলেতে অলাভ।
উভয়তে এক আত্মা হওয়াতে নির্ভর
মূলকে তাড়না তাঁরা করিল বিস্তর ॥

Sprung from the first the second liv'd alone;
Thus from three, Four faiths in world were known.
the fourth's history is somewhat uncommon;
From the third produced,
at last both were one.
Tho' for a time the first estranged became.
Three at the last assumed a comon name.
Worse than useless one from the fourth arose,
Not professing, the Second's temper shews:
Governed by one passion they the great Root,
In various war, did greatly persecute.

বারোইরো বইটির ভূমিকায় লিখেছেন—

গ্রন্থকারের ইংরেজি এবং কাব্য প্রচেষ্টা দু'ক্ষেত্রেই খুঁত থাকতে পারে...পাঠকরা যা বিবেচনা করবেন ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে যখন তারা দেখবেন যে, একজন অনুবাদককে কত প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয় এবং লেখক যেখানে নিজেকে কবি হিসেবেই বিবেচনা করেন না।

বারোইরো রচিত আর কোনো পুস্তিকার সন্ধান পাওয়া যায়নি।

কবিতাপত্র

কবিতার প্রতি বাঙালির আকর্ষণ যে কী দুর্মর তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে উনিশ শতকে ঢাকা থেকে মুদ্রিত বইপত্র পর্যালোচনা করলে। উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গে বা আরো নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে ঢাকায় যে পরিমাণ বই প্রকাশিত হয়েছিল তার সিংহভাগ ছিল কবিতা। সেই ১৮৭০ সালে, ঢাকার একটি সংবাদপত্র মন্তব্য করেছিল,

"এখন এদেশে পদ্য পুস্তকের একপ্রকার স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। সে সকলের আয়তন অতি ক্ষুদ্র। কোনখানি ১২ পৃষ্ঠা, কোনখানি ১৮ পৃষ্ঠা, কোনখানি ২৪ পৃষ্ঠা, উর্দ্ধ সংখ্যার ৩৬ পৃষ্ঠার পরিমিত। এইরূপ আয়তনের পুস্তকে কি কি বিষয় কি রূপ লেখা হয়, তাহাও পাঠকবর্গকে জানান কর্তব্য। উহার অধিকাংশের লিখিত ছন্দই, পয়ার, ত্রিপদী

একাবলি, তোটক এবং মধ্যে ২/৪ পঙ্‌ক্তি অমিত্রাক্ষর। ইহা ব্যতীত আর কতগুলি ছন্দ আছে, তাঁহার নাম জানি না। তাহা ত্রিপদী পয়ার প্রভৃতির ৫/৭ পঙ্‌ক্তি একত্র রচিত হয়। সেই সকল ছন্দের কলেবর বৃদ্ধির নিয়ম বা পরিমাণ নাই।"

সুতরাং আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে, ঢাকার বাংলা মুদ্রণ শুরু হয়েছিল কবিতাপত্র দিয়েই।

ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম কবিতাপত্রের নাম 'কবিতা কুসুমাবলী'। প্রকাশিত হতো 'বাঙ্গালা যন্ত্র' থেকে। এখানে উল্লেখ্য যে, ঢাকা শহর থেকে প্রকাশিত প্রায় চারটি সাময়িকপত্রের মধ্যে তিনটিই ছিল কবিতা বিষয়ক এবং তিনটির মধ্যে দুটির সঙ্গেই জড়িত ছিলেন কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ও হরিশচন্দ্র মিত্র।

'কবিতা কুসুমাবলী' প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬০ সালে (জ্যৈষ্ঠ, ১২৬৭ সন)। প্রথম বছর পত্রিকাটি সম্পাদনা করেছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার; তারপর খুব সম্ভব হরিশচন্দ্র মিত্র এবং শেষে প্রসন্ন কুমার সেন। কৃষ্ণচন্দ্র লিখেছেন, "আমি, হরিশ্চন্দ্র মিত্র এবং প্রসন্ন কুমার সেন— এই তিনজন ক্রমে 'কবিতা কুসুমাবলী' প্রকাশ করিতে আরম্ভ করি। বছর খানেক উহা আমি চালাইয়াছিলাম।" 'কবিতা কুসুমাবলী'র প্রথম পৃষ্ঠার শিরোনামে লেখা থাকত—

"কবিতা কুসুমাবলী মাসিক পত্রিকা
সন্তোষয়তু সর্ব্বেষাং সতাং চিত্র মধু ব্রতনি।
নানা রস সমাপীনা। কবিতা কুসুমাবলী।"

প্রথমদিকে, 'কবিতা কুসুমাবলী'র আকার ছিল 'রয়েল আটাংশির এক ফর্মা' দ্বিতীয় সংখ্যা ছিল দু'ফর্মার। বার সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছিল মোট ১৭২ পৃষ্ঠা। প্রথম সংখ্যার মূল্য ছিল দেড় আনা। কিন্তু দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে দাম বাড়ানো হয়েছিল এক আনা এবং অগ্রিম বার্ষিক মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছিল দেড় টাকা।

'কবিতা কুসুমাবলী'র প্রথম সংখ্যায় খুব সম্ভব শুধু পদ্যই ছাপা হয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে পরিবর্তন হয়েছিল নীতির। কিছু গদ্য রচনাও স্থান পাচ্ছিল। ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যায় একটি বিজ্ঞাপনে দেখি লেখা হয়েছে—"কবিতা কুসুমাবলীর প্রথম সংখ্যা প্রচারিত হইলে অনেক সহৃদয় ব্যক্তি এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, কেবল কবিতার কলাপে পরিপূর্ণ হইলে কবিতা কুসুমাবলী সাধারণের সম্যক হৃদয়গ্রাহিণী হইতে পারিবে না। ইহাতে সময় সময় গদ্যেও কোন কোন প্রবন্ধ প্রকটিত হইলে ভাল হয়; আমরাও বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, তাঁহাদিগের অভিপ্রায় নিতান্ত সুসঙ্গত। কেননা জগতে সমুদয় লোকের মনের গতি সমান নহে। কেহবা কবিতাকলাপের মকরন্দ পানে, সমুৎসুক। কেহবা সুললিত গদ্য পাঠে অনুরক্ত, কেহবা গদ্য পদ্য উভয়েরই রসাস্বাদনে প্রীতি প্রকাশ করিয়া থাকেন। সুতরাং কোন পত্রিকা নিরবচ্ছিন্ন পদ্যে অথবা গদ্যে পরিপুরিত হইলে সমুদয় পাঠকের মানসিক সুখোৎপত্তির সম্ভাবনা নাই। অতএব আমাদের একান্ত ইচ্ছা এই পত্রিকাখানি গদ্য পদ্য উভয়েই অলঙ্কৃত করি।

১৫ই আষাঢ় ১৭৮২ শক — শ্রী হরিশচন্দ্র মিত্র
ঢাকা বাঙ্গালা যন্ত্র — প্রকাশক।"

পত্রিকা প্রকাশকের মতে. পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা ছিল চারশ'র মতো। কিন্তু মনে হয় এ সংখ্যাটি অতিশয় অতিরঞ্জিত। পত্রিকাটি তিন বছরের বেশি টিকে ছিল কিনা জানা যায়নি। দ্বিতীয় বর্ষে গদ্য রচনা খুব সম্ভব হ্রাস পেয়েছিল। এ প্রসঙ্গে প্রকাশক হরিশচন্দ্র মিত্র লিখেছিলেন—

"কবিতা কুসুমাবলীর দ্বিতীয়ভাগ প্রচারণে প্রবৃত্ত হওয়া গেল। এইক্ষণ অবধি ইহা প্রতি মাসের বিংশতি দিবসে নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইয়া গ্রাহকগণের সমীপস্থ হইবে। যদ্যপি কখন কোন অপ্রতিকার্য্য দৈবদুর্ঘটনা উপস্থিত না হয়, ভরসা করি, এ প্রতিজ্ঞান অন্যথা হইবেক না।

"বিগত বর্ষের জ্যৈষ্ঠ মাসে এই পত্রিকা প্রথম জন্মগ্রহণ করত কিছুকাল নিয়মিত রূপে প্রচারিত হইয়া পশ্চাৎ নানা কারণবশতঃ কিয়ৎকাল অনিয়মিতরূপে প্রকাশিত হয়। তন্নিবন্ধন গ্রাহকগণমধ্যে অনেকে কবিতা কুসুমাবলীকে সংশয়িত জীবন বোধ করিযাছিলেন। যাহা হউক এক্ষণে জগদীশ্বরের ইচ্ছায় কতিপয় বন্ধু বিশেষ আনুকূল্য করিয়া ইহার জীবন রক্ষণে অস্বীকৃত হইয়াছেন বলিয়াই আমরা ইহার পুনঃপ্রচারণে সাহস করিলাম। এক্ষণে গ্রাহকগণ সানুকল্প ব্যবহার করিলেই বোধহয় আর এই পত্রিকাকে সংশায়িতপ্রাণা হইতে হইবে না।

গত বর্ষে যে প্রণালীতে এতৎপত্রিকার রচনাকার্য্য সম্পাদন করা গিয়াছে, এবারেও সেই প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে। বিশেষের মধ্যে এই যে প্রথমভাগের মধ্যে গদ্য প্রবন্ধেরও সন্নিবেশ করা যাইত, এবারে সেই নিয়মটি প্রায় অবলম্বন করা যাইবে না। যেহেতু আমাদের গ্রাহকবর্গের মধ্যে অনেকেই কবিতা কুসুমাবলীতে সমধিক কবিতা দর্শনের স্পৃহা রাখেন এবং স্পৃহা পরিপূরণার্থ আমাদিগকে ভূয়োভূয়ঃ অনুরোধ করিয়াছেন।"

কেদারনাথ মজুমদারের গ্রন্থে 'কবিতা কুসুমাবলী'র তিনটি কবিতা ও একটি গদ্য রচনা উদ্ধৃত হয়েছিল। তবে কোনটি কোন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল তা তিনি উল্লেখ করেননি। এখানে তা সংকলিত হলো—

১। কবিতা আলোচনার আবশ্যক

কবিতা পাঠ প্রলভনীয় সমুদায় ফলবত্তা প্রলাভ করা যাইতে পারে বঙ্গ ভাষায় এরূপ বিশুদ্ধ কাব্যের সংখ্যা অত্যল্প দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বতন বঙ্গীয় কবিগণ যে সমস্ত কাব্য প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই উলঙ্গ আদিরস দোষে দোষিত। তৎপাঠে উপকার হওয়া দূরে থাকুক প্রত্যুত প্রভূত অপকারেরই সম্ভাবনা। অতএব অধুনা দেশমধ্যে অভিনব কাব্যকলা বিভাসিত হইয়া জনসমাজের কল্যাণ বিধান করে, ইহা নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। এই বাঞ্ছিত বিষয়ের সুসিদ্ধি সম্পাদনে আধুনিক বহুল মার্জ্জিত বুদ্ধি কোবিদ্‌গণ লেখনী ধারণ করিয়াছেন, আমাদের কবিতা কুসুমাবলীও তাঁহাদিগের সহকারিতা সাধনোদ্দেশ্যে বিকশিতা হইয়াছে। ফলতঃ বঙ্গীয় কবিতার উৎকর্ষ সাধন ও বিশুদ্ধ কাব্যকলা প্রচার দ্বারা জনমণ্ডলীর কল্যাণ বর্দ্ধনই এতৎ পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য।

২। সুরা মাহাত্ম্য

হায় হায় বিখ্যাত বিদ্বান লোক যাঁরা
সুরাব প্রধান ভক্ত হয়েছেন তাঁবা ॥
কেহ কেহ সুরাপাত্রে মত্ত হয়ে বলে
'রিফরম' বিরাজিত সদা লাল জলে ॥

৩। চাকুরী সমস্যা

দশ টাকার রাইটারী যদি হয় খালি।
ওমেদার মিলে তার কত শত জানি ॥
কি করিবে সুবিদ্যায় কি করিবে গুণে।
নির্গুণ সুপদ পায় মুরুব্বির গুণে ॥

৪। পূজা বাড়ী

চণ্ডী মণ্ডপেতে বসি ব্রাহ্মণ নিকরে।
"যাদেবী সর্ব্বভূতেষু" বলে চণ্ডী পাঠ করে ॥
....
সাহেবের খানা দিতে যেমন উৎসুক।
ব্রাহ্মণ ভোজনে তার নয় ততটুকু ॥
সাহেবানা পছন্দেতে সাজায়ে টেবিল
বসেন আমোদে মেতে যতেক ডেবিল ॥
গৌরাঙ্গিণী দুর্গার পূজায় নাহি মন।
শ্বেতাঙ্গিনী সেবায় সর্ব্বস্ব করে পণ ॥

সংবাদপত্র

'ঢাকা নিউজ' শুধু বাংলাদেশের প্রথম ইংরেজি সাপ্তাহিক সংবাদই নয়, ঢাকার প্রথম সংবাদপত্রও বটে। ঢাকা শহরের ইংরেজ, আর্মেনী ও অবাঙালি জমিদার ও নীলকররা নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য প্রকাশ করেছিলেন সাপ্তাহিকীটি।

'ঢাকা নিউজ'-এর প্রথম সংখ্যা ছাপা হয়েছিল ১৮ই এপ্রিল, ১৮৫৬ সালে। প্রথমে পত্রিকাটি ছিল এক পাতার। ১৩ নম্বর সংখ্যা থেকে পত্রিকার পাতা বৃদ্ধি পেয়েছিল ৪ পৃষ্ঠায় এবং সঙ্গে থাকত 'সাপ্লিমেন্ট' যেখানে চলতি বাজার দরই ছিল মুখ্য। দ্বিতীয় খণ্ড পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছিল ৮ পৃষ্ঠায়।

'ঢাকা নিউজ' প্রকাশিত হতো প্রতি শনিবার। চাঁদার হার ছিল বার্ষিক ২ রুপি ৮ আনা এবং তা পরিশোধ করতে হতো অগ্রিম। প্রতি সংখ্যার দাম ছিল দু'আনা। বিজ্ঞাপনের হার ছিল লাইন প্রতি দু'আনা এবং এক টাকার নিচে কোনো বিজ্ঞাপন গ্রহণ

করা হতো না। পত্রিকার অধিকাংশ খবরের বিষয়বস্তু ছিল নীল এবং নীলকর। এছাড়া চিঠিপত্র এবং আঞ্চলিক কিছু খবরও থাকত। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের সময় ঢাকা নিউজ জোরালো সমর্থন জানিয়েছিল ইংরেজদের। পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় থাকত বিজ্ঞাপন (সংখ্যা অবশ্য ছিল খুবই কম), শেষের দিকে থাকত 'কমার্শিয়াল' শিরোনামে নীল ও কুসুম ফুলের চলতি বাজার দর।

'ঢাকা নিউজ' ছাপা হতো 'ঢাকা প্রেস' থেকে যার মালিক ছিলেন পাঁচজন। পত্রিকাটির মালিকও ছিলেন খুব সম্ভবত এই পাঁচজন। এঁরা ছিলেন এ এম ক্যামারুন, এন পি পোগজ, জে এ গ্রেগ, জে পি ওয়াইজ এবং কে এ গনি। আর্মেনী পোগজ, ইংরেজ ওয়াইজ ও কাশ্মিরি গনি ছিলেন জমিদার। বাকি দুজনের পরিচয় জানা যায়নি।

৩০শে নভেম্বর, ১৮৫৮ সালে পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থাপনা-ভার পরিবর্তিত হয়েছিল। খুব সম্ভব ১৮৬৯ সালে 'ঢাকা নিউজ' প্রকাশ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং এ পত্রিকার ব্যবস্থাপনা পরিষদই হয়তো নতুন একটি পত্রিকা 'বেঙ্গল টাইমস' প্রকাশ শুরু করেছিল।

'ঢাকা নিউজি'-এর সম্পাদক ছিলেন আলেকজাভার ফর্বেস। সম্পাদক হওয়ার আগে কাজ করেছিলেন তিনি দ্বারকানাথ ঠাকুরের রেশমের কুঠিতে, আলিমিয়ার (ঢাকার জমিদার) জমিদারিতে এবং ঢাকা ব্যাংকে। পরে তিনি 'ঢাকা নিউজ'-এর সম্পাদিকতা ত্যাগ করে কলকাতার 'হরকরা' পত্রিকার সম্পাদনা-ভার গ্রহণ করেছিলেন।

ফর্বেস যখন 'ঢাকা নিউজ' প্রকাশ শুরু করেছিলেন তখন সম্মুখীন হয়েছিলেন বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতার। 'ঢাকা নিউজ'-এর প্রথমদিককার বেশ কিছু সংখ্যায় এর বিবরণ পাওয়া যায়।

'ঢাকা নিউজ'-এর একটি সংখ্যায় ফর্বেস লিখেছিলেন, 'পৃথিবীর একেবারে প্রত্যন্ত প্রান্তে না হোক, প্রত্যন্ত প্রান্তে তো বটেই, আমরা স্থাপন করেছিলাম একটি মুদ্রণযন্ত্র। আমাদের কাছে তখন ছিল না কোন কম্পোজিটর বা প্রিন্টার। এদের সবাইকে তৈরি করতে হয়েছে আমাদের।' এখানে উল্লেখ্য যে প্রথম তেরটি সংখ্যা পর্যন্ত প্রিন্টারের নাম পাচ্ছি একজন বাঙালির শ্রীনাথ দত্ত, হয়তো ফর্বেস এঁকে কাজ শিখিয়েছিলেন হাতে-কলমে। ফর্বেস আরো লিখেছিলেন, প্রথম সংখ্যাটির কম্পোজ, প্রুফ, মুদ্রণ সব ক্ষেত্রেই তাঁকে হাত লাগাতে হয়েছিল। তাছাড়া কলকাতার মতো যেহেতু মুদ্রণ ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি তখনও, তাই প্রেসে ব্যবহৃত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রও ছিল না ঢাকায়। ১৮৫৬ সালের 'ঢাকা নিউজ'-এর একটি সংখ্যায় দেখি সম্পাদক জানাচ্ছেন যে, টাইপের অভাবে একটি রিপোর্ট তিনি ছাপতে পারেননি। পরের স্টিমারে কিছু টাইপ আসছে। আশা করা যাচ্ছে তখন আর অসুবিধা হবে না। আরেকবার দেখা গেল, দুটি গ্যালি হারিয়ে (বা চুরি হয়ে) গেছে এবং জানানো হচ্ছে ঐ গ্যালি দুটির সন্ধান কেউ দিতে পারলে তাকে পুরস্কৃত করা হবে।

'ঢাকা নিউজ' টিকে ছিল প্রায় ১৩ বছরের মতো। 'সোমপ্রকাশ' যদিও উল্লেখ করেছিল, ঐ পত্রিকাখানি থাকাতে অনেক কুক্রিয়াশীল ব্যক্তি দমনে ছিল কিন্তু আসলে

পত্রিকাটি সব সময় নীলকরদেরই সমর্থন করেছিল বা দেখছিল ভূস্বামীদের স্বার্থ। এ কারণে অনেক সময় পত্রিকাটিকে 'প্ল্যান্টার্স জার্নাল'ও বলা হতো।

বাংলা সংবাদপত্র

উনিশ শতকে ঢাকা তথা পূর্ববঙ্গ থেকে যেসব পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল 'ঢাকা প্রকাশ' ছিল তার মধ্যে অন্যতম। শুধু তাই নয়, 'ঢাকা প্রকাশ' ঢাকার প্রথম বাংলা সংবাদপত্র। আরো উল্লেখ্য, পূর্ববঙ্গ বা বাংলাদেশে 'ঢাকা প্রকাশ'-এর মতো এত দীর্ঘদিন ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে আর কোনো সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়নি। উনিশ শতকের ষাট দশকে প্রকাশিত হওয়ার পর পত্রিকাটি টিকে ছিল প্রায় একশ' বছর—এ শতকের ষাট দশক পর্যন্ত। এছাড়া গ্রাহক সংখ্যাকে যদি আমরা জনপ্রিয়তার মাপকাঠি হিসেবে ধরি তাহলে দেখব 'ঢাকা প্রকাশ' ছিল ঐ সময়ের একটি জনপ্রিয় সংবাদপত্র। পত্রিকা প্রকাশের পরে এর প্রচার সংখ্যা ছিল আড়াইশ।[১] এবং নব্বই দশকে হিন্দু পুনরুত্থানবাদীদের আন্দোলনের সময় এর প্রচার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছিল পাঁচ হাজারে। সরকারও গুরুত্ব দিতেন 'ঢাকা প্রকাশ'কে। উনিশ শতকে 'রিপোর্ট অন নোটিভ পেপার্স'-এ পূর্ববঙ্গের পত্রপত্রিকার মধ্যে প্রায় ক্ষেত্রেই 'ঢাকা প্রকাশ'-এর সংবাদ বা মতামত সংকলিত হতো।

'ঢাকা প্রকাশ'-এর সঙ্গে জড়িত 'বাঙ্গালা যন্ত্র'-এর নাম। 'বাঙ্গালা যন্ত্র' ছিল ঢাকার প্রথম বাংলা মুদ্রণযন্ত্র। এ প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়েছিল পূর্ববঙ্গের প্রথম সাময়িকপত্র মনোরঞ্জিকা। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ'ও মুদ্রিত হয়েছিল এখানে। বস্তুত এ মুদ্রণযন্ত্রটি ঢাকার চিন্তারাজ্যে বিপ্লবের সূচনা করেছিল। কারণ, 'বাঙ্গালা' যন্ত্র থেকে শুধু 'ঢাকা প্রকাশ'ই নয়, অন্যান্য বইপত্রও মুদ্রিত হতে থাকে এবং এতে উৎসাহিত হয়ে কয়েক বছরের মধ্যে আরো কয়েকজন ঢাকায় স্থাপন করেছিলেন মুদ্রণযন্ত্র। শুরু করেছিলেন পত্রপত্রিকার প্রকাশ।

'বাঙ্গালা যন্ত্র' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কে বা কারা? এ সম্পর্কে আমরা যা জানতে পারি তা হলো—ঢাকা জিলার সদর উপরিভাগান্তর্গত তেঁতুলঝোড়া গ্রামবাসী স্বনামখ্যাত ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র, ধামরাই গ্রামবাসী বিদ্যালয়সমূহের ডিপুটি ইন্সপেক্টর ও পরবর্তী ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বাবু দীনবন্ধু মৌলিক এবং বিক্রমপুরান্তর্গত রাঢ়িখালি গ্রামবাসী বিজ্ঞানাচর্য স্যার জগদীশচন্দ্রের পিতা ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বাবু ভগবানচন্দ্র বসু ও তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক ঈশ্বরচন্দ্র বসু, মালখানগরবাসী ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বাবু রামকুমার বসু প্রমুখ-এর উদ্যোগ ও যত্নের ফলেই বিগত ১২৬৬ সনে ইং ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে তৎকাল প্রচলিত একটি মুদ্রণ যন্ত্র (চিলাপ্রেস) ও অক্ষরাদি আনীত হইয়া 'বাঙ্গালা যন্ত্র' নামে.ঢাকা নগরীর বাবুর বাজারে প্রতিষ্ঠিত হয়।

উপরোক্ত সবাই ছিলেন ব্রাহ্ম মতে বিশ্বাসী। নিজেদের মতামত বা বিশ্বাস প্রচারের

কারণে হয়তো তাঁরা ভেবেছিলেন নিয়মিত কিছু প্রকাশ করার। যৌথ মালিকানার এই প্রেস থেকে পরিচালকরা প্রথমে কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় প্রকাশ করেছিলেন পূর্ববঙ্গের প্রথম সাময়িকপত্র 'মাসিক মনোরঞ্জিকা'। ১২৬৭ সনের শেষার্ধে নীলকরদের অত্যাচার সম্বন্ধে পরিচালক ও পৃষ্ঠপোষকগণের মধ্যে মতভেদ হওয়াতে 'মাসিক মনোরঞ্জিকা' উঠে যায়। এবং "উহার পৃষ্ঠপোষক ও পরিচালকগণ একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশে কৃতসংকল্প হন এবং তাহারই ফলে বিগত ১২৬৭ সালের ২৪শে ফাল্গুন বৃহস্পতিবার 'ঢাকা প্রকাশ' জন্মগ্রহণ করে।"

'ঢাকা প্রকাশ' প্রকাশনার ব্যাপারে পরিচালকদের যে ব্রাহ্ম মত প্রকাশের ব্যাপারটি উৎসাহিত করেছিল এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। প্রথম কয়েক বছরের 'ঢাকা প্রকাশ' দেখলে এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এবং 'ঢাকা প্রকাশ'-এর এ ভূমিকা বিরোধিতা করার জন্য গোঁড়া হিন্দুরাও পত্রিকা প্রকাশে বাধ্য হয়েছিলেন। এ ছাড়া, কলকাতার 'সোমপ্রকাশ'ও প্রভাবিত করেছিল পরিচালকদের। 'ঢাকা প্রকাশ' নামকরণ থেকে এর পরিচালনা, রচনা পদ্ধতিতে এ প্রভাব স্পষ্ট।

প্রথমে, 'ঢাকা প্রকাশ' সপ্তাহে 'গুরুবারে' অর্থাৎ বৃহস্পতিবারে প্রকাশিত হতো। সাপ্তাহিকটির প্রথম পৃষ্ঠার ওপরে 'ঢাকা প্রকাশ' এবং তার নিচে ছোট টাইপে লেখা থাকত 'সাপ্তাহিক' শব্দটি। এর নিচে মুদ্রিত হতো একটি ঋষিবাক্য—'সিদ্ধিঃ সাধ্যে সমামস্তু।' পরে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল—'প্রসাদাদিহ ধূর্জ্জটেঃ'। প্রথম বছর পত্রিকা রয়েল আকারে দু'ফর্মা বা আট পৃষ্ঠার ছিল। ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক মূল্য ছিল পাঁচ টাকা।

পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠার বাঁ দিকে থাকত বিজ্ঞাপন। ডান দিকে মাঝে মাঝে থাকত সম্পাদকীয় বা গুরুত্বপূর্ণ কোনো খবর বা বিশেষ কোনো বিষয়ের ওপর পত্রিকার নিজস্ব মতামত। এরপর ছিল 'সম্বাদাবলী' (বা সংবাদাবলী)। এই বিভাগে বিভিন্ন পত্রপত্রিকা থেকে বা নিজেদের সংগৃহীত সংবাদ ছাপা হতো। এ ছাড়া নিয়মিত ছাপা হতো চিঠিপত্র। সমকালীন সামাজিক ইতিহাসের জন্য এই বিভাগটি গুরুত্বপূর্ণ।

'ঢাকা প্রকাশ'-এর পরিচালকগণের মধ্যে ছিলেন ব্রজসুন্দর মিত্র, দীনবন্ধু মৌলিক, ঈশ্বচন্দ্র বসু, চন্দ্রকান্ত বসু প্রমুখ এবং সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার। সেই থেকে ঢাকা প্রকাশের সম্পাদক/মালিকানা অনেকবার বদল হয়েছে কিন্তু এর প্রকাশ ছিল অব্যাহত এবং কালক্রমে পূর্ববঙ্গে প্রধান পত্রিকা হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল 'ঢাকা প্রকাশ'। তবে প্রথমদিকে, "বিদ্যালয়সমূহের ডিপুটি ইন্সপেক্টর দীনবন্ধু মৌলিক মহাশয়ের পদোচিত প্রতিষ্ঠার বলেই যে তখন ঢাকা প্রকাশের সমধিক প্রচার সম্ভব হইয়াছিল এরূপ অনুমান একেবারে অসঙ্গত নহে।"

উনিশ শতকের পূর্ববঙ্গের পত্রিকায় প্রায় ক্ষেত্রেই সম্পাদকের নাম নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হতো না। ফলে, কখন কে পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন তা নির্ণয় করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। 'ঢাকা প্রকাশ'-এর বেলায়ও সে কথা প্রযোজ্য। তবে পূর্ণচন্দ্রের প্রবন্ধের সাহায্যে আমরা 'ঢাকা প্রকাশ'-এর সম্পাদকদের নাম জানতে পারি।

যেমন, প্রথম সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের কথাই ধরা যাক। পত্রিকার চতুর্থ বর্ষ পর্যন্ত পত্রিকায় তাঁর নামই দেখা যায়। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—"সম্পাদকের দায়িত্ব মজুমদার মহাশয়ের উপর ছিল না। 'ঢাকা প্রকাশের' চতুর্থ বৎসর ২২ সংখ্যা পর্যন্ত তাঁহার নাম প্রকাশকরূপেই পাওয়া যায়। যিনি সম্পাদক ছিলেন তিনি 'ঢাকা প্রকাশের' দ্বিতীয় বর্ষের শেষাশেষি কর্মচ্যুত হন।" 'সোমপ্রকাশ' থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি তার বক্তব্যের যথার্থতা প্রমাণ করেছেন। কিন্তু আবার এও দেখা গেছে, পত্রিকা হেড কম্পোজিটরের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হচ্ছে। তবে, অন্যান্য সূত্র অনুযায়ী, প্রথম চার বছর কৃষ্ণচন্দ্রই ছিলেন সম্পাদক।

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের পর 'ঢাকা প্রকাশ'-এর সম্পাদক হয়েছিলেন দীননাথ সেন। খ্যাতির মধ্যগগনে তখনও তিনি পৌঁছাননি বটে কিন্তু একজন ব্রাহ্ম হিসেবে ঢাকা শহরে তিনি হয়ে উঠেছিলেন বেশ প্রভাবশালী। তাঁর সময় 'ঢাকা প্রকাশ' বৃহস্পতিবারের বদলে শুক্রবারে প্রকাশিত হতে থাকে এবং পঞ্চম বর্ষ থেকে প্রকাশিত হতে শুরু করে রোববার থেকে।

দীননাথ জন্মগ্রহণ করেছিলেন ঢাকার দাশরায় ১৮৩৯ সালে। কুমিল্লা জেলা স্কুলে এবং পরে ঢাকা কলেজ থেকে বিএ পরীক্ষা দিয়েছিলেন (বঙ্কিমচন্দ্রও সেবার পরীক্ষা দিয়ে কৃতকার্য হয়েছিলেন কিন্তু দীনানথ কৃতকর্ম হননি। ফলে শিক্ষক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে)। এর কিছুদিন পর নিযুক্ত হয়েছিলেন নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক। পূর্ববাংলার স্কুলসমূহের ইন্সপেক্টর হয়েছিলেন শেষ অবধি।

যৌবনেই দীননাথ আকৃষ্ট হয়েছিলেন ব্রাহ্মধর্মের প্রতি। ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ তথা পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা ও পাটুয়াটুলীতে (ঢাকার) পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্মমন্দির স্থাপনে পালন করেছিলেন তিনি অগ্রণী ভূমিকা। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন সংস্কারমূলক আন্দোলনেও তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। পরিণত বয়সে তিনি মত পরিবর্তন করেছিলেন। দীননাথ খুব সম্ভব সবচেয়ে স্বল্পকাল ছিলেন ঢাকা প্রকাশের সম্পাদক।

দীননাথের পর 'ঢাকা প্রকাশ'-এর সম্পাদনা-ভার গ্রহণ করেছিলেন ঢাকার আরেকজন ব্রাহ্মকর্মী গোবিন্দ প্রসাদ রায় (মাঝখানে জগন্নাথ অগ্নিহোত্রীর তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হয়েছিল পত্রিকা)। পত্রিকার মালিকানাও হাতবদল হয়েছিল তখন। গোবিন্দ প্রসাদ প্রথমে ছিলেন 'ঢাকা প্রকাশ'-এর বেতনভোগী কর্মচারী। পত্রিকা পঞ্চমবর্ষে পদার্পণ করলে তিনিই এর স্বত্ব কিনে নিয়েছিলেন (খুব সম্ভব বাঙ্গালা যন্ত্রসহ)। মহারানী ভিক্টোরিয়া যখন 'ভারতেশ্বরী' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন তখন এ উপলক্ষে দিল্লিতে যে দরবার (উৎসব) হয়েছিল তাতে পূর্ববঙ্গের একমাত্র পত্রিকা সম্পাদক হিসেবে তিনি আমন্ত্রিত হয়েছিলেন।

কিছুদিন পত্রিকা চালাবার পর গোবিন্দ প্রসাদ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন এবং তখন পত্রিকার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেছিলেন ঢাকা ব্রাহ্ম বিদ্যালয়ের শিক্ষক অনাথবন্ধু মৌলিক। দু'বছর সম্পাদনা করেছিলেন তিনি। তারপর গোবিন্দ প্রসাদ সুস্থ হয়ে আবার সম্পাদনা-ভার গ্রহণ করেছিলেন এবং সহকারী হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন পণ্ডিত বৈকুণ্ঠচন্দ্র নাথকে।

১২৮৯ সনে গোবিন্দ প্রসাদের মৃত্যু হলে 'ঢাকা প্রকাশ' ও 'বাঙ্গালা যন্ত্র'-এর দাযিত্ব গ্রহণ করেছিলেন তাঁর জামাতা যাদবচন্দ্র সেন। দু'বছর চালিয়েছিলেন তিনি পত্রিকা। কিন্তু প্রতিযোগিতায় না পেরে তিনি মানিকগঞ্জের অধীনে চারিপাড়া গ্রামবাসী তালুকদাব বাবু গুরুগঙ্গা আইচ চৌধুরীব কাছে প্রেস ও 'ঢাকা প্রকাশ'-এর স্বত্ব বিক্রি করে দিয়েছিলেন। ১২৯১ সালে তিন হাজার চারশ' পঞ্চাশ টাকার বিনিময়ে গুরুগঙ্গা 'বাঙ্গালা যন্ত্র' ও 'ঢাকা প্রকাশ'-এর মালিকানা কিনে নিয়েছিলেন।

১২৯২ সন পূজার পর তিনি পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত করেছিলেন পূর্ববঙ্গের তৎকালীন খ্যাতনামা কবি দিনেশচরণ বসুকে।

দিনেশচরণের জন্ম ১৮৫৯ সালে পূর্ণিয়াতে, পিতা অভয়চরণ বসুর কর্মস্থলে। তবে, পৈত্রিক বাড়ি তাঁর মানিকগঞ্জের শ্রীবাড়ীতে। ভাগলপুর থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাস করে তিনি ভর্তি হয়েছিলেন কলকাতা মেডিকেল কলেজে। কিন্তু শারীরিক কারণে আর তাঁর মেডিকেল পড়া হয়নি। তিনি চলে এসেছিলেন ময়মনসিংহে এবং শিক্ষকতা গ্রহণ করেছিলেন নাসিরাবাদ মাইনর স্কুলে। ১৮৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত 'ময়মন-সিংহ সভা'র ছিলেন তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ১৮৮১ সালের তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল, ময়মনসিংহ থেকে সাপ্তাহিক 'চারুবার্তা'। কবিতা উপন্যাস মিলিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর আটটি গ্রন্থ।

দিনেশচরণ পঞ্চাশ টাকা বেতনে নিযুক্ত হয়েছিলেন সম্পাদক। এ পত্রিকার কার্যালয় স্থানান্তরিত হয়েছিল বাবু বাজার থেকে ইসলামপুরে ১৬ নং বাড়িতে। তবে, দিনেশচরণ সম্পাদক ছিলেন মাত্র দু'মাস। এরপর ব্যক্তিগত কারণে তিনি পদত্যাগ করেছিলেন এবং তখন স্বয়ং গুরুগঙ্গা নিজে ভার গ্রহণ করেছিলেন পত্রিকার এবং এ সময়ই বদল ঘটে পত্রিকার দৃষ্টিভঙ্গির। কারণ, গুরুগঙ্গা ছিলেন গোঁড়া হিন্দু।

১২৯৩ সনের আষাঢ় মাসে তিনি ঘোষণা করেছিলেন—"এভাবে কার্য্যারম্ভ করার পর যাদব ও বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি সুবুদ্ধিগণ আমার দুর্নাম রটাইয়া ঢাকা প্রকাশের হিতৈষী দলকে শত্রু করিয়া তুলিলেন। বৈকুণ্ঠ বাবু শশীবাবুর সাহায্যে ঢাকা গেজেটের সৃষ্টি করিয়া ঢাকা প্রকাশের সমস্ত গ্রাহককে প্রায় বিনামূল্যে যোগাইতে ও তাহাতে আমাকে অশিক্ষিত বলিয়া ঘোষণা করিতে লাগিলেন। ঢাকা প্রকাশের বিরুদ্ধে যেরূপ ষড়যন্ত্র আরম্ভ হইয়াছিল, মানুষের ক্ষমতায় সেরূপ ষড়যন্ত্র হইতে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব। কিন্তু 'ঢাকা প্রকাশ' দ্বারা বিশেষ কার্য্য সাধনের জন্য যেন স্বয়ং বিধাতা আমা দ্বারা এই দুঃসময়ে ঢাকা প্রকাশকে রক্ষা করিয়াছিলেন।"

চৈত্র ১২৯১ থেকে জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮-এ ষোল বছর 'ঢাকা প্রকাশ' সম্পাদনা করেছিলেন গুরুগঙ্গা আইচ। শেষের দিকে ঢাকা প্রকাশের বিরুদ্ধে তিনটি মামলা দায়ের করেছিলেন ঢাকা পৌরসভার সচিব সার্কিস, ঢাকা শহরের প্রভাবশালী নাগরিক রূপলাল সাহা ও 'শাহিন মেডিকেল হলের স্বত্বাধিকারী'। গুরুগঙ্গা প্রথম দুটি মামলা আপসে মিটিয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু শেষটি মেটাতে পারেননি এবং সে মামলায় তাঁর এক মাসের জেল হয়েছিল। এসব ও আর্থিক কারণে ১৩০৮ সালে তিনি পত্রিকার স্বত্ব বিক্রি করে দিয়েছিলেন।

১৩০৮ সালের আষাঢ় মাসে বিক্রমপুরের ব্রাহ্মণ গাঁ নিবাসী শ্রীযুক্ত মুকুন্দ বিহারী চক্রবর্তী বিএ এবং "স্বাধীন ত্রিপুরার পরলোক প্রস্থিত মহারাজ নীরদচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের অবসরপ্রাপ্ত মন্ত্রণা সচিব বাবু রাধারমণ ঘোষ বিএ" ঢাকা প্রকাশের স্বত্ব ক্রয় করেছিলেন।

পত্রিকার পটভূমিকা হিসেবে পূর্ণেন্দু চক্রবর্তী একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। একবার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বেঙ্গলি' পত্রিকার অফিসে গিয়েছিলেন রাধারমণ। সেখানে কথা প্রসঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন—'তুমি যাহাই বল না কেন, যেখান হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও পড়িবার যোগ্য একখানি সংবাদপত্র প্রকাশিত হইতে পারে নাই, সে দেশের শিক্ষা-দীক্ষায় গৌরব করা যাইতে পারে না।' এ কথায় আহত হয়েছিলেন রাধারমণ। এর পরই তিনি স্বত্ব ক্রয় করেছিলেন পত্রিকার।

তাঁদের সময়ও 'ঢাকা প্রকাশ'-এর নীতি তেমন পরিবর্তিত হয়নি। 'ঢাকা প্রকাশ' পূর্ববৎ সনাতন ধর্মের সেবাতেই নিযুক্ত ছিল এবং "রাজনৈতিক বিষয়ে মধ্যম পন্থাই অনুসরণ করিয়া আসিতেছে। এবং শাসক ও শাসিতের মধ্যে সম্প্রীতি সংস্থাপনে চেষ্টা করিতেছে। এ নিমিত্ত বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের সময় তাঁকে নানাবিধ বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল।"

পত্রিকা কেনার কিছুদিন পর মুকুন্দ বাবুই সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন। সম্পাদকও ছিলেন তিনি নিজে। ১৩০৮ থেকে পত্রিকার আকার বদলে গিয়েছিলো—ডাবল ক্রাউন। দীর্ঘ ত্রিশ বছর মুকুন্দ বাবুর সহকারী হিসেবে যারা যুক্ত ছিলেন পত্রিকার সঙ্গে তাঁরা হলেন পণ্ডিত রাজকুমার চক্রবর্তী, পণ্ডিত প্রিয়নাথ বিদ্যাভূষণ, নিশিকান্ত ঘোষ, গিরিজাকান্ত ঘোষ, উমেশচন্দ্র বসু, হরিহর গঙ্গোপাধ্যায়, মধুসূদন চৌধুরী এবং পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে, 'ঢাকা প্রকাশ'-এর সর্বশেষ সংখ্যাটির তারিখ ১২-৪-১৯৫৯। সম্পাদক আবদুর রশীদ খান। প্রকাশিত হতো ৫৯/৩ কিতাব মঞ্জিল, ইসলামপুর থেকে। অবশ্য, এর আগে থেকেই পত্রিকাটিতে নিলামের ইস্তেহার-ই অধিকাংশ জায়গা করে নিয়েছিল। তাতে মনে হয়, চল্লিশ দশক থেকেই 'ঢাকা প্রকাশ' জনপ্রিয়তা হারিয়েছিল এবং সম্মুখীন হচ্ছিল প্রতিযোগিতার এবং এ জন্যই পত্রিকাটি শেষ পর্যায়ে পরিণত হয়েছিল নিলাম ইস্তেহারে এবং ইস্তেহার হিসেবেই ষাটের দশকে 'ঢাকা প্রকাশ'-এর প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।

স্কুল

ঢাকায় প্রথম স্কুল প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব ব্যাপটিস্ট মিশনারি ওয়েন লিওনার্দের।

লিওনার্দের জন্ম আয়ারল্যান্ডে। কোম্পানির সৈনিক হিসেবে চাকরি নিয়ে ভারতে পদার্পণ করেন তিনি ১৭৮৭ সালে। শ্রীরঙ্গপত্তনের যুদ্ধে তিনি অংশ নিয়েছিলেন। ১৮০৬ সালে সার্জেন্ট—মেজর হিসেবে পদোন্নতি পেয়ে আসেন কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে।

কলকাতয় থাকার সময় লিওনার্দ উইলিয়াম কেরির লেখা পড়েন, বক্তৃতা শোনেন। কেরি তাঁকে প্রভাবিত করেছিলেন। ফলে দেখি ১৮১০ সালে তিনি কলকাতার লালবাজার গির্জায় ব্যাপটিস্ট মতবাদে দীক্ষিত হন এবং সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের পর ব্যাপটিস্টমণ্ডলীর হয়ে প্রচার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। শ্রীরাম-পুরের মিশনারিদের উদ্যোগে তখন বেশ কিছু 'বেনিভোলেন্ট ইনস্টিটিউশন' বা দাতব্য সংস্থা ছিল। লিওনার্দকে সেগুলি পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল।

১৮১৫ সালে এমন একটি ঘটনা ঘটে (যা জানা যায়নি) যার ফলে শ্রীরামপুর মিশন ঠিক করে লিওনার্দকে বদলি করতে হবে। বেনিভোলেন্ট ইনস্টিটিউশনের একটি শাখা খোলার জন্য লিওনার্দকে ঐ বছরই ঢাকা পাঠানো হয়। পাঠানোর উদ্দেশ্য, তাদের ভাষায়—"Two establish a branch of Benevolent Institution, in a large circle of Roman catholic children going up in ignorance and vice in that once flourishing capital of Bengal".

লিওনার্দ ঢাকায় এসে উঠলেন ছোট কাটরায়। ওপর তলায় থাকতেন তিনি আর নিচের বড় ঘর ব্যবহৃত হতো বক্তৃতা বা প্রার্থনার কাজে। লিওনার্দ প্রথমে নারায়ণগঞ্জের দিকে স্কুল খুলতে চেয়েছিলেন কিন্তু এ কাজে কোনো সহায়তা পাননি। তখন ১৮১৬ সালে একক প্রচেষ্টায় লিওনার্দ প্রধানত খ্রিস্টান শিশুদের জন্য স্কুল খোলেন। ঢাকায় প্রথাগত স্কুল প্রতিষ্ঠা সেই প্রথম। অবশ্য, এসব স্কুলে মূলত খ্রিস্টধর্ম বিষয়েই পাঠদান করা হতো। দু'বছরের মধ্যেই স্কুলের সংখ্যা দাঁড়ায় ছয়টিতে। এর মধ্যে পাঁচটিতে শিক্ষা দেওয়া হতো বাংলায়, একটিতে উর্দুতে। কাজের চাপ বেড়ে যাওয়ায় লিওনার্দকে সাহায্য করার জন্য তখন শ্রীরামপুর থেকে পাঠানো হয়েছিল রামপ্রসাদকে। কেরি কর্তৃক ধর্মান্তরিত প্রথম ব্রাহ্মণ হরেন রামপ্রসাদ। বিয়ে করেছিলেন কৃষ্ণ পালের কন্যাকে।

লিওনার্দ ঢাকায় এসেছিলেন ১৮১৫ সালে। তারপর থেকে ১৮৪৮ সাল পর্যন্ত একটানা ছিলেন ঢাকায়।

সরকারি স্কুল

ঢাকা তথা বাংলাদেশের প্রথম সরকারি স্কুল হচ্ছে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল যা এখনও সগৌরবে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। উনিশ শতকে ও এ শতকের গোড়ার দিকে অবিভক্ত বাংলার জনজীবন যারা নিয়ন্ত্রণ করেছেন তাঁদের অনেকেই ছিলেন এ স্কুলের ছাত্র। সে পরিপ্রেক্ষিতে কলেজিয়েট স্কুল নিয়ে ঢাকাবাসী গর্ব করতে পারেন।

১৮৩৫ সালে জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন লর্ড বেন্টিংকের কাছে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছিল, প্রেসিডেন্সী বিভাগের প্রধান প্রধান শহরে, যেমন ঢাকা, পাটনা প্রভৃতিতে ইংরেজি সাহিত্য, বিজ্ঞান পড়াবার জন্যে স্কুল খোলা উচিত। কমিটি অবশ্য আগেই ঢাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের কাছে জানতে চেয়েছিল, ঢাকায় একটি সরকারি স্কুল স্থাপন করা যাবে কিনা এবং প্রয়োজনীয় স্কুল চালাতে হলে, স্থানীয়

অধিবাসীদের কাছ থেকে চাঁদা পাওয়া যাবে কিনা। গণ্যমান্যদের মধ্যে ঢাকার সহকারী সার্জন ডা. জেমস টেলর এবং আরো অনেকে উৎসাহের সঙ্গে এ প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়েছিলেন। কমিটি এ পরিপ্রেক্ষিতে সরকারকে সুপারিশ করেছিল ঢাকায় সরকারি স্কুল স্থাপন করতে এবং অনুদান হিসেবে স্কুলটিকে বার্ষিক ছয় হাজার টাকা মঞ্জুর করতে। ২৪ জুন ১৮৩৫ সালে ভারত সরকার কমিটির এই সুপারিশে প্রদান করেছিলেন সম্মতি।

কমিটি ঢাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উৎসাহে এতই আগ্রহী হয়ে উঠেছিল যে ১৮৩৫ সালের জুন মাসে বেসরকারিভাবে ঢাকায় স্কুল স্থাপনের জন্য মি. রিজ ও পার্বতীচরণ সরকারকে প্রেরণ করেছিল ঢাকায়। স্কুলের জন্য ভাড়া নেওয়া হয়েছিলআণ্টাঘর ময়দানের পাশে ইংরেজ কুঠিটি। এভাবে ১৫ জুলাই ১৮৩৫ সালে শুধু ঢাকায় নয়, সমগ্র বাংলার প্রথম সরকারি স্কুলটির উদ্বোধন করা হয়েছিল। ঢাকাবাসীরা স্কুলের জন্য চাঁদা তুলেছিলেন পাঁচ হাজার টাকা। এর মধ্যে মনোমোহন ও লালমোহন ঘোষের পিতা রামলোচন ঘোষ দিয়েছিলেন এক হাজার টাকা। স্কুলটি পরিচিত ছিল 'ইংলিশ সেমিনারী' নামে। ১৮৪১ সালে এর একটি কলেজ শাখা খোলা হয়েছিল।

কলেজিয়েট স্কুলের প্রথম তিনজন শিক্ষক ছিলেন রিজ, প্যারিচরণ সরকার এবং গান। প্রথমজন ছিলেন হেডমাস্টার। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শিক্ষক ছিলেন যথাক্রমে প্যারিচরণ ও গান। আদিনাথ জানিয়েছেন, স্কুল থেকে অবসর নিয়ে গান সাহেব পরে একটি রুদ্ধগৃহে ত্রিশ বছর নির্জনে বাস করে মারা যান। এই ত্রিশ বছর তাঁর দেখাশোনা করত একটি ভৃত্য। তিনি আরো জানিয়েছেন, এই স্কুলের প্রথম দিককার ছাত্ররা ছিলেন ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা ব্রজসুন্দর মিত্র, নবাব আবদুল গনি, মৌলভীবাজারের প্রতিষ্ঠাতা আবদুল আলী, আর্মেনী জমিদার হার্নি ও পোগজ প্রমুখ।

১৮৩৫ সালে কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৩৬ জন। পরের বছর এ সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১৪৯-এ। এর মধ্যে ৮ জন ছিলেন মুসলমান, ৭ জন খ্রিস্টান ও বাকিরা হিন্দু। হান্টারের বই থেকে আমরা আরো তিন বছরের ছাত্রসংখ্যা জানতে পারি। ১৮৫৬-৫৭, ১৮৬০-৬১ ও ১৮৭০-৭১ সালে ছাত্রসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩০৫, ২২১ ও ২৬৬ জন। এর মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা ছিল ১২, ৫ ও ১০ এবং অন্যান্য ২৫, ২০ ও ১০ জন। ১৮৬৮ সালে এক রিপোর্টে জানা যায়, ঐ সময় কলেজে ছিলেন একজন হেডমাস্টার, আটজন সাধারণ শিক্ষক, দুইজন পণ্ডিত ও একজন মুন্সী। কর্মচারীর মধ্যে ছিলেন একজন কেরানি, একজন গ্রন্থাগারিক এবং বারজন ভৃত্য। এ প্রসঙ্গে ১৮৬৬ সালের (এপ্রিল) রিপোর্টটি উল্লেখ করতে হয়। ঐ সময় দেখা যাচ্ছে, ছাত্রসংখ্যা হ্রাস পেয়েছিল অস্বাভাবিকভাবে, যার কোনো কারণ অবশ্য উল্লেখ করা হয়নি। ১৮৬৬ সালে সর্বমোট ছাত্রের সংখ্যা ছিল ১১০ জন, পরের বছর ছিল ১২৩ জন যার মধ্যে ৬ জন ছিলেন খ্রিস্টান, বাকিরা সব হিন্দু এবং আশ্চর্য, কোনো মুসলমান ছিলেন না সে বছর। ঐ সময় স্কুলের ফিস ছিল দেড় থেকে তিন টাকা।

১৮৪১ সালে ঢাকা কলেজিয়েটকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল ঢাকা কলেজ এবং

নতুন অট্টালিকা নির্মাণ করা হয়েছিল যার নিচের তলায় বসত স্কুল, ওপরে কলেজ।

১৯০২ সালে রমেশচন্দ্র মজুমদার ছিলেন এ স্কুলের ছাত্র। তাঁর বিবরণ থেকে জানতে পারি, স্কুলের তখন একটি হোস্টেল ছিল—'রাজচন্দ্র হিন্দু হোস্টেল'। ব্রাহ্মসমাজের চত্বরেই খুব সম্ভব ছিল এটি। লিখেছেন তিনি, মাসে থাকা খাওয়াসমেত হোস্টেল খরচ হতো সাড়ে সাত টাকা।

কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্রদের কৃতিত্ব কিংবদন্তির মতো। একটি উদাহরণ দিচ্ছি। এখনও কলেজিয়েট স্কুলের সদর দরজার সামনে স্মৃতিফলকে লেখা আছে—

In memory of meritorious services of babu Ratanmoni Gupta (1888-1896), most successful techer in Bengal.

During his Headmasership the Dacca collegiate School stood first 8 years out of 9 at the entrance examinaion.

উনিশ শতক থেকে বিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলার খ্যাতিমান ব্যক্তিদের অধিকাংশই ছিলেন কলেজিয়েট স্কুলের সঙ্গে যুক্ত শিক্ষক অথবা ছাত্র হিসেবে। জগদীশচন্দ্র বসু, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ এর উদাহরণ।

এ শতকের প্রথম দিকের কলেজিয়েট স্কুলের একটি বর্ণনা পাই স্কুলের ছাত্র বুদ্ধদেব বসু ও ভবতোষ দত্তের লেখায়।

"ঢাকার কলেজিয়েট স্কুলটি অনেক কালের নামজাদা—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমল থেকেই মর্যাদাবান।... প্রকাণ্ড মাঠের মধ্যে চারদিকে মোটাসোটা থাম, চওড়া বারান্দা দিয়ে ঘেরা সাদা রঙের বাড়ি, তার একদিকে একটা সুন্দর লাল রঙের বাড়ি। যেখানে উঁচু ক্লাসগুলি বসে, ভূগোল, বিজ্ঞান, মেকানিক্স, ড্রইং শেখাবার জন্য আলাদা ঘর, চমৎকার জিমনেসিয়াম, কাঠের কাজ শেখার জন্য একটা টিনে ছাওয়া লম্বা রোড। মাঝে মাঝে ঘর বদল করতে হয় কলেজের ছেলেদের মতো, তাই আমরা খুব গর্বিত বোধ করি।

নিচু পাঁচিলে ঘেরা মস্ত ছড়ানো চৌহদ্দির মধ্যে স্কুল, সুরকির পাড়-বসানো হরতন আকৃতির ছোট একটি বাগানও আছে—সেখানে ফোটে রং-বেরঙের বিলিতি ফুল। সিঁড়ি, মেঝে, বারান্দা সব তক্‌তকে পরিষ্কার, ক্লাশ পেরিয়ে গাড়িঘোড়ার শব্দ লেশমাত্র পৌঁছায় না।"

কলেজ

ঢাকার প্রাচীনতম এবং প্রথম সরকারি কলেজ ঢাকা কলেজ। কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'ঢাকা সেমিনারি'র [বা কলেজিয়েট স্কুল] শাখা হিসেবে। এবং ঢাকা সেমিনারি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সরকারি উদ্যোগে; সে পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা কলেজকে প্রথম সরকারি কলেজ হিসেবে ধরা হচ্ছে।

'ঢাকা সেমিনারি' যখন পূর্ববঙ্গেব ইংরেজি শিক্ষার কেন্দ্রে পরিণত হচ্ছিল তখন

ঢাকাব গণ্যমান্য ব্যক্তিদের অনেকেই ঢাকায় একটি কলেজ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা সেমিনারিতে (ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল) ১৮৪১ সালে খোলা হলো একটি কলেজ শাখা। নাম দেওয়া হয়েছিল এই শাখার ঢাকা সেন্ট্রাল কলেজ। এর ভাগ ছিল দুটি—সিনিয়র এবং জুনিয়র। প্রতিটি শাখার আলাদা একজন হেডমাস্টার ছিলেন কিন্তু অধ্যক্ষ ছিলেন একজন—কেম্ব্রিজের জে. আয়ারল্যান্ড। সিনিয়র পর্যায়ে সেখানে পড়ানো হত ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও সাহিত্য। জুনিয়র পর্যায়ে ইংরেজি, বাংলা, অঙ্ক, ইতিহাস ও ভূগোল। ১৮৪৪ সালে এ কলেজে পাঠদান করতেন ১৪ জন ইউরোপীয় ও ভারতীয় শিক্ষক।

সাধারণের চাঁদায় দুই হাজার টাকায় স্থানীয় জনশিক্ষা কমিটি জনৈক মি. শেফার্ডের কাছ থেকে জমি কিনেছিলেন কলেজের নতুন অট্টালিকা নির্মাণের জন্য। ১৮৪১ সালের ২০ নভেম্বর কলকাতার বিশপ ঢাকা সেমিনারি পরিদর্শনের পর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন কলেজের। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। বাজনা বাজিয়েছিল ৪৫ নেটিভ ইনফ্রেনট্রির বাদক দল। এই ভবন নির্মিত হয়েছিল পুরনো ঢাকা শহরে যা পরবর্তীকালে কলেজিয়েট স্কুল এবং বর্তমানে স্টেট ব্যাংক নামে ছিল পরিচিত।

ভিত্তির নিচে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল একটি তাম্রফলক। বিশপের ভাষণের পর তাম্রফলকটি পাঠ করে শুনিয়েছিলেন মি. প্রাট। তাতে লেখা ছিল—

The

COLLEGE OF DACCA

Founded by the British Government of India, for the instruction of the native youths of the Eastern Districts of Bengal in Europen literature and science.

This first stone of the edifice is laid by

The Right Reverand Daniel

Lord Bishop of Calcutta, and Metroplitan of India. On the 20th day of November, A.D. 1841, in the reign of her Most Gracious Majesty

Queen Victoria,

and during the administration of the Right Honorable the Earl of Auckland, G.C.B., Governor-General.

কলেজ ভবনের নকশা তৈরি করেছিলেন কর্নেল গ্যার্সটিন। নির্মাণকাজের ব্যয় ধরা হয়েছিল সাড়ে চব্বিশ হাজার টাকা এবং ভবন নির্মাণের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল গণপূর্ত বিভাগের ওপর। ভবন নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছিল ১৮৪৪ সালে।

ঢাকা কলেজের প্রথম দিককার কিছু তথ্য আমরা জানতে পারি অধুনা দুষ্প্রাপ্য কলেজ রিপোর্ট থেকে।

১৮৪২ সালে কলেজের ছাত্রসংখ্যা ছিল ৩৪৪ জন। ১৮৪৮ সালে ছিল ২৮৯ জন যার মধ্যে ত্রিশ জন ছিল খ্রিস্টান, উনিশ জন মুসলমান ও বাকি সব হিন্দু। সিনিয়র ডিপার্টমেন্টের তিন জন শিক্ষকই ছিলেন ইংরেজ। জুনিয়র বিভাগের নয় জনের মধ্যে পঞ্চম থেকে সপ্তম ছিলেন বাঙালি। প্রিন্সিপাল এবং হেডমাস্টারের বেতন ছিল যথাক্রমে ছয়শ' ও চারশ' টাকা। সিনিয়র বিভাগে, দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ শিক্ষকের বেতন ছিল যথাক্রমে ৩০০, ২০০ এবং ১৫০ টাকা। জুনিয়র স্কুল বিভাগে প্রথম থেকে অষ্টম শিক্ষকের বেতন ছিল যথাক্রমে ১৫০, ১০০, ৮০, ৬৫, ৫০, ৪০, ৩০ এবং ২০ টাকা। এ বিভাগের তৃতীয় থেকে অষ্টম শিক্ষক পর্যন্ত ছিলেন বাঙালি, বাকি সব ইংরেজ।

১৮৪৮ ও ১৮৫০-এ ঢাকা কলেজের পরিচালনা কমিটিতে পদাধিকার বলে ছিলেন রেভিনিউ কমিশনার, সিভিল এবং সেশনস জজ, কমিশনার, কালেক্টর, ম্যাজিস্ট্রেট, আবগারি কমিশনার, সিভিল সার্জন, প্রিন্সিপাল সদর আমিন, জে পি ওয়াইজ, খাজা আলিমুল্লাহ, রাজমোহন রায়, মির্জা গোলাম পীর এবং মিত্রাজিত সিংহ।

ঢাকা কলেজ শুধু ঢাকারই নয়, পূর্ববঙ্গে উচ্চশিক্ষা, বিশেষ করে ইংরেজি শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। শুরু থেকে এখন পর্যন্ত ঢাকা কলেজ 'এলিট' কলেজ। ড. শরিফউদ্দিন মন্তব্য করেছেন, শহরের সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে যে নতুন দিক উন্মোচন হয়েছিল সে ক্ষেত্রে এ অঞ্চলে পালন করেছিল কলেজটি প্রধান ভূমিকা। উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গে, বিশ শতকের প্রথমদিকে অখণ্ড বাংলায় যাঁরা প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন তাঁদের একটি বড় অংশ ছিলেন এ কলেজের ছাত্র। ঢাকা কলেজকে অত্যন্ত গর্বের বিষয় হিসেবে দেখতেন ঢাকাবাসী। ঐ আমলের পত্রপত্রিকা খুললে দেখা যাবে, ঢাকা কলেজ সংক্রান্ত সামান্যতম বিষয়ও স্থান করে নিচ্ছে পত্রপত্রিকায়। এ ধরনের একটি উদাহরণ দিচ্ছি। ১৯০০ সালে 'ঢাকা প্রকাশ'-এ প্রকাশিত একটি সংবাদের সামান্য উদ্ধৃতি— "প্রেসিডেন্সী কলেজেব গৌরব বৃদ্ধির জন্য এতকাল শিক্ষা বিভাগের উর্দ্ধতন কর্মচারীরা ঢাকা কলেজকে দাবাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন। ঢাকার ছাত্রদিগের স্বাভাবিক গুণে যখনই ঢাকা কলেজের ফল ভাল হয়, তখনই ইহার প্রফেসারের উপরে টান পড়ে। প্রেসিডেন্সী কলেজের কর্তৃপক্ষ ঢাকার যে প্রফেসারকে তখন ভাল মনে করেন, তখনই তাঁহাকে ঢাকা হইতে সরানো হয়, আর যত নূতন শিক্ষানবীসকে ঢাকা কলেজের ঘাড়ে দেওয়া হয়।"

১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে ঢাকা সেন্ট্রাল কলেজকে (স্কুল ও কলেজ) দুই ভাগে ভাগ করা হয়। সিনিয়র বিভাগ পরিণত হয় পূর্ণ কলেজ হিসেবে এবং মনে হয় সে সময় এর নামকরণ করা হয়েছিল ঢাকা কলেজ। ঐ বছরই কলেজটি অনুমোদন পেয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের। স্কুলটি (পুরনো ইংলিশ সেমিনারি) বা জুনিয়র বিভাগ পরিণত হয় ইংরেজি উচ্চ বিদ্যালয়ে এবং মনে হয় সে থেকে স্কুলটি পরিচিতি লাভ করে কলেজিয়েট স্কুল হিসেবে।

১৮৫৭-৫৮ সালেই চার বছরের স্নাতক ডিগ্রি কোর্সের বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। অর্থাৎ ঐ সময় এন্ট্রান্স বা ম্যাট্রিক পাস করেই সরাসরি ছাত্ররা ডিগ্রি কোর্সে ভর্তি হতে

পারতেন। ১৮৬২, দু'বছরের ফার্স্ট আর্টস কোর্স এবং ১৮৬৩ সালে এম. এ. কোর্স খোলা হয়েছিল। ১৮৫৭-৫৮ সালে ঢাকা কলেজে ছাত্র ছিল একচল্লিশ জন। ১৮৭৫ সালে কলেজে খোলা হয়েছিল বিজ্ঞান বিভাগ/ভবন এবং এর জন্যও পূর্ববঙ্গ/ঢাকাবাসী দান করতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। ফরিদপুরের জমিদার গোলাম আলী চৌধুরী একাই দান করেছিলেন দশ হাজার টাকা।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮৫৮ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম স্নাতক বা বিএ পরীক্ষায় পরীক্ষার্থী ছিলেন দশজন (তেরজনের মধ্যে তিনজন ছিলেন অনুপস্থিত)। এর মধ্যে ঢাকা কলেজ থেকে পরীক্ষার্থী ছিলেন একজন— দীননাথ সেন্ (পরবর্তীকালে ঢাকার বিশিষ্ট নাগরিক)। এঁরা সবাই অকৃতকার্য হয়েছিলেন তবে পরে 'গ্রেস নম্বর' দিয়ে যদুনাথ বসু ও সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে পাস করানো হয়েছিল। ঢাকা কলেজের প্রথম পরীক্ষার্থীর এই অবস্থার ফলে, প্রিন্সিপাল ব্রেনান্ড নাকি এত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন যে, দীননাথকে তিনি বেঞ্চের উপর দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন।

ঢাকা কলেজ থেকে প্রথম বি. এ. পাস করেছিলেন রোহিনীকুমার বসাক। এই কলেজের প্রথম মুসলমান গ্র্যাজুয়েট ছিলেন সিরাজুল ইসলাম (১৮৬৭ খ্রিঃ) এবং তিনি পরবর্তীকালে নওয়াব উপাধি পেয়েছিলেন। প্রথম এম. এ. ডিগ্রি লাভ করেছিলেন দুজন—প্যারিমোহন বিশ্বাস (দ্বিতীয় শ্রেণী), হরিচৈতন্য ঘোষ (তৃতীয় শ্রেণী)। অঙ্কে এ ডিগ্রি পেয়েছিলেন তাঁরা ১৮৬৭ সালে। তবে, এম. এ. প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিল ঢাকা কলেজ ১৮৯৪ সালে। সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র ইংরেজি সাহিত্যে এ কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। নাজিরুদ্দিন আহমদ প্রথম মুসলমান যিনি ১৯০৬ সালে ইংরেজি সাহিত্যে প্রথম শ্রেণী পেয়েছিলেন। মুসলমানদের মধ্যে তিনিই প্রথম এ ডিগ্রি লাভ করেছিলেন। তিনি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম রেজিস্ট্রার। প্রথম মুসলমান যিনি ঢাকা কলেজ থেকে সম্মানসহ স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন তিনি হলেন কাজী জহিরুল হক (১৮৮৬)। পরে তিনি কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন।

১৮৬৮ সালে কলেজের ছাত্র বেতন ছিল মাসিক পাঁচ টাকা। ঐ আমলের তুলনায় এ হার যে অত্যধিক ছিল তা বলাই বাহুল্য। ১৮৪১ থেকে ১৯০৮ সালের মধ্যে উনিশজন এ কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। আদি প্রিন্সিপালদের মধ্যে খ্যাতনামা ছিলেন গণিতজ্ঞ ব্রেনান্ড ও বুথ।

বঙ্গভঙ্গের পর, রমনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠছিল নতুন ঢাকা শহর। ১৯০৮ সালে নির্মিত কার্জন হল ও সংশ্লিষ্ট আরো কয়েকটি অট্টালিকা এ সময় বরাদ্দ করা হয়েছিল ঢাকা কলেজকে। ফলে পুরনো ঢাকার পুরনো ভবনটি সম্পূর্ণ কলেজিয়েট স্কুলকে ছেড়ে দিয়ে ঢাকা কলেজ স্থানান্তরিত হয়েছিল কার্জন হলে। কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিস্ট্রি বিল্ডিংকে। ঢাকা কলেজের ছাত্রদের জন্য নির্মিত হয়েছিলো একটি ছাত্রাবাস যা ঢাকা হল নামে ছিল পরিচিত। শুধু তাই নয়, ঢাকা কলেজের চারজন অধ্যাপকের জন্য চারটি নতুন বাংলো নির্মাণ করা

হয়েছিল। ১৯১০-১১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিদর্শক মি. এইচ. আর. জেমস ঢাকা কলেজ পরিদর্শন করে লিখেছিলেন—

পাঁচ বছর পর ঢাকায় এসে এবং ঢাকা কলেজের আশ্চর্য রূপান্তর দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। ১৯০৬ সালে আমি যখন পুরাতন কলেজটি পরিদর্শন করেছিলাম তখন নতুন জায়গায় কার্জন হল ও সংলগ্ন অট্টালিকাগুলো নির্মিত হচ্ছিল এবং ছাত্রাবাসের বহিরঙ্গের সব কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। বঙ্গভঙ্গের দরুন দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে যে সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি হয়েছে ঢাকা কলেজ তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে এখন সুপ্রতিষ্ঠিত। ছাত্রসংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে এবং শিক্ষকের সংখ্যা বার থেকে সাতাশ-এ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু পরিবর্তনের ব্যাপারে এটাই বড় কথা নয়। আসল কথা হল, কলেজটি এখন সকল দিক থেকেই একটি পূর্ণাঙ্গ আবাসিক কলেজে পরিণত হয়েছে। এখানে যাঁরা কর্মরত আছেন তাঁরা সকলেই এই কলেজের জন্য গর্ববোধ করতে পারেন। আমার স্বল্পকালীন অবস্থানের সময়েও আমি এখানে কলেজ জীবনের সুস্থ, সুন্দর ও সুষম লক্ষণ প্রত্যক্ষ করেছি।

১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে, ঢাকা কলেজের অবনয়ন হয়। ঢাকা কলেজ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কোর্সের ভার দেওয়া হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে। ঢাকা কলেজে ঐ পর্যায়ে যাঁরা শিক্ষকতা করতেন তাঁদেরও নিয়ে নেওয়া হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে। ঢাকা কলেজের গ্রন্থাগার, মেধাবী ছাত্রদের জন্য দেওয়া বিভিন্ন বৃত্তিও হস্তান্তর করা হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে। এসব বৃত্তির অধিকাংশ এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু। ঢাকা কলেজ পরিণত হয় শুধু উচ্চ মাধ্যমিক একটি কলেজে। এবং ঢাকা কলেজকে আবার স্থানান্তরিত করা হয় পুরনো হাইকোর্ট ভবনে যা নির্মিত হয়েছিল পূর্ববঙ্গের ছোট লাটের জন্যে। এখানে একটি কথা উল্লেখ্য, আজকের প্রজন্মের অনেকেই জিজ্ঞেস করেন, কার্জন হলের পূর্বের সড়কটি কেন কলেজ রোড নামে পরিচিত? এ সড়কটির নামকরণ করা হয়েছিল তখন যখন কার্জন হলে ছিল ঢাকা কলেজ।

বেসরকারি কলেজ

ঢাকার প্রথম বেসরকারি কলেজ জগন্নাথ কলেজ। সরকারি ঢাকা কলেজের মতো জগন্নাথ কলেজও ঢাকার শিক্ষার ক্ষেত্রে পালন করেছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। জগন্নাথ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে যাত্রা শুরু হয়েছিল ঢাকা কলেজের এবং কালক্রমে তা পরিণত হয়েছিল একটি 'এলিট' কলেজে যেখানে সাধারণ ছাত্রদের প্রবেশাধিকার ছিল না। জগন্নাথ কলেজ সেসব ছাত্রদের জন্য দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। বোধহয় এ কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সময়ের কোষাধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র নাগ লিখেছিলেন, গরিব ও পশ্চাৎপদ জনসংখ্যার হাতের নাগালের মধ্যে বিদ্যাকে এনে দিয়ে জগন্নাথ কলেজ পূর্ববাংলায় সৃষ্টি করেছিল সামাজিক বিপ্লবের।

জগন্নাথ কলেজের ইতিহাস আলোচনা করতে হলে অনেকটা পিছিয়ে যেতে হবে এবং তা শুরু করতে হবে ঢাকা ব্রাহ্ম বিদ্যালয় থেকে।

ঢাকা শহবে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যখন ব্রাহ্ম আন্দোলন বিকশিত হচ্ছিল তখন আন্দোলনের নেতৃবর্গ একটি স্কুলের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। তখন ব্রজসুন্দর মিত্র, অনাথবন্ধু মৌলিক, পার্বতীচরণ রায় ও দীননাথ সেনের যৌথ প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয়েছিল ব্রাহ্ম বিদ্যালয়।

আদিনাথ সেন লিখেছেন, তাঁর বাবা দীননাথ সেন এ স্কুল স্থাপনে মনস্থ করে জানিয়েছিলেন ব্রজসুন্দরকে যিনি তখন ছিলেন কুমিল্লায়। ব্রজসুন্দর "এই বিদ্যালয়ের জন্য মাসিক ত্রিশ টাকা অর্থ সাহায্য ও তাহার বাড়ির নীচের কামরাগুলি বিদ্যালয়ের কাজের জন্য ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইলেন। ১৮৬০ খৃঃ ঢাকায় ব্রাহ্ম স্কুল সংস্থাপিত হয়।"

কিন্তু আদিনাথ আবার ১৮৫৯ সালের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেন্ডার উদ্ধৃত করেছেন, যেখানে ১৮৫৮ সালে ব্রাহ্ম স্কুল স্থাপনের উল্লেখ আছে এবং সেখানে প্রতিষ্ঠাতা উপরোল্লিখিত চার জনের নাম ঠিক আছে। জগন্নাথ কলেজের এক সময়ের অধ্যাপক ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় ব্রাহ্ম বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা সাল উল্লেখ করেছেন ১৮৬৬ সাল বলে। অনাথবন্ধু মৌলিক তাঁর স্মৃতিচারণে যে সময় ব্রাহ্ম স্কুল স্থাপিত হয়েছিল বলে উল্লেখ করেছেন সে সময় হিসেব করলে দাঁড়ায় ১৮৫৮/৫৯। শরিফউদ্দিন ব্রাহ্ম বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৬৩ বলে উল্লেখ করেছেন।

আদিনাথ যে সময়টার কথা লিখেছেন, অর্থাৎ দীননাথ যখন ব্রজসুন্দরকে কুমিল্লায় চিঠি লিখলেন, সে সময়টা হবে ১৮৫০-৫১। কারণ ব্রজসুন্দর সে সময় কুমিল্লায় ছিলেন।

এ পরিপ্রেক্ষিতে ধরে নিতে পারি প্রতিষ্ঠাতা অনাথবন্ধু ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেন্ডারই সঠিক, অর্থাৎ বাহ্ম স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৫৮ সালে, ব্রজসুন্দরের আর্মেনীটোলার বাসায় এবং প্রাথমিকভাবে খুব সম্ভব ব্রজসুন্দর স্কুলকে অর্থ সাহায্য করতেন যার ইঙ্গিত দিয়েছেন আদিনাথ সেন আগে।

ব্রাহ্ম বিদ্যালয়ে পড়াবার জন্য কলকাতা থেকে আনা হয়েছিল অঘোরনাথ গুপ্তকে। তারপর, গোবিন্দ প্রসাদ রায় ও জগন্নাথ অগ্নিহোত্রী এবং এক সময় কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারও শিক্ষকতা করেছিলেন এ স্কুলে। শেষের দিকে '৮ বৎসরকাল অনাথবন্ধু মৌলিক স্কুলের প্রধান পণ্ডিতের পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া অনেক যুবকের মনে ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতি প্রীতির সঞ্চার করিয়াছিলেন।'

ব্রাহ্ম স্কুল লুপ্ত হলে একটি সংবাদপত্র লিখেছিল "পূর্বে ব্রাহ্ম স্কুলে বাংলা ভাষায় অধ্যাপনা মাত্র হইত। তৎপরে উহার সহিত ইংরেজী ভাষায় কয়েকটি শ্রেণী সন্নিবেশিত করিয়া উহাকে মাইনর ক্লাশ স্কুল করা হয়। কয়েকজন মাত্র মাইনর স্কুলশিপ প্রাপ্ত হইলে শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়কগণ প্রোৎসাহিত হইয়া উহাকে হায়ার ক্লাশ স্কুল করেন। অর্থাৎ উহা হইতে ছাত্রগণ প্রবেশিকা পরীক্ষা দান আরম্ভ করে। উহাতে ক্রমোন্নতি লক্ষিত হওয়াতে

বোধহয় কিশোরীবাবু স্কুলটি তাহার পিতার নামে গ্রহণ করিয়াছেন। যোগ্য যোগ্য শিক্ষকদিগের হস্তেই এই বিদ্যালয়ের অধ্যাপনা-ভার সমর্পিত ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পরীক্ষা দান করিয়া যাহারা বেকার বসিয়া থাকিতেন, অথবা ল'ক্লাশে আইন অধ্যয়ন মানসে বাধ্য হইয়া ঢাকায় অবস্থান করিতেন, সাধারণতঃ তাঁহারাই অল্প অল্প বেতনে এই বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা কার্য্য সম্পাদন করিতেন।"

উনিশ শতকের সত্তর দশকে স্কুলটি অর্থ সংকটে পড়ে। অনাথবন্ধু মৌলিক তখন রানাঘাটের এসডিও। তিনি রামশঙ্কর সেন ও বর্ধমানের কমিশনারের পার্সোন্যাল আসিস্ট্যান্ট ভগবানচন্দ্র বসুর কাছে অর্থ সাহায্যের জন্য যান। এরা দু'জনেই ছিলেন পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজের সুহৃদ। আর্থিক সাহায্য প্রদানের নিশ্চয়তা দিলেও শেষ মুহূর্তে আর্থিক সাহায্য দেওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। ফলে, স্কুলটি টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে ১৮৭২ সালে ব্রাহ্ম স্কুলের ভার তুলে দেওয়া হয়েছিল বালিয়াটির জমিদার কিশোরীলাল রায় চৌধুরীর হাতে। তিনি স্কুলের নাম বদলে, পিতার নামে রেখেছিলেন স্কুলের নাম— জগন্নাথ স্কুল।

হৃদয়নাথ মজুমদার তাঁর স্মৃতিকথায় জগন্নাথ স্কুল সম্পর্কে বেশ কিছু আলোকপাত করেছেন। এখানে আরেকটি কথা উল্লেখ্য, জগন্নাথ স্কুল থেকে কিশোরীলাল হাই স্কুল এবং তারপর ডায়মন্ড থিয়েটার ও পরে জগন্নাথ কলেজ প্রতিষ্ঠা— এই যে প্রক্রিয়া, এ নিয়ে অনাথবন্ধু, ললিতমোহন, সতীশচন্দ্র যাঁরাই স্মৃতিকথা লিখেছেন, তাঁদের লেখাতেই খানিকটা বিভ্রান্তি আছে। সে বিভ্রান্তি বাদ দিয়ে আমি তাঁদের সূত্র নিয়েই ঐ প্রক্রিয়াটি আলোচনা করব।

হৃদয়নাথ লিখেছিলেন, কলেজিয়েট, পোগজ স্কুলের অনেক পরে স্থাপিত হয়েও জগন্নাথ স্কুল এগিয়ে গিয়েছিল স্কুলে হেডমাস্টার গোপীমোহন বসাকের জন্য। বসাক ছিলেন পোগজ স্কুলে কিন্তু জগন্নাথ স্কুল প্রতিষ্ঠিত হলে তাতে যোগ দিয়েছিলেন হেডমাস্টার হিসেবে। স্কুলের ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল দ্রুত। শুধু তাই নয়, গোপীনাথের আমলে পাঁচ/ছয় বছর এন্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিল জগন্নাথ স্কুল। ঢাকা বিভাগে শিক্ষক হিসেবে নাম ছড়িয়ে পড়েছিল গোপীমোহনের। কলেজিয়েট ও পোগজের খ্যাতিও চাপা পড়ে যাচ্ছিল এ খ্যাতির কারণে। এই সময়, স্কুলের খরচ বাদ দিয়ে, হৃদয়নাথ জানিয়েছেন, স্কুলের লাভ থাকত এক হাজার টাকা।

গোপীমোহন মাসে বেতন পেতেন দু'শ টাকা। স্কুলের আয় ও খ্যাতি বৃদ্ধি দেখে স্বাভাবিকভাবেই তিনি মালিকের কাছ থেকে দাবি করেছিলেন ইনক্রিমেন্ট। কিশোরী-বাবুর উপদেষ্টারা আবার গোপীমোহনকে পছন্দ করতেন না। ফলে মালিক ও হেডমাস্টারের মধ্যে দেখা দিল বিরোধ এবং এক সুন্দর সকালে কর্মচ্যুত হলেন গোপীমোহন। রাতারাতি স্কুলের নাম বদলে রাখা হলো কিশোরীলাল জুবিলী হাই স্কুল। সাল ১৮৮৭। গোপীমোহন ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারেন এই আশঙ্কায়ই কিশোরীলাল স্কুলের নাম বদল করে দিয়েছিলেন। জুবিলী স্কুল এখনও টিকে আছে।

জগন্নাথ স্কুল যখন তুঙ্গে তখন অনাথবন্ধু প্ররোচিত করেছিলেন কিশোরীলালকে এর

সঙ্গে একটি কলেজ খুলতে। কিশোরীলাল বোধহয় স্কুলের অবস্থা দেখে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। সম্মতি জানিয়েছিলেন তিনি। ঢাকার তৎকালীন উকিল ত্রৈলোক্যনাথ বসু, অনাথবন্ধু ও বিচারপতি সারদাচরণ মিত্রের চেষ্টায় কিশোরীলাল অনুমতি পেলেন ১৮৮৪ সালে দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি কলেজ খোলার, যেখানে আইনের ক্লাসও সংশ্লিষ্ট থাকবে। কিশোরীলাল কলেজটির নাম রাখলেন জগন্নাথ কলেজ। জগন্নাথ স্কুল ও কলেজ ১৮৮৭ পর্যন্ত একই কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের অধীনে পরিচালিত হতো। ১৮৮৭ সালে জগন্নাথ স্কুল লুপ্ত হলে স্কুল ও কলেজ আলাদাভাবে পরিচালিত হতে থাকে। আরো পরে, জানিয়েছেন হৃদয়নাথ, জুবিলী স্কুল স্থানান্তরিত হলে, স্কুলের পূর্বে যেসব জমিজমা ছিল তা কিনে নির্মিত হয়েছিল জগন্নাথ কলেজের অট্টালিকাসমূহ।

কলেজের জন্য প্রথম যে চারজন অধ্যাপক নিয়োগ করা হয়েছিল তাঁরা হলেন কুঞ্জলাল নাগ, বৈকুণ্ঠকিশোর চক্রবর্তী, রাখালকৃষ্ণ ঘোষ এবং বসন্ত কুমার রায়। কুঞ্জলাল নাগ ছিলেন জগন্নাথ কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ হিসেবে অচিরেই তিনি বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন ঢাকায়।

ঢাকা কলেজের বিপরীতে জগন্নাথ কলেজের প্রতিষ্ঠা ছিল সাধারণ ছাত্রদের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। যদিও ঢাকা কলেজের শিক্ষক ও ছাত্ররা জগন্নাথ কলেজকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতেন, তবুও জগন্নাথের জয়যাত্রা থেমে থাকেনি। ডিপিআই রিপোর্ট উদ্ধৃত করে শরিফউদ্দিন আহমদ দেখিয়েছেন শুরুতে ১৮৮৫ সালে জগন্নাথ কলেজের ছাত্রসংখ্যা ছিল ৪৮। চার বছর পর ১৮৮৯ সালে তা এসে দাঁড়িয়েছিল ৩৯৬-তে।

অসুস্থতার কারণে, কুঞ্জলাল নাগ অবসর গ্রহণ করলে, কলেজের অধ্যক্ষের ভার গ্রহণ করেছিলেন বৈকুণ্ঠকিশোর চক্রবর্তী। তিন বছর পর বৈকুণ্ঠকিশোর চলে গিয়েছিলেন আনন্দমোহন কলেজে। তখন হেরম্বচন্দ্র মৈত্রকে কলকাতা থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল অধ্যক্ষ হিসেবে। দু'বছর পর হেরম্বচন্দ্র ফিরে গেলেন কলকাতার সিটি কলেজে। তখন, অনাথবন্ধু ও সতীশচন্দ্র দুজনে ছুটলেন কলকাতায় এবং হেরম্বচন্দ্রের পরামর্শে রায় বাহাদুর ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়কে আমন্ত্রণ জানালেন কলেজের অধ্যক্ষ হতে। ললিতমোহন সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন ১৯০৪ সালে।

ললিতমোহনের সময়ই জগন্নাথ কলেজের সত্যিকার বিকাশ হয়েছিল। এ কথা উল্লেখ করেছেন অনাথবন্ধু মৌলিক। ললিতমোহন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল পর্যন্ত ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ।

ললিতমোহন কলেজের ভার গ্রহণের চার বছর পর পরিবর্তন হয়েছিল কলেজ ব্যবস্থাপনার। কিশোরীমোহন তখন স্কুল কলেজ থিয়েটার নিয়ে খুব বিব্রতকর অবস্থায় ছিলেন। তিনি জানতেন ঢাকা শহরে একটি স্কুল ও কলেজের মালিক হয়ে তিনি পরিবারের সুনাম বৃদ্ধি করেছেন, কিন্তু কলেজের আর্থিক অবস্থা ছিল খারাপ। তিনি খুব সম্ভব এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চাচ্ছিলেন। এরকম পরিস্থিতিতে একদিন (১৯০৮) সকালে অনাথবন্ধু মৌলিক কিশোরীবাবুকে অনুরোধ জানালেন কলেজটি একটি ট্রাস্ট ডিডের মাধ্যমে সাধারণের কাছে হস্তান্তর করতে। কিশোরীবাবু তখন ঢাকার কমিশনার

আর, নাথানকে চিঠি লিখে কিশোরীলাল জুবিলী স্কুল ও জগন্নাথ কলেজকে ট্রাস্টিদের হাতে অর্পণের সিদ্ধান্ত জানালেন। অনাথবন্ধু ললিতমোহনকে সঙ্গে নিয়ে দ্রুত কমিশনারের হাতে সেই চিঠি পৌঁছে দিয়েছিলেন। ৭ মার্চ ১৯০৮ সালে জগন্নাথ কলেজের ট্রাস্টিবৃন্দ ও সেক্রেটারি অব স্টেটের মধ্যে এক দলিল সম্পাদনের মাধ্যমে কলেজের ব্যবস্থাপনার পরিবর্তন ঘটল। কলেজটি রূপান্তরিত হলো প্রথম শ্রেণীর কলেজে। সে বছর সরকার মঞ্জুরি দিয়েছিলেন কলেজকে ৮৫ হাজার টাকা ক্যাপিটাল গ্রান্ট ও ১২ হাজার টাকা রেকারিং গ্রান্ট হিসেবে।

কলেজের এই দ্বিতীয় পর্বে ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় এবং ঢাকার কমিশনার নাথান জগন্নাথ কলেজকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। ললিতমোহন কলেজের অর্থ সংকট মোচনের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরেছেন আর নাথান তাকে করেছিলেন সহায়তা। নাথান সব সময় জগন্নাথ কলেজকে উল্লেখ করতেন 'আমার কলেজ' বলে। এসব কিছুর বিস্তারিত বিবরণ আছে ললিতমোহনের দীর্ঘ স্মৃতিকথায়। জগন্নাথ কলেজকে গড়ে তোলার ব্যাপারে আনন্দচন্দ্র রায়ের অবদানও তুচ্ছ করার মতো নয়। তবে, যাঁকে জগন্নাথ কলেজের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা যায় তিনি হলেন অনাথবন্ধু মৌলিক। সেই ব্রাহ্ম স্কুল থেকে জগন্নাথ স্কুল, তারপর জগন্নাথ কলেজ— এই দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় তিনি ছিলেন জড়িত ও তৎপর।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পর 'জগন্নাথ কলেজই রাজনীতিক আন্দোলনের' কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনের অনেক সভা হয়েছিল এখানে, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এখানেই দিয়েছিলেন ঢাকাবাসীর উদ্দেশে তাঁর বক্তৃতা। ঢাকাতে এসে ১৯০১ সালে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর প্রথম বক্তৃতা এই কলেজ প্রাঙ্গণেই দিয়েছিলেন।

মেডিকেল স্কুল

ঢাকার প্রথম মেডিকেল স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মিটফোর্ড হাসপাতালে। কলকাতায় একটি মেডিকেল কলেজ আগেই ছিল। কিন্তু তাতে শিক্ষার্থীর ভিড় বেড়েই চলছিল বিশেষ করে বাংলা শ্রেণীতে। তৎকালীন গভর্নর স্যার জর্জ ক্যাম্পবেল এ পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৭৩ সালে ঠিক করলেন মেডিকেল কলেজ সংক্রান্ত একটি পরিকল্পনা নেয়ার। সিদ্ধান্ত হলো কলকাতা, ঢাকা ও পাটনায় তিনটি মেডিকেল স্কুল স্থাপন করা হবে, যেখানে পাঠদান করা হবে বাংলায়। ঢাকায় মেডিকেল স্কুল স্থাপন প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন সরকার—

ঢাকার স্কুল পূর্ববঙ্গের তেরো মিলিয়ন লোকের প্রয়োজন মেটাবে। এখন কলকাতার স্কুলে অধ্যয়নরত ছাত্রের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ পূর্ববঙ্গের। পাশ্চাত্য চিকিৎসার এখন বিস্তার ঘটেছে সেখানে। ঢাকার স্কুল আসামেরও প্রয়োজন মেটাবে।

কিন্তু এর দশ বছর আগে, ঢাকাবাসীরা ঢাকায় একটি মেডিকেল স্কুল স্থাপনের আবেদন জানিয়েছিল। তৎকালীন ঢাকা ও পূর্ববঙ্গের প্রভাবশালী পত্রিকা 'ঢাকা প্রকাশ'

লিখেছিল, 'ঢাকায় বিদ্যালয়ের সংখ্যা কেবল মন্দ হয় নাই। কিন্তু এক্ষণে কেবল একটা চিকিৎসা বিদ্যালয়ের অভাব রহিয়াছে।' এবং এ জন্য পূর্ববঙ্গবাসীর যথেষ্ট অসুবিধা হচ্ছে। 'যদি কলিকাতা মেডিকেল কলেজের বাঙ্গালা ক্লাসের ন্যায় এ স্থলে একটা চিকিৎসা বিদ্যালয় সংস্থাপিত করা হয়, তাহা হইলে ঐ সমস্ত পল্লী গ্রামবাসীদিগের অতি মহত্তর উপকার দর্শে সন্দেহ নাই।' পত্রিকাটি প্রস্তাব করেছিল—'এই চিকিৎসা বিদ্যালয় সংস্থাপনার্থে ঢাকার আর্য্যদিগকে অনুরোধ করাই আমাদিগের কর্ত্তব্য, কিন্তু তাঁহাদিগের ঈদৃশ মহৎ বিষয়ে অনুরাগ নাই বলিয়াই আমরা গভর্নমেন্টকে বিরক্ত করিতেছি। স্যার চার্লেস (চালর্স) ট্রিবিলিয়ান বাহাদুর এবারে বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্তে যে টাকাগুলি দিয়াছেন তাহার কিয়দংশ দ্বারাই প্রস্তাবিত বিদ্যালয়টি অনায়াসে সংস্থাপিত হইতে পারে। ভূতপূর্ব আয়-ব্যয় পরিদর্শক লেঙ সাহেব গত বৎসর যে টাকাগুলি দিয়াছিলেন, তাহা সমুদয় ব্যয় করা হয় নাই। আবার এবারকার প্রদত্ত টাকাগুলিরও ঐরূপ অবস্থা না করিয়া তাহা তাদৃশ মহৎ বিষয়াদিতে ব্যয় করা কি নিতান্ত উচিত নহে?'

সিদ্ধান্ত হলো, নতুন মেডিকেল স্কুল সংশ্লিষ্ট থাকবে মিটফোর্ড হাসপাতালে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার 'ইস্ট' পত্রিকায় যে সংবাদ ছাপা হয়েছিলো তা উদ্ধৃত করছি। সংবাদটি দীর্ঘ কিন্তু এ সংবাদে বেশ কিছু তথ্য আছে—

"We are glad to announce to our readers that the proposed Medical School at Dacca is at last to become an accomplished fact. This new school will be opened on the 15th June next. There was a rumour that each student only would be admitted to the new Medical School who had passed the University Entrance Examination. Many young minds were put to despair by this news. But now we are glad to be able to say that those who have passed either the University Entrance, the Vernacular Scholarship, or the Minor Scholarship Exam. will be allowed to take their admission in the Dacca Medical School. The new School will be exactly on the same footing as "The Campbell School of Medicine" at Shealdah. The Course of study will extend over three years; and it will embrace the various subjects of Anatomy and Surgery, Chemistry and medical Jurisprudence, Materia Medica and Medicine and Midwifery. After a third year of study, there will be a final exam, which will be conducted by the committee consisting of the Deputy Surgeon General of the Circle, the Supdt of School and another Medical Officer, assited, if necessary, by the teachers, who will themselves conduct the class examination of First and Second year student.

"The rate of fees will be the same as has lately been laid down for

the Campbell School of medicine, viz two rupees on entrance, three rupees monthly and ten rupees for licence...those who are candidates for admission to the Dacca Medical School must be between the ages of 16 to 20 years."

১৮৬৫ সালের ১৫ জুন ঢাকা মেডিকেল স্কুলের ক্লাস শুরু হয়েছিল। এ পরিপ্রেক্ষিতে লিখেছিল 'বঙ্গবন্ধু'—

"আগামী ১৫ই জুন ঢাকাতে মেডিকেল স্কুল সংস্থাপিত হইবে। বাবু কালীচন্দ্র দত্ত, সূর্যনারায়ণ সিংহ, দুর্গাদাস রায়, উমাচরণ দাস এবং প্রকাশচন্দ্র সেন উক্ত স্কুলের প্রফেসর হইবেন। মেডিকেল স্কুল হইবে সুখেরই বিষয়, কিন্তু কলিকাতা মেডিকেল কলেজের সঙ্গে যে সকল দুরাচার, দুর্ব্যবহার ও দুর্নীতির সংশ্রব রহিয়াছে তাহা যাহাতে ঢাকার স্কুলে স্থান না পায় তজ্জন্য প্রথমাবধি সাবধান থাকা হয়, তাই আমাদের অনুরোধ, নচেৎ দুঃখের সীমা থাকিবে না।"
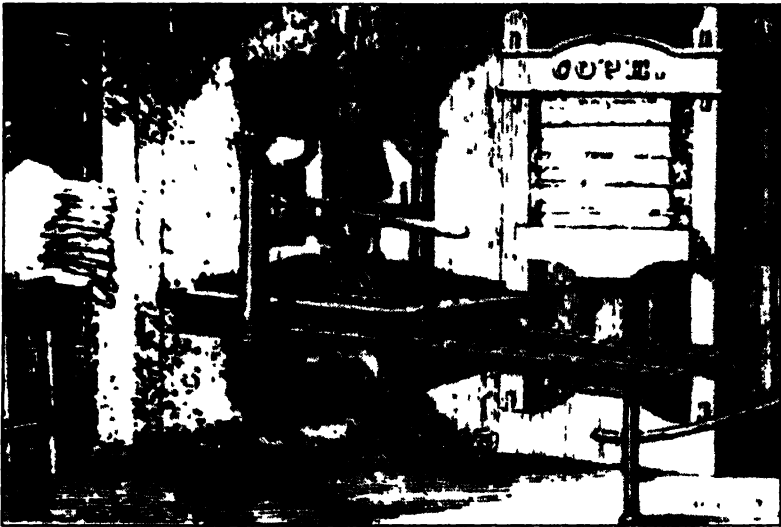
ঢাকার প্রথম মুদ্রণ যন্ত্র 'অ্যালবিয়ন প্রেস'। এ ছবিতে ঐ ধরনের একটি মুদ্রণ যন্ত্র।

প্রথম বছর স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন ৩৮৪ জন ছাত্র। তবে, উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছাত্ররা কলকাতা মেডিকেল স্কুলেই চলে যেতেন। কিন্তু আস্তে আস্তে অবস্থার উন্নতি হতে লাগল। ১৮৭৮ থেকে ১৮৮৫ সালের মধ্যে ১৩৬ জন এল. এম. এফ. ডাক্তার পাস করে বেরিয়েছিলেন এ স্কুল থেকে।

মেডিকেল স্কুল স্থাপনের পর মিটফোর্ড হাসপাতালকে সময়োপযোগী করা হয়েছিল। এক সময় মেডিকেল স্কুল সম্প্রসারণের প্রয়োজন হলো, এবারও স্কুলের ভবন

THE

FIRST REPORT

OF THE

EAST-BENGAL MISSIONARY SOCIETY.

MDCCCXLVIII.

WITH

AN APPENDIX &c.

DACCA:

PRINTED AT THE KATTRA PRESS.

1849.

ঢাকাব মুদ্রিত প্রথম বইয়ের নামপত্র, ১৮৪৯।

SCRIPTURAL RIDDLES

IN

BENGALI

RENDERED

INTO

ENGLISH VERSE,

WITH ENGLISH NOTES &c.

ধর্ম্মপুস্তক সম্বন্ধীয়

প্রহেলিকা

ও ইংরেজি কবিতা ছন্দে অর্থযুক্ত তর্জ্জমা

—o—

BY S. BAREIRO

DACCA:

PRINTED AT THE KATTRA PRESS.

- - -

1849

শুধু ঢাকা নয়, তৎকালীন পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশিত প্রথম বই যেখানে বাংলা অক্ষব ব্যবহৃত হয়েছিল, ১৮৪৯।

THE DACCA NEWS.

No.3. SATURDAY 10th MAY. 1856. PRICE 2 ANNAS.

STEAM TO DACCA AND ASSAM — The one point on which the residents in the districts lying to the east and north east of the Ganges, whether Civil or Military, Europeans or Natives, Missionaries or Planters, are agreed, is the absolute necessity of regular communication with Calcutta. Despairing however of, for several years at least, obtaining this, they agree that the next best thing is regular and frequent steamers on the Berhampooter and Soorma. The inhabitants of Dacca have petitioned Government to put steamers on this line; — the Commissioner of Dacca has constantly written that the only boon he requires for the districts under his care is steamers; — the Assam Tea Company has petitioned for steamers; — and at last we seem to have got steamers. We say seem because there is a rumour that those now running are to be taken off the line in September, when they will be required by Government, for the purpose of moving troops.

A few steamers put on a line for a short time, officered by men whose interest it is to show that the line does not pay, in order that they may be removed to one where they make a profit from the passage money of a number of passengers, with Steam Agents receiving only Rs 20 a month, and without wharves or godowns for landing and storing goods, can neither prove profitable as a speculation nor can they assist much in increasing production, because traders will not employ carriers who are irregular in their arrivals and departures, nor will they keep goods for a down-steamer which may not call.

That we may not be accused of supposing cases which may never occur we may mention, — that we have known a Captain of a Government Steamer refuse to take on board the sample boxes of a batch of Indigo, weighing a few pounds and which it was of the utmost consequence should reach Calcutta as soon as possible, *because his vessel was overloaded* — that we have known a Captain of a Government Steamer accept freight for the down trip, in consequence of which the goods were kept waiting for him for nearly a month, and when he arrived his

For all these reasons we are glad to learn that there is some hope of a private Company being formed, for the navigation of these rivers.

The following letter has been kindly placed at our disposal

"I shall now lay before you the result of my enquiries regarding the cost of 3 River steamers suitable for keeping up a monthly communication between Calcutta and Assam

The cost of three Steamers with Flats may be estimated in round numbers at Rs.4,00,000

This estimate is based on the cost of the last three new Boats and Flats belonging to the India General Steam Navigation Co

The steamers will be 130 feet long and 26 feet wide. Engines 80 Horse power, with Tubular Boilers capable of working up to 100 Horse power

The Flats [illegible] feet long and 2? feet wide capable of carrying [illegible] Tons of General Cargo.

The monthly expense of the steamer

Captain & Mate	Rs	300	
Engineer	„	250	
Crew	„	470	1,020
Ditto of Flat			
Captain & Mate	„	180	
Crew	„	200	380 1 400

multiply by 12 equal to 16,800 multiply by 3 equal to total for 3 steamers per annum Rs 50,400

3[illegible] Days steaming at 2[illegible] mds Coal per day equal to 6000 mds per mensem or 72,000 mds per annum at an average of 10 ans. per md. „ 45,000

95,400

Repairs & Stores per annum say	Rs	10,000
Agency charges &c	„	20,000

'ঢাকা নিউজ' শুধু বাংলাদেশের প্রথম ইংরেজি সাপ্তাহিক সংবাদপত্রই নয়, ঢাকার প্রথম সংবাদপত্রও বটে, ১৮৫৬।

রেজিষ্টরি করা। নং ১৭।

ঢাকাপ্রকাশ

সাপ্তাহিক।

" সিদ্ধিঃ সাধ্যে সতামস্তু। "

১০ম ভাগ
১৯শ সংখ্যা। } সন ১২৭৯। ১০ই আষাঢ়। রবিবার। ইংরাজী ১৮৭২। ২৩শে জুন। } বার্ষিক মূল্য ডাক মা
শুলসমেত ৬।০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

বিগত চৈত্র মাস হইতে ঢাকাপ্রকাশের নূতন বৎসর আরম্ভ হইয়াছে। গ্রাহকগণ সত্বর ইহার অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন। যাঁহাদিগের নিকট ইহার মূল্য বাকি পড়িয়াছে, তাঁহারা এপর্য্যন্ত পূর্ব্ব মূল্য পরিশোধ না করাতে আমরা নিরুপায় হইয়া তাঁহাদিগের কাগজ বন্ধ করিব। তাঁহাদিগের যদি ঢাকাপ্রকাশ গ্রহণে অভিলাষ থাকে, সত্বর পূর্ব্ব মূল্য পরিশোধ পূর্ব্বক অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন। অতঃপর যাঁর ঢাকাপ্রকাশ গ্রহণে বাসনা না থাকিলে তবে কেবল পূর্ব্ব মূল্যই বর্ত্তমান মাস মধ্যে প্রদান করিবেন। অন্যথা নিশ্চয়ই উপায়ান্তর অবলম্বিত হইবে।

শ্রীগোবিন্দ প্রসাদ রায়।
ঢাকা বাঙ্গলা যন্ত্রের
তত্ত্বাবধারক।

বিজ্ঞাপন।

মহেট জিটন ও আয়ারলণ্ডের অন্তঃপাতী ইংলণ্ড এণ্ডসন্, ইংলণ্ড লিমিটেড এণ্ড কোম্পানী বার্গান বার্কিস্ এণ্ড কোম্পানী ডুবায়েণ এণ্ড কোম্পানী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ এবং সুবিখ্যাত ঔষধালয় সমূহ হইতে উত্তম২ ও নূতন২ ঔষধ সকল আনয়ন করা হইয়াছে ঐসকল ঔষধ বিক্রয়ার্থ আমার পাটুয়াটুলীস্থ ডিস্পেন্সরিতে রাখা হইয়াছে।

শ্রীরুদ্রচন্দ্র নাগ

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত বাবু মহচন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত বাবু কালীনারায়ণ রায় শুভসাধিনীর গ্রাহক মহাশয় বরেষু প্রতি—

আপনাদিগের নিকট শুভসাধিনী পত্রিকা মুদ্রাঙ্কণ দরুণ যাহা প্রাপ্য আছে তাহা অদ্য তারিখ হইতে ১৫ দিবসের মধ্যে পরিশোধ করিয়া দিবেন। যদি তাহা না দেন তবে ১৫ দিবস পরে আপনাদিগের নামে নালিশ উপস্থিত করিব। জ্ঞাতার্থে নিবেদন করিলাম ইতি॥

সন ১২৭৯।
১০ই আষাঢ়। } শ্রীইন্দ্রকুমার ভৌমিক
ঢাকা বাঙ্গলা যন্ত্রালয়ের
মোহরের।

বিজ্ঞাপন।

মোহা ও দাউদের মহৌষধ। মাশুল সহিত নিম্নলিখিতরূপে বিক্রয় হইবে।

মোহা	২।৵০
দাউদ	।৵০

শ্রী শ্যামাচরণ বন্দোপাধ্যায়
পণ্ডিত গোহগরন সং
কেশ স্কুল পো. গোহ
জয় জেলা ঢাকা।

বিজ্ঞাপন।

এস্ কে, চট্টোপাধ্যায় এণ্ড কোং
বাবুর বাজার।

আমাদের দোকানে একপ্রকার অতি উৎকৃষ্ট পাঁচরা নাশক সাবান বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। অন্যান্য নানাপ্রকার নূতন জিনিসও বিক্রয় হইতেছে।

ঢাকা।
১লা আষাঢ়। ১২৭৯।

বিজ্ঞাপন।

জেলা ঢাকার ফৌজদারী এলাকাধীন নারায়ণগঞ্জের যাত্রা যে বর্তমান আছে, তাহার সওয় ফাইন অর্থাৎ

'ঢাকা প্রকাশ' ছিল ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র, ১৮৬১।

কলেজিয়েট স্কুল, ১৮৯০। ঢাকার প্রথম সরকারি স্কুল।
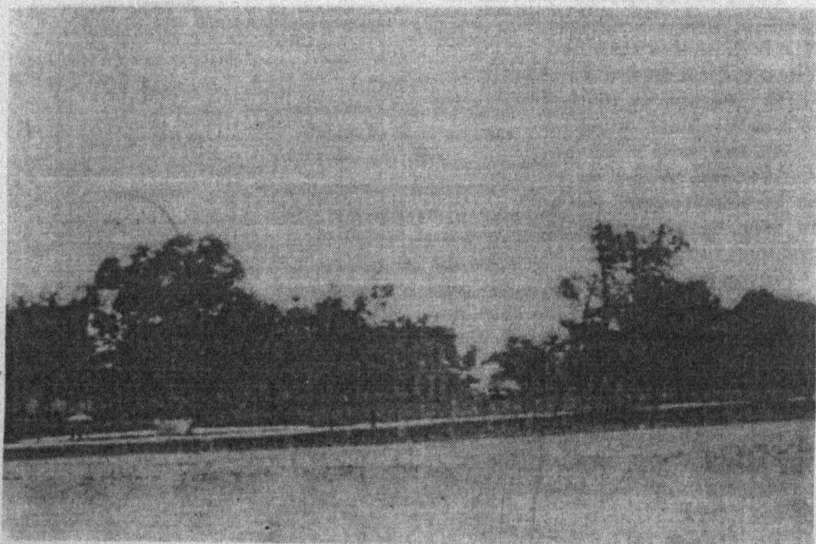
ঢাকা কলেজ, ১৯১৭। বর্তমানে যা পুরনো হাইকোর্ট ভবন নামে পরিচিত। 'ঢাকা কলেজ' ছিল ঢাকার প্রথম সরকারি কলেজ।

জগন্নাথ কলেজ। বর্তমানে কলেজের প্রশাসন ভবন হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।
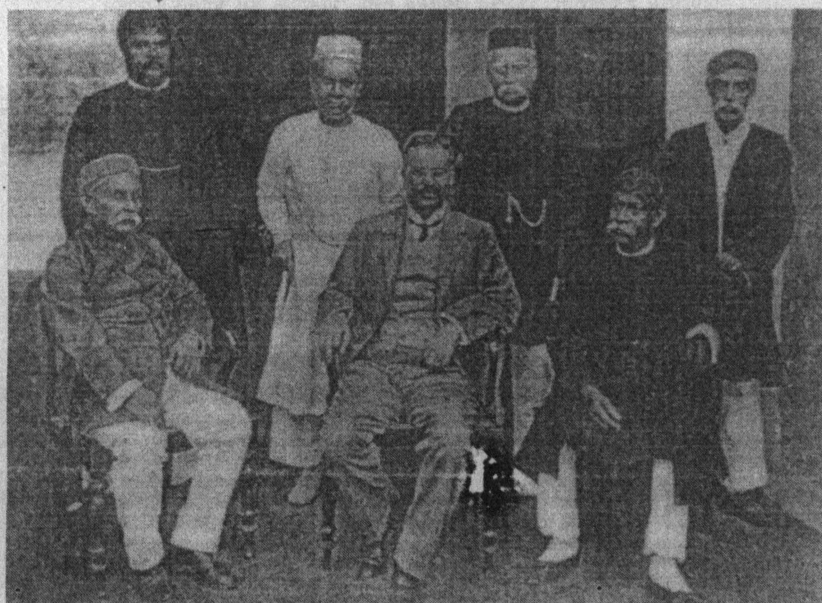
জগন্নাথ কলেজের ম্যানেজিং কমিটি। মনে হয় ১৯০৮ সালে জগন্নাথ কলেজের ভার ট্রাস্টিদের হাতে অর্পণের পর এই কমিটি গঠিত হয়েছিল। দাঁড়িয়ে বাঁ থেকে— ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়, খাজা মোঃ ইউসুফ, আনন্দচন্দ্র রায়, কালীপ্রসন্ন রায়। বসে বাঁ দিক থেকে— চন্দ্রকুমার দত্ত, আর. নাথান, কিশোরীলাল রায় চৌধুরী।
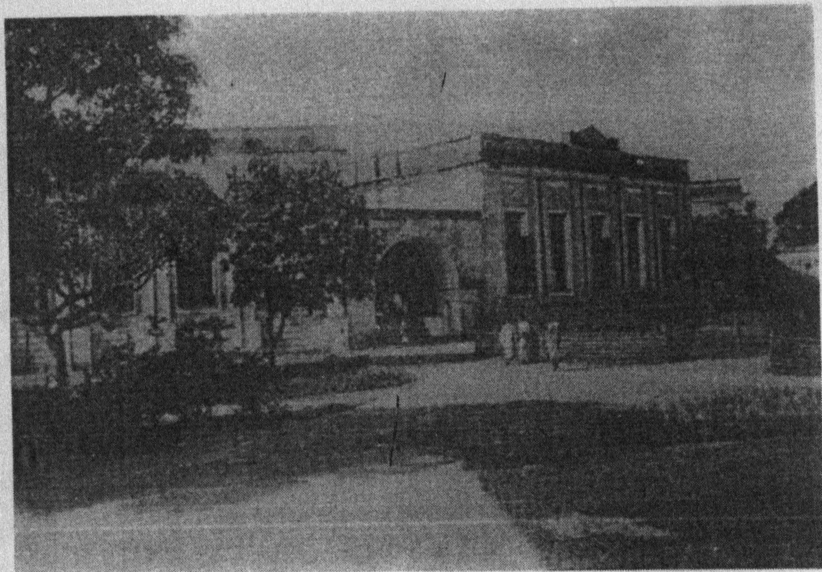
মিটফোর্ড হাসপাতাল, ১৯১৭। এখানেই প্রথম মেডিকেল স্কুল স্থাপিত হয়েছিল।
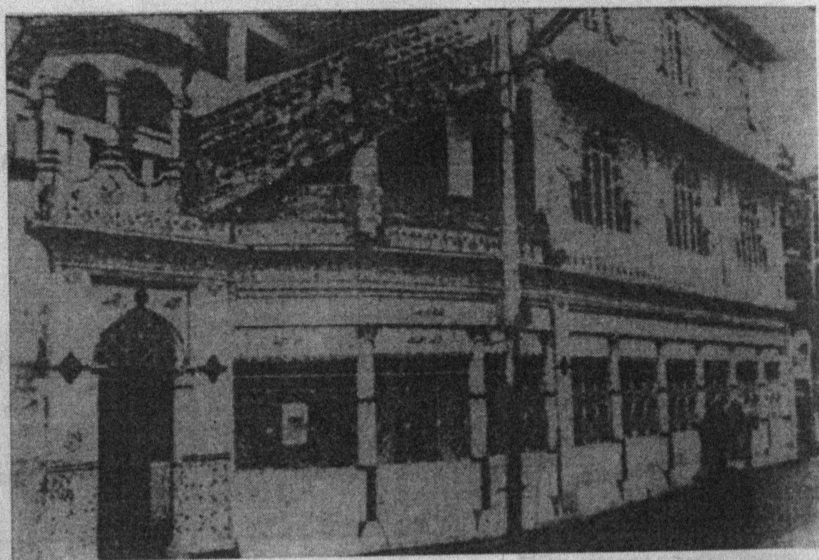
ঢাকার প্রথম মসজিদ বিনত বিবির মসজিদ। এখন এর আদিরূপ আর নেই।
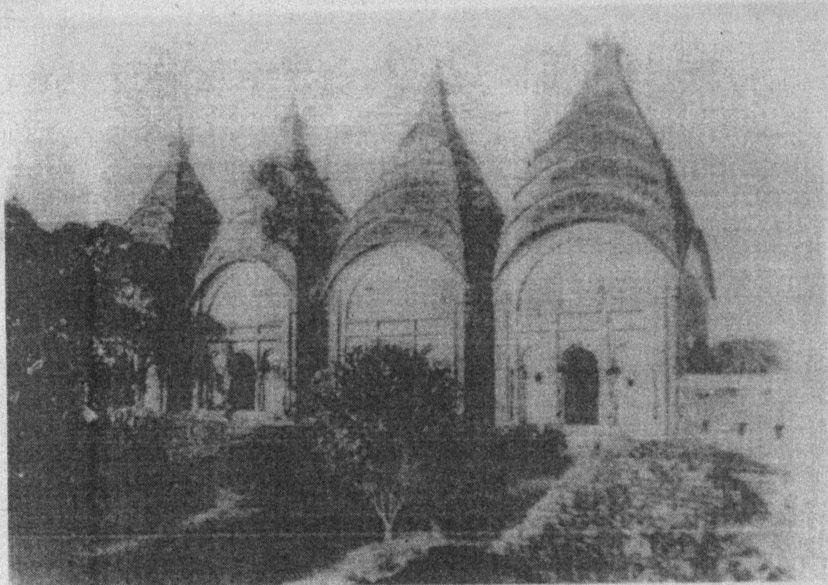
ঢাকেশ্বরী মন্দির চত্বরের চারটি শিবমন্দির।
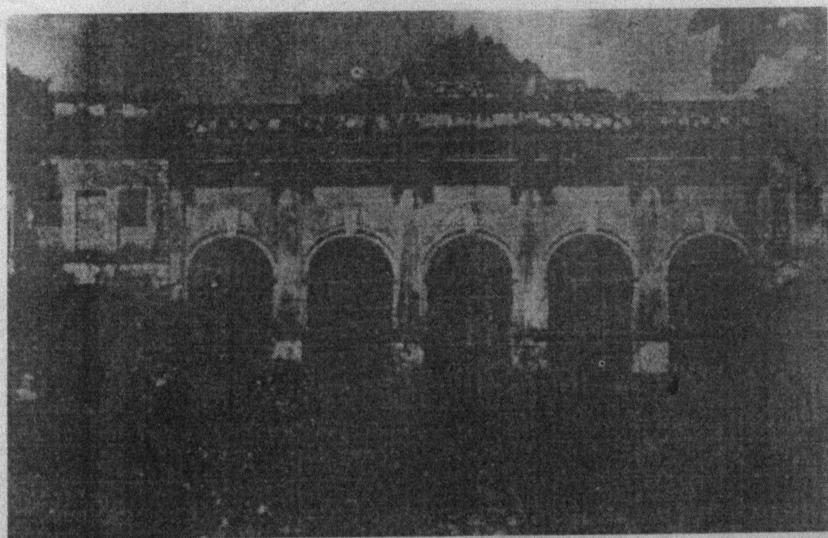
পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজ মন্দির যা নির্মিত হয়েছিল ১৮৬৯ সালে।
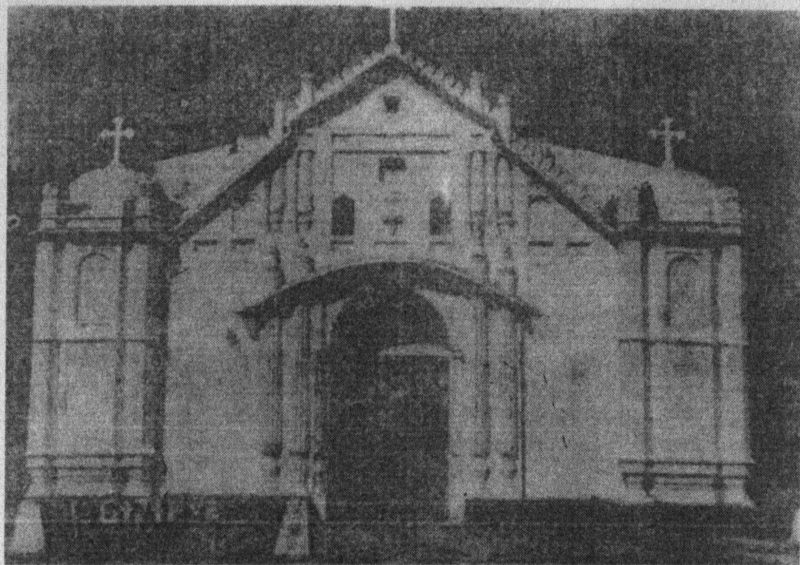
ঢাকার প্রথম গির্জা, তেজগাঁর গির্জা।
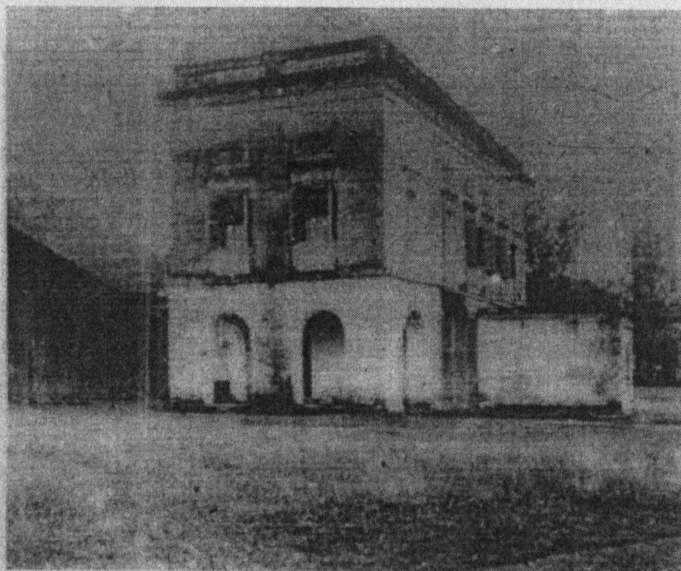
প্রথম ব্যাংক, ঢাকা ব্যাংক, ১৮৪৬।
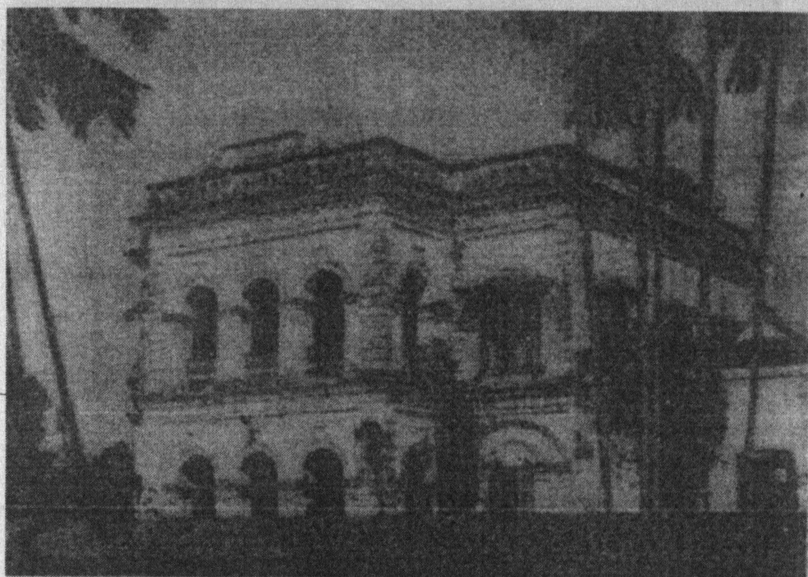
ওয়ারীর একটি পুরনো বাড়ি।
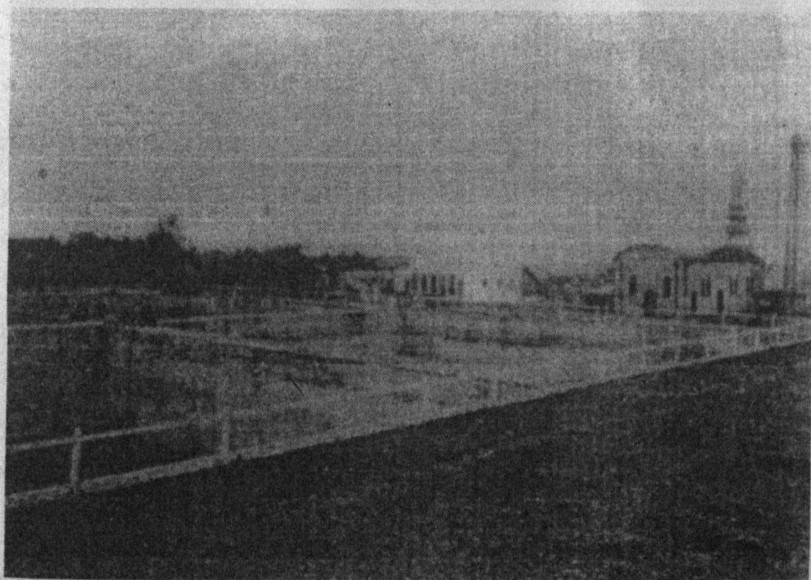
পরিশ্রুত পানি সরবরাহের জন্য ওয়াটার ওয়ার্কস নির্মিত হয়েছিল ১৮৭৮ সালে।
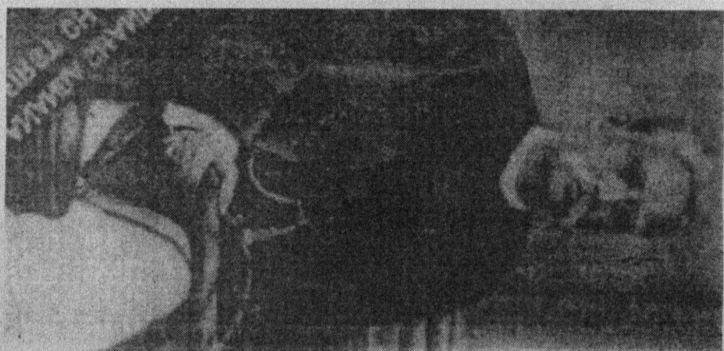
অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট আবদুল গনি ও পোগজ।

পৌরসভার প্রথম নির্বাচিত চেয়ারম্যান আনন্দচন্দ্র রায়, ১৮৮৪।

নির্মাণের জন্য এগিয়ে এলেন ধনাঢ্যরা। স্কুল ভবনের জন্য যাঁরা দান করেছিলেন তাঁরা হলেন—

রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর	—২০,০০০
বাবু রঘুনাথ দাস	—১৫,০০০
রাজা সূর্যকান্ত আচার্য বাহাদুর	—১০,০০০
মীর মোহাম্মদ	—৫,০০০
শ্রীমতি বিশ্বেশ্বর দেবী	—২,০০০
মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর	—১,০০০
রাজা সুরেন্দ্রমোহন ঠাকুর	—১০০০
বাবু শ্রীনাথ রায়	—১,০০০
শ্রীমতি জাহ্নবী চৌধুরাণী	—১,০০০
শ্রীমতি বিন্দুবাসিনী চৌধুরাণী	—১,০০০
বাবু প্রাণশঙ্কর ও বাবু প্রভাতশঙ্কর রায় চৌধুরী	—৫০০
বাবু শ্যামাপ্রসাদ রায় চৌধুরী	—৫০০
বাবু যোগেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী	—২০০
বাবু হেমচন্দ্র	—২০০
বাবু হেমচন্দ্র	—১০০

১৮৮১ সালের আগে কিছুদিনের জন্য হয়তো স্কুলের কার্যক্রম বন্ধ ছিল। পত্রিকার একটি বিজ্ঞাপন দেখে এ অনুমান করছি—

"এতদ্বারা জ্ঞাপন করা যাইতেছে যে, আগামী ১৫ই জুন ঢাকা মেডিকেল স্কুলের শিক্ষাকার্য্য পুনরারম্ভ হইবে। যাহারা মেডিকেল স্কুলে ভর্তি হইতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে ১৫ই জুনের পূর্ব্বে রেজিস্টারি বহিতে নাম লেখাইতে হইবে। ভর্তি হইবার পূর্বে প্রার্থীগণের নিম্নলিখিত কোনও পরীক্ষোত্তীর্ণ হওয়ার সার্টিফিকেট প্রদর্শন করা আবশ্যক।

১ম, প্রবেশিকা পরীক্ষা।

২য়, মাইনর ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা।

৩য়, বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা।

বঙ্গদেশীয় গভর্নমেন্টের ১৮৮১ সনের ৩০শে মার্চ তারিখের আদেশানুসারে সেশনের প্রারম্ভে একটা কম্পাউণ্ডার ক্লাশ খোলা হইবে। এই শ্রেণীতে প্রবেশার্থীদিগকে ১৫ জুনের পূর্ব্বে নাম রেজিস্টারি করিতে হইবে।

২৬শে মে ১৮৮১ এছ পারভিস্ ঢাকা মেডিকেল স্কুলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট।"

১৮৮৭ সালে ২রা এপ্রিল ঢাকার কমিশনার ডব্লিউ আর. লারমিনি ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন। স্কুল ভবন উদ্বোধন করা হয়েছিল ২২ সেপ্টেম্বর ১৮৮৯ সালে।

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, প্রায় একশ' বছর আগেও বাংলায় মেডিকেল শিক্ষা দেওয়া সম্ভব ছিল, যা আজ অনেকের মতে অসম্ভব। দ্বিতীয়ত, যাঁরা জড়িত ছিলেন

মেডিকেল স্কুলের সঙ্গে, তাঁরা দায়িত্ব মনে করে বাংলায় বইও লিখেছিলেন। এ ধরনের কয়েকটি বই হলো—কাশীচন্দ্র গুপ্তের "অস্ত্র চিকিৎসা' (১৮৮১), চুনিলাল দাসের প্যাথলজি ও এনাটমি বিষয়ক 'নিদান ও রুগ্ন দেহ সূক্ষ্ম তত্ত্ব' (১৮৯৬), হরিপ্রসাদ চক্রবর্তীর 'ডাক্তারি অভিধান' (১৮৮৯) ও সূর্যনারায়ণ ঘোষের 'অস্ত্র চিকিৎসা' (১৮৯২)।

কাশীচন্দ্র দত্ত, সূর্যনারায়ণ ঘোষ ও দুর্গাদাস রায়—এই তিনজন মিলে আবার ১৮৮০ সালে প্রকাশ করেছিলেন চিকিৎসা বিষয়ক সাময়িকী 'ভিষক'।

১৯৬২ সালে ঢাকার মেডিকেল স্কুল রূপান্তর করা হয় কলেজে এবং এর নামকরণ করা হয় সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ। ১৯৭২ সালে সলিমুল্লাহ কলেজ পরিণত হয় পূর্ণাঙ্গ মেডিকেল কলেজে এবং প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন ডাঃ এ. এফ. এম. নূরুল ইসলাম।

হাসপাতাল

কোম্পানি আমলে সাধারণের স্বাস্থ্য সংরক্ষণে শাসকদের কোনো দায়দায়িত্ব ছিল না। তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল বাণিজ্য। ঐ সময়, স্বাস্থ্যগত দিক থেকে ঢাকার অবস্থা ছিল শোচনীয়। সরকারের কোনো দায়দায়িত্ব না থাকায়, সাধারণের চাঁদায় বা ব্যক্তিগত উদ্যোগেই স্বাস্থ্য সংরক্ষণের দায়িত্ব যতটা পালন সম্ভব তা করা হতো।

এ পর্যন্ত সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী, উনিশ শতকের প্রথম দিকে, ঢাকা শহরে চিকিৎসার জন্য যে ক'টি সংস্থা ছিল তা হলো—

১. একটি ছোট হাসপাতাল যেখানে সংকুলান হতো মাত্র চল্লিশ জন রোগীর। ১৮০৩ সালে কলকাতার দেশীয় হাসপাতালের শাখারূপে তা স্থাপন করা হয়েছিল। হাসপাতালটি কিন্তু পরিচালিত হতো সাধারণের দেয়া চাঁদার একটি ফান্ডের সুদ থেকে। তহবিলে জমা ছিল মাত্র বাইশ হাজার টাকা।
২. চক বাজারের কাছে 'লুনাটিক অ্যাসাইলাম' বা পাগলা গারদ এবং জেল হাসপাতাল।
৩. সামরিক হাসপাতাল। সামরিক হাসপাতালে সাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল না। দ্বিতীয়টি ছিল বিশেষ হাসপাতাল। সে দিক থেকে বিচার করলে ১৮০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালটিই ঢাকার প্রথম হাসপাতাল। পরে, এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠা করা হয় মিটফোর্ড হাসপাতাল।

মসজিদ

ঢাকার প্রথম মসজিদ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে বিনত বিবির মসজিদকে। নারিন্দা পুলের উত্তরে ছোট এই মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল ঢাকা মুঘল রাজধানী হওয়ার আগে। মসজিদে প্রাপ্ত এক শিলালেখ থেকে জানা যায় ৮৬১ হিজরী (দানীর মতে ১৪৫৭ সাল)

মারহামাত-এর কন্যা মুসাম্মাত বখত বিনত এটি নির্মাণ করেছিলেন, সেই সময় বাংলার সুলতান ছিলেন নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহ এবং রাজধানী ছিল গৌড়। মারহামাত বা তাঁর কন্যা বখত বিনত সম্পর্কে অবশ্য আর বেশি কিছু জানা যায়নি।

মসজিদটির স্থাপত্যশৈলী ছিল প্রাক-মুঘল। পরবর্তীকালে সংস্কারের কারণে অবশ্য এর আদি রূপ পরিবর্তিত হয়েছে।

বিনত বিবির মসজিদের ফারসি শিলালেখটি অনুবাদ করেছেন হরিনাথ দে ইংরেজিতে—

"With the call 'come to weab' by
morning and night
Lo! the mosque of this pauper was
night well bedight
Named Bakht Binat Daughter of Marhamat.
CCML W/X1=861"

মন্দির

ঢাকার সবচেয়ে প্রাচীন মন্দির ঢাকেশ্বরী। অনেকে তো মনে করেন ঢাকা নামের উৎপত্তি এই ঢাকেশ্বরী নাম থেকেই। কিংবদন্তি অনুসারে একবার রাজা বিজয় সেনের রানী গিয়েছিলেন লাঙ্গলবন্দে, স্নানে। ফেরার সময় জন্মেছিল তাঁর একটি পুত্র সন্তান, ইতিহাসে যিনি পরিচিত বল্লাল সেন নামে। বল্লাল সেন সিংহাসনে আরোহণের পর নিজের জন্মস্থানকে স্মরণীয় করে রাখার জন্যে নির্মাণ করেছিলেন এই মন্দির।

অন্যভাবেও কিংবদন্তিটি প্রচলিত। বল্লাল সেন একবার স্বপ্নে দেখেছিলেন, এই জায়গায় জঙ্গলে ঢাকা অবস্থায় পড়ে আছে দেবী। বল্লাল সেন দেবীকে উদ্ধার করে স্থাপন করেন এক মন্দির যা পরিচিত হয়ে ওঠে ঢাকেশ্বরী নামে। কিংবদন্তি যাই হোক, হিন্দু সম্প্রদায় মনে করেন ঢাকেশ্বরী ঢাকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

ঢাকেশ্বরী মন্দির চত্বরে আছে দু'ধরনের স্থাপত্যরীতির মন্দির। প্রাচীনতমটি পঞ্চরত্ন, দেবী দুর্গার, যা সংস্কারের ফলে মূল চেহারা হারিয়েছে। এ শতকের গোড়ার দিকে ব্রাডলি বার্ট লিখেছিলেন, বর্তমান মন্দিরটি দুশো বছরের পুরোনো এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এক হিন্দু এজেন্ট বর্তমানেরটি নির্মাণ করেছেন। খুব সম্ভব এজেন্ট ভদ্রলোক মন্দিরটি সংস্কার করেছিলেন।

এটি ছাড়া আছে চারটি শিবমন্দির। কিংবদন্তি অনুযায়ী, ষোড়শ শতকে রাজা মান-সিংহ এখানে চারটি শিবলিঙ্গ স্থাপন করে নির্মাণ করেছিলেন চারটি শিবমন্দির। কিন্তু মনে হয় না এ তথ্যের কোনো বিশ্বাসযোগ্যতা আছে।

বাংলা চৌচালা ও শিখর মন্দিরের মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায় ঢাকেশ্বরী স্থাপত্যে।

রতনলাল চক্রবর্তী এক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, "এর নির্মাণ-শিল্প ও গঠন-প্রণালী বৌদ্ধ মঠের মতো।" তাঁর মতে, সম্ভবত তা ছিল বৌদ্ধ মন্দির, পরবর্তীকালে যার রূপান্তর করা হয়েছিল হিন্দু মন্দিরে। এ থেকে তিনি অনুমান করছেন, এটি নির্মিত হয়েছিল সম্ভবত দশম শতকে।

উনিশ শতকে ঢাকেশ্বরী মন্দির কেমন ছিল? হৃদয়নাথ মজুমদার এ সম্পর্কে বর্ণনা রেখে গেছেন। তখন (খুব সম্ভত সত্তর দশকে) মন্দিরটি ছিল জঙ্গলে আবৃত। এর দক্ষিণে ছিল উর্দু রোড যা পশ্চিমে চলে গিয়েছিল পিলখানার দিকে। উত্তর-পশ্চিমে ছিল মীরপুরে যাবার রাস্তা। উত্তরে ছিল জঙ্গল আর পূর্বে উর্দু বাজার।

মন্দিরটি পঞ্চরত্ন, সামনে নাটমন্দির। নাটমন্দিরকে ঘিরে আছে এক সারি ঘর। আর আছে একটি বড় পুকুর, নহবতঅলা ফটক যার ভেতর দিয়ে হাতি যেতো। পূর্বে আছে কিছু সাধুর সমাধি যাঁরা এক সময় মন্দিরে পূজো বা ধ্যান করতেন। মন্দিরের বাইরে আছে পাঁচটি (চারটি) মঠ, প্রতিটিতে একটি শিবলিঙ্গ। ঢাকেশ্বরী মন্দিরের পুরোহিত প্রতিদিন এর পূজো করেন। দেবী হলেন দশভূজা। কথিত আছে তা নাকি সোনার তৈরি। দেবীর ডান ও বাঁ দিকে আছে আরো কিছু মূর্তি। পুরনো আমলের অনেক হিন্দু মন্দিরের মতো এর ভেতরটাও অন্ধকার। দেবী দর্শনের জন্য দিনের বেলায়ও জ্বালতে হয় আলো। মন্দিরের মালিক অনেক। এর কারণ নতুন অনেক সেবায়েত পুরনো সেবায়েতদের কাছ থেকে কিনেছিলেন মালিকানা।

যতীন্দ্রমোহন রায় ১৯০১ সালে লিখেছিলেন, "ঢাকেশ্বরী জঙ্গলাকীর্ণ কিন্তু যেন শান্তিনিকেতন। কলকণ্ঠ বিহগের অস্ফুট কাকলির সহিত সন্ধ্যারতির শঙ্খ ঘণ্টারোল বিমিশ্রিত হইয়া স্থানটিকে বাস্তবিকই আনন্দমুখরিত করিয়া তুলে। ....শ্যামপত্রপূর্ণ আম্র প্রভৃতি বৃক্ষরাজি আপন আপন শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া এরূপভাবে আলিঙ্গন সংঘবদ্ধ হইয়া শান্তিকুঞ্জ নির্মাণ করিয়াছে যে মধ্যাহ্ন ভাস্করের প্রদীপ্ত কিরণজালও উহা ভেদ করিয়া মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে না। সুতরাং নিদাঘ মধ্যাহ্নেও সুশীতল বায়ুস্পর্শে শরীর স্নিগ্ধ হইয়া যায়।"

এ দেশের দ্বিতীয়/তৃতীয় দশকের ঢাকেশ্বরী মন্দিরের স্মৃতিচারণ করেছেন নাজির হোসেন। খানিকটা দীর্ঘ হলেও তাঁর বর্ণনা এখানে উদ্ধৃত করছি। তাহলে ঢাকেশ্বরীর একটি চিত্র ফুটে উঠবে আমাদের কাছে—

"আগের দিনে চৈত্র মাসে এই ঢাকেশ্বরী মন্দির প্রাঙ্গণে বিরাট মেলা বসতো। বহু রঙ-বেরঙের দোকানে এ স্থান সরগরম হয়ে উঠতো। আগমন-পুণ্যার্থী এখানে এসে মন্দির দর্শন করে পুণ্য সঞ্চয় করে বাড়ি ফিরে যেতো। হিন্দু ধর্ম বিশ্বাসী লক্ষ লক্ষ মানুষ ব্রহ্মার পদতলে আশ্রয় ও পাপস্খলনের আশায় চৈত্র মাসের শুক্লা অষ্টমীতে লাঙ্গলবন্দে মিলিত হয়ে ব্রহ্মপুত্র নদীতে স্নান করে চির মোক্ষ লাভ করতো। আর একই প্রেরণায় দেবী দুর্গার আশীর্বাদ লাভকল্পে পুণ্যার্থীরা সারাদিন পিপীলিকার সারির মতো বিভিন্ন পথ ধরে নানা দিক থেকে ত্রস্ত পদে এগিয়ে আসতো ঢাকেশ্বরী মন্দিরের দিকে। এটি ছিলো তাদের কাছে সারা বছরের সেরা পর্ব। বহু আশা-প্রত্যাশা নিয়ে ঘর থেকে বের হতো

পুণ্যার্থীরা। চোখে-মুখে ফুটে উঠে তাঁদের প্রাণের ব্যাকুলতা, পাপ মোচন করে ফেলার ঐকান্তিক আগ্রহ, আনত মস্তকে তারা ভগবানের ধ্যান করতে করতে নীরবে এগিয়ে চলতেন মন্দিরের দিকে। কোন দিকে তাঁদের মন নেই. আহার, নিদ্রা, পায়ের ক্লান্তির প্রতি ভ্রূক্ষেপ নেই। মনে তাঁদের প্রবল বিশ্বাস— সিদ্ধি লাভ হবেই। এসব তীর্থযাত্রী এক একটি ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত, প্রতি দলে দশ থেকে বিশজন। দলের সবাই স্ত্রীলোক। তাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একজন মাত্র পুরুষ, গ্রামের মুরব্বি ধরনের লোক। বহু দূর-দূরান্ত থেকে এমনিভাবে দল বেঁধে আসেন তাঁরা। অতি বৃদ্ধ-দুর্বল-লোলচর্ম, বয়সের ভারে ন্যূব্জ এরকম বৃদ্ধ-বৃদ্ধারও সমাবেশ ঘটে। মন্দিরের নিকটতম ও শহরের বিভিন্ন মহল্লা হতে যুবকরা আসে স্বেচ্ছাসেবকরূপে কাজ করার জন্য পুণ্যার্থীর। একান্ত নিবিষ্ট মনে স্ব স্ব আকুতি ও প্রার্থনা নিবেদন করে এবং মাঝে মাঝে 'ওম ঢাকা ঈশ্বরী' বলে প্রণাম জানায়।"

ঢাকেশ্বরীর সেই আগের রূপ এখন আর নেই। ১৯৯০ সালে এরশাদ সরকার সৃষ্ট দাঙ্গায় ঢাকেশ্বরী মন্দিরের খোলস ছাড়া বাকি সব কিছু ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে।

ব্রাহ্ম মন্দির

ব্রাহ্মদের উপাসনার জন্য নির্মিত প্রথম মন্দিরটি পরিচিত 'পূর্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ মন্দির' নামে। ঢাকায় ১৮৪৬ সালের ৬ ডিসেম্বর আবগারি ইন্সপেক্টর ব্রজসুন্দর মিত্রের উদ্যোগে স্থাপিত হয়েছিল ব্রাহ্মসমাজ। কুমারটুলির গোলাম মিস্ত্রির বাড়িতে স্থাপিত এই সমাজের নাম ছিল— ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ।

প্রথম দিকে ব্রাহ্ম সদস্য সংখ্যা ছিল যখন কম তখন বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জনের বাসায় হতো ব্রহ্মোপসনা। কিন্তু কালক্রমে সদস্য সংখ্যা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাওয়ায় আলাদা একটি গৃহ বা স্থানের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল যা পূর্ববাংলার ব্রাহ্মদের বার্ষিক মিলনস্থল হতে পারে বা যেখানে কেন্দ্রীয়ভাবে সম্ভব হবে ব্রহ্মোপাসনা।

এ পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৬৬ সালে তৎকালীন ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ সম্পাদক দীননাথ সেন প্রস্তাব করেছিলেন একটি গৃহ নির্মাণের। এজন্য সাহায্য চেয়ে চিঠি লিখেছিলেন পূর্ববঙ্গে অনেক ব্রাহ্ম কর্মীকে। সানন্দে ব্রাহ্ম কর্মীরা এ প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়েছিলেন। দীননাথ সেন প্রস্তাব করেছিলেন গৃহের নাম রাখা হোক 'পূর্ব বাঙলা সাধারণ সভামন্দির'। কিন্তু সভ্যরা প্রস্তাব করেছিলেন গৃহের নাম রাখা হোক—'পূর্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ'।

এই প্রস্তাব পাস হওয়ার পর ১৮৬৬ সালের ২৫শে আগস্ট ন'জন কর্মীকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল একটি 'গৃহ নির্মাণ কমিটি'। কমিটির যাঁরা সদস্য ছিলেন তাঁরা হলেন— ঢাকার কমিশনারের পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট অভয়চন্দ্র দাস, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রামকুমার বসু, কলেজিয়েট স্কুলের হেডমাস্টার কৈলাসচন্দ্র ঘোষ, বৈকুণ্ঠনাথ সেন, পোগজ স্কুলের হেডমাস্টার গোপীমোহন বসাক, স্কুলসমূহের ডেপুটি ইন্সপেক্টর

অক্ষয়কুমার সেন, কমিশনার অফিসের হেডক্লার্ক উমেশচন্দ্র দাস, জমিদার রাধিকামোহন রায়, কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক ও ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক দীননাথ সেন।

এরপর কমিটি অগ্রসর হয়েছিল চাঁদা সংগ্রহে। আবেদনপত্রে সদস্যরা এ বলে অঙ্গীকার করেছিলেন, "এই টাকার জন্য আমরা দায়ী থাকিব এবং যদি সমুদয় টাকা আদায় না হওয়া নিবন্ধন, অথবা অন্য কোন অপ্রীতিকর কারণবশতঃ গৃহ নির্মাণ না করা হয় তবে আপনাদের টাকা প্রত্যর্পণ করিব।"

গৃহ নির্মাণের জন্য চাঁদা দিয়েছিলেন ৫৮৫৭ জন। এর মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রজসুন্দর মিত্র ও দুর্গামোহন দাস দিয়েছিল যথাক্রমে ৫০০, ৬০০ ও ১০০০ টাকা।

চাঁদা সংগ্রহের পর কমিটি গৃহের জন্য পছন্দ করেছিলেন কলেজিয়েট স্কুলের পাশের জমিটুকু। এ জমির মালিক ছিলেন কলতাবাজারের জমিদারগণ (শ্যামচাঁদ বসাক, জগন্নাথ বসাক, কুঞ্জবিহারী গোবর্ধন, চৈতন্যকৃষ্ণ সাধুচরণ, গোবিন্দচরণ বসাক, সনাতন ও কৃষ্ণদাস বসাক প্রমুখ। তাঁরা বার্ষিক বাহাত্তর টাকা খাজনায় ও সাতশ' নয় টাকা সেলামিতে 'কায়েমী মোকররী মিরাসা পাট্টা' দিয়েছিলেন কোষাধ্যক্ষ রাধিকানাথ রায় ও সম্পাদক দীননাথ সেনকে (পরে পাট্টা হস্তান্তর করা হয়েছিল ব্রাহ্মসমাজের অছিদের)। জমি রেজিস্ট্রারি হয়েছিল ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৮৬৮ সালে।

সমাজগৃহের মন্দিরের নকশা প্রস্তুত করেছিলেন উমকান্ত ঘোষ। ঠিকাদারী দেওয়া হয়েছিল রামমানিক্য সিংহকে এবং ১৮৬৭ সালের এপ্রিলে মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিনে অভয়কুমার দত্ত।

১৮৬৯ সালে প্রায় দশ হাজার টাকা ব্যয়ে 'দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সবচেয়ে সুন্দর' এই ব্রাহ্ম মন্দিরটির নির্মাণকাজ শেষ হয়েছিল। দ্বিতল এই গৃহের প্রধান আকর্ষণ হলো— একতলার হলঘর যা ৫৫ ফুট দীর্ঘ, ২২ ফুট প্রশস্ত ও ২১ ফুট উঁচু।

ব্রাহ্মসমাজ মন্দির উদ্বোধন করা হয়েছিল ৫ই ডিসেম্বর ১৮৬৯ সালে। ঐদিন ঢাকাবাসীরাও কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে যোগ দিয়েছিলেন উদ্বোধনী উৎসবে এবং উৎসবটি সম্পন্ন হয়েছিল জাঁকজমকের সঙ্গে। এ সম্পর্কে তৎকালীন সংবাদপত্রের একটি রিপোর্ট দীর্ঘ হলেও উদ্ধৃত হলো—

"গত ২১শে ও ২২শে অগ্রহায়ণ (১২৭৬) দিবস উক্ত সমাজগৃহের প্রতিষ্ঠাকার্য্য অতিসূচারুরূপে সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে। ২১শে অগ্রহায়ণ রবিবার অতি প্রত্যুষে ব্রাহ্মগণ আরমানিটোলাস্থিত পুরাতন ব্রাহ্মসমাজগৃহে সমবেত হইলে সেখানে কিয়ৎক্ষণ উপাসনা ও সংকীর্তন হয়। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় তৎকালে যেরূপ হৃদ্যরূপে একটি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সকলেরই তাহা সবিশেষ মনোহারিণী হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। অনেকেই তৎশ্রবণে বিগলিত চিত্ত ও সাশ্রুনয়ন হইয়াছিলেন। আরমানিটোলাস্থিত সমাজবাড়ীর চত্বরে সংক্ষিপ্তরূপে উপাসনা করিয়া সকলে ব্রাহ্ম সংকীর্তন করিত করিতে রাস্তায় বহির্গত হইলেন। ব্রাহ্মরা নগর সংকীর্তন করিতে নূতন বাহির হইয়াছেন, এই বলিয়া হউক, অথবা অন্য যে কোন কারণেই হউক, নানা শ্রেণীর বহু সংখ্যক ব্যক্তি এই সংকীর্তন শ্রবণ করিতে রাস্তার উভয়পার্শ্বেই দণ্ডায়মান

হইয়াছিলেন। ... কি হিন্দু কি মুসলমান এবং খৃষ্টান সকল সম্প্রদায়েরই প্রধান প্রধান ব্যক্তি ব্রাহ্ম সংকীর্তনে আকৃষ্টমনা হইয়া অতি সুগম্ভীর চিত্তে উহার পদমাধুরী শ্রবণ করিয়াছিলেন। যখন সংকীর্তনকারীদিগের পশ্চাৎই ভূরি ভূরি লোক নূতন সমাজগৃহের বহিঃস্তোরণে দণ্ডায়মান হইলেন এবং গৃহের সম্মুখভাগে বহুসংখ্যক প্রধান ব্যক্তি তাহাদিগকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ ২ অগ্রসর হইতে লাগিলেন তৎকালে এক চমৎকার দৃশ্য হইয়াছিল। .... এইভাবে ব্রাহ্ম সংকীর্ত্তন করিতে ২ গৃহপ্রবেশ করিলে সকলে যথাযোগ্য আসন পরিগ্রহ করিলেন। গৃহপ্রবেশ সময়ে এত লোকের সমাবেশ হইয়াছিল যে, বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত ২ ব্যক্তিকে আসনাভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে হইয়াছিল। ঢাকার সকল সম্প্রদায়েরই প্রধান ২ ব্যক্তিগণ এই সময়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন। মান্যবর শ্রীযুক্ত খাজা আব্দুল গনি ও খাজা আসানউল্লা প্রভৃতি অতিসম্ভ্রান্ত মুসলমানগণ, জোয়াকিন পোগজ ও ডেভিড প্রভৃতি খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের সম্মানশালী আর্মেনিয়ানগণ এবং বাবু বরদাকিংকর রায়, বাবু ত্রিলোচন চক্রবর্ত্তী, মুন্সী লক্ষ্মীকান্ত দাস ও কৃষ্ণকুমার বসু প্রভৃতি হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান উকীল এবং আমলাগণ অকুণ্ঠিতচিত্তে এই দিবস সভায় গমন করিয়াছিলেন।

"বক্তৃতার পর সংক্ষিপ্তরূপে প্রার্থনা ও সংকীর্ত্তন হইলে বেলা ১০টার সময় সভা ভঙ্গ হইল। প্রাতঃকালে ঘোষণা করা হইয়াছিল, ১১টার সময় পূর্ব্ব বাঙলা ব্রাহ্মসমাজের গৃহে অন্ধ-আতুর প্রভৃতি দীন-দুঃখীদিগকে কিছু ২ দান করা হইবে। ১২টা পর্যন্ত কাঙ্গালদিগের প্রতীক্ষা করিয়া দানারম্ভ করা হইল। পূর্ব্বে ঢেঁড়া দেওয়াতে সহস্রাধিক দীন-দুঃখী উপস্থিত হইয়াছিল। প্রাপ্তবয়স্ক সাধারণ দীন-দুঃখীদিগকে এক ২ আনা, ক্ষুদ্র বালক-বালিকাদিগকে এক এক পয়সা এবং অন্ধ-আতুর প্রভৃতি নিতান্ত অক্ষমদিগকে এক একখানি বস্ত্র দান করা হইয়াছে।"

বঙ্কুবিহারী কর লিখেছেন, "দানে উপকৃত হইয়া দরিদ্রগণ অজ্ঞতাবশতঃ চীৎকার করিয়া বলিতেছিল 'খৃষ্টানদের জয় হউক'। ব্রাহ্মগণ যতই বলিতেছিলেন, আমরা খৃষ্টান নই, তাহারা তাহাতে কান না দিয়া ততই বলিতেছিল 'খৃষ্টানদের জয় হউক'।

ঐদিন অপরাহ্নে ও পরদিনও অনুষ্ঠান হয়েছিল।

ব্রাহ্ম মন্দির ব্যবহার বিষয়ক আটটি নিয়ম করা হয়েছিল। নিয়মাবলীর ৬ নম্বর নিয়ম ছিল—

'এই গৃহের অভ্যন্তরে কিংবা প্রাঙ্গণমধ্যে কোথাও পূর্ব্বোক্ত কার্য্য (ব্রহ্মোপাসনা) ব্যতীত কোন সৃষ্ট বস্তু বা মনুষ্য অথবা কল্পিত দেব-দেবীর উপাসনা, বর্ণনা, পূজা কিংবা পদধারণ প্রভৃতি কোন প্রকার ব্যবহার অথবা পান-ভোজনাদি হইতে পারিবে না।'

৭ নং নিয়ম ছিল—'এই গ্রন্থ সংগ্রহে (অর্থাৎ মন্দিরের গ্রন্থাগারে) কোন প্রকল্প কুনীতি প্রবর্ত্তক পুস্তকাদি থাকিতে পারিবে না।'

সমাজগৃহের অছি নিযুক্ত করা হয়েছিল. সাতজনকে, তবে প্রথমে নিযুক্ত করা হয়েছিল ১৪ জনকে "ইহাদিগের মধ্যে যে সাতজনের পদ প্রথমতঃ শূন্য হইবে তাহাদিগের স্থলে নতুন ট্রাষ্টী নিযুক্ত হইবে না। তারপর যখনই ট্রাষ্টীগণের সংখ্যা

সাতজনের ন্যূন হইবে, তখনই পূর্বোক্ত নিয়মানুসারে নূতন ট্রাষ্টী নিয়োগ করিয়া উক্ত সংখ্যা পূরণ করিতে হইবে।"

প্রথম চৌদ্দজন অছি ছিলেন— ব্রজসুন্দর মিত্র, অভয়কুমাব দত্ত, অভয়চন্দ্র দাস, দুর্গামোহন দাস, ভগবানচন্দ্র বসু, রামলঙ্কর সেন, রামকুমার বসু, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, অক্ষয়কুমার সেন, রাধিকামোহন রায়, কৈলাসচন্দ্র ঘোষ, পার্বতীচরণ রায় ও দীননাথ সেন।

১৮৭১ সালে এই সমাজগৃহেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অভয়চন্দ্র দাসের উদ্যোগে ঢাকার বিখ্যাত গণ-পাঠাগার রামমোহন লাইব্রেরি। ১৯১০ সালে প্রায় দশ হাজর টাকা ব্যয়ে সমাজগৃহের চত্বরে পাঠাগারের জন্য নির্মিত হয়েছিল আলাদা ভবন, যার উদ্বোধন করেছিলেন প্রথম ভারতীয় প্রিভি কাউন্সিলর স্যার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত, আই. সি. এস.। গ্রন্থাগার ভবনের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন এর আগের বছর পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী। ১৮৭১ সাল থেকে বিভিন্ন জনের দানে এ পাঠাগার পূর্ববঙ্গের একটি বিশেষ পাঠাগারে পরিণত হয়েছিল, যেখানে দুষ্প্রাপ্য বইয়ের সংখ্যা ছিল অনেক। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সৈন্যরা এই পাঠাগারটি ধ্বংস করে দিয়েছিল।

১৮৮২ সালে সমাজগৃহের চত্বরেই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছিল রাজচন্দ্র প্রচারকাশ্রমের। এর জন্য অর্থ সাহায্য করেছিলেন রাজচন্দ্রের পুত্র প্রতাপচন্দ্র। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন আনন্দমোহন বসু।

যে ব্রাহ্ম সমাজ গৃহ একসময় ছিল কলরবমুখর এখন তা পরিণত হয়েছে নির্জন এক মন্দিরে। ঢাকায় অবস্থানরত কয়েকটি ব্রাহ্ম পরিবার এখন এর দেখাশোনা করেন।

গির্জা

পর্যটক মানবিক ও তাভেরনিয়ের তাঁদের বর্ণনায় ঢাকার একটি গির্জার কথা উল্লেখ করেছেন যা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল ১৬১২ সালে। এটি নির্মাণ করেছিলেন অগাসটিয়ানরা। কিন্তু এই গির্জা কোথায় ছিল, কেমন ছিল সে সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। এরপর যে গির্জাটির উল্লেখ আমরা পাই এবং যা এখনও টিকে আছে তা হচ্ছে তেজগাঁর গির্জা যা 'জপমালা রানীর গির্জা' হিসেবেও পরিচিত। এটি ঢাকার প্রাচীনতম গির্জা এবং এ কারণেই তেজগাঁর গির্জাকে প্রথম গির্জা হিসেবে উল্লেখ করা হলো।

তেজগাঁর গির্জা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন পর্তুগিজরা। তাঁরাই ইউরোপীয়দের মধ্যে প্রথম যাঁরা প্রচার করেছিলেন খ্রিস্টধর্ম। গির্জাটি কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। তবে, সম্প্রতি মোহাম্মদ শামসুল হক বিভিন্ন তথ্য পর্যালোচনা ও স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য দেখে এর প্রতিষ্ঠা-সময় নির্ণয় করেছেন যা যুক্তিযুক্ত। তিনি এর প্রতিষ্ঠাকাল উল্লেখ করেছেন ১৬৭৭ সাল বলে যখন শায়েস্তা খান ও পর্তুগিজদের মধ্যে যুদ্ধ ও শান্তিচুক্তি হয়েছিল। পরবর্তীকালে মূল গির্জার সঙ্গে নতুন অংশ যোগ হয়েছে, সংস্কার ও পুনর্গঠনও করা হয়েছে।

মূল গির্জাটি ৪৪ হাত দীর্ঘ আয়তকার ইমারত। এর প্রবেশ পথ পাঁচটি, দুটি উত্তরে, একটি পশ্চিমে ও দুটি দক্ষিণে। উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ৯টি করে মোট আঠারটি জানালা। দানী লিখেছেন, 'ব্যাসিলিকান গির্জার যাবতীয় বৈশিষ্ট্য এতে বিদ্যমান, যেমন—একটি কেন্দ্রীয় নেভ, দু'পার্শ্বে দুটো আইল, দেউরী এবং বেদী বেষ্টনকারী ইমারত; তবে পূর্বদিকস্থ সমবৃত্তাকার উদগত অংশটি এর ব্যতিক্রম, কেননা এটা এখানে ক্ষুদ্রাকার বর্গ গঠন করেছে।'

দানী আরো উল্লেখ করেছেন—"এটা হিন্দু-মুসলিম ও খৃষ্টান— এ তিনটি স্থাপত্য রীতির সমন্বয়। এ জন্য বাংলাদেশের স্থাপত্যে এটা অতুলনীয়। এখানে উল্লেখযোগ্য হিন্দু স্থাপত্য উপাদান হলো পদ্ম ও কলসের প্রতীকধর্মী ব্যবহার। বেদী ধারণকারী কাসপ বা সূক্ষ্মাগ্র খিলানবিশিষ্ট আমাদেরকে শায়েস্তা খানের স্থাপত্যের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। ধনুকাকৃতির বক্রছাদ, কার্নিস বা ছাইক বিশুদ্ধভাবে বাংলাদেশীয়। কিন্তু সুবৃহৎ এ্যাপস ও দেওয়ালে যীশুকে ক্রোড়ে নিয়ে দণ্ডায়মান মাতা মেরী ও জোসেফ ট্যাবারন্যাকল, তিনকোণা ছাদ, ত্রিভুজাকার পেডিমেন্ট, আঁকাবাঁকা নকশাসহ স্তম্ভ নিশ্চিতভাবেই খৃষ্টান।"

সভা-সমিতি

বাঙালির উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত প্রথম সভা 'আত্মীয় সভা।' রামমোহন রায় কলকাতায় নিজ বাসগৃহে এ সভার পত্তন করেছিলেন ১৮১৫ সালে। এ প্রক্রিয়া কলকাতায় অব্যাহত ছিল গোটা উনিশ শতক ধরে।

এ পর্যন্ত যেসব তথ্য পাওয়া গেছে তার সূত্র ধরে বলা যায়, ঢাকায় এ ধরনের প্রথম সভা স্থাপিত হয়েছিল ১৮৩৮ সালে। নাম তিমিরনাশক সভা। এ সমিতি সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায়নি। শুধু জানা গেছে 'বঙ্গভাষা শুদ্ধ করণার্থ' এটি স্থাপিত হয়েছিল। শহরের স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষকেরাই ছিলেন এর সভ্য। সভাপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন শ্যামচরণ বসু।

'তিমিরনাশক' শুধু ঢাকারই নয়, বাংলাদেশের প্রথম সমিতি।

মুসলমান সভা

ঢাকার মুসলমানদের উদ্যোগে প্রথম যে সভা বা সমিতি স্থাপিত হয়েছিল তার নাম সমাজ সম্মিলনী সভা। ঢাকা মাদ্রাসার সুপারিন্টেন্ডেন্ট ওবায়দুল্লাহ আল·উবেদী ছিলেন এর উদ্যোক্তা। ১৮৭৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এ সভার উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি সৃষ্টি করা। নবাব আহসান উল্লাহ এ সভাকে একবার তিনশ' টাকা দান করেছিলেন। 'সমাজ সম্মিলনী' কত দিন টিকে ছিল জানা যায়নি।

থিয়েটার

ঢাকায় সাংগঠনিকভাবে থিয়েটার চর্চার জন্য প্রতিষ্ঠা কবা হযেছিল 'পূর্ববঙ্গ বঙ্গভূমি'। সাধারণের চাঁদায় প্রতিষ্ঠিত এ ধরনের সংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্র স্থাপন বাংলাদেশে বোধহয় এই প্রথম। পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি ছিল ঢাকা শহরের থিয়েটার চর্চা এবং বিভিন্ন সভা-সমিতিব কেন্দ্র।

পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজের পাশে, এখন যেখানে জগন্নাথ কলেজ বা তার পাশে স্থাপিত হয়েছিল পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি। এর প্রতিষ্ঠাতাদের মাঝে ছিলেন সবজীমহলের জমিদাব মোহিনীমোহন দাস, উকিল বাম চক্রবর্তী ও অভয় দাস, নর্মাল স্কুলের পণ্ডিত মতিলাল চক্রবর্তী, দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহেশ গাঙ্গুলী। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়, আবো অনেকে চাঁদা দিয়েছিলেন যদিও সুনির্দিষ্টভাবে কোন নামের উল্লেখ পাওয়া যায় না।

খুব সম্ভব ষাটের দশকেব শুরুতেই রঙ্গভূমি স্থাপিত হয়েছিল। কারণ, ১৮৬৪ সালের এক সংবাদে জানা যায, আট হাজার টাকা চাঁদা তুলে রঙ্গভূমি সংস্কার করা হয়েছিল।

অনুমান করে নেয়া যায় উদ্যোক্তারা রঙ্গভূমি প্রতিষ্ঠার পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে তুলেছিলেন একটি নাট্যদল যার নাম ছিল—'পূর্ববঙ্গ নাট্যসমাজ'। সংবাদপত্রের একটি সংবাদও তা সমর্থন করে। —'যে সময়ে ঢাকার ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ রামাভিষেক নাটকের প্রথম অভিনয় করিতে প্রবৃত্ত হন তখন বহুতর টাকা সংগ্রহে ইহা সুনিশ্চিত হইয়াছিল।' ঢাকায় এর আগে দু'একটি নাটক মঞ্চস্থ হতে পারে। তবে, সাংগঠনিক উদ্যোগ পরিকল্পিতভাবে 'রামাভিষেক'ই বোধহয় প্রথম অভিনীত হয়েছিল।

পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি কখন লুপ্ত হয়েছিল তা অবশ্য জানা যায়নি।

বায়োস্কোপ

ঢাকায় বায়োস্কোপ দেখানো হয়েছিল প্রথম কবে? এ প্রশ্নের আগে দেখা যাক, কলকাতায় কবে প্রথম দেখানো হয়েছিল বায়োস্কোপ? ১৮৯৬ সালে। ঠিক এর দু'বছর পর, ঢাকার ক্রাউন থিয়েটারে প্রথম দেখানো হয়েছিল বায়োস্কোপ। দেখিয়েছিল 'ব্রাডফোর্ড কোম্পানি'। এমনও হতে পারে ইংল্যান্ড থেকে ঐ কোম্পানি তৎকালীন ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতায় এসেছিল বায়োস্কোপ দেখাতে এবং সেখান থেকে দু'একদিনের জন্য হয়তো এসেছিল ঢাকায়। ১৮৯৮ সালের ১৭ এপ্রিল, ঢাকার সংবাদপত্র 'ঢাকা প্রকাশ'-এ বায়োস্কোপ সংক্রান্ত প্রথম সংবাদটি মুদ্রিত হয়েছিল। সংবাদটি ছিল এ রকম—

"অত্রত্য ক্রাউন থিয়েটারে অদ্য রাত্রি হইতে এক অদ্ভুত দৃশ্য প্রদর্শিত হইবে। ব্রেডফোর্ড সিনেমেটোগ্রাফ কোম্পানী এরূপ সজীব চিত্র প্রদর্শন করিবেন যাহা দেখিয়া নিতান্ত বিস্ময় জন্মিবার সম্ভাবনা। গত বছর গ্রীক ও তুরস্কের যে ভীষণ যুদ্ধ

হইয়াছে তাহা ও অন্যবিধ আশ্চর্য্য বিষয় যেন ঠিক কার্য্যক্ষেত্রে যাইয়া প্রত্যক্ষ করিতেছি বলিয়া নাকি বোধ হইবে। আমরা আগামীবার ইহাব বিশেষ বিবরণ প্রকাশ করিব। আগামী বুধবার পর্যন্ত প্রত্যহ বাত্রি ৮ ঘটিকা হইতে এই ক্রীড়া প্রদর্শনের কথা হইযাছে।"

ঢাকায় প্রথম বায়োস্কোপ দেখানো হয়েছিল ক্রাউন থিয়েটারে উনিশ শতকের শেষার্ধে। ঢাকা শহরকে মাতিয়ে বেখেছিল 'ডায়মন্ড' আব 'ক্রাউন' থিয়েটার। সত্যেন সেন ও তাঁর অনুসরণে অনুপম হায়াৎ ক্রাউন থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে যা লিখেছেন তা সঠিক নয়।

ঢাকার একটি নাট্যদল 'সনাতন নাট্যসমাজ' ভেঙে গেলে তার উদ্যোক্তাদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল ক্রাউন থিয়েটার। উদ্যোক্তাদের মধ্যে দুজন ছাড়া বাকি সবাই এমনকি অভিনেতারাও যোগ দিয়েছিলেন ক্রাউন থিয়েটারে। 'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি' ছিল জগন্নাথ কলেজের পাশে। ঠিক কবে ক্রাউন থিয়েটার প্রতিষ্ঠা কবা হয়েছিল তা জানা যায়নি। তবে অনুমান করে নিতে পারি তা স্থাপিত হয়েছিল ১৮৯০-৯২-এর মধ্যে। প্রথম দিকে ক্রাউনে সারারাত অভিনয় চলত।

কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ ও ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষমণ্ডলী এ ব্যাপারে আপত্তি করলে ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট অভিনয়ের সময় বেঁধে দিয়েছিলেন রাত এগারটা পর্যন্ত। এসব কারণেই বোধহয় ক্রাউন থিয়েটার পরে স্থানান্তর করা হয়েছিল ইসলামপুরের বর্তমান আহসানউল্লাহ রোডে। ক্রাউন থিয়েটারে শুধু যে প্রথম বায়েস্কোপ দেখানো হয়েছিল তাই নয়, ১৮৯৩ সালে এখানেই বাংলা নাটকে অভিনেত্রীরূপে স্থানীয় মহিলারা অভিনয় করেছিলেন।

ঢাকায় প্রথম যে বায়োস্কোপটি দেখানো হয়েছিল তার পুরো বিবরণটি ছাপা হয়েছিল পত্রিকায়। এখানে তা উদ্ধৃত করছি যাতে বায়োস্কোপের বিষয়বস্তু সম্পর্কে পাঠকরা ধারণা করতে পারেন—

"ফটোগ্রাফ ও ছায়াবাজি সকল পাঠকই ভাল দেখিয়াছেন। ফটোগ্রাফে লোকের নিশ্চল ছবি পরিলক্ষিত হয়, ছায়াবাজিতে ছবিগুলিকে একটু লাড়িয়া-চাড়িয়া দেখান যায়, কিন্তু সে লাড়িয়া-চাড়িয়া দেখানে একটু বাহাদুরী থাকিলেও ঠিক জীবিত লোকের কার্যবৎ পরিলক্ষিত হয় না। ঐ সিনেমেটোগ্রাফে যে দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, তাহা অতি আশ্চর্য! অত্রত্য ক্রাউন থিয়েটার গৃহে কলিকাতা হইতে যে একটি কোম্পানী আসিয়া ঐ সিনোমেটোগ্রাফ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার একটি বিষয় আমরা সংক্ষেপে পাঠককে বলিলেই পাঠক বুঝিবেন, কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! আমরা দেখিয়াছি, শ্রী শ্রীমতী ভারতেশ্বরীর ডায়মণ্ড জুবিলির মিছিল, গ্রীক-তুরস্ক যুদ্ধে তুরস্কের মুসলমান সৈন্য কর্তৃক গ্রীকদিকের স্ত্রী-পুরুষের লাঞ্ছনা ও হত্যা; গ্রীকের যুদ্ধ জাহাজ কর্তৃক তুরস্কের প্রভীষা দুর্গ অবরোধ, গ্রীকের গুপ্তচরকে ধরিয়া হত্যা করা, কুমারী ডিয়নের ৩০০ ফিট উচ্চ হইতে জলে পতন, রুশ জারের অভিষেকোপলক্ষে জনতা, পাগল নাপিতের ভয়াবহ ক্ষৌরকার্য্য, সমুদ্রে তুফান, সিংহসহ পালকের ক্রীড়া, ফ্রান্সের বড় রাস্তায় লোকদিগের গমনাগমন, ফরাসী

সৈন্যের অশ্বারোহণে গমনাগমন, ফ্রান্সের রেলে লোকের যাতায়াত এবং আরও অনেক প্রকার দেখিবার যোগ্য দৃশ্য।

মহারানীর জুবিলি মিছিলে দেখিবে, সৈন্যগণ ও ইংলান্ডের বড় লোকের ঘোড়া ও গাড়ী আরোহণে হাজারে হাজারে ক্রমশ চলিয়া যাইতেছেন, ইহারই মধ্যে মহারানী একখানি গাড়ীর শোভা বিস্তার করিয়া চলিয়া গেলেন। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘোটকগুলি আরোহীসহ কখনও নাচিতে নাচিতে, কখনও হাঁটিয়া, কখনও দৌড়াইয়া চলিতেছে, কখনও মিছিলে গতিরোধ হওয়ায় থামিতেছে যেন প্রকৃতপক্ষেই মিছিল দেখিতেছি বলিয়া বোধ হইতেছে। তুর্কী মুসলমান সৈন্যরা ক'একজন একটা প্রকাণ্ড বাড়ীর সম্মুখে আসিল; বাড়ির দরজা রুদ্ধ দেখিয়া বড় বড় মুগুর প্রহারে দরজা ভাঙিয়া ফেলিল; গৃহে প্রবেশপূর্বক খুঁজিতে লাগিল, পুরুষ পাইলে তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়া প্রহার করতঃ মারিয়া ফেলিল; আবার কোন সৈন্য একটি রমণীকে ধরিয়া নির্জনে লইয়া গেল, কেহ কেহ ঘরের সিন্দুক বাক্সাদি বাহির করিতে লাগিল; বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন রূপে ভয়ানক কার্য্যসকল করিতে লাগিল। গ্রীকের এক প্রকাণ্ড যুদ্ধজাহাজ একস্থানে লাগিয়াছে, ঐ জাহাজ ভিন্ন তুরস্কের প্রভীষা দুর্গ দেখা যায় না বটে, কিন্তু তাহারই উদ্দেশ্যে জাহাজের মধ্য হইতে ক'একজন গোলন্দাজ সৈন্য বাহির হইয়া কামানের আগুন দিতে লাগিল, কামানের শব্দ নাই, কিন্তু ধূমে জাহাজটি ঢাকিয়া গেল; আবার পরিষ্কার হইল, কামান দাগা হইল ও ধূমাচ্ছন্ন হইল। ইহারই মধ্যে ঐ গোলন্দাজদিগের একজন পড়িয়া ছটফট করিতে করিতে মৃত্যুলাভ করিল; অর্থাৎ অবরুদ্ধ প্রভীষা নগর হইতে কামানের গোলা আসিয়া তাহার নিপাত করিল বলিয়াই বোধ হইল।

তুরস্কের সৈন্যরা গ্রীকের তূর্ণাভাস্ নামক অতি সুন্দর একটি দুর্গ আক্রমণ করিলে গ্রীকেরা পলাইয়া দুর্গে প্রবেশপূর্ব্বক দরজা বন্ধ করিল। তুরস্ক সেনারা ক'একজন আসিয়া দেখে দরজা বন্ধ। তখন তাহাদের একজন দুর্গের ভিত্তিতে কোন একটা কাজ করিল, অমনই ধূমরাশি উদ্‌গীর্ণ হইয়া দরজা ভাঙিয়া গেল, তখন তুরস্ক সেনারা ঐ ভগ্ন দরজা দিয়া প্রবেশ করিতে লাগিল; কামান, বন্দুকের ধূম উদ্‌গীরিত হইতে লাগিল, কোন কোন সৈন্য ভূমিতে পড়িয়া ছটফট করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল। একজন ভদ্রলোকে টেবিল সম্মুখে বসিয়া বোধহয় বিচার করিতেছেন। কয়েকজন তুরস্ক সৈন্য একজন গ্রীক গুপ্তচরকে ধরিয়া আনিল, তার পকেটে বোধহয় একটা কিছু পাওয়া গেল, ইহারই মধ্যে বিচার হইল, তাহাকে বান্ধিয়া একস্থানে রাখা হইল, কতকগুলি সৈন্য বন্দুকসহ সারিবন্দী হইয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিল, তাহাদের সকলের বন্দুক হইতে একবারে সহস্র ধূমরাশি নির্গত হইল, সেই গুপ্তচরটার প্রাণ তৎসঙ্গে উড়িয়া গেল। আর একটা গ্রীক দুর্গের দরজা তুরস্ক-সৈন্যরা ভাঙিয়া ফেলিলেও তাহার মধ্য হইতে ধূমরাশি নিগৃত হইয়া তৎসঙ্গে অবশ্যই কামানের গোলায় অনেক তুরস্ক সেনার পতন হওয়ায় তাহারা প্রত্যাবর্তন করিল।

ইংলান্ডের একটা বড় রাস্তায় তুষারাপাত হইয়াছে, তাহার উপরে শত শত সাহেব ও বিবি দৌড়াদৌড়ি হুড়াহুড়ি করিয়া পরস্পর পরস্পরকে বরফ তুলিয়া তুলিয়া ছুড়িয়া

মারিতেছে, ঐ নিক্ষিপ্ত বরফ অনেকের কাল পবিচ্ছদের উপরে সাদা হইয়া উঠিয়াছে, নিক্ষিপ্ত তুষারের কতক কতক ঝর ঝর করিয়া পড়িযা যাইতেছে; ইহারই মধ্যে কেহ বাইসাইকেল হইতে পড়িলেন, হাঁটু ভাঙিযা কষ্টে সৃষ্টে পতিত বাইসাইকেল লইয়া চলিয়া গেলেন। নাপিতের ক্ষৌরকার্য্যটি এক ভয়ানক ভোজবাজী। একটি সাহেব ক্ষৌরির নিমিত্ত চেয়ারে বসিয়াছেন, নাপিত প্রথমে গিয়া তাহার দাড়ি গোঁফ খুব ভাল করিয়া ভিজাইয়া আনিল। পরে খুব ধারালো ক্ষুব ও কাইচি আরও শানাইয়া লইল। তাহার চেষ্টা দেখিয়া ভদ্রলোক উঠিবার চেষ্টা করিলেও সে থামাইয়া প্রথমে ক্ষৌরির আয়োজন করিল এবং ক্ষুর গলায় বসাইয়া গলা একেবার কাটিয়া মাথাটি লইয়া আসিল। পরে ঐ মাথাটির দাড়ি গোঁফ যেভাবে ক্ষৌর করিতে হয় করিয়া তাহার গলায় কি একটা জিনিস মাখাইল এবং মাথাটি দেহের যথাস্থানে লাগাইবামাত্র ভদ্রলোকটি বাঁচিয়া উঠিলেন। তিনি তখন সেই দুরন্ত নাপিতকে ধরিয়া তাহার বৃহৎ গামলার মধ্যে ফেলিয়া পাড়াইতে লাগিলেন। বোধহয় যেন নাপিত সেই গামলার মধ্যে নিষ্পিষ্ট হইয়া মরিল, কিন্তু পরে সেই গামলা ভদ্রলোক উল্টাইয়া দেখাইলেন তাহার মধ্যে কিছুই নাই। এই ভয়ানক ভোজবাজী বস্তুতই বিস্ময়জনক। একটা জলাশয়ের উপরে একটা বাড়ী ও ঘাটলা। বাড়ীর বহু উচ্চ ছাদ ও নানা স্থান হইতে শত শত সাহেব লাফাইয়া লাফাইয়া ঐ জলে পড়িতেছেন, তাহাদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে জল ছিটিয়া দশ বার হাত উচ্চে উঠিতেছে, তাহারা সাঁতরাইয়া আবার উঠিতেছেন, আবার পডিতেছেন। এইরূপ বহু প্রকার কার্য্য ঠিক যেন জীবিত লোকে করিতেছে বলিয়া উল্লেখিত সিনোমেটোগ্রাফে পরিলক্ষিত হইতেছে। এই সিনেমেটোগ্রাফ যিনি উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহার বিজ্ঞত্ব অসাধারণ, তাহার উদ্ভাবিত যন্ত্রের ব্যবহাকারীরাও ধন্যবাদভাজন। এই আশ্চর্য দেখিবার নিমিত্ত অর্থ ব্যয় করাকে আমরা সার্থক মনে করি। জীবিত লোককৃত নাটক সার্কাসাদি অপেক্ষা ইহা শত সহস্র গুণ শ্লাঘা তাহা আমরা না বলিয়া পারি না। ইহা দেখাও ব্যয়সাধ্য নহে—শ্রেণীভেদে আট আনা হইতে তিন টাকা মাত্র। অতএব এই আশ্চর্য্য ব্যাপার সকলেরই দেখিয়া রাখা উচিত।"

বাণিজ্যিক ব্যাংক

ঢাকার প্রথম বাণিজ্যিক ব্যাংক—ঢাকা ব্যাংক। ১৮৪৬ সালে ঢাকার জমিদার নীলকর, সিভিলিয়ানরা মিলে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ব্যাংকটি। এর উদ্যোক্তা ছিলেন ঢাকার তত্ত্বাবধায়ক সার্জন ল্যাম্ব, ঠগী দমনের সহকারী তত্ত্বাবধায়ক এইচ. এম. নেশান, জমিদার খাজা অলিউল্লাহ ও জে. পি. ওয়াইজ, উকিল নন্দলাল দত্ত, কমিশনের জন ডানবার, ঢাকার সিভিল সার্জন টি. ওয়াইজ ও খাজা আবদুল গনি। এঁরা ছিলেন ব্যাংকের প্রথম ট্রাস্টিও। সচিব ছিলেন আলেকজান্ডার ফর্বেস। ইনি প্রথমে কাজ করতেন দ্বারকানাথের কোম্পানিতে, পরে সম্পাদনা করেছিলেন ঢাকার প্রথম সংবাদপত্র 'ঢাকা নিউজ'। ব্যাংকের প্রস্তাবিত মূলধন ছিল ৫০০,০০০। প্রতিটি শেয়ারের দাম ছিল এক

হাজাব টাকা। তবে বিনিয়োগকৃত মূলধন ছিল ৩০০,০০০। অবশ্য অন্য আরেকটি সূত্রে জানা যায়, বিনিয়োগকৃত মূলধন ছিল চার লক্ষ টাকা এবং মনে হয় তাই সঠিক।

দশ বছব পব দেখা গেলো, শেয়ার হোল্ডারদেব অনেকে যাবা ঢাকার বাইরে থাকেন, তাবা শেয়ার বিক্রি করে দিতে চাইছেন। এ পবিপ্রেক্ষিতে ১৮৪৬ সালে, ব্যাংকটিকে নতুনভাবে ঢেলে সাজানো হলো। নতুন পবিচালকরা হলেন -খাজা আবদুল গনি, জে.পি. ওয়াইজ, আর. জি. কার্নেগট, জে. জি. এন পোগজ, মৃত্যুঞ্জয় দত্ত, দীননাথ ঘোষ, উইলিয়াম ফলি এবং মধুসূদন দাস। সচিব ছিলেন আলেকজান্ডার ফর্বেস, পরে জি. এম. রেইলি।

ইতিমধ্যে প্রেসিডেন্সি বিভাগে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল ব্যাংক অব বেঙ্গল। তাদের শাখা ছিল রেঙ্গুন, পাটনা, ঢাকা, মির্জাপুর ও বেনারসে। সরকারেব ইচ্ছায় পূর্বাঞ্চলে তাদের অবস্থান দৃঢ় করতে ব্যাংক অব বেঙ্গলের পরিচালকবা ঢাকা ব্যাংক কিনে নেন] [বা তা বিলীন হয়ে যায ব্যাংক অব বেঙ্গলের সঙ্গে] এবং এর পরিবর্তে শেয়ার হোল্ডারদের ব্যাংক অব বেঙ্গলের ২৯০, ৯৯৯ টাকার শেয়ার দেওয়া হয়।

পরিকল্পিত আবাসিক এলাকা

ষাটের দশকে ঢাকায়, পেশাজীবীদের জন্য সরকার পরিকল্পিত আবাসিক এলাকা হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন ধানমণ্ডি। তারপর গড়ে উঠেছে বনানী, গুলশান, বারিধারা, উত্তরা প্রভৃতি। গত শতকের শেষার্ধে, ব্রিটিশ সরকার তেমনি একটি আবাসিক এলাকা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। প্রাথমিক ব্যর্থতার পর অবশ্য সরকাব সফল হয়েছিলেন তাদের লক্ষ্যে। ঢাকার ভদ্রলোকদের জন্য প্রথম যে পরিকল্পিত আবাসিক এলাকা গড়ে তোলা হয়েছিল, তা হলো উয়ারী বা ওয়ারী। ঢাকার কালেক্টর ওয়্যারের নামানুসরে পরিচিত হয়ে উঠেছে এলাকাটি। ১৮৮৪ সালে তিনি ছিলেন ঢাকার কালেক্টর এবং তিনিই পত্তন করেছিলেন উয়ারীর। এখনও উয়ারীতে আছে তার নামে একটি সড়ক।

উয়ারী ছিল সাতশ' একরের সরকারি খাস জমি। ১৮৩৯ সালে এ জমির প্রথম কৃষি বন্দোবস্তের পর পুরো এলাকাটি পত্তন দেওয়া হয়েছিল জঙ্গলবাড়ি হিসেবে। বাড়িসহ প্রতিবিঘা ফলের বাগানের খাজনা ধার্য করা হয়েছিল ছয় টাকা। মসলিন ধোয়ার জন্য ধোপাদেরও বরাদ্দ করা হয়েছিল কিছু জমি। এ ধরনের জমির খাজনা ছিল বিঘা প্রতি চার আনা। বন্দোবস্তকৃত পুরো খাজনা দাঁড়িয়েছিল প্রায় একানব্বই টাকার মতো। কিন্তু, ঢাকা তখন ক্ষয়ের পথে, ফলে এ খাজনাও মনে করা হচ্ছিল খুব বেশি। তাই ১৮৪১ সালে, পুরো এলাকাটির খাজনা ধার্য করা হয়েছিল উনপঞ্চাশ টাকা। অর্থাৎ দু'ধরনের জমির খাজনাই হ্রাস পেয়েছিল। তা সত্ত্বেও ১৮৭৬ সালের দিকে দেখা গেল, উয়ারীর ৬ ভাগেরও ৫ ভাগ জমি পরিণত হয়েছে জঙ্গলে।

১৮৭৬ সালে পৌরসভা ঠিক করেছিল পুরো এলাকাটি সরকারের কাছ থেকে কিনে নিয়ে উন্নত করবে। এ জমির জন্য সরকারকে পৌরসভা ১,৪৭৫ টাকা দেওয়ার প্রস্তাব

করেছিল। সরকারের মতে, এ দাম ছিল নামমাত্র, তাই প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। ১৮৮৫ সালে সরকার নিজেই ঠিক করেছিল আবাসিক এলাকা হিসেবে উয়ারীকে উন্নত করতে হবে এবং এজন্য ভার দেওয়া হয়েছিল তৎকালীন ঢাকার কালেক্টর ফ্রেডারিক ওয়্যারকে।

কালেক্টর ওয়্যার বেশ আগ্রহ নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন। জঙ্গল পরিষ্কার, রাস্তাঘাট করে পুরো এলাকাটিকে তিনি ভাগ করেছিলেন আবাসিক প্লটে। প্রতি বিঘার খাজনা নির্ধারণ করা হয়েছিল ছয় টাকা। শর্ত ছিল, তিন বছরের মধ্যে বাড়ি তুলতে হবে, বাড়ির প্ল্যান পাস করিয়ে নিতে হবে কালেক্টরকে দিয়ে। খুব তাড়াতাড়িই বিলি করা হয়েছিল জমিগুলি। হৃদয়নাথ মজুমদার লিখেছেন, তারপর পাঁচ বছরের মধ্যে দেখা গেল, উয়ারী রূপান্তরিত হয়েছে সরকারি কর্মকর্তাদের আবাসিক এলাকা হিসেবে। তাঁর মতে, উয়ারী ছিল তখন ঢাকার 'স্যানিটোরিয়াম'।

কিন্তু মনে হয়, সম্পূর্ণ এলাকাটি বাড়িঘরে পূর্ণ হতে সময় লেগেছিল অনেক। ১৮৯০ সালের একটি সংবাদে জানা যায়, টাকার অভাবে অনেক সরকারি কর্মচারী উয়ারীতে বাড়ি নির্মাণ সম্পূর্ণ করতে পারেননি—

"....উয়ারী নামে কতকটা ভূমির উপরে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি পড়াতে তাহাতে লোক বসাইবার জন্য প্রচার যত্ন ও অর্থব্যয় হইয়াছে। জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া তথায় অনেকগুলি [প্লট] গভর্ণমেণ্টের অর্থে প্রস্তুত হইয়াছে। ঢাকায় যাহাদের বসতবাড়ী নাই, সেই সব ভদ্রলোকদিগের প্রার্থনা অগ্রগণ্য করিয়া বিঘাপ্রতি বার্ষিক [অস্পষ্ট] করিয়া পত্তন করা হইয়াছে। ইতিমধ্যে তথায় কেহ কেহ বাড়ী করিয়া ব্যবসা আরম্ভ করিলেও অর্থাভাবে অনেকেই কিছু করিতে পারে নাই, ইহা জানিতে পারিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব যে সকল রাজকর্মচারীকে ঐরূপ অসমর্থ দেখিয়াছে, তাহাদিগকে ছয় মাসের বেতন অগ্রিম দিয়া তাহা হারাহারিতে দেড় বৎসরে কাটিয়া লওয়া সুস্থির করতঃ ওপরিতন গভর্ণমেণ্টের অনুমোদনের জন্য পাঠাইয়াছেন। সম্ভবতঃ কার্য্যসিদ্ধি হইবে, কিন্তু হয় নাই।"

উয়ারী আবাসিক এলাকায় পরিণত হলে, দেখা গেল, এর ঘরবাড়ি ঢাকা শহরের পুরনো এলাকার ঘরবাড়ি থেকে ভিন্ন। এ এলাকার বাড়িগুলি দেখলে বোঝা যায় পরিবর্তন হয়েছে মধ্যশ্রেণীর রুচির। গ্রামের সঙ্গে তার বন্ধন হয়েছে খানিকটা শিথিল। কিন্তু গ্রামের স্মৃতি বা নস্টালজিয়ার রেখা মিলিয়ে যায়নি তখনও। গ্রামে যেমন দখিন দুয়ারী ঘর, উঠোন, রান্নাঘর, সব আলাদা হয়েও একটা ইউনিট বা এককের মতো, এ এলাকার বাড়িগুলিও তেমনি।

বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ভবতোষ দত্ত ১৯২২ সালে এসব এলাকা সম্পর্কে যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে চিত্রটি আরো স্পষ্ট হবে। লিখেছেন তিনি—"ওয়ারি ঠিক শহরতলি নয়, কিন্তু শহরের মধ্যে হয়েও একটি ভিন্ন করমের উপান্তিক না হলেও প্রান্তিক। রাস্তাঘাট পরিচ্ছন্ন, রাস্তায় লোক বেশি নেই, যারা আছে তারাও পোশাকে পরিচ্ছদে মার্জিত। বাড়িগুলি সুন্দর—একতলাই বেশি, কয়েকটি মাত্র দোতলা, তার প্রত্যেক বাড়িতে

অনেকটা খোলা জমি।...এখানে রমনার অভারতীয় উদ্যান নগরীব স্বাচ্ছন্দ্য নেই. পুরানো পল্টনের নবীনতা নেই. টিকাটুলির গ্রাম-ছোঁওয়া ভাব নেই. নবাবপুরের ঘিঞ্জি বসতিও নেই। সবই একটু সংযত, সবই বাহুল্যবিহীন।"

"এখানে যাঁরা থাকতেন তাঁরা মধ্যবিত্ত। দু'একজন জমিদার ছাড়া খুব বড় লোক প্রায় কেহই নন। চরম দারিদ্র্যও এখানে দেখা যেত না। প্রধানতঃ থাকতেন কয়েকজন আদিবাসিন্দা. যাঁরা পনের-কুড়ি বছর আগে প্রায় বিনামূল্যে এখানে জমি কিনেছিলেন। এঁরা ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী – ডেপুটি, মুনসেফ, জেলা জজ। এঁরা সকালে বাজারে যেতেন এবং গৃহভৃত্যের হাতে থলে, ঝুড়ি ভরতি বাজার করে আসতেন, আর বিকেলে পল্টনের মাঠে বেড়াতে যেতেন।"

পরিশ্রুত পানি

১৮৭৮ সালের আগে পরিশ্রুত পানি সরবরাহের ব্যাপারটিই ছিল ঢাকাবাসীর কাছে অজানা। খাবার পানির উৎস ছিল নদী, খাল বা পাতকুয়া। এসব উৎস থেকে পানি সরবরাহ করার জন্য একটি আলদা শ্রেণীই গড়ে ওঠে যারা পরিচিত ছিল ভিস্তি নামে। চামড়ার মশকে করে ভিস্তিরা বাড়ি বাড়ি পানি পৌঁছে দিত। এ শতকের ষাট দশক পর্যন্ত ভিস্তিরা সচল ছিল শহরে।

১৮৬৯ সালের ঢাকার সহকারী সিভিল সার্জেন্টের এক রিপোর্টে জানা যায়, শহরের কুয়োর পানি ভয়ানকভাবে দূষিত, খালের ও নদীর পানিও দূষিত। কারণ এসবে যুগের পর যুগ ধরে আবর্জনা সঞ্চিত হচ্ছে। ঢাকার অহরহ মহামারীর প্রধান কারণ ছিল দূষিত পানি।

১৮৮১ সালে ঢাকায় কলেরা মহামারীর কথা স্মরণ করে দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছিলেন— "ঢাকায় তখন জলের কল ছিল না, কূপের জল খাইতে হইত; তাহাতে গলগণ্ড জন্মিত এবং সেই জলের গুণে বার মাস কলেরা ঢাকায় লাগিয়াই থাকিত। ঢাকার নামে আমার সেই শৈশবের ত্রাস এখনও আছে।"

১৮৭১ সালে ঢাকার নবাব আবদুল গনি সরকারকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করেন শহরের কল্যাণার্থে ব্যয় করার জন্য। ইংল্যান্ডের প্রিন্স অব ওয়েলসের রোগমুক্তির কারণে আল্লাহর করুণায় কৃতজ্ঞ হয়ে নবাব গনি এ দান করেছিলেন। পরে ঠিক হয় এ টাকা ব্যয় করা হবে ঢাকায় পরিশ্রুত পানি সরবরাহের জন্য। এ সম্পর্কে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল পত্রিকায়—

"পূর্বে আমরা পাঠকগণকে অবগত করাইয়াছিলাম, খাজে আবদুল গনি, সি, এস, আই. ঢাকার কোনরূপ স্থায়ী উন্নতির নিমিত্ত ৫০ সহস্র টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। সম্প্রতি স্থিরীকৃত হইয়াছে যে. উক্ত টাকা দ্বারা ঢাকায় জলের কল প্রস্তুত হইবে। এই কল বাঙ্গলা বাজার হইতে নবাবগঞ্জ পর্যন্ত এক শ্রেণীতে বড় রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইবে। গনি মিঞার টাকার সার্থক ব্যয়ে আমরা এবার বড় সন্তুষ্ট হইলাম।"

এ প্রকল্প কার্যকর করার জন্য নবাবের মনোনীত ব্যক্তিদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিতে ছিলেন সিভিল সার্জন ডা. জেমস ওয়াইজ, অভয়চন্দ্র দাস, মিত্রজিৎ সিং, ভগবান চন্দ্র চৌধুরী, খাজা আহসানউল্লাহ ও মহিউদ্দিন। পঞ্চাশ হাজার টাকা ছিল এ প্রকল্পের জন্য অপ্রতুল। ১৮৭৪ সালের জানুয়ারি মাসে নবাব আবদুল গনি এজন্যে একটি বৈঠক আহ্বান করেন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ভাওয়ালের রাজা কালী নারায়ণ, ঢাকার জমিদার রাজা বাবু, কাশিমপুর, নানিয়া ও পুবাইলের জমিদার, রাজকুমার বসাক ও রূপলাল দাস এবং দুজন বাঈজী রাজলক্ষ্মী ও আমিরজান। বৈঠক হলো কিন্তু কোনো জমিদারই এ কারণে টাকা দান করতে রাজি হলেন না। শুধু রাজলক্ষ্মী আর আমিরজান জানালেন তাঁরা পাঁচশ টাকা করে দান করবেন। বৈঠকের এ ফলাফল দেখে নবাব গনি নিজেই আরো এক লক্ষ টাকা দান করেন এবং সরকার এ কারণে তাঁকে ধন্যবাদ জানায়। নবাব গনির দানে একটি শর্ত ছিল যে, ঢাকাবাসীকে নিখরচায় পানি সরবরাহ করতে হবে। এরপরও নবাব আহসানউল্লাহ পঞ্চাশ হাজার এবং সরকার নব্বই হাজার টাকা অনুদান দিয়েছিলেন।

১৮৭৪ সালে তৎকালীন ভাইসরয় ওয়াটার ওয়ার্কসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ১৮৭৮ সালের মে মাসে কাজ শেষ হয় এবং ঢাকার কমিশনার এফ, বি, পিকক ওয়াটার ওয়ার্কসের উদ্বোধন করেন। ঢাকায় শুরু হয় পরিশ্রুত পানি সরবরাহের।

প্রথমে পাইপ লাইনের ছিপ দৈর্ঘ্য ছিল চার মাইল। রানী ভিক্টোরিয়া ভারত সম্রাজ্ঞী উপাধি গ্রহণ করলে ঢাকার নবাব এ উপলক্ষে বিশ হাজার টাকা দান করেন।

১৮৮৪ সালে তিনি ছয় হাজার টাকা ব্যয়ে নবাবপুর থেকে দিলকুশা পর্যন্ত পানির লাইন নেন। মদনমোহন বসাক ১৮৮৮ সালে নবাবপুর থেকে জোড়পুল পর্যন্ত লাইনের ব্যবস্থা করে দেন। ১,২৫,০০০ টাকা সরকারি ঋণ দিয়ে মিউনিসিপ্যালিটি ১৮৮৯-৯০ সালে সরবরাহ লাইন আরো বিস্তৃত করে। ১৮৯৩ সালে প্রতিদিন ৩,৬০,০০০ গ্যালন পানি সরবরাহ করা হতো। পাইপ লাইনের দৈর্ঘ্য ছিল তখন ১৬ মাইল। রাস্তায় হাইড্রেন্টের সংখ্যা ছিল ১২৯। খরচ হতো বার্ষিক ১৮,০০০ টাকা। ১৮৯৯-১৯০০ সালে খরচ হয়েছিল ১৯,১০০ টাকা।

বিদ্যুৎ বাতি

চলিত শতকের প্রথম বছর ঢাকা শহরে বিদ্যুৎ এসেছিলো এবং এর বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন ঢাকার নবাব আহসানউল্লাহ।

উনিশ শতকের শেষার্ধে ঢাকা শহরের কিছু রাস্তায় তেলের বাতি দেয়া হয়েছিল। ঘরবাড়িতেও হারিকেন, কুপি বা মোমবাতিই ব্যবহৃত হতো। বড়লোকদের বাড়িতে ঝাড় বাতি। এদিক থেকে অজপাড়াগাঁর সঙ্গে তৎকালীন পূর্ববঙ্গের প্রধান শহরের তেমন কোনো তফাৎ ছিল না।

১৮৮০ সালে ব্রিটিশ সরকার নবাব আহসানউল্লাহর পিতা নবাব আবদুল গণিকে

সিএসআই উপাধি প্রদান করে। পুত্র আহসানউল্লাহ খুশিতে তখন ঢাকা শহরেব রাস্তায় গ্যাসবাতি প্রদানের কথা ঘোষণা করেন। কলকাতার 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় একটি বিবৃতি প্রদান করে তিনি বলেছিলেন--

"The enthusiam displayed by our fellow townsmen on the occassion of my fathers investiture with the insignia of a knight Commander of the star of India, has so touched and gratified me that as a token of appreciation of the good feeling shown today by both Mohamedans and Hindus of Dhaka, I propose to light such main roads and streets of the city as are now lighted with oil lamps, with gas, entirely at may own costs, on the sole condition that the Municipality will, on their part, undertake to expand, on improved sanitation and the purchase and maintenance of fire engines, the sum that now expend on lighting the town

ঢাকার পত্রিকা 'বেঙ্গল টাইমস' লিখেছিল—

When Nawab Sir Abdul Ghanie was about to be knighted, his son Nawab Ahsanullah promised a reward to every perosn who should illuminate his dwelling in honour of that event. If you maintain my father's Izzat, he promised by himself and though others 'I will make you khooshie "

এ প্রতিশ্রুতি দিলেও দীর্ঘদিন তা কার্যকব হয়নি। কাবণ, নবাব মিউনিসিপালিটিকে যে শর্ত দিয়েছিলেন, মিউনিসিপালিটি হয়তো তা বাখতে পারেনি। অর্থাৎ ঢাকার পয়ঃপ্রণালীর উন্নয়ন ও দমকলের ব্যবস্থা কবা। কিন্তু ঢাকাবাসীকে খুশি করাব প্রতিজ্ঞা আহসানউল্লাহ্ ভোলেননি।

এই প্রতিজ্ঞাব এক যুগ পব ১৯০১ সালের ৭ ডিসেম্বর তারই অর্থ সাহায্যে ঢাকাব বেশ কিছু রাস্তায় বৈদ্যুতিক বাতি প্রদান করা হয়েছিল। ঢাকার কোন কোন বাস্তায় বৈদ্যুতিক বাতি দেয়া হবে তাব একটি বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছিল ১৯০১ সালেব জুলাই মাসে। বিদ্যুৎ প্রদানেব জন্য 'দি ঢাকা ইলেকট্রিক লাইট ট্রাস্টিস' গঠন করা হয়েছিল। তবে এই পরিষদ নিয়ন্ত্রণ কবত পৌরসভা। বিজ্ঞপ্তিটি ছিল এরকম—

Notice

DACCA ELECTRIC LIGHT

The Dacca Electric light trustees do hereby give notice under section 3 Classes iii of Act IX of 1895 that they are applying to Goverment for a licence under the said act to supply Electricity in and near the following streets and places :

Rahmatgonj Road (upto the works)
Chowk circular road.
Mogultully road.
Nulgolla road.
Babu Bazar road.
Committegonj road.
Armenia street (upto Ray Bahadoor's street)
Islampur road.
Ahsunmunzil road.
Patuatuly road.
Wiseghat road.
Patuatuly Lower road.
Patuatuly ghat road.
Bangla Bazar road.
Dal Bazar road.
Farashgonj road to Iron Suspension bridge
Dig Bazar road.
Victoria park.
Lukhi Bazar road (as far as R.C. chapel).
Sadarghat road.
Shakhari Bazar road (West of the Bank Dacca College).
Johnson road.
Nuwabpur road.
Railway staff quarters road (upto the Ramna teaching ground road).

Jamdani Nagore road and Raja's dawri lane together with the lanes connecting them upto say Shahibi's Bazar

Dacca — J.T. Rankin
5th July 1901". — on behalf of trustees

ঢাকায় বিদ্যুৎ বাতি জ্বলে ওঠে ৭ ডিসেম্বর ১৯০১ সালে। এ বিষয়ে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল পত্রিকায়। রিপোর্টটিতে নানাবিধ তথ্য থাকায় সম্পূর্ণ রিপোর্টটিই উদ্ধৃত করা হলো- –

"ঢাকার বিজলী বিকাশ

গতকল্য সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে. শ্রীযুক্ত নবাব বাহাদুরের অনুকম্পায়, ঢাকা নগরীর প্রধান প্রধান রাস্তাগুলি চপলা চমকে অকস্মাৎ হাসিয়া উঠিয়াছে। যেখানে মিউনিসিপালিটী'র দীনা, ক্ষীণা, দীপ কলিকা কৌতূহলাক্রান্ত। অবগুণ্ঠবতী কুলবধূর ন্যায় এখানে ওখানে অলক্ষ্যে উঁকি ঝুঁকি মারিয়া পথিকের মনে ঘৃণার সঞ্চার করিয়া দিত, আজ সেখানে দামিনীপ্রভা বিমল চন্দ্রিকাপাতে জনসাধারণের নয়নমন পুলকিত করিয়া তুলিয়াছে। ঢাকার ন্যায় শহরে এরূপ দৃশ্য লোকনয়নে নিপতিত হইবে দশ বৎসর পূর্বে বোধ হয় তাহা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। কিন্তু নবাব বাহাদুরের অপার অনুগ্রহে অসম্ভবও সম্ভব হইয়াছে। এ নিমিত্ত শ্রীযুক্ত নবাব সাহেব সকলেরই আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু কর্তব্যের অনুরোধে এ সময়ও আমাদিগকে দুই একটি অপ্রিয় কথার অবতারণা করিতে হইতেছে। শুনিতেছি এই কার্যের জন্য নবাব বাহাদুরের চারি লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। চারি লক্ষ টাকা এককালীন দান দানশৌন্ডতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই। কিন্তু এতগুলি টাকা যাহাদের হস্তে ব্যয়িত হইল তাহাদের কি বিবেচনা করা উচিত ছিল না যে সম্পন্ন কার্য ব্যয়ের অনুপাতে উপযোগী হইয়াছে কিনা? চারি লক্ষ টাকা ব্যয়ে শহরের কতই না উন্নতি করা যাইত! যাহা হোক এ সম্বন্ধে এখন কোন কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। রাস্তাঘাটে আলোকের অভাব যে কথঞ্চিৎ দূরীকৃত হইয়াছে তজ্জন্যই এখন ঢাকাবাসীর কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

শ্রীযুক্ত ছোটলাট বাহাদুরের সমক্ষে তড়িত আলোক প্রথম বিকশিত হইবে ইহাই স্থির হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় তাহার অসুস্থতা নিবন্ধন তিনি আসিতে পারিলেন না। সেক্রেটারী মাননীয় মিঃ বোলটন সাহেব গতকল্য সন্ধ্যার সময় এখানে আসিয়া তড়িতালোকের উদ্বোধন ক্রিয়া সমাপন করিয়াছেন। অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত নবাব বাহাদুরের আমন্ত্রণে তাঁহার আহসান মঞ্জিল প্রাসাদে শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সমবেত হইয়াছিলেন। প্রাসাদের দ্বিতলস্থ বারান্দায় সভার অধিবেশন হয়। মিঃ বোলটন মধ্যভাগে এবং নবাব বাহাদুর তাহার দক্ষিণে এবং কমিশনার সাহেব বামভাগে উপবেশন করিয়াছিলেন। ইলেকট্রিক লাইট বিষয়ক রিপোর্ট কমিশনার বাহাদুর কর্তৃক পঠিত হইলে মাননীয় মিঃ বোলটন মহোদয় নবাব বাহাদুরের দানশীলতার প্রশংসা করিয়া একটা ছোটখাটো বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার এক অংশে তিনি বলিয়াছেন যে, 'এখন হইতে মিউনিসিপালিটীর উপর একটি গুরুভার অর্পিত হইল। উত্তম জল নিষ্কাশন পন্থা নির্মাণ এবং অপ্রশস্ত রাজপথগুলির বিস্তৃতি সাধন না করিলে ইলেকট্রিক লাইট মানাইবে কেন? অতএব মিউনিসিপালিটী এ বিষয়ে যত্নবান হোন।' আমরা আশা করি মিউনিসিপালিটী এ আদেশ প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইবেন না।"

কবরস্থান

ঢাকায় কবর দেয়া ছিল একটি সমস্যা। অনেকে বাড়ির আঙিনায় বা রাস্তার আশপাশে

কবর দিতেন। উনিশ শতকে ঢাকায় অনেক জলা ছিল। শীতেব মৌসুমে সেগুলো শুকিযে গেলে সেখানেও কবর দেয়া হতো। বর্ষাতে আবার পচা মৃতদেহের অংশবিশেষ ভেসে উঠত। যেমন, আর্মেনীটোলা ঝিল এ কাবণে বিষাক্ত হযে উঠেছিল। সামগ্রিকভাবে অবস্থাটা কেমন ছিল তা বোঝা যাবে ১৮৬৪ সালে সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি রিপোর্টে--

ঢাকার মহামারীর বিভিন্ন কারণের মধ্যে পত্রিকা উল্লেখ করেছিল, একটি কারণ হচ্ছে 'ঢাকাস্থ ইতর মুসলমানগণের কবর দেয়ার দূষ্যতা।'

"ঢাকায় যে সকল ইতর মুসলমান বাস করে, তাহাদিগের শব সমাহিত করিবার কোন বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট নাই। লোক গমনাগমনের পথের পার্শ্বে যে সকল স্থান ছাড়া পড়িয়া থাকে অনেকে সেই সকল স্থানে, অনেকে নিজ নিজ বাড়িতে মৃত শরীর নিখাত করিয়া রাখে। জনাকীর্ণ তাঁতীবাজার ও বংশালের সন্নিহিত নূতন সড়কের পূর্ব পার্শ্বে এত শব নিধান হইয়াছে যে, ঢাকায় তিলার্ধ শূন্য রয় নাই। তথাপি আমরা দু'বেলাই প্রায় তথায় কবর দিতে দেখিতেছি। এই সকল শব কেবল নামে সমাহিত হইয়া থাকে। কৃষকেরা শস্য বীজ যেমন মৃত্তিকার নিম্নস্থ করিয়া রাখে, শব সমাহিতরাও সেইরূপ মৃত্তিকা দ্বারা শরীরটা আচ্ছাদিত করিয়া আইসে বলিলেই হয়। শব নিহিত কবিরার জন্য যেরূপ গভীর কূপ খনন ও মৃদাচ্ছাদন আবশ্যক, তাহারা তাহাব কিছুই কবে না। এক বা অর্ধ হস্ত প্রমাণ একটা গর্ত খনন করিয়া তন্মধ্যে শবটা নিক্ষেপ করিয়া কতকটা মাটি দিয়া ঢাকিয়া আসে।...যাহা হউক, এইরূপ শব নিখাত হওয়াতে.....কুকুর প্রভৃতি মাং-সাশী পশু সকল নখাকর্ষণে অনায়াসেই তাহা বাহির করিয়া ফেলে। তাহা হইতে দুর্গন্ধময় বায়ু উত্থিত হইয়া বায়ু দূষিত করে।

অপিচ, ঢাকার অনেক স্থানেই জলা আছে। ঐ সকল জলাশয়াদি কয়েক ঋতুতে পরিশুষ্ক হইয়া যায়। সেই সময় তাহার মধ্যেও অনেক লোক কবর দিয়া থাকে। প্রাবৃটকালে যখন এই সকল জলপূর্ণ হয়, তখন প্রোথিত শব গর্তে জল প্রবিষ্ট হইয়া তাহার সহিত সম্যকরূপে মিশ্রিত হইয়া যায়। সুতরাং বায়ুর ন্যায় জলও এতদদ্বারা বিদূষিত হইয়া থাকে।..."

এ ধরনের যত্রতত্র কবর দেয়া বন্ধ করে, মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে সুনির্দিষ্ট জায়গায় কবর দেয়া বা কবরস্থান তৈরির চিন্তাভাবনা হতে থাকে। ১৮৬৮ সালে মিউনিসিপ্যালিটির চৌহদ্দির মধ্যে যেসব জায়গায় কবর দেয়া হতো (পারিবারিকভাবেও) তার একটি তালিকা তৈরি করা হয়। তালিকায় ১২টি কবর দেয়ার জায়গার খোঁজ পাওয়া যায়। সেগুলো হলো—চম্পাতলি, বেগম বাজার, পূরব দরওয়াজা, বেচারাম দেউড়ি, আগামসিহ দেউড়ি প্রভৃতি। মিউনিসিপ্যালিটি সরকারের কাছে এর অনেকগুলো বন্ধ করে দেয়ার সুপারিশ করে। লে. গভর্নর এ সুপারিশ মেনে নিয়ে বেশ কটি কবরস্থান বন্ধ করে দেয়ার নির্দেশ দেন। সরকারি নির্দেশ ঠিকমতো মান্য করা হচ্ছে কিনা তা তদারক করার জন্য ঢাকার কমিশনার ও মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ডা. গ্রাহাম, ডা. ওয়াইজ ও খাজা আহসানউল্লাকে নিয়ে একটি উপ-কমিটি

গঠন করা হয়। এ কমিটির ওপর দায়িত্ব ছিল বিকল্প প্রস্তাব রাখার। তাঁরা আগাসাদেক বাজার ও পুরানা ক্যান্টনমেন্ট (পুরানা পল্টন)— এ দুটি কবরস্থান খোলার চিন্তাভাবনা করছিলেন।

পরবর্তী দশ বছরেও এর সমাধান করা যায়নি। ১৮৮১ সালে সিভিল সার্জন আগাসাদেক বাজারের কবরস্থানটি বন্ধ করে দেয়ার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। এখানে পুরনো একটি কবরস্থানের মতো ছিল এবং তা বন্ধ করেও দেয়া হয়েছিল। ১৮৮৯ সালে দেখি, আগাসাদেক বাজারের প্রতাপ চন্দ্র দে এবং আরো অনেকে ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেন যে, এখানে মাঝে মাঝে গর্ত করে লাশ ফেলে রাখা হয়। তারপর শৃগাল, কুকুর এসে উৎপাত করে। সুতরাং তা বন্ধ করে দেয়া হোক। কিছু মুসলমান বাসিন্দা আবার এতে আপত্তি জানায়। ২০ মে ১৮৮৯ সালে পৌরসভার কমিশনারদের এক সভায় এই গোরস্থান উন্মুক্ত করে দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। পরে লে. গভর্নরের হস্তক্ষেপের ফলে এই সিদ্ধান্ত বাতিল হয়ে যায়।

অবশেষে পুরানা নাখাসে ১৮৮২ সালে মিউনিসিপ্যালিটির কর্তৃত্বাধীন প্রথম কবরস্থান খোলা হয়। ১৮৮৯ সালে গেণ্ডারিয়ায় খোলা হয় দ্বিতীয় কবরস্থানটি। এটির ব্যয়ভার বহন করেছিলেন দীননাথ সেন। আজিমপুর ও জুরাইনে কবরস্থান খোলা হয় পঞ্চাশ দশকে। কবর খোঁড়ার পুরনো একটি হিসাব পাওয়া গেছে। ১৯১৮ সালের এ হিসাবে জানা যায়, প্রাপ্তবয়স্কের কবর খোঁড়ার জন্য দিতে হতো ১০ আনা, মাঝারি আকারের লাশের জন্য ৭ আনা এবং শিশুর লাশের জন্য ৫ আনা।

অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট

১৮৬১ সালে ব্রিটিশ সরকার ফৌজদারি মামলা সংক্রান্ত ক্রিমিনাল প্রসিডিউর কোড পাস করেছিল। এই বিলের বিধান ছিল, শহরাঞ্চলে ছোটখাটো অপরাধ বিচারের জন্য প্রয়োজনীয় 'অনারারি' (অবৈতনিক) বা 'স্টাইপেনডারি' (বৃত্তিধারী?) ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা যাবে। ঢাকায় ইংরেজ সরকার এ ধরনের প্রথম অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে দু'জনকে নিযুক্ত করেছিলেন। ১৮৬১ সালে যে দু'জন নিযুক্তি হয়েছিলেন তাঁরা হলেন— জে জি এন পোগজ বা নিকি পোগজ এবং খাজা আবদুল গনি। দু'জনেই ঐ সময় ছিলেন ঢাকা শহরের প্রভাবশালী নাগরিক।

উনিশ শতকের মধ্যভাগে ঢাকা শহর তো বটেই পূর্ববঙ্গের আর্মেনীয় সম্প্রদায়ের একজন নেতা ছিলেন পোগজ। তিনি ছিলেন জমিদার এবং ব্যবসায়ী। পোগজ ঢাকায় কবে এসেছিলেন বা তাঁর জন্ম কোথায় এবং কখন তা জানা যায়নি। তবে, তিনি সমসাময়িক ছিলেন ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা ব্রজসুন্দর মিত্র, নবাব আবুদুল গনি, মৌলবীবাজারের প্রতিষ্ঠাতা আব্দুল আলী প্রমুখের। একটি সূত্র অনুসারে, তাঁরা সবাই ছিলেন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের প্রথম দিককার ছাত্র।

পোগজ খুব সম্ভব পরলোকগমন করেছিলেন ১৮৭০ সালে। মৃত্যুর আগে চলে

গিয়েছিলেন লন্ডনে এবং যাবার আগে বোধহয় তাঁর অস্থাবর সম্পত্তি/জমিদারি একটি ট্রাস্ট করে দিয়েছিলেন। খবরের কাগজের একটি বিজ্ঞাপনে দেখি, ১৮৮৩ সালে পোগজ ট্রাস্ট কলকাতায় পোগজের বগুড়া ও পাবনার জমিদারিসমূহ নিলামে উঠিয়েছে।

জমিদার, ব্যবসায়ী এবং বিদেশী হওয়া সত্ত্বেও পোগজ ঢাকায় নানা ধরনের সমাজসেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করেছিলেন সক্রিয়ভাবে। ঐ আমলের সংবাদপত্রসমূহে এসব কর্মকাণ্ডের বিক্ষিপ্ত সংবাদ পাওয়া যায়। ঢাকা পৌর কর্পোরেশনের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন তিনি। কিন্তু, পোগজকে ঢাকার লোকজন এখনও মনে রেখেছে তাঁর অক্ষয় কীর্তি পোগজ স্কুলের জন্য। ১৮৪৮ সালে এই স্কুল স্থাপন করেছিলেন তিনি। তখন এর নাম ছিল 'পোগজ অ্যাংলো ভার্নাকুলার স্কুল অ্যাট ঢাকা'। ভালো বাংলা ও ইংরেজি জানতেন পোগজ। স্কুলের প্রথম হেডমাস্টারও ছিলেন তিনি। বাংলাদেশের প্রাচীনতম স্কুলটির মধ্যে একটি হলো পোগজ স্কুল এবং উনিশ শতকে তো বটেই এখনও এ স্কুলের খ্যাতি অম্লান। পোগজের বাড়ি ছিল খুব সম্ভব আর্মেনী গির্জার পাশে 'সুধাময় হাউস' বা শাবিস্তান সিনেমা হলের পাশের কোনো বাড়ি। এ তথ্য জানিয়েছেন পোগজ স্কুলের এক সময়ের হেডমাস্টার মনীন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য।

আবদুল গনির নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়া বাহুল্য মাত্র। তাঁর কারণে তাঁর পরিবার ব্রিটিশ সরকার প্রদত্ত 'নবাব' উপাধি বংশানুক্রমে ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছিল। ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক ও সম্পদের কারণে তাঁর এবং তাঁর পরিবারের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল শুধু নিজ জমিদারির প্রজাদেরই নয়, ঢাকাবাসীদেরও এক রকম নিয়ন্ত্রণ করা। সামাজিকভাবে ঢাকাবাসীদের (প্রধানত মুসলমানদের) তিনি নিয়ন্ত্রণ করতেন পঞ্চায়েতের মাধ্যমে। তাঁর বাসভবন 'আহসান মঞ্জিল'-এ রীতিমতো বসত দরবার।

আবদুল গনির পূর্বপুরুষরা ছিলেন কাশ্মিরি। জন্ম তাঁর ১৮৩০ সালে। তবে তিনি কতদূর লেখাপড়া করেছেন তা জানা যায়নি। এতোটাকু শুধু জানা যায় যে, কলেজিয়েট স্কুলের আদি ছাত্রদের মধ্যে তিনি একজন।

আবদুল গনিকে খাজা পরিবারের কর্তৃত্ব গ্রহণ করতে হয়েছিল মাত্র আঠার বছর বয়সে। বাংলা ১২৫৩ সনে খাজা পরিবারের সবাই মিলে, "...শুধু কর্তৃত্ব নহে : তাঁহারা এক ওয়াকফনামা প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে চিরদিনের জন্য তাঁহার মতল্লি করেন এবং তিনি যাঁহাকে ইচ্ছা মতল্লি করিতে পারিবেন, এরূপ ক্ষমতা তাহাকে প্রদান করেন, ঐ এজমালী সম্পত্তির ন্যায্য মোসহারা [মাসোহারা] পাওয়া ভিন্ন অপর বিশেষ কোন দাবি তাঁহারা রাখিয়াছিলেন না। ঐ রূপ ওয়াকফনামা ১২৫৩ সনে ২৭শে বৈশাখ প্রস্তুত হয়।"

আবদুল গনি ইংরেজ শাসকদের নজরে এসেছিলেন প্রথম ১৮৫৭-এর বিদ্রোহের সময়। ঐ সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র সাতাশ। অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছিলেন তিনি ইংরেজদের, যে জন্য বাংলার শাসক হ্যালিডে পর্যন্ত তাঁর রিপোর্টে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছিলেন গনি মিয়ার। আর একজন ইংরেজ প্রশাসক বাকল্যান্ড লিখেছিলেন, ঐ সময় বলেছিলেন গনি মিয়া—

"এই সংকটময় মুহূর্তে আমার উপস্থিতি সরকারকে সাহস যোগাবে। আমার অনুপস্থিতি বিস্তার করবে আতংক, যা রোধে আমরা এখন শংকিত।"

তারপর তিন দুর্ভেদ্য করেছিলেন নিজ অট্টালিকা, পরিবারবর্গকে সজ্জিত করেছিলেন অস্ত্রে, সরকারকে দান করেছিলেন মোটা অংকের অর্থ, সহায়তা করেছিলেন সরকারকে হাতি, ঘোড়া নৌকা সব কিছু দিয়ে।

১৮৬০ সালে ঢাকায় শিয়া-সুন্নিদের এক মারাত্মক দাঙ্গা হয়েছিল। ডা. সিরাজুল ইসলাম তাঁর এক প্রবন্ধে লিখেছেন, সরকার পর্যন্ত ঐ দাঙ্গা রোধ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। তখন অবুদল গনি নিজ প্রচেষ্টায় মাত্র তিন দিনের মধ্যে শান্ত করে তুলেছিলেন ঢাকা শহরকে এবং সরকার তাঁকে সিএসআই [কোম্পানিয়ন অব দি অর্ডার অব দি স্টার অব ইন্ডিয়া] উপাধি দিয়েছিল। ১৮৬৭ সালে ভাইসরয় তাঁকে মনোনীত করেছিলেন আইন পরিষদের সদস্য হিসেবে। ১৮৭৫ সালে তাঁকে বংশানুক্রমিক নবাব উপাধি দেওয়া হয়েছিল। ১৮৮৬ সালে লাভ করেছিলেন কেসিএসআই [কিং কমান্ডার অব দি অর্ডার অব দি স্টার অব ইন্ডিয়া] উপাধি। ইংরেজদের এ অনুগ্রহ পূর্ববঙ্গে প্রবল প্রতাপশালী করে তুলেছিল নবাব গনিকে।

জবরদস্ত জমিদার ছিলেন নবাব গনি। পৈত্রিক সূত্রে পেয়েছিলেন তিনি ঢাকা, বরিশাল, কুমিল্লা ও ময়মনসিংহে বিস্তৃত জমিদারি। জবরদস্ত বলছি এ কারণে যে, (একটি উদাহরণ) "নবাব বাহাদুর কলিকাতা হইতে প্রত্যাবর্তনকালে বরিশালের জমিদারীতে উপস্থিত হন। তাহাতে প্রজাগণ তাঁহাকে প্রায় সাড়ে ত্রিশ হাজার টাকা নজর দেয়।" প্রজাদের কড়া নির্দেশ দিয়ে তিনি বলেছিলেন, তাঁর জমিদারিতে, সালিসে উপস্থিত না হয়ে সরাসরি কেউ আদালতে যেতে পারবেন না।

ঢাকা শহরে তাঁর আভিজাত্য, বৈভব ও প্রভাবের প্রতীক ছিল আলী মিয়ার কেনা সেই রংমহল। বাড়িটিকে প্রায় পুনর্নির্মাণ করে নাম দিয়েছিলেন তিনি নিজের ছেলের নামে 'আহসান মঞ্জিল'। তবে ঢাকাবাসীর কাছে তা নবাববাড়ি নামেই ছিল অধিক পরিচিত। এর দক্ষিণে বুড়িগঙ্গার দিকে বারান্দা ও সিঁড়ি (যা দিয়ে সরাসরি ওঠা যায় দোতলায়) এবং উত্তর দিকের প্রধান ফটক ও নহবতখানা তিনিই নির্মাণ করেছিলেন। ১৮৮৮ সালে ঘূর্ণিঝড়ে 'আহসান মঞ্জিল' ক্ষতিগ্রস্ত হলে তা আবার পুনঃনির্মাণ করা হয়েছিল এবং তখনই নির্মিত হয়েছিল এর গম্বুজ।

তৎকালীন ঢাকা শহরের অনেকাংশের মালিক ছিলেন তিনি। শাহবাগ, বেগুনবাড়িতে ছিল তাঁর বাগান, অট্টালিকা। বেগুনবাড়িতে ত্রিশ বিঘা পরিষ্কার করে তৈরি করেছিলেন চা বাগান। সেখানে ব্যবহার করেছিলেন 'কাছার বীজ' এবং ১৮৬৭ সালে সেখান থেকে পেয়েছিলেন আড়াই মণ চা।

শাহবাগ তো নবাবের ছিলই, অনুমান করে নিচ্ছি রমনা রেসকোর্সও ছিল নবাবের সম্পত্তির অন্তর্গত। ড. সিরাজুল ইসলাম একবার আমাকে বলেছিলেন, নবাব পরিবারের দলিলপত্র ঘেঁটে তিনি জেনেছেন, সলিমুল্লাহর মৃত্যুর পর, তাঁর সম্পত্তির হিসাব তৈরির সময় রেসকোর্সকেও দেখানো হয়েছিল সম্পত্তির অংশ হিসেবে।

ঢাকায় পেশাদারী ঘোড়দৌড়ের প্রচলন করেছিলেন নবাব আবদুল গনি। হতে পারে এক ধরনের নতুন ব্যবসা হিসেবে ঘোড়দৌড় যখন চালু করেছিলেন নবাব গনি এবং তখন হয়তো রমনা এলাকাও লিজ নিয়েছিলেন।

আবদুল গনির ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে যা জানা গেছে, তা হলো—বিয়ে করেছিলেন তিনি দু'বার। পুত্র-কন্যার সংখ্যা ছিল ছ'জন। ব্রাডলি বার্ট লিখেছেন, ভোরে উঠে নবাব গনি খানিকটা বেড়াতেন অথবা যেতেন শিকারে বা অশ্বারোহণে। সকাল সাত-আটটায় আহসান মঞ্জিল সংলগ্ন 'চা-খানা'য় বৈঠক করতেন সমবেত লোকদের নিয়ে। সকাল ন'টায় যেতেন নিজের ঘরে এবং নাস্তা করতেন পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে। জেনানা মহলে কাটাতেন তারপর এগারটা থেকে দুটো পর্যন্ত। এরপর বসতেন জমিদারির কাজ নিয়ে। রাত আটটা থেকে দশটা পর্যন্ত সময় কাটাতেন বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে।

আবদুল গনি ১৮৭৭ সালে খাজা পরিবারের কর্তত্বভার অর্পণ করেছিলেন পুত্র আহসানউল্লাহর ওপর।

ঢাকার প্রথম সংবাদপত্র 'ঢাকা নিউজ'-এর ছিলেন তিনি একজন উদ্যোক্তা। ঢাকার প্রাচীন প্রেসগুলির মধ্যে অন্যতম 'ঢাকা নিউজ প্রেসে'র তিনি ছিলেন একজন অংশীদার। এখান থেকেই প্রকাশিত হয়েছিল পূর্ববঙ্গের প্রথম ইংরেজি সাপ্তাহিক 'ঢাকা নিউজ'। স্বাভাবিকভাবেই এ পত্রিকা ছিল খানিকটা 'নেটিভ' বিদ্বেষী। উনিশ শতকের চল্লিশ দশকে [আনুমানিক] একটি ফ্রি স্কুল স্থাপন করেছিলেন তিনি, কিন্তু কখনও তা ভালো চলেনি। ১৮৬৬ সালে, পুরব দরওয়াজায় স্থাপন করেছিলেন একটি লঙ্গরখানা। এর বৈশিষ্ট্য ছিল এখানে তাদেরই আশ্রয় ও বাসস্থানের বন্দোবস্ত করা হতো যারা থাকবে স্থায়ীভাবে। লঙ্গরখানায় থাকত ২০ জন পুরুষ, ১৬ জন মহিলা ও ৬টি শিশু। এদের অধিকাংশই ছিল খোঁড়া অথবা পঙ্গু।

আবদুল গনি, ঢাকা শহরের জন্য অন্তত একটি কাজ করে গেছেন যে জন্য ঢাকাবাসী তাঁকে স্মরণে রাখতে পারে। তা হলো বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ। ১৮৭৮-এর পূর্ব পর্যন্ত ঢাকায় খাবার পানির উৎস ছিল বুড়িগঙ্গা বা পাতকুয়োর নোংরা পানি। এ কারণে ঢাকা শহরে মহামারী প্রায়ই লেগে থাকত। ১৮৭৯ সালে নবাব গনি কেসিএসআই উপাধি পেলে এবং প্রিন্স অব ওয়েলসের সুস্থ হয়ে ওঠার কারণে, সরকারকে দান করেছিলেন পঞ্চাশ হাজার টাকা। ইচ্ছে ছিল, সে টাকা দিয়ে ঢাকাবাসীদের জন্য যেন কিছু করা হয়। এ টাকা খরচ করার জন্য গঠিত হয়েছিল একটি কমিটি এবং ঠিক হয়েছিল ঢাকায় বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য ব্যয় করা হবে এ টাকা।

নবাব গনি এ প্রকল্পে দান করেছিলেন মোট দু'লক্ষ টাকা। ১৮৭৪ সালে লর্ড নর্থব্রুক ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন ওয়াটার ওয়ার্কসের এবং ১৮৭৮ সালে তা উদ্বোধন করেছিলেন ঢাকা বিভাগের কমিশনার পিকক [ড. ইসলাম তার এক প্রবন্ধে লিখেছেন, নর্থব্রুক উদ্বোধন করেছিলেন ওয়াটার ওয়ার্কস তা ঠিক নয়]।

ঐতিহাসিকদের অনেকেই আবদুল গনির দান-ধ্যানের প্রশংসা করেছেন। দান-ধ্যান

যে তিনি প্রচুব কবেছিলেন তা সত্যি। কিন্তু তাঁব দানেব তালিকা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, দেশের জন্য যা ব্যয় করেছেন তার থেকে বেশি না হলেও বিদেশী স্বার্থে কম দান করেননি। আব স্থানীযভাবে যা ব্যয় কবেছেন তা নিজেব প্রজা বা শহরবাসীর কথা ভেবে নয়, ব্রিটিশ কোনো প্রতিনিধিব সে অঞ্চলে পদার্পণকে স্মরণ বাখার জন্য বা ঔপনিবেশিক সরকারের অনুরোধে। এই তালিকা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, ঢাকা শহরের জন্য এককালীন দু'লক্ষ টাকা দান ব্যতীত অধিকাংশই খরচ করা হয়েছিল ঔপনিবেশিক শাসকের সম্মানার্থে বা ধর্মীয় কাজে।

সবশেষে নবাব গনি [নবাব পরিবাব] ও ঢাকার আদি অধিবাসীদের সম্পর্কের কথা উল্লেখ করতে হয়। এই আদি অধিবাসী বা কুট্টিরা ছিলেন নবাবদের অত্যন্ত অনুগত। ১৯২১-২২ সালে এমএলএ আবুল হুসেন আহসানউল্লাহকে লেখা নবাব গনির একটি চিঠি প্রকাশ করেছিলেন খবরেব কাগজে—"নবাব সাহেব তার পুত্রকে লিখেছিলেন যে, তিনি যেন মনে রাখেন যে, ঢাকাব কুট্টিরা তাদের প্রজা নয়—অথচ তাদের প্রজার মতো ব্যবহার করতে হবে - খানদানেব নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য। এসব লোক যদি লেখাপড়া শিখে বাস্তব অবস্থা জানতে পারে তবে খানদানের নেতৃত্বের পরিকল্পনা ছাড়তে হবে। তাদের অন্যভাবে টাকা-পয়সা দিয়ে সময় সময় সাহায্য করা যেতে পারে—কিন্তু স্কুলের ব্যবস্থা যেন না করা হয়।"

ঢাকার সাপ্তাহিক 'ঢাকা প্রকাশ' ১৮৬৪ সালে লিখেছিল—"ঢাকায় খাজা আবদুল গণির মতো ঐশ্বর্য্যশালী লোক আর নাই। ক্ষোভের বিষয় এই যে, তিনি দেশহিতকব সৎকার্য্য সাধনে নিতান্ত উদাসীন। তাঁহার কার্য্যের মধ্যে কেবল মৃগয়া, ভোজ এবং ঘোড়দৌড়ই দেখিতে পাওয়া যায়।"

তবে পরবর্তী ত্রিশ বছরে পরিবর্তন হয়েছিল আবদুল গনির। তাঁর দানের তালিকা এর প্রমাণ। ১৮৯৬ সালে যেদিন তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন সেদিন ঢাকায় নেমে এসেছিল শোকের ছায়া। স্কুল, কলেজ, অফিস-আদালত সব ছিল বন্ধ। প্রায় 'পঞ্চাশ হাজার লোক যেন নদীপ্রবাহের ন্যায়' শবানুগমন করেছিল।

নির্বাচিত মেয়র

আনন্দ চন্দ্র রায় ঢাকা পৌরসভার প্রথম নির্বাচিত চেয়ারম্যান বা সভাপতি। অবশ্য প্রত্যক্ষ ভোটে তিনি নির্বাচিত হননি। নির্বাচিত হয়েছিলেন কমিশনারদের ভোটে।

'ঢাকা মিউনিসিপ্যাল ইমপ্রুভমেন্ট অ্যাক্ট'-এর বলে ১৮৬৪ সালের আগস্ট মাসে স্থাপন করা হয়েছিল ঢাকা 'মিউনিসিপ্যাল কমিটি'। ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি বা পৌরসভা পরিচালনা করত সভাপতির নেতৃত্বাধীন একটি কমিটি। ১৮৮৪ সালের পূর্ব পর্যন্ত ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট পদাধিকার বলে ছিলেন মিউনিসিপ্যালিটির সভাপতি। ভাইস-চেয়ারম্যান নিয়োগ করতেন বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর। বিভাগীয় কমিশনার, ম্যাজিস্ট্রেট, নির্বাহী প্রকৌশলী ও সিভিল সার্জন ছিলেন পদাধিকার বলে কমিটির

সদস্য। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট স্কিনার এবং ঢাকা কলেজের শিক্ষক জর্জ বিলাট ছিলেন পৌরসভার প্রথম চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান। পৌরসভার প্রথম কমিটির সদস্যদের মধ্যে যাঁদের নাম জানা গেছে তাঁর হলেন কুক. ল্যাম্ব ওয়াইজ, ব্রজমোহন রায়, মির্জা গোলাম পীর, সোয়াটম্যান, ব্রজরতন দাস, আলি মিয়া, মির্জা মোহাম্মদ খান, রেভারেন্ড শেফার্ড, গোলক নারায়ণ রায়, জেমস হলিং, উইনসন, সারকিস ও ব্রজমোহন রায়। এঁরা সবাই ছিলেন তৎকালীন ঢাকার গণ্যমান্য নাগরিক।

১৮৮৪ সালে চালু হলে নির্বাচন প্রথা। নির্বাচিত কমিশনাররা ঠিক করলেন ঢাকা পৌরসভার চেয়ারম্যান তাঁরা নির্বাচন করবেন। ১৮৮৪ সালে ওয়ার্ড কমিশনারদের নির্বাচনের (সীমিত ভোটে) পর প্রথম সভা বসল কমিশনারদের। সে সভাই নির্বাচন করবে একজন সভাপতি ও সহ-সভাপতি। অনেকে ভেবেছিলেন, প্রথমত তৎকালীন ঢাকার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ফ্রেডারিক ওয়্যারের নামই প্রস্তাবিত হবে চেয়ারম্যান বা সভাপতি হিসাবে। কিন্তু হঠাৎ একজন নির্বাচিত কমিশনার সৈয়দ গোলাম মোস্তফা চেয়ারম্যান হিসাবে আনন্দ চন্দ্রের নাম করেন এবং বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি নির্বাচিত হন। এ প্রসঙ্গে সৈয়দ গোলাম মোস্তফার (১৮১৪-১৯০৭) কথা উল্লেখ করতে হয়। সৈয়দ গোলাম মোস্তফার জন্ম ১৮১৪ সালে সোনারগাঁর সাদীপুরে। তাঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন বিখ্যাত সুফি সৈয়দ ইব্রাহিম দানিশ মন্দ, যিনি নাকি আবার ছিলেন হযরত হুসেনের অধস্তন পুরুষ। জনশ্রুতি অনুযায়ী সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শা'র সময় 'দানিশ মন্দ' পারস্য থেকে সোনারগাঁয় এসে বসতি বাঁধেন।

গোলাম মোস্তফা থাকতেন ঢাকায়। বাড়ি ছিল তাঁর বেচারাম দেউড়িতে। জজ কোর্টে ওকালতি করতেন। পঁয়ত্রিশ বছর ধরে তিনি ছিলেন ঢাকার অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট। ফারসি ভাষায় সাহিত্য চর্চা করতেন। ঢাকার মুসলমানরা তাঁকে মান্য করতেন।

উনিশ শতকের শেষ ভাগ থেকে এ শতকের প্রথম তিন দশক পর্যন্ত আনন্দচন্দ্র রায় ছিলেন ঢাকার একজন প্রভাবশালী নাগরিক। জন্ম তাঁর ১৮৪৪ সালে।

আনন্দচন্দ্রের পিতা গৌরসুন্দরের কর্মস্থল ছিল ঢাকা। পিতার সঙ্গেই থাকতেন আনন্দচন্দ্র এবং সে কারণেই তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল ঢাকায় পড়াশোনা করা। শিক্ষারম্ভ হয়েছিল তাঁর পোগজ স্কুলে এবং পরে মাত্র উনিশ বছর বয়সে ওকালতি পাস করে আনন্দ চন্দ্র শুরু করেছিলেন ওকালতি। অচিরেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন ঢাকার একজন প্রভাবশালী আইনজীবী। বিত্ত অর্জনের পর কিনেছিলেন জমিদারি। ভোলায় ছিল আর্মেনী জমিদার লুকাসের জমিদারি। আনন্দচন্দ্র তা কিনে নিয়েছিলেন। ফলে সমাজে জমিদার ও প্রখ্যাত আইনজীবী হিসাবে হয়ে গিয়েছিলেন প্রতিষ্ঠিত। এরপর তাঁর প্রভাব আরো বিস্তৃত করেছিলেন সমাজসেবা (যেমন, পুরানো আদালতের বার লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা ও ঢাকেশ্বরী মন্দিরের ফটক নির্মাণ, বিভিন্ন ধরনের দান ও স্কুল স্থাপন) ও রাজনীতির মাধ্যমে এবং তাঁর রাজনীতির শুরু পৌর নির্বাচন দিয়ে। ১৮৮৪ সালে নির্বাচনে পাঁচ

নম্বর ওয়ার্ড থেকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছিলেন কমিশনার এবং তারপর চেয়ারম্যান।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়, সরকারি প্রস্তাবের বিরোধিতা করার জন্য আনন্দচন্দ্র রায় পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন 'জনসাধারণ সভা' বা 'পিপলস এসোসিয়েশন'। সংগঠনটি সাংগঠনিক রূপ লাভ করেছিল ১৮৮২ সালে। পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছিল তা আবার ১৯০১ সালে। এ অঞ্চলে, বিশেষ করে ঢাকায় সরকারবিরোধী জনমত সংগঠনের 'জনসাধারণ সভা' পালন করেছিল বিশেষ ভূমিকা। 'পূর্ববঙ্গ জমিদার সভা'রও তিনি ছিলেন একজন উৎসাহী সভ্য। এছাড়া বিভিন্ন সময় ছিলেন তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য, জগন্নাথ কলেজের অছি ও কার্যকরী কমিটির সদস্য এবং ঢাকার ১৯১২ সালে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি।

আনন্দচন্দ্র নিজ গ্রামে স্ত্রী আনন্দময়ীয় নামে স্থাপন করেছিলেন একটি স্কুল। খুব সম্ভব সেই স্কুলই পরে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল আর্মেনীটোলায় তাঁর বাসভবনে যা এখন আমাদের কাছে পরিচিত আনন্দময়ী স্কুল নামে।

আনন্দচন্দ্র রায়ের সঙ্গে যারা নির্বাচিত হয়েছিলেন তারা হলেন ভাইস চেয়ারম্যান খাজা আমিরুল্লাহ, কমিশনার রমাকান্ত নন্দী, ডা. কুম্বি, ডা. পি কে রায়, গোপীমোহন বসাক, ঈশ্বরচন্দ্র দাস এবং পূর্ণ চন্দ্র ভূঁইয়া।

পৌরসভা প্রতিষ্ঠার ১৩০ বছর পর ১৯৯৪ সালে অনুষ্ঠিত হলো প্রথম প্রত্যক্ষ সার্বজনীন ভোটে মেয়র ও কমিশনার নির্বাচন। সে পরিপ্রেক্ষিতে মোহাম্মদ হানিফ হলেন প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত প্রথম মেয়র।

পৌরসভার মুসলমান চেয়ারম্যান

ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির প্রথম নির্বাচিত মুসলমান চেয়ারম্যান ছিলেন খাজা আসগর। নবাব পরিবারের সদস্য ছিলেন তিনি। নবাব আবদুল গনি ছিলেন তাঁর শ্বশুর। ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষা-সামাজিক কর্মকাণ্ডে ছিলেন তিনি জড়িত।

খাজা আসগর ১৮৭৪ সালে ঢাকা মিউনিসিপালিটির কমিশনার মনোনীত হন। ১৮৭৯ সালে সরকার তাকে ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে মনোনীত করেন। ১৮৯১ সালে তিনি মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। তাঁর আগে যে দু'জন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন তাঁরা হলেন আনন্দচন্দ্র রায় (১৮৮৫-৮৮) ও ঈশ্বরচন্দ্র দাস (১৮৮৮-৯১)।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ হলে নবাব সলিমুল্লাহ ঢাকার নর্থব্রুক হলে এক সভা আহবান করেন এবং ঐ সভায় গঠিত হয় 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক মুসলমান সমিতি'। এই সমিতির উদ্যোগেই ১৯০৬ সালে শাহবাগে 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি'র প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। খাজা আসগর ছিলেন সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি। এক সময় তিনি ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্বও পালন করেছিলেন।

খাজা আসগর উর্দুতে একটি বই লিখেছিলেন। 'তারীখ-এ-আসাদী-এ আমেরিকা' বইটি ছিল যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা ইতিহাস সম্পর্কিত। অবসর সময়ে তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করতেন, বিনা পয়সায় ওষুধ দিতেন। ১৯০৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁর মৃত্যুতে 'ইস্টার্ন বেঙ্গল অ্যান্ড আসাম এরা' লিখেছিল—"He was a member of the Dacca Nawab's Family and became homeophatic practitioner. For many years, he distributed medicine gratis to poor people, many of whom he cured of their ailments. He was for a long period, a Municipal commissioner, and later was a member of our local legislative council. His funeral was very largely attended by persons of all religions denominations, by whom he was held in respect. This gentleman was a connecting link between the old school of Dacca Muhammadans and the Crescent school. He was kind-hearted and pleasant manners....There are but very few Muhammadan gentlemen left in Dacca. Whom we remember when we first came amongst them".

পি.এইচ.ডি.

শুধু ঢাকায় নয়, ইউরোপে ভারতীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম পি.এই. চডি. ডিগ্রি লাভ করেছিলেন নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

১৮৫২ সালে ঢাকার পশ্চিমপাড়ায় জন্ম নিশিকান্তর। পিতার নাম কাশীকান্ত চট্টোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন ঢাকার একজন উকিল, রক্ষণশীল হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতা। তাঁর তিন পুত্রের মধ্যে প্রথম দু'জন ব্রাহ্ম ধর্মের সংস্পর্শে এসেছিলেন। এদের মধ্যে নবকান্ত ছিলেন বিখ্যাত। নবকান্তকে তাঁর পিতা ত্যাজ্যপুত্র করেছিলেন। কনিষ্ঠ ছিলেন নিশিকান্ত।

একুশ বছর বয়সে তিনি ইউরোপ চলে যান উচ্চ শিক্ষার্থে। ১৮৭৩ সালে তিনি ভর্তি হন লাইপজিগ বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে জার্মান, সংস্কৃত, ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস ইত্যাদি অধ্যয়ন করেন। তারপর জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন।

নিশিকান্ত এরপর চলে যান রাশিয়ায়। সেখানে দু'বছর সেন্ট পিটার্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ভাষাসমূহের অধ্যাপক ছিলেন। ১৮৮৩ সালে তিনি ফিরে আসেন দেশে।

ইউরোপে ভারতীয় অধ্যাপকদের মধ্যেও তিনি প্রথম।

নিশিকান্ত পি.এইচ.ডি ডিগ্রির জন্য যে অভিসন্দর্ভ রচনা করেছিলেন তার শিরোনাম ছিল—The Yatras or The Popular Dramas of Bengal। ১৮৮২ সালে লন্ডন থেকে 'ট্রুবনার অ্যান্ড কোং' অভিসন্দর্ভটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছিল।

নিশিকান্ত বইটি উৎসর্গ করেছিলেন তাঁব বোন সাবদা সুন্দরী দেবীকে। উৎসর্গপত্রে লিখেছিলেন "To My Dearly beloved sister, Srimati Sarada Sundari Devi, these pages, containing some of the earliest recollections of my boyhood, passed under loving eyes, are dedicated with the tenderest regards of her affectionate brother"

দেশে ফেরার পর তিনি অধ্যাপনা করেন হায়দ্রাবাদ, মজঃফরপুর ও মহীশুর কলেজে। শেষ জীবনে গ্রহণ করেছিলেন ইসলাম ধর্ম। তবে বাকি জীবন অতিবাহিত করতে হয়েছিল দারিদ্র্যে। অথচ ১৮৬৯ সালে তাঁর পিতা যখন তাঁর বড় ভাই নবকান্তকে ত্যাজ্যপুত্র করেন তখন নিশিকান্ত লিখেছিলেন নবকান্তকে – I am a rich Zemindar, living in a two storied building which I can call my own : You are a poor houseless wanderer seeking a place to lie on denied by the world even a home, we had been born of the same parents : loved and petted equally you rather more why then wander houseless and live in grand building...

ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে নিশিকান্তর আত্মীয়তা সম্পর্ক হয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন তাঁর জামাতা।

নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় পরলোকগমন করেন ১৯১০ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি।

সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জী

বাংলা বই

আদিনাথ সেন, স্বর্গীয় দীননাথ সেনের জীবনী ও তৎকালীন পূর্ববঙ্গ, কলকাতা, ১৯৪৮।

কেদারনাথ মজুমদার, ঢাকার বিবরণ, ঢাকা, ১৯১০।

কেদারনাথ মজুমদার, বাংলা সাময়িক সাহিত্য, ময়মনসিংহ, ১৯১৭।

নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়, ঢাকা।

নাজিব হোসেন, কিংবদন্তীর ঢাকা, ঢাকা, ১৯৭৬।

বুদ্ধদেব বসু, আমার ছেলেবেলা, কলকাতা, ১৯৭৩।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোবিন্দচন্দ্র রায়, দীনেশচরণ বসু, কলকাতা, ১৩৬২।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, হরিচন্দ্র মিত্র, কলকাতা, ১৯৬৫।

ভবতোষ দত্ত, আট দশক, কলকাতা, ১৯৮৮।

মুনতাসীর মামুন, উনিশ শতকে ঢাকার থিয়েটার, ঢাকা, ১৯৭৯।

মুনতাসীর মামুন, উনিশ শতকে বাংলাদেশের সভাসমিতি, ঢাকা ১৯৮৪।

মুনতাসীর মামুন, উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র, ১ম খণ্ড, ঢাকা, ১৯৮৫, এবং দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা, ১৯৮৭।

যতীন্দ্র মোহন রায়, ঢাকার ইতিহাস, ঢাকা, ১৩১৯।

রতন লাল চক্রবর্তী, বাংলাদেশের মন্দির, ঢাকা।

রমেশচন্দ্র মজুমদার, জীবনের স্মৃতি দীপে, কলকাতা, ১৯৭৮।

রা, সে, আত্মজীবনী, ঢাকা, ১৮৬৮।

ইংরেজি বই

Ahmed, Sharifuddin, *Dacca,* London, 1986.

Annual Report of the college of Hadji Mohammad Moshin with its Subordinate schools; and of the colleges of Dacca and Kishnaghor for 1847, 48, Calcutta, 1849.

Clay. A. L., *Principal Heads of the History and Statistics of Dacca Division,* Calcutta, 1868.

Dani. A. H. Dacca, Dacca 1957.

D'oyly, Charles, Antiquities of Dacca, London, 1824.

Haider, Azimusshan (ed), *A City and its Civic body--A Souvenir to mark the centenary of Dacca Municipality,* Dacca, 1966.

Hasan. Syed Mahmudul, *Dacca, The City of Mosques,* Dacca, 1981.

Majumdar. H. *The Reminiscence of Dacca,* Calcutta. 1926

Proceeding of the Lieutenant Governor of Bengal, Judicial Dept 1869. 1871. 72. 79

Scriptural Riddles in Bengali, Rendered in to English Verse, with English Notes and c., Dacca. 1849

Symes Scutt. G P *The Hisory of the Bank of Bengal*. Calcutta. 1904

The First Report of the East Bengal Missionary Society MDCCXL with an Appendix etc. Dacca. 1849

Taylor, James, *Sketch of the Topography and Statistics of Dacca*, Culcutta, 1840.

Taifoor, S.M. *Glimpses of Old Dacca*, Dhaka, 1956

ইংরেজি প্রবন্ধ

Ali, S. M. 'Education and culture in Dacca during the last Hundred years', Muhammad Enamul Haq (ed), *Muhammad Shahidullah Felicitation volume*, Dacca, 1966.

Moulik, Anath Bandhu. 'Reminiscences of the old Jagannath College'. History of Jagannath College and *Jagannath Hall Remunion* Dacca. 1936.

Shaw. G.W. 'Printing and Publishing in Dhaka, in Sharifuddin Ahmed, (ed), *Dhaka, Past, Present, Future*, Dhaka, 1993

বাংলা প্রবন্ধ

মুনতাসীর মামুন, *'ঢাকার আদি মুদ্রণ, ঢাকার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের উপাদান'*, ঢাকা, ১৯৯১।

মু. হাবীবুর রশীদ, *'প্রথম আশি বছরের ইতিহাস, ঢাকা কলেজ'*, দৈনিক বাংলা, ১৫-১-১৯৮৭।

মোঃ শামসুল হক, *'জপমালা রাণীর গীর্জা, তেজগাঁও, একটি পর্যালোচনা'*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, অক্টোবর, ১৯৮৬।

মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, *'সাময়িকপত্রের সেকালের ঢাকা'*, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ঢাকা ১৯৭০।

মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, *'উনিশ শতকে প্রকাশিত ঢাকার সাময়িকপত্র'*, ভাষা সাহিত্যপত্র, ৫ম সংখ্যা, ১৩৮৪।

মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, *'সেকালের ঢাকা': মুদ্রণ ও প্রকাশনা'*, বক্তব্য। ২, ১৩৮৪।

রফিকুল ইসলাম, *'মিটফোর্ড হাসপাতাল তথা স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ সম্পর্কে কিছু ঐতিহাসিক তথ্য'*, শেকড় সন্ধান, ১৩৯১।

শিশির কুমার বসাক, *'ঢাকা নাট্যশালার আদি ইতিহাস'*, দৈনিক আজাদ, ১৯৬৪।

সত্যেন সেন, *'সদরঘাটের বাকল্যান্ড বাঁধ'*। শহরের কথা, ঢাকা, ১৯৭৪।

সৈয়দ মুর্তাজা আলী, *'উনবিংশ শতাব্দীতে ঢাকায় নাট্য আন্দোলন'*, সাহিত্য পত্রিকা, ১৩৮০।

পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য, *'ঢাকা প্রকাশ'* জীবন কথা, ঢাকা প্রকাশ, ৭০ ভাগ, ১ম সংখ্যা।

বাংলা ইংরেজি সাময়িকপত্র

ঢাকা প্রকাশ

ঢাকা রিভিউ ও সম্মেলন

Dacca News

Bengal Times

ঢাকা : ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ
দলিলপত্র
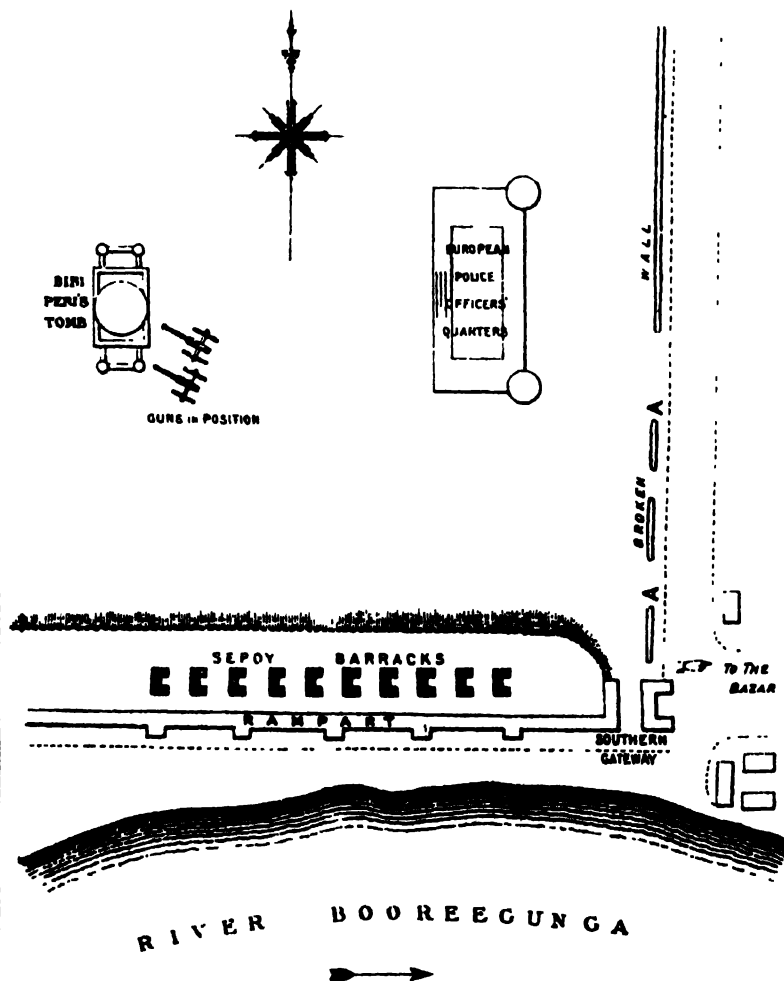
১৮৫৭ সালে লালবাগ দুর্গে সংঘটিত যুদ্ধের স্কেচ প্ল্যান। সিভিলিয়ান ক্লে-র আঁকা ১৮৯৬

ভূমিকা

বিদ্রোহ এবং বিপ্লবে পার্থক্য আছে। বিপ্লবের অর্থ শুধু শাসকের পরিবর্তনই নয়, সরকার ব্যবস্থা, সমাজ, অর্থনীতি সর্বক্ষেত্রে সামগ্রিক পরিবর্তনই বিপ্লব।[১] অন্যদিকে, কোন সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মানে এ নয় যে সামগ্রিক সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন। বিদ্রোহ শুধুমাত্র শাসক পরিবর্তনের জন্যেও হতে পারে। এ পরিপ্রেক্ষিতে, ১৮৫৭ সালে, ভারতীয় সিপাহিরা ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ করেছিল তাকে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ হিসেবে আখ্যায়িত করবো।

১৮৫৭ সালের ২৯ মার্চ, কলকাতার কাছে ব্যারাকপুরে মঙ্গলপান্ডে নামে এক ভারতীয় সৈনিক কর্তৃক জনৈক ইংরেজ অফিসারকে হত্যা প্রচেষ্টার মাধ্যমে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের সূত্রপাত। কিন্তু প্রবল ও ব্যাপক আকারে প্রথম তা ছড়িয়ে পড়েছিল মিরাটে ১০ মে এবং এরপর ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষ করে উত্তর ভারতে। পূর্ববঙ্গ বিদ্রোহের মূল কেন্দ্র থেকে এক প্রান্তে অবস্থিত হলেও এর রেশ পৌঁছেছিল এখানে। ১৮৫৭ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর দিল্লির পতন ও সম্রাট বাহাদুর শাহর গ্রেফতারের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহের মোটামুটি সমাপ্তি হয়েছিল, যদিও বিভিন্ন অঞ্চলে, আঞ্চলিক নেতারা তখনও যুদ্ধ করে চলেছিলেন। ১৮৫৮ সালের ৮ জুলাই লর্ড ক্যানিং আনুষ্ঠানিকভাবে বিদ্রোহের সমাপ্তি ও শান্তির সূচনার কথা ঘোষণা করেছিলেন এবং ঐ বছরই ব্রিটিশ সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন।

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের প্রকৃতি নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। তবে বিদ্রোহের কারণগুলি সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা মোটামুটিভাবে একমত পোষণ করেন। তাৎক্ষণিকভাবে, সামরিক বাহিনীতে বিদ্রোহ শুরু হলেও পরে তা আর সামরিক বাহিনীতে সীমাবদ্ধ থাকেনি। আর্থ-সামাজিক কারণগুলি তখন বড় হয়ে উঠেছিল। সুতরাং ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহকে 'বিদ্রোহ' হিসেবে আখ্যায়িত করলেও এর ভেতরের সামাজিক আন্দোলনের উপাদানগুলি তুচ্ছ করার মতো নয়।

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ নিয়ে বিভিন্ন সব মতামত প্রকাশিত হয়েছে। এসব মতামতকে এখানে কয়েক ভাগে ভাগ করে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো—

ক. উনিশ শতকে ইংরেজ ঐতিহাসিক যেমন, কে (এ হিস্ট্রি অব দি সিপয় ওয়ার ইন ইন্ডিয়া, ১৮৬৪), ম্যালেসন (হিস্ট্রি অব দি ইন্ডিয়ান মিউটিনি, ১৮৭৮, দ্বিতীয় সংস্করণ), রাইস হোম্‌স (এ হিস্ট্রি অব দি ইন্ডিয়ান মিউটিনি ১৮৮৩) প্রমুখ

১৮৫৭-এর বিদ্রোহ সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এ তত্ত্বই অস্বীকার করতে চেয়েছিলেন যে, ব্রিটিশ কুশাসনই এ বিদ্রোহের কারণ। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই তারা যুদ্ধের সামরিক প্রকৃতির ওপর গুরুত্ব আবোপ করেছিলেন বেশি।[২]

খ. জাতীয়তাবাদের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় ঐতিহাসিকরা বিদ্রোহকে চিহ্নিত করেছিলেন ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধ হিসেবে। ১৮৫৭-এর বিদ্রোহী নেতারা পরিণত হয়েছিলেন জাতীয় বীরে। বিদ্রোহের প্রধান কারণ হিসেবে তাঁরা নির্ধারণ করলেন বিদেশী শক্তির নিপীড়নকে। এ মতবাদ প্রথম উপস্থাপিত করেছিলেন সাভারকার ১৯০৯ সালে তাঁর 'দি ইন্ডিয়ান ওয়ার অব ইন্ডিপেন্ডেন্স' নামক গ্রন্থে[৩]। রাজনীতিবিদ, যেমন, আবুল কালাম আজাদ, অশোকমেহতা বা ভূপতি মজুমদার প্রমুখ উপরোক্ত মতবাদ সমর্থন করেছেন।[৪]

১৯৫৭ সালে বিদ্রোহের শতবার্ষিকী উপলক্ষে ভারতে বেশ কিছু পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল। এর মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ সেন, রমেশচন্দ্র মজুমদার এবং পিসি যোশীর (সম্পাদিত) গ্রন্থ তিনটি উল্লেখযোগ্য।[৫] ঐ গ্রন্থ তিনটিতে আমরা আবার তিন ধরনের মত পাই।

গ. ভারত সরকারের অনুরোধে সেন তাঁর গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। তাঁর মতে, বিরাট জাতীয় অভ্যুত্থান হিসেবে এ বিদ্রোহকে চিহ্নিত করা যায় না। তবে তিনি এটাও স্বীকার করেছেন যে, প্রাথমিকভাবে সামরিক বিদ্রোহ হিসেবে শুরু হলেও অন্তিমে তা আর সামরিক বাহিনীতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি।[৬]

ঘ. রমেশচন্দ্র মজুমদারের অবস্থান একেবারে বিপরীত মেরুতে। তাঁর মতে, এটি স্বাধীনতার জন্যে জাতীয় যুদ্ধ ছিল না। বিদ্রোহের নেতাদের পূর্ব পরিকল্পিত কোন পরিকল্পনাও ছিল না এবং তখন ছিল না কোন রকম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি।[৭] শশীভূষণ চৌধুরী তাঁর দু'টি গ্রন্থেই এ মতবাদ খণ্ডন করে বলেছেন, ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে সামরিক ও বেসামরিক ঐক্য স্থাপিত হয়েছিল এবং জনগণ সচেতনভাবে তা সমর্থন করেছিলেন।[৮]

ঙ. মার্কসবাদী ঐতিহাসিকদের মত, জাতীয়তাবাদীদের মতামতের কাছাকাছি। কার্ল মার্কস প্রথম এই অভুত্থানকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। তবে মার্কবাসীদের মতে, এটি ছিল কৃষকদের জাতীয় অভ্যুত্থান[৯] এবং সাম্রাজ্যবাদ শাসক ও ঐতিহাসিকদের সুপরিকল্পিত প্রচারের ফলে, 'সিপাহি বিদ্রোহ' নামেই ভারতীয় মহাবিদ্রোহ আমাদের কাছে পরিচিত।[১০]

মার্কসবাদী ঐতিহাসিক ব্যতীত, বাকি সবার মতামতের সার সংক্ষেপে করেছেন মেটকাফ এভাবে—'It was something more than a Sepoy mutiny. but something less than a national revolt[১১].

বিদ্রোহের প্রকৃতি সম্পর্কে সেন এবং মজুমদার, মোটামুটি একই কথা বলেছেন। তাঁদের মতে, বিদ্রোহ সফল হলে, ইংরেজ আমলে সর্বক্ষেত্রে যেমন উন্নতি হচ্ছিল তা বন্ধ হয়ে যেত। এক কথায়, এর চরিত্র ছিল সামন্ততান্ত্রিক। সুশোভন সরকার এ মত

খণ্ডন করে দেখিয়েছেন, সেন ও মজুমদারের বক্তব্যে পরস্পর বিরোধিতা আছে। একদিকে তাঁরা যেমন বলছেন বিদ্রোহের চরিত্র ছিল সামন্ততান্ত্রিকতা অপর দিকে বলেছেন, এ বিদ্রোহ ছিল অসংগঠিত ও স্বতঃস্ফূর্ত। সুতরাং তাঁদের বক্তব্য তাঁরাই নস্যাৎ করে দিয়েছেন। এছাড়া প্রমাণিত হয়েছে, অধিকাংশ জমিদার বা রাজ-রাজড়ারা ছিলেন ঔপনিবেশিক সরকারের পক্ষে।[১১]

উপরোল্লিখিত মতামত বিশ্লেষণ করে বলতে পারি যে, সর্বভারতীয় পরিসরে বিচার করলে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ ছিল প্রথম জাতীয় অভ্যুত্থান। এটিই ছিল ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ যা আঞ্চলিক সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এর জন্যে নিঃসন্দেহে দায়ী ছিল ইংরেজদের লুণ্ঠন, অত্যাচার, শোষণ।

বলা যেতে পারে, ভারতীয় সিপাহিদের নির্দিষ্ট কিছু কারণ ছিল, কিন্তু এস. গোপালের ভাষায় প্রায় ক্ষেত্রেই ছিল সে সিপাহির পোষক পরা একজন কৃষক। যে গ্রাম থেকে সে এসেছিল, নিশ্চয় সে গ্রামের অবস্থা তার ওপর সৃষ্টি করেছিল প্রতিক্রিয়ার।[১৩] এ বিদ্রোহের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ, কৃষকের স্বার্থ ও ক্রোধ উৎসারিত হয়েছিল।

তবে, সমগ্র ভারতে, বিভিন্ন অঞ্চলে সমাজ গঠনে বিভিন্নতার দরুন, বিদ্রোহের পরিসর, আয়তন, কেন্দ্রবিন্দু হয়েছিল বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকম এবং তাই আমরা দেখি, পরবর্তী পর্যায়ে সামগ্রিকভাবে ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে, এ বিদ্রোহের প্রভাব বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল। যেমন, পূর্ববঙ্গ ছিল বিদ্রোহের কেন্দ্র থেকে অনেক দূরে এবং এখানকার মানুষ এ বিদ্রোহে তেমনভাবে সাড়া দেয়নি। কিন্তু পরে, কৃষক বিদ্রোহের সময় লক্ষ্য করা যায়, এ বিদ্রোহ কৃষকদের মনে প্রভাব বিস্তার করেছিল।

২

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ নিয়ে এ পর্যন্ত অনেক গ্রন্থ, প্রবন্ধ রচিত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। বিদ্রোহের মূল কেন্দ্র থেকে বাংলা, আরো নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে পূর্ববঙ্গ বা বাংলাদেশ ছিল অনেক দূরে। বিদ্রোহের রেশ এখানে পৌঁছার কথা নয়, তবুও পৌঁছেছিলো। এতে বোঝা যায় ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ এক ধরনের সর্বভারতীয় রূপ পেয়েছিলো।

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ ও বাংলাদেশ সম্পর্কিত গ্রন্থ/প্রবন্ধের সংখ্যা তাই নিতান্ত কম। তা ছাড়া সমসাময়িক নথিপত্রের অভাবও একটি বড় কারণ। এসব লক্ষ্য করে অধ্যাপক রতনলাল চক্রবর্তী রচনা করেন—'সিপাহী যুদ্ধ ও বাংলাদেশ'। ১৯৮৪ সালে, বাংলা একাডেমী গ্রন্থটি প্রকাশ করে। বাংলাদেশ ও ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ নিয়ে এটিই প্রথম গ্রন্থ। বিভিন্ন রেকর্ড রুম খুঁজে আহরিত তথ্যাদির ভিত্তিতে তিনি গ্রন্থটি রচনা করেন। এ বিষয়ে আর কোন গ্রন্থ রচনার সুযোগ আছে বলে মনে হয় না।

ঢাকা শহরের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমি দীর্ঘ দিন ধরে কাজ করার চেষ্টা করছি। এ পরিপ্রেক্ষিতেই প্রায় একযুগ আগে ১৮৫৭-এর বিদ্রোহ ও ঢাকা শহর নিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম যার ভিত্তি ছিল ব্রেনান্ডের রোজনামচা ও হৃদয়নাথ মজুমদারের স্মৃতিচারণ। পরবর্তীকালে এ প্রবন্ধটি মার্জনা করতে গিয়ে নতুন কিছু সূত্র ব্যবহার করি যার মধ্যে 'ঢাকা নিউজ' অন্যতম। সম্প্রতি এ বিষয়ে কাগজপত্র ঘাঁটতে গিয়ে মনে হলো, অধ্যাপক চক্রবর্তীর বইটি থাকা সত্ত্বেও এ বিষয়ে অন্য ধরনের একটি গ্রন্থ প্রকাশ করা যেতে পারে। এ পরিপ্রেক্ষিতেই সংকলিত হলো 'ঢাকা : ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ'। অধ্যাপক চক্রবর্তীর বইয়ের বিষয় সারা বাংলাদেশ (বর্তমান) এবং যেখানে বিদ্রোহের পটভূমি থেকে অন্যান্য বিষয় সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। অন্যদিকে, বর্তমান সংকলনের পরিসর শুধুমাত্র ঢাকা শহর এবং এ শহর ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের প্রতিক্রিয়া মাত্র।

এ গ্রন্থের দুটি পর্ব। প্রথম পর্বে বিভিন্ন নথিপত্রের সাহায্যে ঢাকায় সংঘটিত ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের একটি রূপরেখা নির্মাণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্বে এ সম্পর্কিত যাবতীয় উপাদান সংকলিত হয়েছে যা ভবিষ্যৎ গবেষকদের হয়তো কাজে লাগতে পারে।

সংকলিত উপাদানের মধ্যে একেবারে নতুন হলো—'ঢাকা নিউজ'। অধ্যাপক চক্রবর্তী এবং আমি আগে বিক্ষিপ্তভাবে 'ঢাকা নিউজ' ব্যবহার করেছি। ঐ সময়, 'ঢাকা নিউজ'ই একমাত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা যা ঢাকা থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে। ঐ পত্রিকার প্রায় প্রতিটি সংখ্যায় বিদ্রোহ সম্বন্ধে কোন না কোন খবর থাকতো। এখানে 'ঢাকা নিউজ' থেকে যেসব নিবন্ধ/সংবাদ সংকলিত হয়েছে তার অনেকগুলিই হয়তো আগে কেউ দেখেননি।

'ঢাকা নিউজ' শুধু ঢাকার প্রথম সংবাদপত্রই নয়, পূর্ববঙ্গের ইংরেজি সাপ্তাহিকও বটে। ১৮৫৬ সালের এপ্রিল মাসে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিলো আলেকজান্ডার ফর্বেসের মালিকানা ও সম্পাদনায়। ফর্বেস ঐ সময় ঢাকার ইংরেজ মহলে বেশ প্রভাবশালী ছিলেন। মূলত নীলকর ও জমিদারদের স্বার্থ রক্ষার্থে ফর্বেস পত্রিকাটি প্রকাশ করেছিলেন। দেশীয়দের তিনি দেখতেন কৃপার চোখে।

ফর্বেস অবশ্য ১৮৫৮ সালেই পত্রিকার মালিকানা হস্তান্তর করে কলকাতা চলে যান। তারপরও 'ঢাকা নিউজ' প্রকাশিত হয়েছিলো ১৮৬৯ পর্যন্ত। বর্তমানে, এ পত্রিকার মাত্র দু'বছরে ফাইল (১৩৪টি সংখ্যা) রক্ষিত আছে ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে। সে সংগ্রহ থেকেই এখানে ১৮৫৭ সাল সম্পর্কিত উপাদানসমূহ সংগৃহীত হয়েছে।

'ঢাকা নিউজ' প্রায় এক বছর ধরে বিদ্রোহ সম্পর্কে পাঠকদের অবহিত করেছে। এ পত্রিকা অবলম্বন করে অগ্রসর হলে আমরা যে চিত্রটি পাই তা হলো, সিপাহিরা উত্তর ভারতের ঘটনাবলী সম্পর্কে জানতো এবং তারা আসন্ন বিদ্রোহের জন্য নিজেদের সংগঠিত করছিলো। শহরবাসীরা সিপাহিদের চালচলনে আতংকিত হয়ে উঠেছিলো এবং নানা কারণে সিপাহিদের সঙ্গে ছোটখাটো সংঘর্ষ হচ্ছিলো। শহরে ইংরেজদের পরিচালিত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, সিপাহিদের আক্রমণাত্মক মনোভাবের পরিচয় পেয়ে,

লালবাগ দুর্গ আক্রমণ করে হটিয়ে দিয়েছিলো সিপাহিদের এবং দোষীদের দিয়েছিলো শাস্তি। কিন্তু 'ঢাকা নিউজ'-এর সংবাদ নিবন্ধ ব্যবহার করার সময় আমাদের একটি বিষয় মনে রাখতে হবে, তা হলো পত্রিকাটি ছিল ইংরেজ এলিট, ব্যবসায়ী, জমিদারদের মুখপত্র। দেশীয়দের তারা মনে করতো অধস্তন এবং ইংরেজ শাসনকে তারা মনে করতো অমোঘ। ঘটনাবলী আমরা হয়তো সঠিক বলে ধরে নিতে পারি কিন্তু বিদ্রোহ সম্পর্কে তাদের বিভিন্ন মন্তব্য রচনা আমাদের ঐ দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার করতে হবে।

লন্ডন থেকে ১৮৭৭ সালে দু'খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিলো চার্লস র‍্যাথবোন ল'য়ের 'হিস্ট্রি দি ইন্ডিয়ান নেভি, ১৬১৩-১৮৬৩।' এ গ্রন্থ থেকেও বিক্ষিপ্তভাবে আগে উপাদান ব্যবহৃত হয়েছে। তাঁর গ্রন্থে, ঢাকার বিদ্রোহ 'দমনে' নৌ-বাহিনীর ভূমিকা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যা আর কোথাও হয়নি। তাঁর মতে, ব্রিটিশ নৌ-বাহিনীর থেকে এটি ছিল আলাদা। তাই এ নৌ-বাহিনীর সদস্যরা বিভিন্ন সময় বীরত্ব প্রদর্শন করলেও উপেক্ষিত হয়েছেন। তিনি ঢাকার বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে লে. লুইসের কথা বারবার উল্লেখ করেছেন যাকে কর্তৃপক্ষ উপেক্ষা করেছিলো। এ গ্রন্থে, কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবকের জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তাই, লয়ের গ্রন্থ থেকে শুধুমাত্র ঢাকা বিষয়ক বিবরণটুকু সংকলিত হলো।

অধ্যাপক রতনলাল চক্রবর্তী, তাঁর গ্রন্থের পরিশিষ্টে, ঢাকা জেলা জজকোর্টের রেকর্ড রুমে রক্ষিত বাংলা ফার্সি ও ইংরেজি দলিল বিশেষ করে বিচারকের রায়সমূহ সংকলন করেছেন যা বেশ মূল্যবান। বর্তমান গ্রন্থটিকে সংহত রূপ দেয়ার জন্য ঐ গ্রন্থের পরিশিষ্ট থেকে বিচারের রায়সমূহ সংকলিত হলো। সিপাহিদের বিচারের কার্যক্রম ও রায় প্রদান দেখলে বোঝা যায়, প্রায় বিনা কারণে আক্রোশবশত তাদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিলো। এ সমস্ত রায়, সিপাহিদের প্রতি ইংরেজ প্রশাসকদের প্রতিহিংসামূলক মনোভাবই তুলে ধরে।

১৮৫৭ সালে ব্রেনান্ড ছিলেন ঢাকা কলেজের গণিতের অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ। শিক্ষাব্রতী হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল, ছাত্রদের মধ্যে তিনি জনপ্রিয়ও ছিলেন। তবে, তৎকালীন ইংরেজদের মতো তিনিও দেশীয়দের অধস্তন ভাবতেন। ১৮৫৭-৫৮ সালে তিনি রোজনামচা লিখেছেন। এ রোজনামচায় তাঁর সেই মনোভঙ্গিই ফুটে উঠেছে।

ব্রেনান্ডের রোজনামচাটি সম্পূর্ণভাবে প্রথম সংকলিত হয় আর্থার ক্লে রচিত ও ১৮৬৮ সালে প্রকাশিত 'প্রিন্সিপাল হেডস অব দি হিস্ট্রি অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিকস অব ঢাকা ডিভিশন' গ্রন্থে। তারপর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, গ্রন্থে এটি সংকলিত হয়েছে। অধ্যাপক চক্রবর্তীর গ্রন্থের আগে ঢাকার বিদ্রোহ সম্পর্কে জানার এটি ছিল প্রধান উৎস। বর্তমান গ্রন্থে সেটি বাংলায় অনুবাদ করে সংকলিত করেছি।

এছাড়া হৃদয়নাথ মজুমদার, রেবতী মোহন প্রমুখের আত্মজীবনীতে, হ্যালিডের রিপোর্ট ও অন্যান্য সরকারি দলিলে নামেমাত্র এ বিদ্রোহের উল্লেখ আছে যা আলাদাভাবে সংকলনদের দাবি রাখে না। তবে, ১৮৫৭ সালের বিবরণ প্রস্তুতে আমি সেসব সূত্র ব্যবহার করেছি।

সূত্র

১. Walter Lacquer, 'Revolution', *International Encyclopaedia of Social Sciences*, Vol XIII-XIV London 1972 pp 501-507

২. Kalyan Kumar Sen Gupta, *Recent Writings on the Revolt of 1857 A Survey*, New Delhi. 1975. p. 8.

3. Thomas R. Metcalf, *The Aftermath of Revolt . India*, 1857-1870 , New Jersey. 1964. pp. 57-58.

৪. কল্যাণকুমার সেনগুপ্ত, *প্রাগুক্ত*, প. ৯

৫. Surendra Nath Sen, *Eighteen Fifty Seven*, New Delhi, 1957.
R. C Majumdar. *The Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857*. Calcutta. 1957.
P. C. Joshi (ed) *The Rebellion*. 1857. New Delhi, 1957

৬. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, সেনের *গ্রন্থ*।

৭. দেখুন রমেশচন্দ্রের *প্রাগুক্ত গ্রন্থ*।

৮. S. B Chowdhury, *Civil Rebellion in the Indian Mutinies*, Calcutta, 1957 এবং *Theories of the Indian Mutiny*, Calcutta, 1965. এ ছাড়া দেখুন, লেখকের অপর আরেকটি গ্রন্থ, *English Historical Writing on the Indian Mutiny 1857-59*, Calcutta, 1971.

৯. জি. সি, যোশী সম্পাদিত *গ্রন্থ* দেখুন।

১০. সুকুমার মিত্র, ১৮৫৭ ও বাংলাদেশ, কলকাতা. ১৯৬০, পৃ. ১।

১১. মেটকাফ, *প্রাগুক্ত গ্রন্থ*, পৃ. ১১।

১২. Susobhan Sarkar, 'View on 1857', *On the Bengal Renaissance*, Calcutta, 1979. p. 116. প্রমোদ সেনগুপ্ত লিখেছেন, ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ ছিল 'প্রথম জাতীয় গণঅভ্যুত্থান' এবং অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ দত্তের ভাষায়, 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম অপক্ব অভিব্যক্তি'। দেখুন প্রমোদ সেনগুপ্ত, *ভারতীয় মহাবিদ্রোহ*; কলকাতা, ১৮৫৭, পৃ. ১। লর্ড ক্যানিঙ লিখেছিলেন,... 'যে সংগ্রামের মুখোমুখি আমরা হয়েছিলাম তাকে আঞ্চলিক অভ্যুত্থান না বলে জাতীয় অভ্যুত্থান বলাই শ্রেয়।' উদ্ধৃত, S. Gopal, *British Policy in India 1858-1905*, Cambridge. 1965. p. 1.

১৩. ঐ

ঢাকা : ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ

১৮৫৭ সালের ২৯ মার্চ, ব্যারাকপুরে মঙ্গলপান্ডে নামে এক ভারতীয় সৈনিক কর্তৃক জনৈক ইংরেজ অফিসারকে হত্যার মাধ্যমে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের সূত্রপাত। কিন্তু প্রবল ও ব্যাপক আকারে প্রথম তা ছড়িয়ে পড়েছিল মিরাটে ১০ মে এবং এরপর ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষ করে উত্তর ভারতে। পূর্ববঙ্গ ছিল বিদ্রোহের কেন্দ্র থেকে অনেক দূরে কিন্তু এখানেও এর রেশ এসে পৌঁছেছিল।

মার্চ মাস থেকেই ঢাকাবাসীরা আশংকা করছিল সংঘর্ষের। মনে হয়, বিভিন্ন ছোটখাটো ঘটনা শহরের বাসিন্দাদের সঙ্গে সিপাহিদের মনোলিন্যের সৃষ্টি করেছিল এবং এসব ঘটনা ইন্ধন যোগাচ্ছিল উত্তেজনার। যেমন, মার্চ মাসের শেষের দিকে, এক ব্রাহ্মণ রুটিঅলাকে পেটানোর দায়ে জনৈক সিপাহিকে একশ রুপি জরিমানা ও অনাদায়ে ছ'মাসের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছিল।[১] আরেকটি খবরে জানা যায়, সেখানকার প্রহরীদের প্ররোচিত করার দায়ে ৩৪ নেটিভ ইনফেনট্রির দু'জন সিপাহিকে দেয়া হয়েছিল ১৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড।[২] 'সাহেব'দের মধ্যেও এক ধরনের ভয় ছড়িয়ে পড়েছিল এবং অনেকে সব কিছু ফেলে শহর ছাড়ার পরিকল্পনা করেছিলেন, কারণ, শোনা যাচ্ছিলো, ইউরোপীয় একটি রেজিমেন্ট রওয়ানা হয়েছে ঢাকার দিকে এবং সপ্তাহখানেকের মধ্যে পৌঁছে যাবে ঢাকা। তখন সিপাহিরা তাদের বাধা দেবে এবং ইচ্ছে মতো শহর লুট করবে।[৩]

এ ধারণা করে নিতে পারি যে, শহরের বাসিন্দা এবং সিপাহিরা দু'পক্ষই পরস্পরকে ভয় করছিলো। একটি ভাষ্যে জানা যায়, দেশী সিপাহিরা থাকতেন তখন লালবাগে এবং তারা পরিচিত ছিলেন 'কালা সিপাহি' নামে। ইংরেজ সিপাহিদের বলা হতো 'গোরা সিপাহি'। কালা সিপাহিরা ছিলেন শক্ত-সমর্থ, অমায়িক এবং এ জন্য শহরের মুসলমানদের মধ্যে তারা খুব জনপ্রিয় ছিলেন। প্রশ্ন উঠতে পারে, তারা কি তাহলে হিন্দু অধিবাসীদের মধ্যে জনপ্রিয় ছিলেন না? এখানে মনে রাখা দরকার উক্তিটি হৃদয়নাথ মজুমদার নামে এক হিন্দু ভদ্রলোকের যিনি তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মন্তব্যটি করেছিলেন যা ছিল কিনা কিছুটা সাম্প্রদায়িক। অবশ্য, তিনি একথা লেখেননি যে, মুসলমান অধিবাসী ছাড়া তারা অন্যদের কাছে ছিলেন অপ্রিয়।[৪]

মে মাসের মিরাটের বিদ্রোহের সংবাদ এসে পৌঁছেছিল ঢাকায়। এ সময়, বাজারে ধর্ম প্রচারকালে সিপাহিদের পক্ষ থেকে মিশনারিদের কিছুটা প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়েছিল।[৫] 'বাংলা বাজার ফিমেল স্কুল'ও এ সময় প্রায় ছাত্রীশূন্য হয়ে গিয়েছিল, কারণ

গুজব রটেছিলো যে, সিপাহিরা স্ত্রী শিক্ষা পছন্দ করেন না। মে মাসের শেষে এবং জুন মাসের শুরুতে ৭৩-এর দু'টি কোম্পানি জলপাইগুড়ি থেকে ঢাকা এসে পৌছেছিল বদলি হিসেবে। ১০ জন ইউরোপীয় বাহিনী ঢাকায় আসতে পারে শুনে সিপাহিরা বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন।[১]

১২ জুন, এ ধরনের একটি গুজব ইংরেজদের কি ভাবে আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলেছিলো তা নিচে উল্লেখ করছি।

ঐ দিন, দুপুর সাড়ে বারোটায়, মিলব্যারাক থেকে এক ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে ছুটে বেরিয়ে পড়েছিলেন। উত্তেজিতভাবে শহরের রাস্তায় ইংরেজ যাদের পেয়েছিলেন তাদের জানিয়েছিলেন, মে মাসের শুরুতে ৭৩ এবং দেশীয় পদাতিক বাহিনী যে দুটি কোম্পানি জলপাইগুড়ির পথে রওয়ানা হয়েছিল, মাঝপথে তারা ব্যারাকপুরে ছাঁটাই করা কিছু সিপাহির সঙ্গে একত্র হয়ে বিদ্রোহ করেছে এবং ঢাকায় ফিরে এসে লালবাগের সিপাহিদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। তারা বাজার লুট করেছে এবং মুক্তি দিয়েছে জেল বন্দিদের।

ম্যাজিস্ট্রেট মি. কিনসের বাসায় মিলিত হলেন বেশ কিছু ইউরোপিয়ান। নদীতে নৌকায় এসে আশ্রয় নিলেন কিছু মহিলা, সংগ্রহ করা হলো তথ্য। পুরো শহরে উত্তেজনা। বাঁধের উপর 'নেটিভ'রা জমায়েত হয়ে অবাক চোখে সব দেখছিলো।

এ আতংক তারপর ছড়ালো ম্যাজিস্ট্রেটের কাচারিতে যেখান থেকে আমাদের বীর পুলিশরা চিৎকার করে বেরিয়ে পড়লো। তারপর আতংক ছড়ালো কলেজে, ছাত্ররা ভয়ে পালালো সেখান থেকে। আতংক এরপর এলো কালেকটরিতে যেখানে তখন বসেছিলো এজলাস। হঠাৎ শোনা গেলো 'আসছে' 'আসছে'। 'কে আসছে' সে প্রশ্ন করার অবকাশ ছিল না কারো। বিচারক উঠে দাঁড়িয়ে বাজিয়েছিলেন বিপদ সংকেত। মুহূর্তে জনশূন্য হয়ে গেলো কাচারি।

অফিস-আদালত সব খালি। ব্যাপটিস্ট চার্চের উল্টোদিকের এক বাড়ির তিন তলায় 'ঢাকা নিউজ'-এর সম্পাদক কেম্প বসে ছিলেন রিভলবার হাতে। আর্মেনিয়ান বণিক সিরকোরও সাহস সঞ্চয় করে রয়ে গিয়েছিলেন সে ভবনে।

শহরের অবস্থাপন্ন বাসিন্দারা বসে ছিলেন ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে। তবে, বেশির ভাগ মানুষই ছোটাছুটি করছিলেন অকল্পনীয়ভাবে। এক গলি দিয়ে বেরিয়ে তারা ঢুকছিলেন আরেক গলিতে। মাটি খুঁড়ে অনেকে তাতে রাখছিলেন ধনসম্পদ। কিন্তু আশ্চর্য! দুষ্কৃতকারী বলে শহরে যারা খ্যাত ঐ সময়ে তারা কোন উৎপাত করেনি। কিন্তু, কিছুক্ষণের মধ্যেই হুহু করে বেড়ে গিয়েছিল জিনিসপত্রের দাম এবং সবাই মিলে কিনে নিয়েছিলেন খাদ্যদ্রব্যের শেষটুকু।

লে. ম্যাকমোহন ও রিড লালবাগের উদ্দেশে রওয়ানা হলেন যেখানে ছিল সিপাহিরা। ফিরে এসে তারা জানালেন, সিপাহিরা শান্ত এবং গুজব ভিত্তিহীন। বিকেলে নেটিভরা ইউরোপিয়ানদের ফিরে আসতে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন কারণ তারা শুনেছিলেন ভাগ্যের হাতে তাদের ছেড়ে দিয়ে ইউরোপিয়নরা পালিয়েছিলেন।[৮]

অবশ্য পরে দেখা গিয়েছিলো পুরো ব্যাপারটিই ভিত্তিহীন। কিন্তু. পরদিনই ইউরোপীয় বাসিন্দারা একটি কমিটি অব সেফটি গঠন করে কাগজে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছিলেন. শহরবাসী ভদ্রলোকরা যেন গুজবে কান না দেন এবং কোন গুজব শুনলে যেন ম্যাজিস্ট্রেট বা কমিটি সদস্যদেব জানান। তখন তারা এর সত্যতা যাচাই করবেন। বিজ্ঞপ্তিতে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আহ্বান জানিয়ে ঢাকার খ্রিস্টানদের বলা হয়েছিলো. বিপদে যেনো তারা পরস্পরকে রক্ষা করেন এবং এ জন্য তাদের প্রথম পদক্ষেপ হওয়া উচিত শহরের একটি বাড়ি ঠিক করা যেখানে বিপদের সময় সবাই মিলে আশ্রয় নেয়া যাবে। প্রস্তাব করা হয়েছিলো এই বলে যে, কমিশনারের বাড়ি-ই এ জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত।[৯]

জুন মাসের মাঝামাঝি একশ' নৌসেনা নিয়ে 'ক্যালকাটা' এসে ভিড়েছিলো ঢাকায়। তাদের সঙ্গে ছিল দুটি ১২ পাউন্ডের কামান।[১০] রতনলাল চক্রবর্তী সরকারি নথি উদ্ধৃত করে বলেছেন, দেড়শো নৌসেনা নিয়ে লে. লুইস. 'জেনোবিয়া' ও 'পাঞ্জাব'-এ করে ঢাকা পৌঁছেছিলেন।[১১] জাহাজের নামের গরমিল হতে পারে। সেনা সংস্থা কমবেশি হতে পারে [সরকারি তথ্যই সঠিক বলে মনে হয়], মূলকথা হলো, ঢাকার ইউরোপীয়দের রক্ষার জন্য নৌসেনা পাঠানো হয়েছিলো। লুইস সৈন্যদের নিয়ে আস্তানা গেড়েছিলেন ব্যাপটিস্ট চার্চের উল্টোদিকের এক বাড়িতে। কুমারটুলিতে এলিসির বাড়িটি মাসিক ৮০ টাকায় ভাড়া নেয়া হয়েছিলো সেনা হাসপাতালের জন্য। তবে ইংরেজরা এতো খুশি হয়েছিলো যে, তাদের মুখপত্র 'ঢাকা নিউজ' লিখেছিলো, গত এক সপ্তাহ ধরে জীবনাশংকায় তারা দিন কাটাচ্ছিল, এখন তা নিমিষে উবে গেছে।

'....খুশিতে, গত রোববার থেকে পিস্তল ও বন্দুকে যে গুলি ভরে রাখা হয়েছিলো তা ছুঁড়তে ইচ্ছে করেছিলো'।[১২]

তবে, যেদিন নৌ-সেনাদের জাহাজ ভিড়েছিলো সদরঘাটে সেদিন বেশ কয়েকজন যুবক নদীর অপর তীরে সিপাহিদের পোশাক পরে কিছু লোককে পিটিয়েছিলো। কেন? তার কারণ অবশ্য জানা যায়নি। ফলে, সে দিনেও ফের দেখা দিয়েছিলো উত্তেজনা। নিরাপদ আশ্রয় ভেবে অনেকে মূল্যবান জিনিসপত্র ফেলে দিয়েছিলেন কুয়োতে। নাজির ঐ যুবকদের গ্রেফতার করে তিন মাসের জন্য [মনে হয়] শ্রীঘরে পাঠিয়েছিলেন।[১৩]

২৮ জুন. দু'জন দলত্যাগীকে পুলিশ ধরেছিলো শহরতলি থেকে। কিন্তু, সিপাহিরা নাকি পুলিশের হাত থেকে তাদেরকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। পরে, দুটি কোম্পানিকেই প্যারেড করানো হয়েছিলো। কিন্তু, বরকন্দজরা দোষীকে চিহ্নিত করতে পারেনি বা ভয়েই করেনি। অন্যদিকে সিপাহিরা অভিযোগ জানিয়ে বলেছিলেন, পুলিশের জন্য তারা শহরে আসতে পারছেন না।[১৪]

এদিকে, লে. লুইস প্রতিদিন তাঁর সেনাদল নিয়ে র‍্যাকেট কোর্ট আর ঢাকা কলেজের সামনে মহড়া দিচ্ছিলেন। মাঝে মাঝে কালেকটরিতেও চলছিলো এই মহড়া। পাহারাদার সিপাহিরা ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন এতে এবং মন্তব্য করেছিলেন— 'ইয়ে কেয়া ডর দেখলাতা?' বোঝা যাচ্ছে নৌ সেনাদের উপস্থিতি পছন্দ করেনি তারা। জুলাইর দুই

তারিখে ঢাকা সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষ ডওয়েল লালবাগে কামান বসানোর জন্য স্ক্রুর খোঁজে পাঠিয়েছিলেন। সিপাহিরা এতে ধারণা করেছিলেন যে, তাদের বোধহয় নিরস্ত্র করা হবে।[১৫]

৩০ জুলাই, ঢাকায় বসবাসরত অধিকাংশ ইউরোপিযনদের (প্রায় ষাট জন) নিয়ে একটি সভা হয়েছিলো। উদ্দেশ্য ছিল, একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তোলা। সভায় ঠিক করা হয়েছিলো, দু'ধরনের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী হবে—পদাতিক এবং ঘোড়সওয়ার। মেজর স্মিথ এবং মি. হিচিন্স যথাক্রমে অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন পদাতিক এবং ঘোড়সওয়ার বাহিনীর।[১৬]

বকরি ঈদের তিনদিন (আগস্ট ১-৩) সারারাত স্বেচ্ছাসেবকরা টহল দিয়ে বেড়িয়েছিলো শহরে, কারণ, তারা ভেবেছিলো ঈদ উপলক্ষে হয়তো ঝামেলা হতে পারে। শুধু তাই নয়, ইউরোপীয়রা এত আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, আগস্টের দু'তারিখে গির্জায় যারা উপাসনা করতে গিয়েছিলেন কাল্পনিক হামলা থেকে তাদেরকে রক্ষার জন্য মোতায়েন করা হয়েছিলো স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী।[১৭]

পরের সপ্তাহে অনেক আর্মেনিয়ান শহর ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন কলকাতায়। ইউরোপীয়রা চিন্তা করছিলেন ফলির মিল দুর্গের মতো দুর্ভেদ্য করার। স্বেচ্ছাসেবকরা তখনও নিয়মিত ড্রিল করছিলো উদ্দীপ্ত হয়ে।

'নেটিভ'রা কিন্তু বুঝতে পারছিলো না 'সাহেব'রা কেন এতো উত্তেজিত বা 'ভলানটিয়ার কা পল্টন' [স্বেচ্ছাসেবক]রাও এতো কষ্ট করে কেন রাতে টহল দিচ্ছে।[১৮]

তবে, নৌসেনারা শহরে আস্তানা গাড়ার পর ইউরোপীয়দের মনোবল ফিরে এসেছিলো। সিপাহি বা যারা বিদ্রোহের আশংকা করছিলো, তাদের ভাষায়, সেসব 'বদমাশ'দের আশায় এখন গুড়ে বালি। নৌ-সেনারা আসার আগে যেসব পরিবার মফস্বল গিয়েছিলো তারা এসেছিলো ফিরে। পত্রিকা খানিকটা বিদ্রূপাত্মক সুরে লিখেছিলো, যারা আতংক সৃষ্টি করেছিলো তারা এখন এতো সাহসী হয়ে উঠেছে যে ঐ ধরনের আশংকার কথা কেউ প্রকাশ করলে তাকে ছুড়ে ফেলে দেবে।[১৯]

আগস্টের বার তারিখে, ঢাকার খ্রিস্টান অর্থাৎ ইংরেজদের তরফ থেকে আলেকজান্ডার ফর্বেস (যিনি ছিলেন আবার ঢাকা নিউজেরও সম্পাদক) কমিশনারের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেছিলেন, বিপদ হলে খ্রিস্টানরা যাতে ফলির মিলে আশ্রয় নিতে পারেন সেজন্য মিলটিকে সজ্জিত করা প্রয়োজন এবং এজন্য দরকার আর্থিক সাহায্য। ফর্বেস হুমকির সুরে জানিয়েছিলেন, ঝামেলা হলে খ্রিস্টানরা যদি শহর ত্যাগ করে তবে রাজস্বর অনেক ক্ষতি হবে। উত্তরে কমিশনার ডেভিডসন জানিয়েছিলেন, এ রকম কাজে অর্থ বরাদ্দ করার কোন ক্ষমতা তাঁর নেই।[২০]

শহরবাসী ইংরেজরা অবশ্য এতে দমে যাননি। নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে তারা ফলির মিল সংরক্ষিত করার কাজ চালিয়ে গিয়েছিলেন। দুশো লোককে নিয়োজিত করা.হয়েছিল এজন্য। তারা আশা করছিলেন, কাজ শেষ হলে সেখান থেকে পাঁচ-ছয় হাজার লোকের আক্রমণ ঠেকানো যাবে।[২১]

মহররম ছিল ২৯ আগস্ট। এদিনও শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় ঘোড়সওয়ার বাহিনী টহল দিয়েছিল সারারাত। তবে উৎসবের প্রধান কেন্দ্র হোসেনি দালানে ভিড় হয়নি অন্যান্য বারের মতো। অনেকের মতে, মুসলমানরা ভীত হয়ে পড়েছিলেন খানিকটা।[২২]

১৭ সেপ্টেম্বর একশ' নাবিক নিয়ে একটি স্টিমার আসাম যাওয়ার পথে থেমেছিল ঢাকায়। তাদের মধ্যে নাকি ঝোঁক দেখা গিয়েছিল বিদ্রোহের। ঢাকা ছেড়ে আর অগ্রসর হতে তারা অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট কারনাক ও লে. লুইস তাদের বাধ্য করেছিলেন নতি স্বীকারে। গুলিভরা বন্দুক ও বেয়নেট দেখিয়ে লুইস তাদের কাবু করেছিলেন। উত্তেজনা ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং তার বিস্ফোরণ ও সমাপ্তি ঘটেছিল ২১ থেকে ২৬ নভেম্বরের মধ্যে।[২৩]

ঢাকার যুদ্ধটি হয়েছিলো ২২ নভেম্বর ১৮৫৭ সালে। এ যুদ্ধের বর্ণনা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে, 'ঢাকা নিউজ'-এ, 'হিস্ট্রি অব দি ইন্ডিয়ান নেভি' এবং ব্রেনান্ডের রোজনামচায় ধরে নিতে পারি, প্রতিটি বর্ণনায় খানিকটা হলেও অতিরঞ্জন থাকা স্বাভাবিক। পুনরুক্তির কারণে, এখানে যুদ্ধের বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হলো না। সার-সংক্ষেপটি উল্লেখ করা হলো মাত্র।

২১ নভেম্বর, গোয়েন্দা সূত্রে চাটগাঁর সিপাহিদের বিদ্রোহের খবর ঢাকায় পৌঁছলে লে. লুইস সামরিক ও বেসামরিক লোকদের এক বৈঠক ডেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, ঢাকার দেশী সিপাহিদের নিরস্ত্র করা হবে।

২২ নভেম্বর সকাল পাঁচটায় জড়ো হতে বলা হয়েছিল স্বেচ্ছাসেবকদের (জায়গার নাম উল্লেখ করা হয়নি; তবে ঢাকা কলেজ হতে পারে)। ঠিক সময়ে কমিশনার, জজ, কিছু সিভিলিয়ান এবং কুড়ি জন স্বেচ্ছাসেবক মিলিত হয়েছিলেন। ভোরের আলো ফোটেনি তখনও।

লে. লুইস, লে. ইটিবিয়াস, লে. ডডওয়েল ও উইলিয়াম ম্যাকফারসন অগ্রসর হয়েছিলেন লালবাগের দিকে। একই সময়ে লে. রিড, ফরবেস, হ্যারিস, স্বেচ্ছাসেবী নলেন পোগজ, স্যামুয়েল রবিনসন ও জন জারকাস রওয়ানা হয়েছিলেন সরকারি কোষাগারের দিকে, প্রহরীদের নিরস্ত্র করার জন্য।

তোপখানায় তখন প্রহরা দিচ্ছিলেন পনের জন সিপাহি। তাদের অনেকেই ঘুমাচ্ছিলেন তখন। ঘুম থেকে তুলে যখন তাদের নিরস্ত্র করা হচ্ছিল তখনই শোনা গিয়েছিল লালবাগ থেকে গুলিগোলার শব্দ। ইংরেজ স্বেচ্ছাসেবীরা হঠাৎ এই গুলিগোলার আওয়াজে খানিকটা হতচকিত হয়ে গেলে, তোপখানার প্রহরীরা সে সুযোগে পালিয়েছিলেন।

নৌসেনারা লালবাগ পৌঁছে দেখেছিলেন সিপাহিরা প্রস্তুত। তারা বোধহয় আগেই খবর পেয়েছিলেন। প্রহরী গুলি ছুড়েছিলেন। ইংরেজ পক্ষে মারা গিয়েছিলেন একজন। অন্য সিপাহিরাও গুলি ছোড়া শুরু করেছিলেন। নৌসেনারা অগ্রসর হয়েছিলেন কেল্লার দক্ষিণ দিকের ভাঙা ফটক দিয়ে। এই ফটক রক্ষার জন্য দুর্গের ভেতর বিবি পরীর কবরের সামনে বসানো হয়েছিল কামান। নৌসেনারা ভেতরে প্রবেশ করামাত্র উড়ে

এসেছিল এক ঝাঁক গুলি। লে. লুইস সৈন্যদের নিয়ে বাঁ দিকে দুর্গপ্রাচীরের উপরে উঠে বেয়নেট চার্জ করে পিছু হটিয়েছিলেন সিপাহিদের। সিপাহিরা আশ্রয় নিয়েছিলেন নিজেদের আস্তানায় কিন্তু ইংরেজ সৈন্যরা সেখান থেকে খুঁচিয়ে বের করেছিলেন তাদের। এ সংঘর্ষে ইংরেজ পক্ষের নৌসেনাধ্যক্ষ আর্থার মেয়ো 'সাহসিকতার' জন্য পরে পেয়েছিলেন ভিক্টোরিয়া ক্রস। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, লালবাগের সংঘর্ষে নিহত হয়েছিলেন একচল্লিশ জন সিপাহি ও তিনজন ইংরেজ নৌসেনা। সংঘর্ষের পর সিপাহিরা কেল্লা ছেড়ে পালিয়েছিলেন জলপাইগুড়ির দিকে। পালিয়ে যাবার সময় নদীতে ডুবে মারা গিয়েছিলেন আরও তিনজন সিপাহি।

লালবাগের সংঘর্ষ সম্পর্কে হৃদয়নাথ মজুমদার যে বর্ণনা দিয়েছেন তা ইংরেজ ব্রেনান্ড থেকে একটু ভিন্ন এবং সত্য বোধহয় লুকিয়ে আছে এ দুয়ের মাঝে।

হৃদয়নাথ লিখেছেন, ব্যাটালিয়নের কাপ্তান একদিন আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর সুবাদারকে ডেকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, পেনশন নিয়ে তাদের চাকরি থেকে অবসর দিলে তারা তা মেনে নিতে রাজি আছে কি না। সুবাদার সময় চেয়েছিলেন তাঁর সঙ্গীদের সাথে পরামর্শ করার জন্য।

কিন্তু ঐ রাতেই (২২ নভেম্বর) ইংরেজরা আক্রমণ করেছিলেন লালবাগ দুর্গ। সিপাহিরা এ ধরনের কোন আক্রমণ আশা করেননি। নিরুদ্বেগে ঘুমিয়েছিলেন তারা। গুলিবর্ষণের শব্দে বিমূঢ় হয়ে গেলেও বিপদ দেখে ত্বরিত তৈরি করে নিয়েছিলেন নিজেদের। তাদের প্রত্যেকের কাছে ছিল দশ রাউন্ড গুলি এবং তাই দিয়ে প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন তারা। অস্ত্রাগারের চাবি ছিল সুবাদারের কাছে। সিপাহিরা তাঁকে অস্ত্রাগার খুলে দিতে অনুরোধ করলে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন তিনি। সুবাদারের স্ত্রীও প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন অনুরোধ জানিয়ে। সিপাহিরা এ পর্যায়ে সুবাদারকে হত্যা করে চাবি ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ইংরেজরা তখন প্রবল হয়ে উঠেছিলেন এবং অস্ত্রের অভাবে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছিল সিপাহিদের।

রেবতী মোহন দাস নামে, ঢাকাবাসী আরেকজনের আত্মজীবনী থেকে জানা যায়, ভোরে দুর্গ আক্রমণের সময় সিপাহিরা একেবারে তৈরি ছিলেন না। কারণ তখন তারা ব্যস্ত ছিলেন 'প্রাতঃকৃত্যাদি' সমাপনে।[১৪]

সম্প্রতি আরেকটি সূত্র থেকে নতুন কিছু তথ্য পেয়েছি। বংশানুক্রমিক শ্রুতির মারফত জানা গেছে এ তথ্য। সূত্রটি হলেন জাতীয় একতা পার্টির (বিলুপ্ত) সাধারণ সম্পাদক সরদার আবদুল হালিম (আমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করেছিলেন মকবুল এলাহী চৌধুরী)। সিপাহিদের সুবাদার ছিলেন সরদার আবদুল হালিমের দাদার বাবা। আবদুল হালিম এ সম্পর্কে জেনেছেন তাঁর দাদির কাছ থেকে। তবে এখানে একটি কথা উল্লেখ্য, রতন লাল চক্রবর্তী সিপাহিদের বিচার সম্পর্কিত যেসব দলিলপত্র উদ্ধার করেছেন সেখানে হালিম-উল্লিখিত সুবাদারের নাম নেই। হতে পারে, সরদার হালিম নামটি ভুল জেনেছিলেন।

সুবাদার শেষ পর্যন্ত হয়তো দোটানায় ভুগছিলেন যার ফলে অস্ত্রাগার খোলা সম্ভব

হয়নি এবং গোলাবারুদের অভাবে সিপাহিরা ইংরেজদের আক্রমণও প্রতিরোধ করতে পারেনি।

যুদ্ধ পৌনে এক ঘণ্টার মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। ইংরেজদের লিখিত বিবরণে গুরুত্ব সহকারে নৌ সেনাদের শৌর্য-বীর্যের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তবে সে বর্ণনা থেকে এও বোঝা যায়, সিপাহিরাও মরিয়া হয়ে লড়েছিলেন। যুদ্ধে ৪১ জন সিপাহি ও ৩ জন নৌসেনা নিহত হন। ৩ জন সিপাহি পালাবার সময় নদীতে ডুবে মারা যান, গ্রেফতার করা হয় তিনজনকে যাদের মধ্যে দু'জন ছিলেন আহত, নৌবাহিনীর আহতের সংখ্যা ছিল ১৮ জন। বাকিরা জামালপুর, ময়মনসিংহ হয়ে ব্রহ্মপুত্রের কাছে পৌঁছায় এবং তারপর ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে চলে যায় রংপুর।[২৫] পথিমধ্যে কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতদের খুব দ্রুত বিচার করা হয়। বলা যেতে পারে, তাদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়া হয়নি। তাদের বিচারকার্যের বিবরণ পড়লে এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সিপাহিদের বিচার হয়নি। মৃত্যুদণ্ড দেয়ার জন্য বিচারের প্রহসন করা হয়েছিলো মাত্র।

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে গ্রেফতারকৃত তিনজন সিপাহিকে ২৩ নভেম্বর জেলা জজের এজলাসে হাজির করা হয়। পরের দিন তাদের ফাঁসিতে ঝোলাবার হুকুম দেয়া হয়।

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সবার ফাঁসি দেয়া হয়েছিলো বর্তমান বাহাদুর শাহ পার্কে। তখন তা পরিচিত ছিল আণ্টাঘর ময়দান নামে।

প্রথম তিনজনকে যেদিন ফাঁসি দেয়া হয় সেদিন আণ্টাঘর ময়দান ও আশপাশের এলাকা ছিল জনাকীর্ণ। আহত দু'জনকে ফাঁসিকাষ্ঠে ওঠার ব্যাপারে সাহায্য করতে হয়েছিলো। বাকিজন নিজেই উঠে গিয়েছিলেন। মৃত্যুর আগে ম্যাজিস্ট্রেটকে তিনি অনুরোধ জানিয়েছিলেন তার চিতাভস্ম যেন নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হয়। ফাঁসি কার্যকর হওয়ার সময় সেই হিম সকালে জনতার মাঝ থেকে শোনা গিয়েছিলো চাপা আর্তনাদ। লো'য়ের বইয়ে এ বর্ণনাটি আছে বিস্তারিতভাবে—

"At the appointed hour, the ground being kept by the sailors and volunteers, the three sepoys were escorted under the ugly and grim-looking beam by a strong guard of Native police. A dense spectre like multitude, dressed in white, had assembled from the city, and occupied every point from which a view could be obtained of the drop. A dead silence prevailed among the vast multitude of people, who could be seen in every direction as for as the eye could reach. The magistrate read and explained to each of the three men their crimes and sentences, but they said nothing; the sharp cold of a chilly November morning made them dumb with terror. The two wounded men had to be assisted up the drop; the other, a Hindoo, went up the ladder unaided, and met his doom with much fortitude. He at the last moment prefered a request to the the magistrate that his body should not be buried, but be thrown into the river. He was told that his request was granted. When the bolt was drawn, and the three men were seen suspended in the air, a low long cotin-

ued moan arose from the hitherto silent multitude, which soon afterward dispensed as quietly as it had assembled. This was the last act of the meeting at Dacca. For seven long months the European inhabitants had been sleeping with revolver under their pillows and with their guns loaded by their bed sides, ready for immediate use. All care and anxiety were now removed."[২৬]

আরো পাঁচজনের ফাঁসির খবর পাওয়া যায় ঢাকা নিউজ থেকে।

"গত বৃহস্পতিবার সকালে, ঠিক সাতটার সময় চারজন বিদ্রোহী যাদের গ্রেফতার করা হয়েছিলো রোববার অপরাহ্ণে তাদের এবং জজ এবারকোম্বি যাদের মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিয়েছিলেন, তাদের ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছিলো গির্জার উল্টাদিকে ফাঁকা জায়গায় তৈরি ফাঁসিকাষ্ঠে। ফাঁসির মঞ্চের ডানদিকে ছিল স্বেচ্ছাসেবী, পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনী। তিনজন বিদ্রোহী নিজেরাই গলায় দড়ি ঝুলিয়ে মৃত্যুবরণ করলেন সাহসের সঙ্গে। চতুর্থজন ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন এবং তাকে শোনাবার জন্য দরকার হয়ে পড়েছিলো সাহায্যের। তাদের আহত বন্ধুদের হাসপাতাল থেকে নিয়ে আসা হয়েছিলো এ দৃশ্য দেখার জন্য। যারা ছিল বিশ্বস্ত তারাও ছিল সেখানে, পুরো ব্যাপারটি সম্পন্ন হয়েছে 'উইথ আই মাই ডিসেন্সি অ্যান্ড ইন কমপ্লিট সাইলেন্স।'"[২৭]

'আরেকজন সিপাহিকে মঙ্গলবার সকাল সোয়া সাতটায় গির্জার উল্টোদিকে ঝোলানো হলো, সবকিছু সম্পন্ন হয়েছে আগের মতোই সুন্দর এবং স্বাভাবিকভাবে।'[২৮]

সিপাহিদের বিচারের বর্ণনা দিয়েছেন ব্রেনান্ড খুব সাধারণভাবে যেন এটাই ছিল ভবিতব্য। যেমন, ৩০ নভেম্বরের রোজনামচায় তিনি লিখেছেন, 'তিনজন বিদ্রোহীকে ফাঁসি দেয়া হলো আজ সকালে। আগে দেয়া হয়েছিলো আটজনকে (সরকারি হিসেবমতে দশজনকে) আমরা মনে করি এ সময় এ ধরনের উদাহরণ সাধারণ মানুষের ওপর সৃষ্টি করবে চমৎকার প্রতিক্রিয়ার। এখন নেটিভরা যেমন ভদ্র, আগে মনে হয় না তাদের এমনটি দেখেছি।'[২৯]

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের সময়, পূর্ববঙ্গ থেকে বিদ্রোহের প্রধান ঘাঁটিগুলি ছিল দূরে কিন্তু তা সত্ত্বেও বিভিন্ন ঘটনা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ঢাকা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, বরিশাল বা যশোরের মতো শহরে পৌঁছেছিলো তার রেশ। কলকাতা বা ঢাকার মতো শহরে যদি খোলাখুলি বিদ্রোহ শুরু হতো তাহলে উত্তর ভারতের মতো বাংলায়ও হয়তো তা ছড়িয়ে পড়তো। বাকল্যান্ড লিখেছেন, তখন, বাংলা সরকারের অধীনে এমন একটা জেলা ছিল না যা প্রত্যক্ষ বিপদের মধ্যে দিয়ে যায়নি কিংবা আশঙ্কা করেনি ঘোরতর বিপদের।[৩০]

ঢাকার সিপাহিরা বিদ্রোহের খবর পেয়েছিলেন। শহরবাসীদের যারা খোঁজখবর রাখতেন তারাও বিষয়টি জানতেন। শহরবাসী ও ইংরেজরা যেমন আশংকা করছিলেন বিদ্রোহের তেমনি সিপাহিরাও ইংরেজদের মনোভাব বোঝার চেষ্টা করছিলেন। সিপাহিদের একটি অংশ সক্রিয় ছিলেন, কিন্তু, মনে হয় সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বলে মনে মনে ক্ষুব্ধ থাকলেও প্রকাশ্য বিদ্রোহে যোগ দেওয়ার সাহস পাননি। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দেওয়া তাদের জবানবন্দি ও অন্যান্য ঘটনাবলি তা প্রমাণ করে। উল্লেখ্য এই যে, যারা

ছিল নিষ্ক্রিয় তারাই ধরা পড়ে বিচারে মৃত্যুদণ্ড লাভ করে। সক্রিয়রা প্রস্তুত ছিল এবং তারা পালাতে সক্ষম হন।

পূর্ববঙ্গে একমাত্র চট্টগ্রামেই সিপাহিরা বিদ্রোহ করেছিলেন। ঢাকার সিপাহিরা একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন মাত্র। কিন্তু ইংরেজদের মহাআতঙ্কের কারণে সেটাই হয়ে উঠেছিলো অপরাধের বিষয়।

ঐ সময় জমিদাররা সামগ্রিকভাবে সাহায্য করেছিলেন ইংরেজদের। ঢাকার কমিশনার জানিয়েছিলেন, তাঁর বিভাগের 'নেটিভ জমিদার' ও অন্যান্যরা তাঁকে প্রচুর সাহায্য করেছেন। যেমন, শিবজয় উজির, নাসিরুদ্দীন, মনোহর, রাজ কিষেণ রায়, মাহমুদ গাজী চৌধুরী, বিবি আমান্নিসা, আসাদ আলী মৌলভি এবং যশোধর কুমার পাইন। নামগুলি মনে হয় অধিকাংশই ছিলেন অবাঙালি। বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছিলেন, জমিদার গণি মিয়া যিনি এ পরিপ্রেক্ষিতে নবাব খেতাব পেয়েছিলেন। তিনি তখন বলেছিলেন, 'এই সঙ্কটময় সময়ে আমার উপস্থিতি সরকারকে সাহস যোগাবে। আমার অনুপস্থিতি আতংক বিস্তার করবে যা রোধে আমরা এখন শংকিত।' তিনি তারপর নিজ বাড়ি দুর্ভেদ্য করেছিলেন, পরিবারবর্গকে সজ্জিত করেছিলেন অস্ত্রে, সরকারকে দান করেছিলেন মোটা অংকের অর্থ, সাহায্য করেছিলেন সরকারকে হাতি, ঘোড়া, নৌকো সব কিছু দিয়ে।[৩১] এক কথায় বলা যেতে পারে, বাংলাদেশের জমিদার, তিনি হিন্দু মুসলমান যাই হোন না কেন সমর্থন করেছিলেন ঔপনিবেশিক সরকারকে। কারণ, নিজ অস্তিত্বের জন্য তারা নির্ভরশীল ছিলেন ঔপনিবেশিক শাসনের ওপর।

ঢাকার কিছু ইংরেজ কর্মচারীকেও এ পরিপ্রেক্ষিতে পুরস্কৃত করা হয়েছিলো। এরা হলেন কালেক্টর সি. এফ. কারনাক, সহকারী শিক্ষক এ. জে. বেইন ব্রিজ, কর্মচারী উইলিয়াম ম্যাকফারসন, সিভিল সার্জন ডব্লিউ. এ. গ্রিন ও চার্চের রেভারেন্ড উইনচেস্টার। নৌ বাহিনীর অফিসার আর্থার মেয়োর সাহসিকতার জন্য 'ভিক্টোরিয়া ক্রস' লাভ করেন। বাঙালিদের মধ্যে কালেকটরি অফিসের নাজির জগবন্ধু সেন পুরস্কৃত হন। পুরস্কৃত হন ভাওয়ালের জমিদার কালীনারায়ণ রায় চৌধুরী ও আবদুল আহমেদ খান।[৩২]

মধ্যশ্রেণীর একাংশও সমর্থন করেছিলো ইংরেজদের। ঢাকার সিপাহিদের নিপাতের খবর শুনে ঢাকার ভদ্রলোকরা বেশ উল্লসিত হয়েছিলেন। তবে, পূর্ববঙ্গের শহরবাসীদের (বা ঢাকারও) বিরাট অংশ যে ইংরেজদের সহযোগিতা করেছিলো এমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। বরং বলা যেতে পারে, নীরবে তারা সব অবলোকন করেছিলো মাত্র।

পূর্ববঙ্গের সাধারণ (ঢাকারও) মানুষ ছিল এসব থেকে অনেক দূরে। কিন্তু, এ ঘটনা বিশেষ করে সিপাহিদের ফাঁসি দেয়ার ঘটনা যে তাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি তা ভাবা ভুল হবে। এ প্রতিক্রিয়ার অভিঘাত আমরা লক্ষ্য করি পরবর্তীকালে নীল বিদ্রোহের সময় যা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্ত।[৩৩] এ পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে, ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ তাদের মনে তাৎক্ষণিকভাবে না হলেও পরবর্তী সময়ের জন্য সৃষ্টি করেছিলো কিছু প্রতীকী মূল্যবোধের যা এ আলোচনার বাইরে।

তথ্যপঞ্জী

১. *Dacca News*. 28 3 1857
২. *Ibid*. 18.4.1857
৩. *Ibid*. 21 3.1857.
৪. Hridayanath Majumdar. *Reminiscences of Dacca*. Calcutta. 1926. মুনতাসীর মামুন, *হৃদয়নাথের ঢাকা শহর*. ঢাকা. ১৯৯৪ (২য় সং)। এখানে বাংলা অনুবাদটি ব্যবহৃত হয়েছে। [পৃ. ৮২-৮৩]
৫. A.L. Clay, *Principal Heads of the History and Statistics of Dacca Division*. London. 1868, p 40-47 ব্রেনান্ডের রোজনমচা এখানেই উদ্ধৃত হয়েছে। মুনতাসীর মামুন, ব্রেনান্ড সাহেবের রোজনামচা, মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত ও ফওজুল করিম অনূদিত. *ঢাকা : ক্লের ডায়েরী*. ঢাকা. ১৯৯০, পৃ. ৪৯-৬৩, এখানে বাংলা অনুবাদটি ব্যবহার করা হয়েছে।
৬. *Dacca News*. 20 6.1857.
৭. ব্রেনান্ড-এর রোজনামচা, ১২.৬.১৮০৭।
৮. ঐ. হৃদয়নাথ, পৃঃ ৮৭-৮৫।
৯. *Dacca News*. 13 6.1857
১০. *Ibid*. 20.6.1857.
১১. ঢাকা বিভাগের কমিশনার অব রেভেনিউর নিকট ঢাকার কালেক্টরেব পত্র. ২৫শে জুলাই. ১৮৫৭। বাংলাদেশ সচিবালয় রেকর্ডস, ঢাকা জেলা. প্রেরিত পত্র ভল্যুম ১৮৩. পত্র সংখ্যা ১২৯. পৃঃ ১০: উদ্ধৃত. রতন লাল চক্রবর্তী, *সিপাহী যুদ্ধ ও বাংলাদেশ*. ঢাকা. ১৯৮৪, পৃঃ ৬৮।
১২. *Dacca News*. 20.6.57.
১৩. *Ibid*, 27.6.1857
১৪. ব্রেনান্ড, ২৮.৬.১৮৫৭।
১৫. *ঐ*. ৫.৭.১৮৫৭।
১৬. *ঐ*. 3 7 1857 ও Dacca News 1 8 1857.
১৭. *ঐ*, 1-3, 3.8.1857
১৮. *ঐ*, 9.8.1857
১৯. *Dacca News*, 27.6.1857.
২০. *Ibid*. 15.9.1857.
২১. ব্রেনান্ড, ২২.৮.১৮৫৭।
২২. *ঐ*, ভ্যলুম ৮.১৮৫৭।
২৩. *Dacca News*, 19.9 1857.
২৪. Charles Rathbone Low. *History of the Indian Navy*. London. Vol II. 1877 pp 438-446; *Dacca News*. 28 11.1857 ; হৃদয়নাথ ও ব্রেনান্ড।
২৫. F.J. Halliday. *Minute by Lt. Governor of Bengal on the Mutineers as they affected the Lower Provinces under the Goverment of Bengal*. Calcutta. 1858. p. 75

২৬. Low. *op cit.* pp 443-444
২৭. *Dacca News*, 24.11.1857
২৮. *Ibid.* 12 12.57.
২৯. ব্রেনান্ড, ৩০.১১.১৮৫৭।
৩০. C.E. Buckland, *Bengal Under the Lieutenant Governor,* Vol. I (Reprint), New Delhi, 1976 p 67.
৩১. *Ibid.*
৩২. ঢাকার কমিশনার অব রেভেনিউ-এর নিকট ডিপুটি কালেক্টরের পত্র, ৭ই জুলাই, ১৮৫৮, বাংলাদেশ সচিবালয় রেকর্ডস, ঢাকা জেলা, প্রেরিত পত্র, ভল্যুম ১৮৯, পত্র সংখ্যা ১১০, পৃ. ১২৭. উদ্ধৃত, রতন লাল চক্রবর্তী, *প্রাগুক্ত*, পৃ, ৭৮৭ ; বাকল্যান্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫২।
৩৩. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, প্রমোদ রঞ্জন সেন গুপ্ত, *নীল বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ*, কলকাতা, ১৯৭৮ (২ খণ্ড)।

সংকলন—১

[Unusual Excitement in Dacca]

There has been unusual exitement in Dacca in connection with the sepoys stationed here. It has been said that the Europeans are about immediatelely to leave town surrendering everything to the sepoy—that a European regiment is within a day march of Dacca, and that the sepoy are prepared to resist them to the last—that the sepoy intend to loot the town and etc. We need not say that the rumours are absurd. What could two hundred men without leaders do against the people of Dacca. We believe that the sepoys are as much afraid of the towns-people as the latter are of them, there is no doubt however, that a bad feeling has sprung up between the towns people and the sepoys, and that the sooner the latter are relieved the better. This is we believe partly owning to their having no officers with them. Lieutenant Dowell of the Artillery, and Lieutenant Hitchins Executive officer, deserve great praise for the manner in which they have endeavoured to supply the place of the officers who ought to have been with the man.

21.3.1857

[Sepoy and the Brahmin Baker]

We are glad to learn that the sepoy who assulted the Brahmin Baker has been sentenced to pay a fine of one hundered rupees, or to suffer imprisonment for six months.

28.3.1857

[Friends opinion]

The FRIEND[১] remarking upon the sepoys beating the brahmin baker, and fear of the people of Dacca of outrages by the military, re-assures them by the remark, that there are only 200 sepoys and it takes four of them to thrash a Bengalee.

4.4.1857

[Fourteen years R.I.]

The two sepoys of the 34 N.I. who tried to seduce the Mint Guard[2] have been sentenced to fourteen years labor in irons.

18.4.1857

DACCA NEWS EXTRA

[7 A. M. 13th June 1857]

At about half past twelve on the morning of the 12th Instant, a gentleman frightened some of those residing at the mills,[1] by telling them that the two companies of the 73rd who had left this sometime ago, for Jolpigooree, had returned, and were about to join with the two companies here, and mutiny. The ladies were immediately put on board boats and sent off, while one of the gentlement came into town, frightening every one as he passed. At length the panic was communicated to those in the Magistrate's Cutcherry, from which our brave police rushed with boud shouts. Terror was next communicated to the College, from which the boys ran in great fright, and from this it spread to the Collectory. The sepoys quietly stood to their arms, and were soon visited by their commander Lieut. Macmilan, Messrs Dowell and Rynd proceeded to the Lal Bagh and most of the Ladies and gentlemen of the station were soon assembled in the Magistrate's house. Here it was ascertained that the whole was a false alarm, and the gentelemen immediately traversed the streets, reassuring the people. A meeting of the inhabitants was then held, and a Committee of Safety organised, whose proceedings will be found below.

NOTIFICATION

It is particularly requested that Gentlemen residing in the Station will not listen to any reports not proceeding from the Magistrate or one of the Members of the Committee formed for the protection of the inhabitants.

It is also requested that gentlemen will not circulate any report or rumours that may reach them, but will at once communicate with the Magistrate or one of the Members of the Committee who will take steps to test the truth of the said reports.

The Committee take this opportunity of informing the Residents

that three is not any truth in the rumour which was spread this morning to this effect that the detachment which left the station some days ago, was returning—as letters were yesterday received from Serajgonge from Lieut. Wilcox reporting all well—

Measures are being taken by the committeee to ensure the safety of the several residents.—

(Signed) C. F. Carnac
C. T. Hitchins.
Wallis Dowell.
R. C. Carnegie.

It is proposed that the Christian inhabitants of Dacca do take measure for their mutual protection.

The first step proposed, is to select a house where all shall congregate in case of necessity; and it is determined that the house of the Commissioner is the most eligible for that purpose.

It is further determined with a view to carry into effect the above resolutions, that a Committee consisting of Messrs Major Smith, Caranc, Dowell, Hitchins, Carnegie be appointed to assist Jenkins, the Head Executive officer present in the station, to provide everything necessary.

(Signed) C. F. Carnac
" W. Thomson
" E. S. Pearson
" C. T. Hitchins
" W. Brennand
" R. G. Carnegie
" W. Macpherson
" W. Winchester
" W. A. Green
" G. M. Lillie
" J. E. S. Lillie
" F. Supper
" Wallis Dowell

13.6.1857

OUR SAILORS

There was not a christian in Dacca whose heart did not beat more cheerily on thursday, when the 'Calcutta' steamer arrived off the town at 10-30 A.M. having on board a hundred gallant English sea men with two twelve pounders. The anxiety we have been in during the past week, not knowing then we might have to fight for our lives, was taken away, and when we saw the sailors harness themselves to the guns (would our high caste sepoys do so?) and march up from the Sudder Ghat to the house that had been prepared for them, where they lost but little time in hoisting the Union Jack, we—well we wont say what we did, but we thought of firing off our guns and pistols which have been loaded ever sunday last.

20 6.1857

[Bangla Bazar Female School]

We are sorry to hear that the Female School in Dacca has fallen off in attendance of the pupils since the occurance of the late panic, from the idea that the sepoys object to Female education. The sepoys are supposed to object, and the supposition of their objection is in the minds of the inhabitant of Dacca, the men who pay those very sepoys entitled to more weight than the approval of the Government. We must pay the penalty of having trusted in men who boasted faithfulness as their great and crowning virtue. We must pay the penalty not of stinginess or cruelty to our mercenaries, but of over indulgence and kindness to men who have even treated any manifestation of those qualities in us as a proof of our weakness. But the day is we hope not far distant, when we shall be able to say, that what is declared to be deconfirmation of that voice by the Government of the land, shall not be set aside or in any way altered by the whim or the absurd prejudices of an ignorant or bigoted set of our servants. After a short time over Government shall be strong, far stronger then when we relied upon governing India by the sword. It shall be strong by being confirmed in the hearts and feeling of the people, and then no sepoy shall done to dictate to the people but each man shall be able to do what he chooses (legally) to do.

20.6.1857

[Arrival of 'Calcutta']

On the day the 'Calcutta' arrived in Dacca, several young men on the other side of the river dressed themselves as sepoys, and molested some of the inhabitants. The alarm spread like wild fire, and a good deal of property we understand was lost in consequence of being thrown into tank. The Nazir soon arrested the evil doer who have, we understand, been rewarded with three months imprisonment.

27.6.1857

[Englishman's Version]

It is not true as stated in the Englishman of the 19th instant, that the sepoys in Dacca refused to let the Artillery officer take arms from the magazine for the protection of the city. Our octogenarian police were armed with the musty jail musket, which they neither knew how to load or fire. Their cartidges were great curosities, some of which we hope Dr. Green has secured for the museum. They were furnished to the Jail in 1795. This is a fact.

27.6.1857

[Arrival of Sailors]

Since the arrival of our sailor we have enjoyed perfect tranquility, and the hopes of budmashes whether sepoys or others have been sadly blighted. The very day often the sailor arrived many families which had gone to the moffussil returned. We owe much also to the arrangements of Mr. Carnac, and to the assistance he has received from almost all the gentlemen who created the alarm have now become so bold, that we are afraid of being knocked down by them if we even hint that there was an alarm at all. A letter from one of the chief alarmists has appeard in the ENGLISHMAN in which he defends his conduct in nearly the same words as a 'voice from the Mills' did in the DACCA NEWS last week. Another letter has also appeared in the HURKARU[*] finding fault with the situation of the house occupied by the sailors as barrack, and insinuating that the Commisioner has placed them there to protect himself. When we state that the post office and college, we think we have said enough to show why the position was chosen. When we state that the Mitford Hospital is about a mile distant from any place which would be an

object of attack, and is surrounded by native houses which would conceal any member of musketeers, and that it would be at least half an hour before the men could reach the Collectory or Bank through a narrow street, we think we have shown why the Hospital was not chosen.

27 6 1857

OUR PANIC

We wrote to a friend at Serajgunge to beg him to trace the Companies of the 73rd under Lieut, Wilcox, and have received the following answer, 'I hope you gave the chap who first set the panic a going a good ducking. These false alarms are more likely than anything else to put the fellows up to rising in earnest, and should be most carefully guarded against. The companies of the 73rd which you were alarmed about were in the present instance as innocent as little lammies. Boats from Rungpore, Goramara, and Bousa (bazaars on the Teesta river) have brought in almost daily accounts of the detachment of the 73rd since they left Serajgunge on the 7th instant. On saturday the 13th they were a little above Kammarjanny bazzar, and on Monday the 15th were reported by some boats that came in this morning (the 19th), to be sailing up the Teesta opposite Panella Ghat, 12 miles east of Rungpore. I shall send you an express should I at any time hear of anything of importance. Our correspondent then reports the boats with the forty men which arrived a few days ago, as having left the mouth of the Testa on the 9th Instant. "If the 73rd at Jolpigooree do mutiny I do not think they will come down this way. They will probaly plunder the Rungpore and Dinagepore treasuries and then be off for the N.W. via Monghyr, Patna Etc.—Here I do not see any signs of disaffection, but the people are beginning to argue about tbe mutinies and their causes. We have a Mussulman population on board the boats alone at the Ghat of some 50,000 men and about 500 Up-Country merchants and burkindazes residents in the bazaars; but as most of these latter are either engaged themselves very extensively in trade,.or employed by the parties who are so, I do not. think a risking here very likely."

If the sepoys at Jolpigooree have any regard for their brethren in

Dacca, who are now in the power of a hundred European sailors eager for a fight, and angry because they have found nothing to do at Dacca, they will not mutiny. We are very doubtful if mutinous sepoys, especially if they have any plunder with them, could leave this part of the country at all. It is only a few weeks since a party of the 34th proceeding from Chittagong on furlough, were soundly thrashed at sure that the magistrate of a district would only have to give a hint to the people that they might keep all the plunder the sepoys were carrying off, and that no questions would be asked, to ensure the destruction of every mutineer in North and East Bengal...Were we to search history we could produce thousands of instances in every age of the race of leaders of men we refer to. The panics which have lately seized almost every station in Bengal, the mutinies which have disgraced our army, are examples of the evil effects of allowing ourselves to be led away be the donkey leader of the flock, who too often assumes among men the place of the old ram among the sheep. The mutinies at the commencement, will probably be found to have originated in the disturbed or discontented brains of some who had in view an increase of pay of one rupee a month, or removal to a station where atta was cheaper. When it was found that no evil effects follwed upon the first disobedience of orders, but that their generals dismissed them with tears in their eyes, and prayers for their future welfare, and recommendation that they should go and how at the shrines where their forefathers had worshipped the foolish sheep thought that they might still go on to leap as had been so successfully done by those who had gone before them. The Government which is too weak, thought they, to punish, may be forced to give in to our demands, and nothing beyond this we believe was in the thoughts of the second batch of mutineers. Disbanding only was their punishment, and now it became certain that the Government must yield, and the demands of a mutionus soldiery rose in consequence. Then came the rich plunder of the Imperial city of Delhi. Man after man, regiment after regiment, throughout the length and breadth of the presidency of Bengal gloated over the idea of the possession of the rich treasuries that were already in their hands, which the murder of a few confiding and help-

less Europeans would enable them to secure. It was too much for men who toiled for years to amass a hundred rupees, to be continually tempted with the possession of thousands which they could not enjoy. They were daily incited to help themselves by the accounts they heard of the success of their brethern. On the one hand was the enjoyment of a good conscience, testifying that they had done their duty, seven rupees a month, and the prospect if they lived long enough to be unable to enjoy it, of a pension. On the other was the guilt of murder, a murder, however, justified by their religion, as that of a Mlecha, a despiser of their Gods. a condemner of Mahommed. Neither Hindoo nor Mussulman, according to their sacred books could think of the murder of such an one as sin.—But, whatever sacred books may say, there still remains in the mind of the most depraved a horror at the idea of murdering him who has through long years cherished one. The leap, however, had been taken by the leaders of the flock. The sheep followed, and at the same time that they obeyed that instinct which is common both to men and sheep, they gratified their lust for riches—riches which they vainly imagined would bring them all enjoyments, but which most of them have already found to turn like the apples of sodom to ashes in their mouths.

But the English have been as sheep like as the natives in following the leader, whether ram or donkey. The English have generally followed the donkey. A donkey hears a story from an ass. The donkey runs away or loads his gun or does something equally ridiculous, and all the others do so likewise. This is called a panic, and there are but few stations in Bengal which have not come under the dominion of donkeydom. Let no one imagine that we set ourselves up as super eminently wise. We are as great a subject of donkeydom as any in Dacca. We should not like to confess all the terrors the infection of which we have caught from arrant donkeys, if we did not think that most men feel that they were as frightened as ourselves. The relief we all felt when 'Our sailors' came, and the boldness of our denunciations of the conduct of the donkey who led us astray, shows what asses we were, and how frightened we were.

Donkeyhood arises generally from want of knowledge, or rather

from that 'little knowledge' which the poet tells us 'is a dangerous thing ' Take for instance our panic in Dacca. If we had known that the two companies of the 73rd instead of having returned, were quietly proceeding onwards towards their destination. We should have been at rest, and the great injury to commerce and inconvenience to families which have been the result of our Dacca panic, would never have occurred. If we had good dawks, and a newspaper published at every station, we should have known all this. Lord Canning therefore by his throwing discouragement in the way of the press, is encouraging future panics with all their attendant evils.—If the sepoys had known how utterly worthless are the things of time, as compared with those of eternity, how little a lakh of rupees is when balanced against eternal life, which can only be taught them by the Gospel of Jesus Christ, they would not have mutinied. Those therefore who have discuoraged by proclamations or by actual persecution the preaching of the Gospel, have encouraged the outbreak of this and future mutinies. Having pointed out two grave errors of our Government and being liable to a revocation of our license for the same, we stop for the present.

27.6.1857

THE FUTURE DEFENCE OF DACCA

We have often pointed out both in this paper and in communications addressed to the authorities, that Dacca and not Jamalpore or Jolpigoree is the place at which a Force to control the surrounding districts should be stationed. Men stationed here could be immediately moved upon Mymensing, Sylhet, Tipperah, Chittagong, Noakhally, Fureedpore or Pubna. Stationed at Jamalpore they can be moved no where. From twenty days to a month would be the shortest time in which boats could be collected with the usual amount of oppression to the people, and a force of sepoys from Jamalpore landed in any one of those districts where their services might be required. It would be almost impossible to send guns with them, for sepoys do not drag their own guns as our sailors do, but require elephants or bullocks. Such guns in the Dacca or Burrisal districts, intersected by nullahs and creeks, would be useless. Sepoys here are of no use but to

guard the Treasury, (quis custodiet ipsos custodes?) and to quarrel with and insult the towns people. When they go to the neighboring districts for treasure, they are so difficult to move, the boats in which they travel are so unsafe, and they commit such oppression in the districts through which they pass, that the Goverment, even when very much in want of money, has often preferred to allow many lakhs of rupees to lie idly in their Treasuries for many months, than to send a treasure party to escort it. On the 28th of last month there were from 8 to 10 lakhs in the three treasuries of Tipperah, Noakholly and Mymensing. We should like to know what arrangements have been made for taking it to Calcutta. None we venture to say, and this money will lie in insecure treasuries in the Mofussil for months, instead of being in the General Treasury where it must be very much wanted. We long ago pointed out how a different arrangement of the Collectories would have the effect of having them all emptied by being drawn against from Calcutta, but as our Governors and Lieutenant Governors have at present something else to think of besides financial arrangements, we shall point out how we think we can combine the defence of this part of the country, with the protection and transmision of the Revenues.

Under the Government of the Mogul there was always a large fleet at Dacca. We, even when we had a whole regiment here, have been sent to quell an insurrectionary movement in any of the surrounding districts, in time to have been useful by nipping it in the bud. The consequence of this is, that we have been forced to permit for a long time the most complete defiance of our magistrates, in the remoter parts of the district, and our authority has been laughed at by a set of Mussumlman ryots, whom a single European with ten Burkindazes, and no fear of the Sudder before him, would have reduced to order in three days. It may be thought that we exaggerate, but let an enquiry be made into the conduct of the Beenadpoor ryots for the last three years, within one day's distance of whose villages no Darogah dare to anchor and the truth of what we have said will be immediately apparent. Let the petitions of the Mahajuns on the subject of river dacoity be produced from Mr. Dampier's late office. Let Mr. Dampier him-

self be examined as to whether he did not give directions to the magistrates under him, to treat leniently and with respect notorious lawbreakers in this district because they were powerful, and it will be clear to every one, that our power and authority here have long been bound by the fetters of red tape, and supported by a force which was never ready, nor, in consequence of red tape, rough. The sepoy was always a rough and ready plunderer of the sugarcane field, a ravager of the young pea crops of the simple villager, but when work was to be done he was hampered with his scruples and his caste, and all his comforts must be attended to before he could be expected to move, even to save the state he was bound to serve. What a ruin he has proved to that state late events have shown.

We want in Dacca a European force—not a large one, for God knows we are peaceable enough. We want men who will do what they are bid, and do it quickly. We do not want soldiers, for there is scarcely a space of ground unintersted with water, large enough for their manuoevers. We are quite aware that English soldier will put themselves on board boats, will pull the oar, will do anything that they are bid to do; but a soldier pulling an oar is very likely to catch a crab, which miscatorial effort is not conducive to much expedition in either warlike or peaceable occupations.

What we want in Dacca—for we believe that the folly will not, for several generations be again committed, of entrusting ourselves to natives only; unless, like the planter, we are unfettered by red tape, and are ready to do what the circumstances demand without considering whether we are bound by red tape to do so or not;—what we want is a force such as we have not here—sailors—men who learned from Nelson that what England expected from a man was his 'duty', without any reference to caste or prejudices.—An hundred or, better still, two hundred sailors stationed in barracks here, with a ship's long boat or a gun boat as their ship, a pinnance or two, and a couple of paddle boats would be worth more to the state than two regiments of sepoys.—Should anything serious, calling for the aid of guns occur in any of the neighboring districts— a thing most unlikely—the gun boat with half the men might be on the spot next day or in two days at far-

thest. It would take weeks to move sepoys. It would take several days to move English soldiers unless indeed they had a Colonel Neile commanding. But we believe that there would be very little call for their services in this way. What they would be most useful for is, to command that sense of respect for the law, which is impressed upon most men when they are aware that the law has always at its command a strong arm, which it can raise to strike when necessary to do so. That power requires to be revealed every now and then to the people. When too long hidden or unused it comes to be disbelieved in. Such a manifestation of power has been long required in Bengal. It was disbelieved in the leniency of the Government, in consequence of the long time that had elapsed since the display of its power, was thought to be the effect of weakness. We have been compelled to put forth our power, and sad has been, and will be, the fate of the poor victims who have been, by our culpable indulgence, led to consider themselves our equals in power and in strength.

But in the time of tranquility and of peace the sailors would be most useful. If there were a couple of paddle boats at their disposal, they would bring in the revenue from the neighboring districts within a few days after if had been paid in, which, when the line of steamers which ought to have been established between Dacca and Calcutta many years ago, is in full action, will place this money at the disposal of the Government within a very short time after it is collected, instead of leaving it in some instances lying, for the greater part of the year unproductive.

Two Hundred European sailors would not cost three quarters of the expense of sepoys, and would be we will not say three times—we say infinitely more useful to their employers. We say nothing of what good they would do in a district—what improved plans of boat building, carpentery, rope making, smith's work & they would introduce. We have known several old 'shippies' as planters. The number of 'dodges' in which they instructed the 'niggers' around them was surprising. We behave that the establishment of a garrison of European sailors here would be nearly as useful as the College. The one given a mental and theoretical, while the other would give a practical education.

We must make India more English. We are now so few in India, that we become Indianised instead of Anglicising the Indians. It is so long since we saw or spoke to a European of the lower orders that we really do not know how we ought to behave to him. We know well that we cannot give him a blow and call him a soor as we can to a native. We also know that he is not our equal and owes us a certain respect. Yet when a sailor touched his hat to us the other night, which by the way but few of the sepoys do, we could not resist taking off our hat to him. There is something in the white face in this country which demands respect. It is now time that the white face should become more common, and should command more respect than it at present does from the natives we have pampered, as an emblem of the possession of freedom and power which the proudest brahmin cannot pretend to a superior force, the white man dies rather than surrender his. The brahmin cringes and whines and sneaks, and waits till his officers is off his guard to assassinate him. The white man boldly but respectfully asserts his right and generally obtains them. The brahmin after a short career of robbery and rapine gets hanged.—To the former respect is due, the latter can excite only the feelings of hatred and contempt. We are the governing race in this country. We must, for the general safety, insist upon respect being paid to us by the Governed. The native sees no difference between Mr. Halliday and the planter's assistant but the accident of rank. He has seen a Musalchee become a Deputy Magistrate. Rank has been deprived of much of its prestige in this country. If then in the eyes of the native rank is but an accident of no great value, what we have in India most to depend on as insuring respect is the white face. But the planter's asssistant's face is as white as Mr. Halliday's.[6] If Mr. Halliday allows an Upstart Moonsiff to insult a European, as has been done to Mr. Warner, Mr. Halliday may take our word for it the he is blackening his own face. We have reason to think, as will be seen from a letter in another part of this paper, that Mr. Halliday will not permit these insults to pass unpunished.—This is rather a digression but let it stand. .

4.7.1857

HOW A NATIVE THINKS IT IS TO BE DONE

TO the EDITOR of the DACCA NEWS

Sir—May I beg of you to insert the following in your next weekly paper.

The present mutinies of the sepoys and the most barefaced treachery which some of the regiments have diliberately shown, together with the shameless ingratitude with which some of the fanatic native potentates (particularly Mohamedans) are assisting them have probably, as is natural to expect, made our rulers to distrust the natives. It is not strange that the Mussulmans who are easily excited in any thing should do so, but my goodness what led our calculating Hindoos to run madly into dangers in which they are sure to be crushed. Not withstanding all the benefits conferred on our country by the British Government, the natives have acted at this conjunction is a way sufficient to lose thier credit in the eyes of their rulers. But our rulers have no reason to distrust the natives of Bengal, they have not shown the least sign of disaffection towards the government. But whatever they might think of the other natives, they may implicitly rely on those who have received an English education, and who well known the value of the British government, and who bear mortal hatred to Mohamedan insolence and barbarity, as they seen them on the pages of history. Their gratitude and their interest too bind them to the present government, for the very, well known, that their glory, however little at may be, and their interest to which they are no less alive than their fathers, are intimately connected with the British government. Even if this government were to be followed by a Hindu one they would have no reason to be glad of it. For, supposing such a thing were to happen, they will be the first persons to be persecuted by our orthodox religionists, who are even now, ready to offer them are greatest possible injury, if they could do it with impunity. Such influence has religion over national character. We are sure as we are sure of any thing in this world, that the British Government in India will not be safe, as long as the prejudices of the people are not dispelled by the diffusion of the learning of the west, as long as the pernicious distinction which separates a Hindu and a Christian is allowed to

exist. Every one who has read English history, knows what a scene of misery England was before the amalgamation of the races, that is of the Celts, Saxons and Normans, took place. And we can predict that India will not be happy, as long as the Hindus, Christians and Mohamedans, the three predominant classes in the country are not incorporated into one body; as long as the interest of the one does not become the interest of the other. This can only be done by an active care on the part of the government to the education of the country. From this time it ought to pay more attention to this department than it has hitherto done; and it ought to encourage education by conferring employments only on those who have received a liberal education.

Dacca
2nd July, 1857

Yours faithfully
A student of the
DACCA COLLEGE.
11.7.1857

DACCA MUNICIPAL COMMITTEE

At a Special meeting of the Municipal Committee held at the Dacca Bank on Tuesday the 14th July 1857 to take into consideration the Commissioner's letter to the Committee dated the 4th Ultimo, as determined by the 5th paragraph of the Proceedings of the Municipal Committee held on the 7th instant.

Present.—Messrs C.T. DAVIDSON.—C.P. CARNAC.—C.T. HITICHINS. —W.A. GREEN.—N.P. POGOSE—KAJE ABDOOL GUNNY.

1st Proposed by Dr. Green and Seconded by Mr. Forbes that the Secretary be directed to write to the Commissioner that the Committee has no objection to the request of Major Smith being complied with.

Proposed by Mr. Carnac that the Committee consent to give to Major Smith that portion of land in front of his house offered by Messers Forbes and Mackiop, and that they do also record their opinion that there can be no objection to Major Smith's enclosing as for as originally intended by him waiving all right to the land in either case,

and that so far from such an enclosure being an eyesore it will be ornamental to the station. Seconded by Mr. Hitchins

The amendment being put the votes were as follows.

For	Against
Kaje Abdool Gunny	C T Davidson Esq.
C.T. Hitchins Esq.	N P. Pogose Esq.
C.F. Carnac Esq.	W A. Green Esq.
	A. Forbes Esq.

In consequence of which vote the original proposition was carried.

(Singed) A. FORBES
Hon. Secy. Municipal Committee
18.7.1857

ADDRESS TO OUR SAILORS

TO THE SEAMEN OF THE DACCA NAVAL BRIGADE-DACCA

Sirs,—We, the students of the Dacca College, cannot allow you to depart from amongst us without expressing our grateful sense of the valuable services rendered by you to the people of the District.

2nd, Some months previous to your arrival, the people of the district in general and those of the town in particular were in momentary fear of the two companies of sepoys that were stationed here for the protection of the Treasury. The circumnstances together with the panic of the 12th June 1857, induced the Government of Bengal to locate a competent body of European troops in the town. The choice fell upon you and you have done justice to it.

3rd. Your arrival amongs us is a great measure allayed our fears, and the glorious victory won by you under your able commander, over the Rascally sepoys at the Laul Baugh Battle on the 20th of November last, resorted full confidence in the minds of those for whose protection you had been sent.

4th. Besides, education was at a standstill in those parts of the country in which mutiny and Rebellion were rampant and it gives us

pleasure in thinking that your presence enabled us to prosecute our studies without apprehension.

Dacca College
28th July, 1858

We remain,
Sirs,
Yours most obdt. servants
and etc.
Well wishes
THE STUDENTS OF THE DACCA COLLEGE
31 7.1857

THE DACCA VOLUNTEERS

At a meeting of the christians inhabitants of Dacca, held in the College on the 30th ultimo for the purpose of forming a volunteer corps.

It was proposed by Mr. Foley, Seconded by Mr. Lucas, and carried unanimously that Mr. Forbes take the chair.

The Chairman having in a few words explained the object of the meeting, the following resolutions were passed.

Proposed by F. Tydd Esq. that this meeting address the commissioner, stating their intention to form themselves into a volunteer corps, and requesting his sanction to the measure. Seconded by Mr. Lucas. Carried unanimously.

Proposed by Mr. Foley, that the Volunteer corps be composed of those who may enrol themselves; to be decided into two bodies, consisting of Horse patrols and the remainder light Infantry, that the former body do not exceed 16 in number, and that they be required to learn the foot exercise in order to be available as infantry if required. Seconded by Mr. Muspratt; caried unanimously.

Proposed by Mr. Middleton that Major Smith be required to take the Command of the body of Volunteers. Seconded by Mr. H. Bell, Carried unanimously.

Proposed by Mr. Robinson that the members of the corps be requested to bring to the first parade what arms they may possess in order that a collection may be made. Seconded by Mr. Shircore, Carried unanimously.

Proposed by Mr. Brennand that absence from parade or other dis-

obedience of order be punishable with fine, not exceeding Rs 10, to be inflicted by the commanding officer. Any offence which in the opinion of the Commandant merit a severer punishment that the above, to be reinvestigated by a committee of seven of the members, to be chosen by the commandant, which may award a sentence of dismissal. Seconded by Dr. Green. Carried unanimously.

Proposed by Mr. Muspratt that the Volunteer Corps be not required to march to a greater distance than two miles in any direction from the treasury, unless with their own consent. Seconded by Mr. Carnegie, Carried unanimously.

Proposed by Mr. Muspratt that a general meeting of the volunteers may be summonded at the requisition of any ten members, Seconded by Mr. Pereira. Carried unanimously.

Proposed by Mr. Carnac that a vote of thanks be passed to Mr. Forbes, for his able conduct in the chair. Carried by acclamation.

1.8.1857

[Volunteers]

Our Volunteers are anxious that they should have a fortification of some sort to defend, and we believe that a position is to be presented to the Commissioner, asking him to give up the college to that sailors for that purpose, and to be a general place of rendezvous in case of disturbance. We would be very much like to the sailors in the college, for a hundred men in the house they have at present is, to say the least of it, a tight fit. And though we do not see the least chance of disturbance here till the rains are over, when Bengal will be full of English Soldiers, we would like to see a fort prepared in case of need. No wise man however fair the weather may appear to be, ever goes at without an umbrella. A fortification would be our umbrella. The sailor have been trying the sailing qualities of their boat during the week. We should like much to see them with their guns on board and all ready for service. So unwarlike have been our pursuitors that we cannot understand how such little boats can carry such heavy guns. We should like to see a shot or two fired from them. Could not Mr. Lewis get up a tamasha for us especially as we have two holidays next week.

8.8.1857

[Fortifying the College]

The idea of fortifying the college mentioned us as last week has been given up, in consequence of the very kind offer of Mr. Foley to give up the Mills as a place of rendezvous. We believe that it is determined, if there should be any necessity for such a step, of which we see but little likelihood, that the christian shall assemble there with their families, for all of whom there will be ample accomodation. The situation is naturally a vey strung one, and could we believe be put into a state of defence in a night, but it is determined to begin the work of making it still stronger at once. Provisions are to be laid in immediately. Our volunteers both horse and foot are rapidly improving in their drill. Being a perfectly unmilitary individual, we really cannot comprehand how any Bengalee or sepoy could for one moment think of standing before the charge of our cavalry. We are sorry to learn that some of the those who enlisted in the infantry have resigned but as these are all the most worthles individuals in the station, it is perhaps a subject of congratulation to the body in general, that they have withdrawn. When we go into garrison, they will doubtless be useful as cooks and musalchees, and in other offices, which though absolutely necessary, are still generally considered neither agreeable nor honorable...yesterday, which was the first day of the Junmoostomee procession a fresrh supply of muskets, bayonets, and fifty rounds of ammunition per man were served out to the volunteers, both infantry and cavalry. The former garrisoned the college during the processions, the later slept at the Billiard rooms all night, from where usual patrols were sent out...The boats have got their guns on board, and we believe we may confidently state, that any mutineers who should attempt to disturb Dacca or the district would meet with a reception which would be far from agreeable, and far from profitabale, for we have no money in the treasury and are doing so good a business generally in hides, linseed and etc. that the bankers have nothing in their chests but bills.

15. 8.1857

DACCA NEWS EXTRA

SATURDAY 15TH AUGUST 1857

The Defence of Dacca.

From the CHAIRMAN of the late Meeting of the

CHRISTIAN INHABITANTS OF DACCA.

To the COMMISSIONER OF CIRCUIT DACCA.

Dated Dacca 12th August 1857.

Sir,—I have been requested by the Christian Inhabitants of Dacca to address you on the advisability of preparing a fortification of some sort, sufficient to accomodate their families, and which they might defend in case of any outbreak in this part of the country.

2. You have already recognised the existence of danger, by authorising the formation of a volunteer corps, and by sanctioning the issue of arms to them. I trust therefore that you will not object to a measure which will tend further to add to our security.

3. You are perhaps aware that a large portion of the Armenian Community left Dacca yesterday for Calcutta. If such desertions of the chief members of society continue, the effect produced upon the wealthy and timid section of the community will be bad, and the turbulent will be encouraged by seeing their timidity.

4. We believe that all fear would be removed from the breasts of the Christian Community, were a place large enough to contain their families placed in a state of defence.

5. It was at first proposed to apply to you for permission to fortify the College but as Mr. Lewis and the Military men at the station consider a house on the river bank as the most desirable situation, and as Mr. Foley has kindly consented to place the Mills at our disposal in case of necessity. I have the honor to request, that you will take into consideration the propriety for fortifying that house; and if you should give your consent to the measure, that you will place the necessary funds at the disposal of the Executive officer, with instructions to proceed with the work with as little delay as possible.

6. When I had the honor of talking with you on this subject last night, you asked me what case I could make out for spending the public

funds on such a work.—I would beg to submit, that if, from want of due precaution, the Christian population were surprised and driven from the city, there would be a likelihood of the Revenue of the district suffering very considerably, besides the amount which might be lost if the Treasury were plundred. The Christians of Dacca have cheerfully given their time and labor as Volunteers and patrols, which have, I believe, in no slight degree contributed to the present quiet the City enjoys. They would too, I have no doubt, contribute their funds towards the public defence, but with the exception of a few individuals, the commmunity is by no means a wealthy one. I trust therefore that you will consider this a case where the public funds may be advantageously spent.

6. I have the honor to forward herewith the original paper circulated upon this subject.
7. The Christian Inhabitants of Dacca will feel, much obliged by your giving an answer to their request as soon as possible, as they think that no time should be lost in commencing the works.

I have the honor to be
Sir
Your most obedient Servant
A. FORBES

Chairman of the late meeting of the Christian Inhabitants of Dacca.

From C. T. DAVIDSON ESQ.
Commissioner Dacca Division

To A. FORBES ESQ.
Chairman of the late Meeting of the
Christian Inhabitants of DACCA.

Dated 13th August 1857, Dhaka.

Sir,—In reply to your letter of yesterday's date, on the subject of fortifying the Mills House as a place of refuge, in case of necessity, for the Christian Inhabitants of this City, and requesting me to place

the necessary funds at the disposal of the executive Officer to carry out the work. I have the honor to state that I have no authority to sanction the expenditure of the public money for such a purpose, nor have I such sufficiently strong grounds for apprehending danger as would warrant my acting on my own responsibility. In deference however to the wishes of the large number of Christian Inhabitants whom you represent and who, as you very properly state, 'have cheerfullly given their time and labor as Volunteers and Patrols' I will submit your proposition for the consideration of the Hon'ble the Lieutenant Governor of Bengal.

I have the honor to be
Sir,
Your most obedient Servant
C.T. DAVIDSON.
Commissioner.

Commissioner's Office
Dacca Division
15.8.1857

[Fortification of Foley's Mill]

Our extra of last week informed our readers, that the government had called upon the executive officer of Dacca to report whether the Mills could be speedily fortified, at a moderate expense. At the same-time the chief Engineer authorized the expenditure of Rs. 300 for the work without further reference. We think a little more liberally with regard to the sum allowed might have been shown, as it would be evident that the efficient fortification of a house capable of holding from 70 to 80 Europeans with their families, in addition to one hundred seamen, would cost rather, more than Rs. 300. However, it is perhaps as well that the work was not left in the hands of those who are hampered with red tape. The funds were advanced by private individuals, and Mr. Foleys energy, together with the able asistance of volunteers both professional and adventurers, have almost completed a very respectable fort, before it was possible for the reply of the Executive officers report to have been received in Dacca, even though that report had been drawn up and the ·reply given with mercantile despatch. The Mill is large four storied building formerly used for the Manufacture of sugar, but converted by it's present owner Mr. Foley

partly into a dwelling house, partly in to godowns for the articles of country produce in which he deals. The godowns are at this season empty and form capital barracks. The earth from which has been surrounded by a ditch of twelve feet in breadth, the earth from which has been thrown up into a rampart of about eight feet in height. The only entrance is by a drawbridge at the north east corner. Out side the ditch is a thick cheavaux de frisse of bamboo in the Burmese style, which Lt. Lewts, a burmese war hero, showed us how to construct. The place is impregnable to any force without cannon, and we have no reason to supose that any force with guns will move against us...

29.8.1857

MUTINY AT DACCA—DISARMING OF THE MUTINEERS—RE-ARMING AND RESTORATION OR CONFIDENCE—

On Thursday morning the *Haringatta* arrived here, having on board a hundred men proceeding to restore confidence in Assam. Fifty of these we belive were sea men enlisted for general service, and Calcutta 'Wanchopes Own.' On their arrival here the latter gentlemen declared that they had been engaged in Calcutta for service in Dacca, and refused to proceed any farther. Lt. Lewis however appeared on the scene with a party of his men, with loaded guns and fixed bayonets, when they were conveyed to the Black Hole in the Barracks, and the triangles were rigged...

19.9.1857

THE DACCA INFANTRY VOLUNTEERS DINNER

The dinner given by the Dacca Infantry Volunteers to the Cavalry and the station came off of the evening of Monday the 9th at Mr. Brennand's house, which he had kindly given up for the occasion. The absence of Mr. Davidson, the Commissioner and the representative of Government, was to be regretted, because he thus missed an opportunity of seeing the Volunteers together, a sight which he has never yet seen, though they drill thrice a week. Mr. Thomson the Superintending Surgeon, Mr. Abercrombie the Judge, and Mr. Winchester the clergyman, were unavoidably prevented from attending. The elite of the society of Dacca was fully represented among the guests by their almost universal presence. The dinner reflected the

very highest credit upon Mr. Manook and the Volunteers who assisted him. We have seldom seen a dinner, even at a private house, which was so good in every respect. This last crowning act is only one among the many which entitle Mr. Manook to take a very high place among the Infantry Volunteers. The chair was taken by Major Smith the Commandant of the Volunteers at 7 precisely. After dinner the following toasts were given by the Chairman; The Queen. The Prince Consort and the Royal Family. The Governor General and the Government of India. The Army, in proposing which Major Smith said.

We Volunteers, gentlemen, consider ourselves Military but still I. think we are so far separate from the Regulars, that it will not be suspected that we are paying a sly compliment to ourselves when my toast shall be known. I see among our guests jackets both red and blue, and right glad. I am to see them as guests at our board. I begin with the red and give you, gentlemen, 'the Army.'

LIEUT, DOWELL said : Gentlemen, I rise to return thanks for the toast that has been just drunk, because, although I am not the senior officer present, I belive I am the senior unconnected with the volunleers. The Bengal army has to a great extent ceased to exist; but the European officers of that army are still amongst us, and no one will venture to attribute the late disasters to any neglect of duty on their part.

THE CHAIRMAN next rose and said, as we have drunk the Army we must now drink the sister service the Navy. I am really sorry for their own sakes that since they came amongst us they have seen no fun in the fighting line but I sincerely congratulate the residents that their services have not been required; but sure enough had they been called upon to act, their would have been some radical reform; among our native friends; Allow me, gentlemen, to propsose the 'Navy and our brave defenders in Dacca.'

Mr. CONNER in responding to the toast said : In returning my thanks for the very hearty toast to the Navy. I must say that there is not a man among us who does not regret that no oportunity has offered for distinguishing ourselves in the field, and showing the

natives how British seamen fight in defence of their countrymen and country women. However, we take comfort from the thought that our presence has allayed the apprehensions of the Ladies of Dacca and afforded them protection. I rejoice to know that in these critical times the Navy has not been inactive, and I have no doubt we shall soon hear of honors won by Capt. Peel and his naval brigade, though for our party in Dacca there appears little hope of such distinction. We are here without our ships, like fishes out of water. Indeed we are altogether non-descript animals, who cannot live on dry land and who die the moment they are put in the water.

THE CHAIRMAN next said : I would gentlemen, that some more inspired individual than myself were your chairman, and could bring before your mind's eye the noble deeds done but yesterday in the far North West, and against such fearful odds; done too when their difficulty and danger was rendered the greater, by the discovery on the very eve of action that our own forces, the very forces by which we were about to attack traitors were themselves traitorous, and our bitterest enemies were in our own ranks. But inspite of overwhelming odds and unheard of treachery, the gallant Wilson and our brave legions have stormed taken and I trust destoryed Delhi. If it be ever rebuilt, I trust it will receive an English name. In India we go sadly in the oposite direction to that taken by our American brethren and other Anglo-Saxon colonists, who never lose sight of old associations. We Anglo-Indians seem simply to hold India until the Moslem or Hindoo think they are strong enough to take it back again. Gentlemen, I propose the health of the Dethi stormers and General Wilson.

LIEUT. DOWELL in returning thanks said : I have the honor of belonging to the same regiment as General Wilson. He was not in Meerut at the time the mutiny broke out, but very soon hastened to the spot, and taking command of the forces at Meerut, distinguished himself as you are aware, in the battles of Gazeeoodeen Nuggur, and from that time he rose step by step until he received chief command of the army before Delhi. How nobly and well that army has done its work, you know. Maj. General Wilson and the Delhi Stormers live long to enjoy the distinguished honors they have reaped.—But whilst

we rejoice in their success, let us not forget the names of the gallant dead. I beg to propose as a toast, the memories of Sir Henry Lawrence, Brigadier Wheeler, General Neill, and General Nicholson.—Drunk in solemn silence.

MR. MUSPRATT then rose and said :—Gentlemen,—I rise to propose the health of one who holds the prominent position of ruler of a considerable part of India—that part too with which we have most to do : I mean the Lieutenant Governor of Bengal. His acts, affecting as they do most of us, are liable to much criticism, especially when we imagine ourselves injured, or that we ourselves could have done the samething much more cleverly and better than he has done, but this is the common fate of all who are raised above their fellow men. We have nothing to do with criticism to night. We wish to look on the bright side of things, and we hope the most desperate radical here will allow the Lieutenant Governor to have a bright side, even though, in his estimation, it be but a little one.—We must remember that it is to him that we owe our existence as a body, and we fully recognise the cordiality with which the offer of our services was accepted by him. Our being a body has enabled us to have the pleasure of seeing so many of our friends here to night.—Although the Lieutenant Governor's districts have not been distrubed, and there has been no call on him to show what they can do in difficulties, still we must acknowledge that it is to his unwearied labors, and his having made the best of the very inadequate means at his disposal, that we owe in a very considerable degree that peace which we now enjoy, It is the duty of every Englishman at the present time to do all in his power to restore peace to India, and to preserve it in those districts which have not been disturbed ; and we may be sure that M. Halliday has been laboring not less zealously than even the hardest working of ourselves for this end. We have not seen all that he has done and is doing, but we see some of the result. In the first place we see that peace has been preserved. This must have been done by a judicious selection of officers for various posts, placing each one where his peculiar talents and dispostion were most useful. Then, almost daily instructions must have been issued to those officers, in reply to

numerous references made on every conceivable subject, under almost every conceivable combination of circumstances and these instructions must have been wise and judicious, for the result has been peace, But there were not only communications from public officers to be attended to, but believe that these were all attended to ; what was good adopted, and the bookish ones answered according to their folly; and all this has been well done for the result is still Peace.—Mr. Halliday has acted boldly as well. He has carried out in practice what has been long a favorite theory with himself and some others, but which experienced much opposition from many in his own service and from almost all the natives. He has enlisted for Government the honorary services of Indigo Planters and others as assistant magistrates. He has thus done much to remove the old name, of Interloper," for he can no longer be called an Interloper whose time and labor is employed by the Government of the Country. His service are required by the Government, and no one can now say to him "What are you doing here? Nobody wants you here." This is a measure calculated to attach to Government those, who used to think themselves treated as outcasts, and who used therefore to find that every thing that was done by Government was bad.—If the secrecy system which our friend of the DACCA NEWS so much condemns were done away with. I have no doubt we should find that Mr. Halliday deserves our thanks for very much more than the few measures I have mentioned. All Mr. Halliday's published minutes show him to be a zealous refomer of abuses, and as such I am sure you will all join me in the toast I propose. Mr. Halliday the Lieutenant Governor of Bengal.

MAJOR SMITH said :—As Chairman of the infantry Volunteers I come forward again to propose the health of the Bengal Civil Service. I do so with sincerity. because in the midst of our warlike preparations we must not forget those who have held the chief part of the administration, and to whose wise influence and practical experience we owe the security we have enjoyed in this part of the land. It is all very well to have our muskets properly oiled and cleaned, and our weapons in readiness, but we must not overlook the obligations

we owe to the Civil Service, nor forget that it is they who have, by their foresight and oiliness of deportment, kept society from bursting and involving us all in its ruin. In Dacca, we have had men amongst us who have done good service not only in this way, but by patrolling the town at night, and lending heart and hand to every measure that appeared necessary for our safety.—I propose gentlemen the Bengal Civil Service.

MR. PEARSON replied as follows :— In returning thanks for the honor you have this night done the Service of which I am proud of being a member. I feel it very difficult to address you without singing our own praise or, as would have been said in olden times making an apology for the Service. The honor you have done us is high, and would at any time have been appreciated : but at the present it is peculitarly gratifying. However high individuals of the service may stand in the estimation of the public we are I fear not popular as a body. Indeed a certain society in Lower Bengal have charged us as being the cause of the present rebellion. I was in correspondence the other day with a member of the Association who wrote to me thus :— "Your Service is doomed. Why do not you—why do not the intelligent thinking men of your service put yourselves at the head of the movement, by coming yourselves forward and praying that the service be thrown open?" I rather stared at this and asked my friend what he meant how much wider open the service could be thrown than it has already been. when any one of any nation or caste is eligible if he can but pass the examination. 'If by throwing open the service you mean doing away with it altogether, if you mean, let there be no regular service, but take any smartish stirring fellow long resident in the Mofussil and hence qualified to hold any appointment (which by the way is a piece of precisely the same arrogance and self-conceit that you charge us with) take me I say, and without giving me any previous training make me a commissioner of Division—If that is what you mean say so honestly, and I think not only we but your friends will class you with M. Proudhon, the upshot of whose maxim "la propriete c'est le rel," turned out to be that M. Proudhon was to get everything and nobody else anything at all ; but, I said, if you don't

mean that, if you allow as I think you must that there must be a regularly trained service, I shall fell obliged by your informing me what better provision could be made for securing efficient officers than has already been made by the new regime in which the only qualifications required are character and talent, the examinations being so strict as to exclude all but men of talent." My friend has not replied, and I think that if we were summarily disposed of and our places filled by that, according to some, universal panacea—Calcuta Barristers, the country would soon wish us back.

I point with pride to the civil servcie in the Upper Provinces and to their conduct during the present disturbances. In that conduct they have illustrated the truth of the observation lately made by one of our body, that the Civil Service constituted the hidden rivets that kept society together and preserved the country from total anarchy. But I detect myself in singing our own praises, a thing I had determined not to do. I crave your indulgences, and indeed when I consider the sincere good feeling which exists between ourselves and the rest of your society, and when I think of the kind and cordial manner in which you have drank our health. I think that there is no occasion for me to say anything more, and I am certain that you all possess to the fullest extent that innate respect for the institutions of your country which is so peculiarly the characteristic of Englishmen. Once more gentlemen I thank you in the name of my brethren for the honor you have done us.—It is now my pleasing duty to propose the health of our gallant entertainers the Infantry Volunteers and Major Smith. To this gallant officer's untiring energy is due to the high state of efficiency to which the corps has attantned, and to the public spirit which induced the members of the corps to enroll themselves and undergo the fatigue of drill, guard mounting & c, often at great personal inconvenience, we may in a great measure attibute the peace and tranquillity which has reigned in our city, and hence in all Eastern Bengal through out these troublous times. I give Major Smith and the Infantry Volunteers; May they never have to fire anything more destructive than a feu de joie,. and may they all continue to have what my friend on the left visibly has, and what I doubt not they all really have, a soul above buttons.

Together with their healths I must beg to propose that of their able supporters the cavalry. now alas! scattered to the four winds of heaven, but to whom we are indebted in no small degree for the share they have taken in the laborious duty of guarding the city in these times. With them I would couple the name of Lieutenant Hitchins their gallant commandant.

MAJOR SMITH in responding said, I am proud of the honor of being in command of the Infantry Volunteers. They have cheerfully undergone the inconvenience and fatigue incident to learning their drill. In putting them in the way of rendering successful serving in case of an emergency. I have not worked alone. No small share of the thanks is due to Mr. Harris, and to Mr. Kally who I regret has not been able to join us on the present occasion, both of whom have materially aided me. Tomorrow or next day. I go to hunt a more intractable animal than Dacca Volunteers, and must for a time resign my command. Mr. Peason, in the name of the Volunteers I return thanks for the honor you have done us. May the same cordially between all of us always exist as exists now.

LIEUTENANT HITCHINS : I have not come here to night as a volunteer, though I hesitate not to say that had it been necessary, I would have been proud to wear the uniform. The Cavalry are not very efficient : but I have no doubt that had we been called out we should have been found rough and ready for any work, and should have been delighted to join our gallant hosts.

LIEUTENANT DOWELL, begged to propose in Major Smith's name, that during his temporary absence Mr. Harris be requested to take command of the Dacca Volunteer Infantry.

MAJOR SMITH said : Celebrated actors have often been indulged in more than one last appearance, I rise therfore to beg your indulgence for one more toast which I ought to have included in my last, but my teelings overpowered me. Among the many good effects that have resulted from volunteering, not the least important has been, the bringing together of many who were quite unknown to each other before, the gathering together of the scattered elements of strength, and that banding together like Englishmen which, more than any

thing else. promotes a strong feeling of mutual sympathy. This good result and that Dacca ever had Volunteers at all is owing in no small measure, to Mr. Forbes our Powder Monkey, whom, for his efficient services, we now promote to the rank of Quarter Master of the Infantry Volunteers.

MR. FORBES : I beg to return my thanks for the cordial manner in which you have drunk my health. It has ben more pleasing to me as it was altogether unexpected. I turn now to a more agreeable duty—As we are all friends here to night, as the enemy has been as carefully excluded from our meeting as she is from mount Athos, where even the very hens are driven from the mountain if they are not cocks, and the ducks are murdered if they are not drakes— trusting gentlemen that there are no traitors in the camp.—I dont care to mention, that, whatever I may say elsewhere, I consider Woman to be the nobler sex, and I am sure that all here who are good husbands will agree with me. How would they get on I should like to know if their wives were to leave them to themselves. We have an old Scotch song which describes how a wife, on her husband's grumbling that he had all the hard work while she stayed at home at ease, offered to change with him. She took out the plough and did a good day's work on returning at night she found the poor husband in a sad plight. The children had tumbled into the fire and burned theselves, the dog had worried the geese, the oat cake had caught fire and set fire to the chimney, which had burned down half the house, and the husband was more than half dead with fatigue and vexation. The woman could do the man's work, but the man could not do the woman's. Married men confess that the woman is the better half. Bachelors will do so when they get married. As for a man who intends dying a bachelor I hope there are none such here, If there are, all I can say is that I pity and despise them dont speak to them.

It may not be theologically correct to say so, but I think the assertion that the chief end of Man is Woman, is one which will not rashly be denied. Just look at a man's life. In infancy his whole aim is to please his mother. In hobbledehboyhood, though he is a despiser of the sex by profession. Still there is a little girl in some neighboring

boarding school that he would willingly thrash half a dozen boys for. In youth what mean all these brushings and oilings, and perfumings? Not surely to be admired of men? After marriage we have high authority for saying that a man's aim is to please his wife, and when he grows old his daughter sons are kicked out into the world to rough it for themselves. No man pities his son who may be driving a cart or breaking stones on the road in Australia. So long as he is doing well and making money. But for his daughter every exertion must be made.

'That he might not beateen the winds of Heaven
Visit her face too roughly."

All man's strivings and efforts have woman as their aim. He tries to earn money enough to marry, to become "settled" in life. You see he considers himself unsettled until woman joins him. I think I am right then in saying that the chief end of man is Woman.

We are forced to drink public toasts first, but whenever we are relived from routine, how quickly do we turn our thoughts to the Ladies. This is always the toast drunk with the best will.

The ladies in India have well deserved all we can say of them. During the present distresses how nobly have they not behaved! We hear a lady scream at a mouse, but that is when there is no real danger or difficulty. She is supposed by some wicked people to do so in order to have an opportunity of throwing herself into a pretty attitude, or to hint to the gentlemen that they are not attentive enough to her. But in the real difficulties they have been lately surrounded with, have we head of the most tenderly nurtured girl complaining? Not but we have had such girls as Miss Wheeler, who so revenged her injured honor that she saved that of all the poor women at Cawnpore; for the natives were, after her deed, afraid to be left alone even with a European girl. We have such women as Mrs. Skene, only 21 years of age, who at Jhansi loaded her husband's guns for him as long as there was any hope, and when that failed, smilingly received his last kiss, and that death from his hand which was far preferable to her than dishonor.—it might be thought that our timid women would wish to run away to a place of safety. We have not found it so, We have found

husbansds and fathers anxious to place them in safety, but we have heard of much resistance to separation, and in many cases they have prevailed. We have found no cowardice among our women. They have nobly upheld, the name of Englishwomen. Our own ladies have excited the admiration not only of a local poet, who has celebrated them as the 'plucky ladies of Dacca', but of many in Calcutta, Not one of them left us during our time of danger.

Gentlemen I need not say more in asking you to drink the health of the Ladies," with nine times nine.

MR. CARNAC then said :—The honor of proposing the next toast has fallen to me, though after the eloquent speeches we have heard, I could have wished that the duty had been entrusted to some one better able to do justice to the meritorious body whose health I am about to propose. My theme is in some sort connected with education. I cannot say too much about education; indeed where would the fine speeches we have heard to night have been without it. It is this that has given them that oiliness so happily alluded to by our worthy Chairman. The rebellion has seriously retarded the progress of education in the Upper Provinces. I do not believe there is a single College or school in those parts which is open just now. And even in Calcutta, the daily arrival of troops from England has made it necessary that the educational buildings should be given up for their accomodation. Here is Dacca, the work of education has I am happy to say, remained uninterupted, a state of things that we owe, in no small degree, to our sailors and volunteers—But after all the efforts that have been made to teach the natives to estimate the advantages of an English education, what has been the result? Many have learnt its value and have been trained to appreciate the higher sphere of being to which it introduces the mind. On the other hand. the present rebellion has afforded painful evidence that signal failure has mingled with our success. How has that miscreant the Nana Saheb profited by an English Education? How has he benefited by English Society? What elevation of nature or sentiment has he experienced from the study of English books and literature? The massacre of Cawnpore furnishes us with an anwer. His appreciatoin of the advantages he enjoyed was

shown in the murder of our countrymen, of our innocent country-women and their helpless babes! But I must not go on in this strain for fear of trespassing upon your time. I do not wish to be understood as proposing to hurt death and destruction against the cause of education. My only object was to express a regret in which I am sure you all share, that we would have been obliged to witness so awful an instance of human perversity, an instance the like of which I hope for the honor of our common nature, may never again appear in the records of crime.—Gentlemen. I propose that we drink to the health of the Principal and Professors of the Dacca College, who in addition to the ardous duties of their office, have cheerfully come forward to share in the defence of this city, and are formost in the ranks of the Dacca Volunteers. It is their work to let light of knowledge into the minds of the natives : but I have no doubt, that if stern duty required it, they would, with equal success, let the light of day into their bodies. I cannot conclude without tendering the thanks of the community to the Principal in particular who was foremost in the offer of his services as a Volunteer, and who, I may add, is the best shot of all his brethren in arms.

MR. BRENNAND said in reply :— Gentlemen, You must allow me to return thanks for myself and my Colleagues not as Professors of the College, but as Volunteers. In this character we do not claim to have done more than our duty nor more than has been done by most of those who compose the volunteer corps. It is counted an honor to be among the foremost to fight in the cause of one's country, and it would have ill become of us as Englishmen to have held back in the support of order, when our country women and their children were exposed to the greatest dangers. That dangers were real I firmly believe, and we shall have benefited but little by the awful experience of our disaster in the North West, if we allow ourselve to become supine, and to relapse into a state of fancied security because danger is not now so apparent.—it is no sign of weakness that we acknowledge by our warlike demonstrations the existence of danger But it is a sign that whatever be that danger, and from whatever quarter it may come, we intend to be in some measure prepared for it, and if it can-

not be evaded, to most in with firmness. And who can say that this danger has not been averted from us altogether by the steps taken to preserve order, by the vigilance of the Magistrate and of the Cavalry Volunteers by the salutary awe inspired by the seamen, and by the certainity that every man among us is armed. The fanaticism of the sepoy is strongly seasoned with cowardice. He has given ample testimony of the respect in which he holds the bravery of our countrymen by the dastardly manner in which his attacks have been made on them. The fiendish frenzy with which he exulted over the temporary prostration of our power, is a confession of the strength of that pervading influence, the authority which he had hitherto worshipped.—in the midst of all the calamities that have befallen us it makes us feel proud of our countrymen when we hear of the many be handed down in history for the admiration of posterity, feast of chivalry that will bear comparison with the most renowned exploits of antiquity. Our nation has cause to be proud of her sons and she will not be tardy in acknowledging her pride—Already the Press, the agency through which these deeds have become known, has conveyed to our English homes records or acts of valour that excite the enthusiasm of our brethren and the admiration of all Europe.— And shall we ignore the services of the Press because it is now under a cloud? Were we to do this, we should, like the treacherous and cowardly sepoy, be rendering evil for good. to the Press we owe it that all England is aroused to a sense of our danger, that England even while weeping over the sufferings of her bleeding offspring, declares that no mercy shall be shown to the horders of sepoy murderers.—in this, one of the nooks of the world, we could with difficulty exist under the dust and the cobwebs of time, prejudice, ignornace, superstition and fanaticism, were it not for the Press.—The Press is a great coadjutor in th cause of education. As a great public teacher it is incessantly impresssing its lessons on the public mind. Can we believe that the public is not the better for those lessons, lessons on the history of humanity.—It may sometimes have prostituted it services to the advancement of Political intrigue or to aid in some objectionable design, but it would be a poor compliment to the intelligence of our countrymen, if such practices

could be long carried on with success.—As the medium, for the expression of public opinion, it has exercised a mighty influence over the destinies of our empire.—But I should be greatly wanting in respect to your judgment were I to enumerate all the advantages we derive from the possession of the Press. I shall only detain you to propose the Press and its worthy representative in Dacca.

MR. FORBES rose and said :—Gentlemen. A facetious friend advised me to return thanks for the toast just drunk, by simply stating that being gagged, I could not be expected to speak. I could not adopt this advice, for the simple reason that I am not in reality gagged, and never felt that I say so. When the unfortunate Press Act was passed, the rule I laid down for my own guidance was to go on as if the law has no existence. It is a law that no man had a right to make. It is a law which declared me to be a seditious traitor to Britain, and more than that—a madman; for if I had done or would do anything to further any cause but that of Britain. I should be working as hard as possible to cut my own throat.—I trust that I have been able to write as I would have done though there had been no Gagging Act. Although I must confess to having perceived a vein of irritation, when speaking of public men, running, thorugh my writing, which was not there before. But I will leave the Gagging Act and say a few words about myself in Dacca. Most of you remember the birth of the DACCA NEWS, what a little thing it was—it is not very big now, though it is more than a year and a half old. It had some hard fights to go through in its infancy, diseases which threatened to carry it off— a sort of Literary Measles and Hooping Cough. It was threatened with two or three actions for libel, it received mysterious warnings from men in high places even before the passing of Gagging Act when it caught a real pucka warning, which might be liken to an attack of small pox or jungle fever in comparison with the diseases of its childhood, but it managed to survive it all—I fully recognise the great power that is welded by the Press. I consider that the office that I have taken upon me is a most important one, and that if I lend that office to the furtherance of any unworthy views or ends, I shall be guilty of a great crime both before God and Man. I have long held the opinion that to

discover and publish truth, on whatever subject—whether it be the truth about the number of stomachs possessed by an animalcule, or the stupendous truths of Astronomy, or the mysterious truths of religion—I say the discovery, and publishijg as soon as discovered, of truth, can never be attended with disadvantage or danger. I have always made truth my aim in the DACCA NEWS. I have been mistaken. I have been wrong. I have published what was not true, but not intentionally. I think that I have been the means of doing some good. I trust I have not done much harm. It is wonderful how the truth carries a man through. When you have told the truth you are quite comfortable : you have to take no thought for the morrow. But if you tell a lie, you have to spend today in inventing more lies, the consequence of the first one. to be told tomorrow.—I have always tried to avoid hurting the feelings of any one. I have attacked, in good strong language to, the public acts of many a man. I trust I have never muddled with the sanctity of Private life.—The consequence of a steady adherence to those two rules is, I am happy to say, that I have made many friends. I do not know that I have made any enemies. I am almost certain that I have no enemies here. I have always fought fairly. I have gone before a man and hit him in the face. I have not sneaked up behind and stabbed him in the back. It would not be English to hate a man who fights fairly. It is for this reason I think I have no enemies.—I have been actuated in my career as a journalist. I think I have a right to declare those principles, for the DACCA NEWS has. even in these troublous times, when the daks of so great a part of India are closed, a circulation of nearly 400 copies. —You may gentlemen, be my enemies at heart, but if you are capital dissemblers, for I have not the least suspicion of any one here : and the kind way in which you have drunk my health may be false, but ifso, it is a capital imitation of the real.

MR. FORBES again rose and said :—I dont know Gentlemen whether it is a misfortune when he is supplied with a good deal of it, nor does.he consider the man who gives him it, or puts him in the way of getting it, an enemy. Nay, so perverted are we, that we are in the habit of considering such a one as a benefactor, and giving him our

honor and our praise, even though he should overwhelm us with the foot of all evil."—One who has done more than most of us to increase the wealth of Dacca is Mr. Willam Foley. He was one of the first to come amongst us for the purpose of engaging solely in commercial pursuits. There had been gentlemen long settled in the district as Indigo planters, men to whom Dacca owes much, for they, especially Messrs Lamb and Wise, had done much in introducing new crops, machinery & c, and though much which they attempted failed, simply because two men could not do every thing, and watch over every thing, and be in every place at once : still much remained, and added to the wealth and resources of the district. But they were land owners and engaged chiefly in the cultivation of the soil. Mr. Foley was. I believe, the first who came here to do simple commercial business unconnected with land or Indigo : at any rate he was the first who engaged in it on a large scale. He has been followed by others, and the result is a good deal more of the root of evil being added to us than we had before.—This commerce is a great magician. She has worked great wonders even in the short nine years I have known Dacca. One of the most remarkably visible effects he has produced is the causing the old palquee to be superseded by wheeled carriages from the lordly barouche of the wealthy baboo, with its four lamps. down to the jingling fabric of rope, bamboos and old iron of the horse breaker which once was a buggy, but now is licensed to carry not less than six at once.—But wealth has penetrated the cottages of the poorer classes, and so it ought to have done, for boat hire has doubled within the last 4 years, and the wages of labour increased 35 percent during the same period I was talking with an old Hindoo the other day— a very orthodox old gentleman, and by no means an admirer of English innovations. Even he acknowledged that the cottage of the ryot presents a very different interior from what it did some ten years ago. Those who could afford to eat but once a day, have now their two meals regularly, and fish three or four times a week instead of once. Their plates and dishes are now of brass or copper, instead of earthen ware or more plantain leaves. Those who used to dine in the dark, can now afford oil for a lamp. The ploughing cattle are increasing in number,

and the jungle is falling fast ; and all this is the effect of the coming of such men as Mr. Foley who have raised the price of Jute from 5 annas a maund to Rs. 2.5 and have trebled o quadrupled the prices of almost every article of produce while they have "developed" others such as hides, which were not exported before. There is still room for twenty Mr. Foleys more, and I only wish we had them and that they all dealt with the Dacca Bank.

But Mr. Foley, besides being a benefactor of mankind in general by planting the Root of all Evil amongst us, and watering it and causing it to flourish, so that it is growing up into a stately tree, deserves more particularly the thanks of the Christian Community of Dacca for the handsome way in which he placed his house at their disposal to be converted into a Fort. This was but of a piece with Mr. Foley's usual hospitable acts. It was no "breaking out in a new place" with him. But we are not to refrain from thanking him because Mr. Foley acted only as he usually does.—I have great pleasure Gentlemen in proposing the Commercial Interests of Dacca, coupled with the name of Mr. Foley both as a merchant and a Volunteer, in both of which capacities he has served well of his country all of us.

LIEUT, MCMULLIN proposed the health of Mr. Harris who succeeds Major Smith in command of the Infantry Volunteers.

MR. HARRIS : Gentlemen :—You have taken me quite by surprise. For the unexpected honor which you have done me in drinking my health. I beg to return you my best and most cordial thanks. Our worthy Major has been good enough to propose me as a fitting individual to officiate as commandant for him during his absence from the station : and for his good opinion of me I am very thankful : but it is not only necessary gentlemen, to be proposed, before I can succeed to so high an honor, but that you Volunteers, particularly. should be disposed to elect me as your commander, —for it is yours not only to propose, an dispose, but to depose too. I can only say, should you be inclined to raise in : at one bound, from the ranks to the prominent position of leader, I will do my utmost to perform my duty towards the corps, and I confidently hope while seconded by your usual zealous efforts, that our gallant commandant, on his return, will not have

occasion to think that the Dacca Volunteer Infantry have in any one respect deteriorated from the high degree of steadiness and discipline which now so eminently characterizes, and does them individually and collectively, so much honor. Before I take my seat, I again beg to thank you, most sincerely, for the honor you have done me.

The next toast which was "The Interests of Science and the Dacca Museum" was received with great cheers, chiefly because it was coupled with the name of Dr. Green.

DR. GRREN :—In rising to return thanks for the toast you have so kindly drunk. I beg to disclaim all pretensions to stand here as the representative of Science. I see around me some who are able to speak deeply on the subject which I certainly am not. I allude more particularly to one gentleman. (Mr. Brennand) one of our noble volunteer Corps, who is able to gauge the skies measure the Sun and Moon, and with equal profoundity I have no doubt fathom the Ocean depths. In coupling the Dacca Museum with the other part of the toast, you have done much honor to Mr. S. Robinson and myself, and have touched a chord which vibrates with thrilling interest. In our scheme of the Dacca Museum we are following out, although at an immense distance, and on a miniature scale, the grand project now carrying out at the India House, of collecting together all the productions,of this vast country, Animal, Vegetable, and Mineral and shewing the purposes to which these may be supplied in the arts and every day concerns of life. We have already made some little progress toward our object, and we beg of you to come an see what we have accomplished. We can shew you the warlike weapons of the Hill tribes of Upper Assam, of the Cossayah and Tipperah Hills, their coarse manufactures of cloth. some of which, howerver, in their decorative design and colouring exhibit considerable taste and ingenuity. We can shew you specimens of the mineral wealth of these districts, of coal, ironstone, pertroleum, and of limestone now forming the mountain top, once forming the bottom of ancient seas, and thickly embedded with marine fossil shells., We can shew you beautiful fibres of the leaf, the stem, and dried pulp or husk, of the fruit of a variety of plants, many of them little regarded common inhabitants of the

jungle. To mention some, for instance the dried husk of the Coconut fruit, the fibres of which twisted into a cable hold fast the ship riding out the storm. We can shew you delicate fibres of a common despised jungle plant, capable of being converted into a fabric equalling in texture the far famed grasscloth : fibres again of such strength and fineness that when used as bow strings these elicit most charming notes. We can shew you skeletons of the Boa Constrictor, of the much dreaded Saurian tribe, of the shark. We are advancing in our collections of natural History. We can shew you numberless vegetable productions. In short gentlemen. we beg of you to come and see our Museum : and hope for your interest and support in every way. I again return you many thanks.

. LIEUT. DOWELL proposed the health of Mr. Samuel Robinson the Secretary to the Museum.

Mr. Robinson returned thanks.

Some beautiful songs were then exquisitely sung, and after "Auld Lang Syne" "by the full strength of the company" the guests separated about half past twelve.

14.11.1857

[Editorial]

We must apologise for our want of editorial matter this week, but we have had so much military duty to do, that we have been forced to neglect our paper, thirty three hours of duty on a stretch, especially when one is laden with unaccustomed revolvers and ammunition, is not favorable to the production of editorial effusions. We say nothing of parades twice a day. We might manage to get an even in spite of them.

It may be as well to remind much of subscribers as are land holders, and to beg them to remind their friends again of the fact, that any one harboring or assisting rebels and traitors or mutineers, renders himself liable to confiscation of his property; and on the other hend, those who catch and deliver up to the police escaped mutineer, or to give information where he is, or who in any way assists him in his escape, is as guilty of mutiny as the man himself, and must expect severe punishment. It will not do to plead fear, or to say that the fugi-

tive was a strong man, and that he speakes in a weak Bengalee who could not struggle with him. He can at least run towards the nearest thannah and give information. When he has done so he has cleared himself from all blame. If not he is liable to punishment and has failed in his duty to the state. We would be sorry to think that there are disoyal persons in Dacca, but if there are not, how was it that the collectory Guard passed through the most populous part of the town with such ease and safety?

28.11.1857

CORRESPONDENCE
THE BUDMASHES OF DACCA

Our judicious magistrate ought to take a particular notice of the nefarious habits of the Khootees or Musselmen of very low birth, they are a very tyrannical race and men of improper and loose conduct which requires a great restrint upon it. The Budmashes whom we are often speaking of greatly from this class of men who in their manhood become wither Dugneeers of gamesters and consequently theives.

Many of the Khootees residing in Kultabazar, Narinda and Bungsal have been found several times engaged in rape when a women happens to pass by any unfrequented lane, on even by a public road, when they attack in a large company.

Your most obedient servant
A SPECTATOR
28.11.1857

OUR BATTLE

On Saturday afternoon an express was received from Chittagong, stating that the companies of the 34th stationed there mutinied on the night of the 18th Instant, and plundered the treasury of about 3 lakhs of rupees. set the prisoners free, blown up their magazine, burned their lines, killed one native a burkindaz, and after giving liberally of their plunder to the mosques and fakeers departed with the blessings of the latter exlaiming, 'We have attained our utmost wish, but have not succeeded in killing the Feringhee dogs." It seems that they went to the houses of the civilians for that purpose, but luckly did not find them. Having place their plunder upon elephants. It seems they were

afraid to take the main road to Tipperah, apprehensive of being intercepted at the crossing of the Fenny. It is believed that they have gone by the hill path towards Sylhet. On receipt of this intelligence in Dacca. It was resolved at ten o'clock on Saturday night to disarm the Sepoys here amounting, with 26 Artilerymen, to about 260 men. The Volunteers were during the night, warned to assemble at the Bank from whence they were to march to the Collector—the Collectory guard where disarmed. A little before five the sailors with their two mountain howitzers. under command of Lieutenant Lewis, and accompanied by Messers Carnac, Bainbridge, Hitchins, Macpherson, Dr. Green and the Reverend Mr. Winchester, marched to the Collectory Gaurd which they disarmed without resistance. The executive officer's guard was soon after marched in without their arms by Lieutenant Rynd, and the whole remained in charge of the Volunteers. Soon after very heavy firing was heard in the direction of the Lall Bagh and the alarm was given that the men were escaping by one back windows in the room in which they were. Unluckily their officer was at that moment absent from them, having gone towards the gate, some shots were fired at the escaping men but Mr. Harris Officiating Commandant of the Volunteers, and Mr. Davidson the Commissioner, having given the order not to fire, they all got off except two who were wounded, and one man who remained 'staunch' being threatened by a volunteer that he would be shot if he moved. Another man was was found lurking in a hut in the neighberhood later in the day. From forty to fifty men must have thus escaped, but as they were unarmed they are probably reserved only to be hunted down by the police. The Volunteers then leaving the Treasury in charge of the Nazir, occupied the sailors hospital close by till firing had ceased, when they again mounted guard at the Treasury.

Messrs Moran and Reily in the afternoon rode out to Major Smith's house. Four of the guard of ten men there had deserted with their arms. The remainder gave up theirs.

But we must now follow our gallant little band of sailors. Away they marched at a tremendous pace for the Lall Bagh situated about a mile and a half to the westward of the Treasury. On their way they

detached a party who disarmed the Commissarial guard. On approaching the Lall Bagh, Lieutenant Mullin accompanied by two sailors went in advance to warn his men of what was coming but being immediately fired at, the whole body advanced, and deployed into line, to understand what follows we ought to have a plan of the place, but that is beyond our power to give, so we must try what we can do by means of description. The Lall Bagh is the ruins of the palace of Shah Jehanghire, but little of it remains with the exception of a great mound of ruins extending four about four or five hundred yards with its sourthern front towards the river. Upon this have lately been built pucka barracks for the sepoys. At right angles, towards the west, there runs a high wall, part of the old palace. The other two sides are enclosed by low wall. In a line running from the east westwards in the middle of this enclosure, are, first a large tank, next the hospital a two storied building, behind that Beebee Purree's tomb, which is a mosque of considerable size, next a large mosque. behind which are the gun sheds which contained two fine six pounders with 26 artillerymen. The guns were drawn out, one on each side of the mosque. One of them commanded the whole range of the barracks, and the other played upon the sailors howitzers, which were commanded by Mr. Connor and Lieutenant Dowell of the Artillery, the latter having volunteered to work one gun to assist in taking his own.

Immediately on the sailors deploying into line, a tremendous fire of gripe was opened upon them from the guns at the same time with a flank fire from the barracks, which having jaffrey work verandahs, afforded shelter to those who fired, as though loopholes, Lieutenant Lewis leaving his howitzers to the care of themselves and of Mr. Carnac and one of two other gentlemen who acted as riflemen, wheeled his men right shoulders forward, and gave the order to charge up the face of the mound which was done in most gallant style, and here several men fell wounded one more tally. Then commenced work of driving the sepoys barrack to barrack along the whole length of the mound, and in doing this Lieutenant Lewis received a slight wound in the thumb, from a sepoy whom he met turning a corner on reaching the end Mr. Midshipman Mayo headed a most gallant

charge, being about twenty yards in advance of his men upon the guns, whereupon the day was won and the sepoys retreated as fast as they could by the North west corner, their retreat being quickened by a shell or two. We are very sorry to say that Dr. Green while attending the wounded at the hospital, was shot through the leg. He is however doing well. The man who shot him was concealed in an officer's tent pitched in the compound. He received his due reward however. The man who killed him told us the whole story and how he suspected that tent, and entering it found the man—'and then?' said we, 'Why I skivered him and took his ramsammy'. 'His what said we, 'His ram-sammy,' upon which he drew from his pocket a sepoys bead necklace.—At the hospital the Revd. Mr. Winchester, distinguished himself in assisting careless of the hot fire to which he exposed himself in carrying the wounded from the field. There were in all about ninety Europeans engaged in this battle against about two hundred sepoys fully prepared for many of their pouches were found to contain sixty rounds of ball cartridge, besides a number of cartridges concealed in their beds and other places and fighting under cover with two, excellent guns. Of the Europeans one was killed and eighteen wounded, three it is belived mortally (two have since died.)

We would account for the sepoys as follow :—8 were 'staunch', about 60 escaped after being disarmed, 41 were killed, 6 were sick. 8 wounded and prisoners I artilleryman has delivered himself up, in all 124; so that 136 remain to be accounted for. Of these many must be wounded and but few armed for a great many muskets were taken from the Lallbagh. A few armed men have been seen going in the direction of Mymensing.

The people of the town behaved remarkably well assisting with loud shouts in dragging the guns and tumbrils to the Collectory, and looking on admiringly when the sailors having made a prize of the drum and rifle belonging to the sepoys marched back to their barracks playing the British Grendiliers. Those who witnessed the fight say that there was not a single man who did not behave most bravely. One man in particular, of the name of Brown we believe, fought six sepoys at once and disposed of a good many of them. 'our sailors' have

fought, their officers say like perfect devils, and yet they did not bayonet the sick in hospital though more than one shot came very suspiciously from that direction.

Mr. Bainbridge cannot be said among the wounded, though he certainly ought to be. He was pitched over the parapet and fell about 20 feet, on his back upon a hard heap of bricks and got up quite unhurt. Strong patrols of volunteers both cavalry and infantry were out during the whole of last night. A shot or two was heard from the jungle, supposed to proceed from the wounded trying to keep off jackals.

Mr. Conner in command of a gun-boat, started for Naraingunge and Dowdkandee on Sunday evening.

LIST OF KILLED AND WOUNDED

Henry Smith *Punjaub* A. B. Mortally (since dead)

Neil Mc. Mullen *Punjaub* A. B. Mortally (since dead)

James Munro *Zenobia* A. B. Mortally (since dead)

William Herden *Punjaub* A. B. Mortally (since dead)

Robert Brown *Zenobia* Artillery Gunner Dangerously (since Dead)

Charles Gardiner *Zenobia.* A.B. Dangerously (am putation of leg)

Alexr. Mc Miller *Punjaub* A.B. Dangerously

Doctor W. A. Green Civil Surgeon Severely

William Alfred *Zenobia* A. B. Severely

George Adams *Zenobia* A. B. Severely

Samuel Hughes *Zenobia* Bombardier Artillery Severely

George List *Punjaub* A. B. Severely

Thomas Kean *Zenobia* Artillery Gunner Severely

James Hughes *Zenobia* Artillery Gunner Severely

Lieut, Lewis *Punjuab* C.F. Slightly

John Jones *Punjuab* C. F. Slightly

Patrick O' Brien *Zenobia* A. B. Slightly

William Brown *Punjaub* A. B. Slightly

Lieut Dowell Bengal Artillery Slightly (Spent ball)

28.11.1857

EXECUTION OF FOUR MUTINEERS

On Thursday morning, exactly at seven o'clock, four of the mutineers who had been caught on the afternoon of Sunday, having been condemmed to death by Mr. Abercrombie the Judge the day before, were hung on one gallows erected on the open space before the Church. The sailors were drawn up on the right of the gallows, and the Volunteer infantry, having the Cavalry on their right rank were drawn up in front. Three of the men adjusted the ropes round their own neeks and died bravely. The fourth fainted from terror, and had to be supported. Their wounded commander were brought from the hospital to witness the execution, and the men where had remained true were also marched up. The whole was conducted with the utmost decency and in complete silence.[7]

DACCA-FRIDAY 27TH November 1857

A soobadar and Naick of the 73rd were hung this morning on the gallows opposite the church. The arrangement were the same as yesterday, except that the volunteers, who have received a considerable addition to their strength, were drawn up on the sight of the gallows, the cavalry in front... From what we can learn, about 75 of the mutineers escaped in a body from the Lallbagh, about half of them armed, and many badly wounded. They proceeded very rapidly in the direction of Mymensingh with the intention of making for the headquarters of the regiment of Jalpaigooree.

28.11.1857

ANOTHER SEPOY WAS HANGED

Another sepoy was hanged on Tuesday morning at a quarter to seven, opposite the church : All went off well and quietly and in the same order as usual.

12.12.1857

ADDITIONAL PARTICULARS CONCERNING 'OUR BATTLE'

There are one or two things which the hurry of the last week caused us to forget mentioning in the account of our battle last week. The first is to account for how the sepoys were found in such a state of preparedness to receive the disarming party, as to have their uniform coats on, and the guns drawn out and most advantageouly

posted. It has been ascertained from the accounts of those who have been subsequently taken, that at the time the Collectory guard was disarmed, three men were started from those back windows which afterwards gave us so much trouble in permitting the escape of the guard, who ran—and every one knows how fast a Pandy can run—and gave their comrades warning. They had at least a quarter of an hour's notice, which was amply sufficient for men who have been accustomed for the last three or four months to be turned out during the night for roll call, to get ready in. That they were ready is proved by the fact, that the sailors were saluted with a volley whenever they came upon the ground, and that the guns were rapidly and admirably served, as was evident from the way in which the ground was ploughed up and from our great loss in artillerymen.—When Mr. McMullin went forward he called for the Havildar Major, whereupon he was immediately fired at by one man, and then by seven. He luckily escaped unhurt, but his syce was wounded.—We stated that it was the afternoon when Messrs Reily and Moran rode to Major Smith's guard and got them to deliver upo their arms. Instead of this it was between nine and ten o'clock. The guard asked for their officer. These gentlemen told one of them to come into the city, about a mile and a half, to get assurance for protection, while one of themselves. Mr. Moran, remained with them as a hostage for good faith—After the Collectory Guard had fled, 8 muskets, some of them loaded, a box of ball cartridge, and a box of caps, were found, which had been over looked by the disarming party.—Some of the Dacca correspondents of the Calcutta papers have rather undervalued the severity of the fight. When we mention that one man in every five of our small force was eighty of the enemy have been accounted for as killed or wounded we think we have given sufficient proof that the fight was no childs play. It appears that the adjutant of the 73rd had been particularly careful in training his men to fire low. He had taught them well, for not one of our men who were wounded by gunshot wounds were hit above the waist, and hence so many fatal cases—The Mutineers used or made away with gun-ammunition as folows : 16 cartridges, 10 round shot, 8 canister (grape).

5.12.1857

FORT FOLEY

It will we believe be allowed by all, that for many years to come Dacca must be garrisoned by European troops. If so, Where are they to be placed? The.frist thing we must look to is their health. Dacca has as every one knows who has had any long experience of it, not only one of the most pleasant climates in the world—neither oppressively hot in summer, nor inconventently cold in winter—but it is eminently a heathful climate for Europeans provided that certain conditions be observed. The first of these is that the European should sleep at least ten feet higher than the surface of the ground. Those who in the town of Dacca neglect this precaution are invariably attacked by a low fever which is very fatal. We ourselves lived for two years on a ground floor in the Mofussil, without experiencing the least ill effect, but we could not have done so in the town itself. The second is that the situation of the house in which the European lives shall be near the river. Up and down the river for twelve months of the year a healthful breeze is perpetually blowing and it seems to be necesary to the European constitution, that it should be nourished by this breeze. It is indeed to this cause that we impute the healthfulness of the European planters throughout Bengal. Their factories are all situated either on the banks of large rivers, or in the midst of wide spreading plains. The situation of our European troops then must be such as to give them the benefit of a two storied house, and of the pure river air. Such a situation and such a house we have in Fort Foley, the old Dacca Mills. There are three stories there, which would accommodate we do not know how many hundred men, and many hundred more might find quarters, were but a few additions. Fort Foley is situated at a most convenient point. It is not in the city, and it is hardly out of it. It juts out into the river, so as to receive the full benefit of the south east monsoon, and also that of the westerly winds. Boats always sail either up or down the river with their sails set. Fort Foley is in such a situation as to receive there benefit of both breezes.—The Lall Bagh, for instance, which was fixed upon by a medical committee, who bestowed three day consideration upon Dacca, and who were so afraid of Lord Dalhousie's having supposed them to be influenced by

private interests in Dacca, that they refused to take any evidence whatever, or even to dine with their own private friends in the station, the Lallbagh is far from being a healthy situation, for during the whole of the South East monosoon the wind has to blow over the whole of the city, reeking with the filthiest exhalations in the hottest season of the year, that season which produces such exhalation and their general results in their greatest virulence, before it reaches it. The only thing that saved the native troops from being annihilated in such a situation, in that quarter of the city where it is notorious that cholera first shows itself, was the fact of their being raised about twenty feet above the ground, and thus breathing an atmosphere which the heavier and more noxious gases had not contaminated. Barracks have been lately built there—more like stables than anything else— and at an expense which none but government would have sanctioned; which, however native troops may have flourished and remained healthy in them, would be death to Europeans. The Barracks there could not be so disposed as to receive the South East monsoon through the whole range—and this we believe to be absolutely necessary to health. At Fort Foley they cannot help doing so.—At the Lallbagh there is no room for a parade ground. At Fort Foley there might be made, at the expense of a few thousand rupees, a magnificent parade ground, which would at the same time add to the health of the men stationed there. Houses for the officers would also be required. Some such houses are already on the property; the remainder of those required might be built at a small expense, is consquence of the vicinity of the Sampore brick fields. There is no place in Lower Bengal where lime is cheaper than in Dacca and that it is not as cheap again is in consequence of the iniquitous denial of justice in the Cherra hills. Perhaps Sampore, a little lower down the river, might be the more advantageous situation for Europeans, but there an immense deal of building would have to be done, and the formation of a parade ground would cost a great deal of money. If we were Government, we would buy the Mills property first, and Sampore next, and cut down every tree and level the whole place, and fix our troops in the Mills. The whole expense would soon be saved by the

healthiness of the men. Except those who committed suicide by drunkenness. Government ought not to lose a single man.

In last August, shortly after we had determined on constructing a fort here as a refuge for our women and children in the day of trouble, and for ourselves in the last extremity, we wrote an article advocating the construction of such forts at every station throughout Bengal. We have had several alarms here, which have shown the advantage of such a fort in tending to disembarass the fighting men of those who were too cowardly to strike a blow in the open on their own behalf, and in providing a place of real security for women, children and those who were too weak to fight. Fort Foley was the spot chosen, and fortified by us with all the skill available in Dacca. It is close to the river, affording both water sufficient for every purpose, and a means of obtaining supplies and communication with the world without. If a regiment or part of a European regiment should be stationed there, the fortifications should be enlarged and made stronger, and the bulk of the treasure, the records, and in fact everything which is valuable in the station, with the exception of those things which are in daily use, should be lodged there, and kept there for many years to come. And the same ought to be the case in every station in India. Forts able to acommodate the usual number of the Christian inhabitants of each station ought to be constructed at once and the treasure and the records and the ammunition, at stations where it is thought advisable to have only native troops, and all that is valuable ought to be kept there. In August last we advised forts. Now when the danger has come and has passed, they are improvising them at Chittagong, at Noakhally, and at Burrisaul. Had the forts existed, perhaps the danger had never come. We believe that this would certainly have been the case had they had a fort, and volunteers raised and armed from the large Christian population of Chittagong. The sepoys would never have dare to have attached a fort in which the treasure was lodged, and which at the least symptom of danger, or even on the occurrence of a panic, was flocked to and guarded by an armed Christian population.—If Fort Foley were garrisoned by but a few Eourepean troops, with cannon, and the Treasure lodged there and were the place but fortified as it is now, to say nothing of the strength which a few hun-

dred rupees would add to it, no force that might enter Bengal would ever dare to attack it, until that day come when the European shall have changed places with the muslin clad Bengalee. When that day comes, then Dacca and the surrounding districts, garrisoned by Europeans and having a fortification in the possession of the latter, may surrender. But until it come, the thing is a impossibility, and it is absurd even to suppose it. When, however, the European or Christians are left but a handful in number, they can only, however they may be resolved, but die uselessly to the honor of their country, or run away ingloriously, to the shame of their country but to the exaltation of their own wisdom and common sense. Had we but forts we need do neither. We therefore advise that Fort Foley should be purchased by Government and garrisoned by Europeans; so shall the Europeans be healthy and we safe.

12.12.1857

A DAY OF THANKGIVING

Say 'Thank you' is one of the first lessons taught by a parent to a child, whether the gift be a penny piece, of a knot of sugar of a new frock or a new toy, the 'Say thank you' invariably follows its bestowal. The child soon learns that if it wishes for and asks for anything good, it will be expected to say 'Thank you :' if it receive it. We stand in exactly the same relation to one whom we address night and morning as "Our Father which art in Heaven." as the child does to its earthly parent, if there be a want felt in a family by the little community of brothers and sisters, the invariable result of their consultations is. Let us ask Papa. Papa can do everything for us and can give us everything we can desire. We know that Papa is very fond of us and that if he refuse us anything it is not because he cannot give it to us, for which or us ever for a moment imagines that there is anything that Papa cannot do, and when he refuses we never doubt his love; if we did we should be most miserable, for if Papa do not love us who will where shall we go? When Papa refuses, we believe him fully when he says that it is not good for us. We trust in his judgment as to what is and what is not for us. But when our requests are granted, we know that we shall have to say 'thank you.' But as it is with an earlthly father, so it is with our Father which is in Heaven. On the 20th of june last

we urged upon Christans in India, and upon Lord Canning, the head of a nominally Christian Government, the duty of applying to our Father by prayer, prayer as a nation and a Government for deliverance from the evils which were praying daily, in their closets were 'wrestling' with God for help but as a nation we had not applied to Him at last there was an ungracious concession to our wishes. A day was set apart for special prayer to God, which was already His. But He who is gracious and merciful did not visit us with the punishment due for offering that which was 'blind and maimed' he has answered our prayers and has sent us great deliverance. But he will expect us to say "thank you" for that deliverance. He will not permit us to pass it by in silence as if it were something that we had deserved of earned. We have received since june very great gifts and mercies from Him. In Dacca we have been preserved, and we are happy to say that two portions of our community, the Baptists and the Armenan, gave thank to god for that preservation.

The members of the English Church cannot thank God till authorised to do so by their Bishop, and he has authorised them to thank God for any of the mercies vouchsafed to India, probably because he is a member of a State Church, of which Queen Victoria is the Head and Lord Canning Queen Victoria's representative; and it would be perhaps improper in him to thank go for anything until Lord Canning declared that it was the time to do so, Lord Canning may probably think that we ought not to 'Hulloa till we are out of the wood' that we ought not thank God till we are in perfect safety, but suppose that we were to be driven out of India within the next month, have we nothing to thank God for? We are taught to pray to Him for our daily bread-not for our weekly or monthly or yearly bread. We may have no bread tomorrow, but is that a reason why we should not give thanks for that which we have enjoyed today? Would an earthly other excuse the thank you" of today, on the plea that we expected something more tomorrow and would then thank for today's gifts and tomorrow's together? Certainly not, and the fact that we had refused thanks for todays gifts, might probably be the reason of his refusing to give us those of tomorrow. And have we as a nation has Lord Canning as a Governor, nothing to return thanks for? What is the cap-

ture of Delhi by a handful of men, who might have been, without men of the world considering it anything extraordinary, annihilated by disease? It is easy for us to say that one European Soldier is equal to ten or twenty of a hundred natives;—but who has given them that power? We used to say that no European could fight during the hot season and the rains. The seige of Delhi was carried on by Europeans during that season. Who gave them the power to resist the deadly sun and rain? In the relief of the Lunch now garrison nothing to say 'thank you' for? May is not the very existence of that garrison, the preservation of its women and children and its brave defenders a subject alone for continued praise and thankfulness? Who was it that kept that small body of native troops faithful when 1000,000 of their brethren had mutinied? Who was it that enabled the European portion of the garrison to undergo unexampled fatigues during five long months? Is there any one among us who would not have felt the destruction of that noble little band as a personal bereavement; as if we ourselves had lost a relation. And have we no cause in their preservation, to say 'thank you'? Though all were to go ill with us from this day forth, still would not gratitude itself call on us to thank that God-that Father who hath done such great things for us. Are we to wait till our delieverance is complete before we offer upon our thanks to God? We are accustomed to accuse the Bengalees of ingratitude, to say that they have no such word as gratitude in their language which is untrue by the way, as most sayings about the Bengaless are-but might not the Bengalee whom we had rescued from starvation and raised to wealth plead, with reason equal to that which induces us to put off our thanks giving to God, that he was not sure whether his riches would last, whether he might not lose them all, had he himself be reduced to a worse condition than if he had never ahd them, as he would never have felt the want their loss occasioned; and that he would wait till the day of his death, and if his riches increased up to that time, and he died wealthy, he would then thank us, we should consider one who reasoned thus as ungrateful in the highest degree, but is not this the reasoning which would prevent us from setting a part a day of natinal thanks giving for the acknowledgedly very great mercies we have already received, because reverses may happen hereafter, and we should find out that we made a mistake in thanking God!

In these days of Sadduceeism-of acknowledging neither angel nor spirit, of ascribing everything that happens to ourselves either to Providence, of Nature, of Chance, instead of the direct interference of God in our personal concerns in these days when the plenary inspiration to the Bible is doubted, and men set aside a word here and a phrase there as a mistranslation of an interpolation, because it does not exactly with our theories, we do not know that it is much to our purpose to quote the Bible in support or an argument. We beg pardon of our readety coincide for stopping here for a moment to ask, whether they would not think one very absurd if he questioned the plain reading of an act of parliament of Henry the Eighth's time merely because it did not agree with his own notions of what ought to have been then done and said. But this is what is done everyday with the Bible. Lawyers everyday stake a case upon the interpretation of a single word in an act of Parliament, a part of the law of England : but if we venture to found an argument upon a whole sentence of the law of God, we are told immediately an interpolation, and it is set aside, even though it should most completely agree, in the opinion of eminent juris consults in that law, with the whole tenor of the Book of the Law. The plenary inspiration of Acts of parliament is disallowed by no man, but the plenary inspiration of the opinion of eminent juris consults in that law, with the whole tenor of the Book of the Law. The plenary inspiration of Acts of Parllament is disallowed by no man, but the plenary inspiration of the Bible, the Law, of God, is disallowed by all but a very few, we shall however assume that a great many of our readers do allow the plenary inspiration of the Bible that is that it is a law which must be weighed word for word, and syllable by syllable, as if it had issued from God's own Press, with God's own name as the printer. We find it written in that law. 'Be careful (full of care) for nothing but in everything by prayer and supplication with thanks given' But we cannot give thanks for what we have not received. It is therefore the natural interpretation of this precept that we should give thanks for the fulfilment of each prayer as it is granted. We have prayed for the fall of Delhi. It has been granted and ought to have been followed by thanks giving. We have prayed for the rescue of the garrison of Lucknow. That too has been granted and ought to have been followed by thanks giving. These have been national prayers,

and ought to have been acknowledged by national thanks givings as each prayer. We have had men praying hard, wrestling with god as Jacob did with the angel, that Dacca might be preserved, Dacca ought to have in return for its preservaiton, returned thanks. Its requests 'were made known unto God.' They were answered : and immediately after that answer ought to have followed the' thanks giving : of Dacca. We have already said that it did follow on the part of a large portion of the community, but it did not on the part of the State Church. We are afraid therefore that the state will be held accountable before God for its neglect on this point.

The state has been hitherto guilty in not having applied to God for assistance. We believe that the day of Humiliation, so far as the state went, in as far as it was appointed for a Sunday, in the intimation of it being expressed in such terms as would allow each Hindoo and Mussulman in the country to join in it, to have been an abomination in the eyes of the God of the Christian. Let not the day of Thanksgiving which we hope will soon be nationally appointed by the representative of the Queen and nation, partake of the same character. Let it be a day peculiarly our own. God forbid that any Christian of any denomination should be excluded from joining in it, but let not the declaration which we hope will soon issue from Government that a day has been set apart for thanks giving to the Lord God of Heaven for his mercies towards us, who are but a handful in this land, be so loosely worded as that it may be joined in by any sepoy, who, seeing that we were gaining the day had laid down his arms and submitted to an already triumphant Government. Let it be a thanksgiving to the God of the Christian; the Christian who, however darkly clouds may lower around him, will never deny that name, the only name of which man has any right to be proud.

We sincerely hope that not many days will pass over our heads before we see a day of thanksgiving appointed by the Government, for the great mercies we have lately experienced, for we find the promise appended to the text we have already quoted to be as follows. And the peace of God which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus."

26.12.1857

THE HERO OF DACCA

We hear of natives being rewarded eveywhere for the conduct during mutinies. As those who did then duty in Dacca, with the exception of Kajeh Abdool Gunny who subscribed a lakh of rupees to the 5 percent loan, were Armenians and Europeans we do not wonder that no thanks or praise has been meted out to any one here. We are however anxious that we should have at least one distinguished felow citizen, and that at least a few drops from that rivers of bounty which the Governor General is causing to flow in the north-west, should trickle towards Dacca. We would therefore recommend to the. Right Honorable the Governor General, for a pension of Four rupees per mensem Amdhoo, one of the Garrywans of the Municipal committee, who on the morning of the 21st of November last, drove his car laden with ammunition for the sailor guns to the Lallbagh, and when the fight there begun, not run away as did his fellow garrywan but made himself extremely useful by carrying ammunition from his cart to the guns. It must be that this was a service of no slight danger, as one great loss of men was at the guns. We are assured that the poor fellow acted with the greatest coolness and self-possession, and we do not see why he should not be made independent and happy for life at a ridicullously small expense to Goverment. The fact as to whether he acted or not as he is said to have done can easily be established by reference to Mr. Lewis. Let us have at least one rewarded man in Dacca. The man we have recommended is in everyway qualified. He has acted well and is a native. We should have misled to say something about batta and prize money to one sailors, but as they are Europeans it would be but a waste of time to do so, they must be content with being branded as a set of blood thirsty ruffins by Mr. Layard.[৪]

3.7.1858

The Dhaka News, Dacca, 1857-1858.

টীকা

১. ১৮১৭ সালের ৩০ এপ্রিল মাসিকপত্র হিসেবে প্রকাশিত হয় ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া। ১৮২০ সালেব জুন মাসে শুরু হয়, এর 'কোয়ার্টার্লি সিরিজ'। সাপ্তাহিকে রূপান্তরিত হয় ১৮৩৫ সালে।

১৮৮৩ সাল পর্যন্ত সাপ্তাহিকটির প্রকাশনা অব্যাহত ছিল। ঐ বছর স্টেটসম্যান পত্রিকার ওভারসীজ এডিশন অন্তর্গত হয়ে যায়, 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া'র। কিছুদিন পর 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া' অন্তর্গত হয়ে যায়, স্টেটসম্যান-এর এবং এর নতুন নাম হয়— 'দি' স্টেটসম্যান অ্যান্ড ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া'। পরে 'স্টেটসম্যান' থেকে ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া নামটি বাদ যায়। ফ্রেন্ড.অব ইন্ডিয়ার' যারা সম্পাদক ছিলেন তাঁরা হলেন—

১. উইলিয়াম কেরি

২. জোসুয়া মার্শম্যান

৩. জন ক্লার্ক মার্শম্যান

৪. মেরিডিথ টাউনসেন্ড

৫. হেনরি মিড

৬. ড. জর্জ স্মিথ

৭. জেমস রাউটলেজ

ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া ও ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর সংকলনের জন্য দেখুন—
Benoy Ghose, *Selections From English Periodicals of 19th Century Bengal,* Vol iii. iv. v. and vi. Calcatta 1980. 1979. 1980. 1981.

২. তোষাখানা।

৩. ফলিস মিল। ১৮৪০ সালে অনামা এক শিল্পী বুড়িগঙ্গার তীরের ঘরবাড়ির এক ছবি এঁকেছিলেন। সেখানে একটি দালানকে উল্লেখ করা হয়েছে ঢাকা সুগার ওয়ার্কস কোম্পানি নামে। অধ্যাপক শরীফ উদ্দিনও জানিয়েছেন, সেখানে একটি চিনির কল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিলো কিন্তু তা চলেনি কোনদিন। ১৮৫০-এর দিকে তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। 'ঢাকা নিউজে' এর উল্লেখ পাই ময়দার কল হিসেবে। তাতে অনুমান করে নেয়া যেতে পারে, চিনির কলটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর উইলিয়াম ফলি নামে এক ইংরেজ মিলটি কিনে স্থাপন করেছিলেন ময়দার কল এবং তখন তা পরিচিত ছিল ফলিস মিল নামে।

১৮৫৮ সালে, বিদ্রোহের পর কলকাতা থেকে সরকারি সৈন্য এসেছিলো ঢাকায় তাদের একাংশকে রাখা হয়েছিলো এখানে। আর্থার ক্রের সরকারি রিপোর্ট থেকে জানা যায়, পরবর্তীকালে সেনা বাহিনী রাখার জন্য ফলিস মিলটি সরকার কিনে নিয়েছিলেন এবং ১৮৬৭ সালে সরকারি নির্দেশে মিল [দালান] এবং তার আশপাশের অঞ্চলকে ক্যান্টনমেন্ট

হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিলো। সম্ভবত সেই সময় থেকেই দালানটি এবং এর আশপাশের অঞ্চল পরিচিত হয়ে উঠে মিল ব্যারাক নামে।

মুনতাসীর মামুন, *ঢাকা : স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী*, ঢাকা, ১৯৯৩।

৪. ১৭৯৮ সালে কলকাতা থেকে চার্লর্স ম্যাকলিনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিলো 'Bengal Horkaru' ১৮৪৪-৮৩ পর্যন্ত এটি প্রকাশিত হতো 'Bengal Horkaru and the Indian Gazette' নামে। হরকরা থেকে রচনা সংকলনের জন্য দেখুন, Benoy Ghose, *Selections from English Periodicals of 19th Century Bengal*, vol. I Calcutta, 1978.

৫. এইচ, এল, ড্যাম্পিয়ার পরবর্তীকালে বাংলা সরকারের সচিব নিযুক্ত হয়েছিলেন (১৮৬৭-৭৭)

৬. বাংলার প্রথম লে. গভর্নর স্যার ফ্রেডারিক জেমস হ্যালডের শাসনকাল (১৮৫৪-৫৯) ঘটনা বহুল। তিনি ইংরেজ ও হিন্দু সম্প্রদায় দ্বারা সব সময়ই সমালোচিত হয়েছেন। ঢাকা নিউজ-এও হ্যালিডে প্রসঙ্গ বারবার এসেছে। তাই তাঁর সম্পর্কে খানিকটা বিস্তারিত বিবরণ দিচ্ছি।

১৮২৪ সালে তিনি বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন। ১৮৪৯ সালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব ও ১৮৫৩ সালে গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিলের সদস্য মনোনীত হন। গভর্নর জেনারেল লর্ড ডালহৌসি তাঁকে লে. গভর্নর মনোনীত করে লিখেছিলেন—

"The fittest man in the service of the Hon'ble Company to hold this great and most important office is in my opinion our colleague, the Hon'ble F. J. Halliaday."

তাঁর সময়ে ইংরেজি বা দেশীয় ভাষায় সেক্যুলার শিক্ষার ওপর জোর দেয়া হয়, স্থাপিত হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, সাঁওতাল বিদ্রোহ সংঘটিত হয় তাঁর সময়ে। বিধবা বিবাহ আইন পাস করা হয় হ্যালিডের উদ্যোগে। পুলিশ বাহিনীর উন্নয়নেও নজর দেয়া হয়।

হ্যালিডে সম্পর্কে ইংরেজরা কি ভাবতেন তাঁর খানিকটা পরিচয় পাওয়া যাবে ঢাকা নিউজ-এর বিভিন্ন সংবাদ ও নিবন্ধে। হিন্দু সম্প্রদায় কি ভাবতেন তার উদাহরণ পাওয়া যাবে—হিন্দু প্যাট্রিয়ট ও অন্যান্য পত্রিকায়। ব্লেয়ার ক্লিং লিখেছেন—

"Halliday was extremely urpopular with the Hindu communty of Calcutta which refused to sign the customary eulogistic address on his depearture from Inida. The Hindoo Patriot commented that his carrer was "remarkable for selfishness aggravated by intense meanness for insolent blunder, systematic insincerity. his supply of a proposal to introduce Bible study into Government schools, his indulgence of the indigo planters, and, above all his support of the Rent Act of 1859."

বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন—

C. E. Buckland, *Bengal under the Lieutenant Governors*, vol, 1. Delhi. 1976 (Reprint). pp. 1 162.

Blair B Kling, *The Blue Mutiny*, Calcutta. 1977.

৭. এ যুদ্ধের বর্ণনা বিভিন্ন জন দিয়েছেন বিভিন্নভাবে। তবে, ইংরেজ পক্ষের একজন কমান্ডার লে. লুইসের ও ভলানটিয়ারদের ভাষ্যের জন্য দেখুন,
C. R. Law, *History of the Indian Navy*, vol ii. London. 1877.

৮. ইংরেজ পক্ষে যারা লড়াই করেছিলেন তাদের মধ্যে আর্থার মেয়ো ছাড়া কেউ-ই কোন সামরিক পদক পাননি। সি, আর, ল, এ প্রসঙ্গে, লিখেছেন—
'But the gallant Commander of the Brigade. who had been wounded at Dacca and again on this occasion [Assam], received no reward and died plain Lieutenant Lewis, while lieutenant [now retired commander] Davies, familiarly known in the service as 'Pat' Davies, has been permitted to linger on in constant suffering from his wound, after having served his country with brilliant courage and devotion at Mooltan to Burmah, China and India, either of these officers been in Royal service. it. is not too much to say that they would received promotion and the C. B. C." R. Law, *opcit* p. 452.

সংকলন—২

We will now trace the services in detail of the Detachments of the Indian Navy, each of which had a distinguishing number, as far as we are able from incomplete records, for which we are indebted to Captain Campbell, to the officers concerned, or, where these are deceased, to their representatives, and to other sources printed or unpublished.*

Very good service was perfomed at Dacca on the 22nd of November, 1857, by No. 4 Detachment and two armed pinnaces, commanded by Lieutenant T.E. Lewis, First-Lieutenant of the 'Punjaub,' of which we gather details from an account by a gentleman, a member of the small local Volunteer force of Europeans and Eurasians, who was present on the occasion. The Detachment, which reached Dacca in August, numbered eighty-five seamen, and the following officers:—Lieutenant Lewis, Acting-Master Connor, Midshipmen W. Cuthell, and A. Mayo, of the 'Punjaub', and Mr. Brown, boatswain. The men were trained to the utmost pitch of efficiency by their gallant Commnader, and officer remarkable for military attainments which would have qualified him for the post of adjutant of Artillery or infantry.**

At a late hour on Saturday night, the 21st of November, a letter,

---

* It appears that this practice of passing themselves off as officers of the Indian Navy, is still practised by certain indivisuals who have no right to the title, to the detriment of the reputation of the old Service Lieutenant H. Ellis (late I.N. (now Master Attendant at "Singapore) writes to us, under date, the 8th of September, 1877 :.... "People in the Straits are all under the idea that the Indian Navy means the Bengal Marine. I assure you there were several of these Bengal marine men down here when poor Burn and I first came, who always signed themselves I.N. and had it on their cards. I have often been so much annoyed that I make it a point never to talk about the Service."

** Late Lieutenant Governor of the North-West Province and Governor of Jamaica.

forwarded by express, was received at Dacca, announcing the fact that the detachment of the 34th Regiment Bengal Native Infantry, stationed at Chittagong, had mutinied, and that, after burning their lines and destroying a great deal of property, they had marched off, apparently to join the 73rd Native Infantry and Artillery at Dacca. The head-quarters of the Regiment which thus commenced the bold game of rebellion, had been ignominiously disbanded at Barrackpore, on the 29th of March, when the first blood of the mutiny was shed; but as soon as the three companies quartered at Chittagong, heard of the disgraceful conduct of their comrades, they addressed to the Government a memorial, in which they declared they would remain 'fatihful for ever.' The Sepoys at Dacca were known to be in league with the 34th Native infantry at Chittagong; and it became apparent that the news of the latter having mutinied, would be received by them through the post the next day, so that it was desirable to disarm them forthwith. Accordingly Mr. Carnac, the officiating Collector and Magistrate, called a council of war, composed chiefly of civilians, to divide with him the responsibility of the mesaure. Lieutenant Lewis and the two subalterns in command of the Native troops were present, and, thought the non combatants were, in a majority, it was finally resolved to act as the circumstances of the case imperatively demanded. The necessary arrangements were, therefore, made as quickly and secretly as possible for disarming the Sepoys at daybreak the next morning. The Volunteers were individually summoned from all parts of the city and station, and ordered to meet at the Bank at four o'clock on Sunday morning. The position was calculated to inspire some degree of anxiety. The detachment of the 73rd Native Infantry numbered three hundred men, who were supported by fifty Native Artillerymen, with two field-pieces and a well stocked magazine of ammunition.

The Volunteer named before says :—"Against three hundred and fifty men with their 9 pounder field guns, backed by a large and disaffected Mahomedan population, our great standby and tower of strength were the sailors of the Indian Navy, about ninety in number, and their two small howitzers which they dragged along with them as

children would their pet toys. They were as fine and trustworthy a handful of men as anyone would wish to command. Well conducted. well under control, well drilled, steady under arms, full of spirit and confidence, and like all British tars, with no end of 'go' in them. Three months of constance and careful training had made them equal in every practical quality to as many old and experinced soldiers, and as shortly after their arrival in Dacca, they were armed with the Enfield rifle, in the use of which they had been thoroughly instructed, it may well be imagined that they were regarded by the English residents with considerable confidence. Still, if they had to fight, there would be four to one against them, and, for so small a body, those would be great odds.

"The Volunteers, though embodied solely for defensive purposes, were yet prepared to go wherever, and do whatever they were ordered. Composed of a few Englishmen of a sprinkling of Armenians, but principally of Eurasians, or half-castes, of men belonging to all classes, and of all ages and professions, it was not deemed advisable to expose them, except in case of extreme necessity, to the risks and dangers inseparable from actual conflict with the Sepoys. Yet they were well drilled and confident in themselves, although so few in number, and might have been safely entrusted to perform more hazardous duties then they were required to do on this occasion.

"At half-past four o'clock on Sunday morning, the 22nd of November, about thirty Volunteers had assembled at the Bank. Not more than a hundred yards off was a guard of fifty Sepoys over the Treasury, which, it was said, contained at the time twelve lacs of rupees (R120.000), and, a couple of hundred yards distant, on the other side of the Treasury. was the house occupied by the sailors as a barrack. These buildings were situated in the centre of the Civil Station, between which and the Sepoy lines, a distance of about a mile, was the native city, chiefly inhabited by a large and fanatical Mahomedan population. It being necessary to disarm the Treasury guard first. It was clearly of the ulmost importance that it should be accomplished without firing shot, which would have alarmed the

main body of the Sepoys on the other side of the city This was managed with great success. The Volunteers, according to agreement, reached the Treasury at a quarter to five o'clock, when the sailors, after disarming the guard, were in the act of marching out of the gateway. Not a hitch had occurred, and the work had been done as quietly as possible. It now devolved upon the Volunteers to act as a guard over the Treasury, and to prevent the disarmed Sepoys from leaving the large enclosure in which it was situated; while the sailors, about eighty strong, accompanied by a few civilians and Volunteers, and the two officers who nominally commanded the Native troops, made the best of their way through the city to the Lallbagh, where they hoped to catch the Sepoys napping.

"The Lallbagh was a large enclosure, which had formerly been a garden áttached to the fort and palace, now in ruins, belonging to the Mahomedan rulers of Eastern Bengal. Immediately to the right, on entering the gateway, was a large tank, and to the left a high embankment, between which ran a narrow road, about forty yards long, which it was necessary to pass before one could be said to be fairly in the Lallbagh. In the centre of the enclosure were two large, high, solid, stone-built structures—a tomb and a mosque, each with a dome in the centre, and minarets at their four corners, which were still occupied by the Sepoys as barracks. These two buildings were directly in a line with one another, and had a space of about fifty yards between them, while the distance from them to the front and rear of the enclosure was one hundred yards either way. Upon the high and broad embankment to the left, which extended the whole way along the west or city side of the Lallbagh, were built, crosswise, several ranges of barracks, which were loopholed for defence, and commanded the mosque and tomb in the centre. Only two or three of these barracks were occupied as dwelling places by the Sepoys, though all of them were so far completed as to be capable of being stoutly defended. The wall by which the Lallbagh had been enclosed to the right had fallen into ruins, and had gaps in it in several places. Lastly, to the right of the tank, not far from the gateway leading into the enclosure, was the Sepoys' hospital and here and there, dotted over the green, were a few

trees and bushes, which however were not thick enough to afford any shelter.

"Such was the position occupied by the Sepoys, who, unfortunately, were not unprepared for the visit which the sailors were about to pay them. How they became informed of it, or whether they had been informed at all, and were about to assume the offensive, was only a matter of conjecture; but it is certain that the saillors on their arrival found the Sepoys drawn up in line ready to receive them. The mosque was strongly occupied, and formed their centre, and on either side of it was drawn up the main body, with the two 9-pounder guns masked in the rear. The sailors marched into the enclosure in columns of sections, and had not formed line, when the officer who Commanded the three companies of the 73rd Native Infantry, and the Lieutenant in command of the Native Artillery, rode forward to persuade the men to lay down their arms peaceably, and to assure them of protection if they would only obey orders. But they had not gone many yard when the Sepoys prepared to fire a volley, which at once put an end to all further attempt at conciliation, and which, fortunately, was fired too high to do any harm. The sailors were then in line, with their two howitzers on their left, and a volley from their Enfields, which did excution, was the prompt reply. Before the smoke cleared away, and without waiting to load, the order was given to charge ; but the Sepoys who had no relish for the sailors' cold steel gave way at once, and rushed to occupy in greater force the buildings around them, especially the barracks on the embankment. The sailors followed, bursting open the doors and driving the Sepoys out, or, wherever they had the opportunity, shooting or bayoneting them. Once an entrance was obtained, the Pandies bolted, and only stood their ground behind the loopholed walls, where they could fire with safety at the sailors while engaged in forcing their way into the buildings. Another party was employed in attacking succesively the mosque and tomb in the centre of the Lallbagh, while the howitzers were hotly engaged in the endeavour to silence the Sepoys 9-pounders. In

Clearing the mosque and tomb, many of the Sepoys, who were unable

to escape in time, were found huddled up beneath their beds, and received their quietus'. Others were 'prodded' out at the point of the bayonet, and run through when endeavouring to get away. The sailors did most of their work with the 'cold steel,' and rarely stopped to load; they never asked or received quarter from their opponents, and they granted none in return. Thus, with few exceptions, all put *hors de combat* were killed. When the Sepoys were brought to bay, it became a hand to hand, life-or-death the struggle. In which the victor only survived. It is difficult now to realise temper of those stern times; but it may well be imagined how fiercely a handful of Englishmen would fight for their lives against fourfold their own number of Sepoys, with Cawnpore! ringing in their ears for a battle cry.

"After about half an hour's hard fighting, the buildings were carried, though not without considerable loss to the sailors, who especially suffered when clearing the loopholed barracks on the embankment. As a last hope, the Sepoys made a stand around the 9-pounder gun, which they had still at work, and the sailors now prepared to charge down upon it from the top of the embankment, where they remained under cover to reform after capturing the barracks. A young midshipman,* who was awarded the Victoria Cross for his gallant conduct on this occasion, placed himself at the head of about twenty of his men, and led them at full speed, and with a loud hurrah!" straight upon the gun. At almost the same moment, the party of sailors that had cleared the mosque and tomb appeared in view on the left flank of the Sepoys, who, together with the artillerymen, instantly broke and fled, abandoning the the gun, which they left loaded, and which was at once turned and fired after them, while the howitzers played upon them from the centre of the enclosure and flanked them in their flight.

"The fight was now fairly won. In less than three quarters of an hour the sailors had beaten shamefully four times their own number of Sepoys out of a very strong position. Only three prisoners were taken, of whom two were wounded; and when the action was over, forty-one Sepoys were lying dead in the Lallbagh. Of the sailors,

* Mr. Arthur Mayo, a gallant and accomplished young officer.

three were killed and sixteen wounded, one of whom subsequently died, nearly one man in every four having been hit. Altogether, it will probably be admitted, this was a sharp morning's work before breakfast in the usually quiet city of Dacca. It was all over in an hour. Not a Sepoy remained alive in the place, excepting the three who had been taken prisoners, and two of these were wounded. That so much had been accomplished with comparatively so small a loss on our side, was decemed worthy of sincere congratulation by everyone. The station was now perfectly safe, for no one anticipated that the mutineers from Chittagong would pay it a visit after the utter defeat of their brethren of the 73rd Native Infantry. Still, every precaution was adopted. Sailors and Volunteers remained on duty throughout the day and the following night; and, for somedays and nights afterwards, guards and patrols were active and vigilant both in and around the city and staiton but nothing further was seen of the defeated and disbanded Sepoys, nor did the mutineers of the 34th Native Infantry approach Dacca. The formers were flying northwards, it was reported, many of them mounted on ponies, and in less than three weeks after their defeat, the wretched remnant that still survived were hunted through the jungles of Cachar into the desert wilds of Bhootan, where eventually they either became slaves or else perished miserably.

"The morning after the fight, Monday, the 23rd of November, the three Sepoy prisoners were taken before the Zillah Judge, who sumarily sentenced them to be hanged on the folllowing day. There was not the least doubt or hesitation about it; and Lord Canning's celebrated Five Acts, which conferred upon every civilian in the country the powers usually exercised under martial law by a General Drum-bead Court, fully warranted the procedure. At the appointed hour, the ground being kept by the sailors and volunteers, the three Sepoys were escorted under the ugly and grim-looking beam by a strong guard of Native police. A dense spectre-like multitude, dressed in white, had assembled from the city, and occupied every point from which a view could be obtained of the drop. A dead silence prevailed among the vast multitude of people, who could be seen in every direction as far as the eye could reach. The magistrate read and explained to each of the three men their crimes and sentences, but they said

nothing; the sharp cold of a chilly November morning made them shiver, and the near approach of death had apparently struck them dumb with terror. The two wounded men had to be assisted up the drop; the other, a Hindoo, went up the ladder unaided, and met his doom with much fortitude. He at the last moment preferred a request to the magistrate that his body should not be burried, but be thrown into the river. He was told that his request was granted. When the bolt was drawn, and three men were seen suspended in the air, a low long continued moan arose form the hitherto silent multitude, which soon afterwards dispersed as quietly as it had assembled. This was the last act of the mutiny at Dacca. For seven long months the European inhabitants had been sleeping with revolvers under their pillows and with their guns loaded by their bedsides. ready for immediate use. All care and anxiety were now removed".*

Lieutenant Lewis says in his despatch :—"The treasury. Excutive Engineers and Commissariat Guards were disarmed without resistance. We then marched down to the Lallbagh; on entering the lines the Sepoys were found drawn up by their magazine, with two 9-pounders in the centre Their hospital and numerous buildings in the Lallbagh, together with the barracks which are on top of a hill, and are built of brick and loopholed, were also occupied by them in great force. Immediately we deployed into line, they opened fire on us from front and left flank, with canister and musketry. We gave them one volley, and then charged with the bayonet up the hill, and carried the whole of the barracks on the top of it, breaking the doors with our musket-butts, and bayoneting the Sepoys inside. As soon as this was done. We charged down hill, and taking them in flank, carried both their guns and all the buildings, driving them into the jungle. While we were thus employed with the small arm men, the two mountain train howitzers, advancing to within 150 yards, took up a position to the right, bearing on the enemy's guns in rear of their magazine, and unlimbering, kept up a steady and well-directed fire. Everyone, both officers and men, behaved most gallantly, charging repeatedly, in face of a most heavy fire, without the slightest hesitation for a moment I beg particulary to bring to notice the conduct of Mr. Midshipman Mayo, who led the last charge on their guns most gallantly, being nearly twenty yards infront of the men. I regret to say our loss has been severe, but not more. I think, than could have been expected from the strength of the position and the obstinacy of the defence. Fortyone Sepoys were countcd by Mr. Boatswain Brown dead on the ground and eight have been since brought in desperately wounded. Three also were drowned or shot in attempting to escape across the river. I enclose the list of killed and wounded. Dr. Best being ill. Dr. Green, Civil Surgeon accompanied the detachment into action, and was severly wounded. I was ably seconded by Mr. Connor, my second in command. Lieutenant Dowell Bengal Artillery volunteered and took command of one of our howitzers, which he fought most skillfully to the end of the action. We were also accompanied by Messers. Carnac. C. S. Macpherson and Bainbridge and Lieutenant Hitchins. Bengal Native Infantry, who rendered great assistance with their rifles, and so whom my thanks are due."

This success broke up an intended junction of the 34th Bengal Native Infantry at Chittagong, who were marching on Dacca. Having received the news of the action, they halted irresolutely tried to cross the river above Dacca, were opposed by a gunboat, judiciously despatched by Lieutnant Lewis for the express purpose, and finally dispersed into the jungles, where they perished miserably for want of food, or were hunted down by the Sylhet Light Infantry. If the Indian Naval Detachment had been repulsed in their attack on the mutineers position, and had been obliged to retreat, a general massacre would probably have ensued, for in their rear lay the city of Dacca, with a large fanatical Mohammedan population in a very excited state. A copy of the following letter of thanks, addressed to Captain Campbell, was received by Lieutenant Lewis, who was himself wounded in this action, signed by Mr. Beadon, Secretary to Government, dated the 4th of December, 1857.—"The Governor-General in Council, while deeply regretting the loss which the Detachment has sustained, is happy to recognise the excellent services it has rendered on this occasion; and His Lordship in Council desires me to request that you will convey to Lieutenant Lewis, and to the officers and men under his command, the which they performed their duty. His Lordship in Council notice, thanks of the Government of india for the gallant manner in with approbation, the conduct of Mr. Midshipman Mayo in leading a charge against the enemy's guns". The Bombay Goverment also under date the 12th of January, 1858, issued the accompanying complimentary order, signed by Mr. (now Sir) Henry L. Anderson. Secretary to Goverment :— "I am directed to inform you that the Right Honourable the governor in Council has perused with heartfelt pleasure the record of the Gallantry dispalyed by Lieutenant Lewis and the officers and men of the Detachment of the Indian Navy at Dacca; and His Lordship in Council has no doubt that the services performed by Lieutenant Lewis and his men will be appreciated by the Right Honourable the Governor General in Council."

Immediately on receipt of intelligence of these events. Lord

Canning despatched to Dacca, in a steamer and flat, three companies of H.M.'s 54th Regiment, and on that and the following day, two Datachments of seamen, with guns, also proceeded to Dacca, whence they were pushed on to Rungpore and Dinagepore, and, on the 4th of December, the Detachment of the 54th Regiment also left for Sylhet. It is almost impossible to exaggerate the magnitude of the service rendered to the State by Lieutenant Lewis at Dacca, but Sir Frederick Halliday, in his Minute, has only done justice to the opportuneness of his arrival and the brillant service perfomed by his handful of seamen.*

Government considering it advisable, at a later date, to strngthen both Dacca and Sylhet, three companies of H.M's 19th Regiment were despatched to Dacca, and, on their arrival, in August, 1858, the greater portion of No. 4 Detachment was pushed on to Sylhet During the stay at Dacca, the Detachment lost some men of fever...

Cherles Rathbone Law, *History of the Indian Navy*, (in 2 vols), London. 1877.

---

* The Lieutenant Governor—a man not given to exaggeration and himself described by Lord Canning in his Minute of the 2nd of July. 1859 on the 'Services of the Civil Officers and others during the Mutiny.' as the right hand of the Government of India."—says of the position of affairs at Dacca—"Uninke most other Divisions of Bengal where in case of any outbreak, a temporary divergence of troops intended for the Upper Provinces was sufficient either altogethor to prevent any outbreak, or at least to avert the more serious consequences, this part of the country was far removed from any possible resource of this kind. All despatch of aid must, therefore, be quite independent of any other movement, whilst the only means of despatch was by a circutous water route. The presence of the sailors prevented any serious consequences that would have been otherwise certain to arise from the mutinous outbreak which afterwards occured, and which but for their presence would probably have happened at an earlier and more embarrassing time, and I need hardly say, been attended with much more serious consequences."

সংকলন—৩

ঢাকার সিপাহিদের মোকদ্দমা সংক্রান্ত বিচার বিভাগীয় দলিলপত্র

বাংলার বেসামরিক কর্মচারী উইলিয়াম ম্যাকফারসনের জবানবন্দি

"On Sunday morning last I accompanied the Sailors under command o Lieutenant Lewis and the civil authoutities who sent to the Lallbagh for the purpose of disarming the Sepoys. When we arrived the (illegible) Lieutenant Leiws. Lieutenant Mr. Wheller at (...illegible) for the purpose (...illegible) to deliver up their arms and was immediately fixed at by one man whose example was followed by all the (...illegible). The main body of the sailors then advanced leaving (illegible) by the Guns with their (...illegible) Gunners behind. I (illegible) with the latter. A contest then commenced between the sepoys and sailors. The sailors (illegible) opposite the Hospital about the middle of the contest. I distinctly saw a man dressed in a (illegible) coat in the Verandah of the Hospital with his muskets as lies hand apparently as if he had first disclassed it. He had advanced in front of the Verandah and was retreating when saw (illegible). It was too far off to (..illegible) him. They were firing from Guns (illegible) direction and it is the confusion I cannot say for certain (sic) that a fire arms was discharged from the Hospital. I was present during the whole time of the outbreak. The Guns were practically (illegible) by the sailors and the sepoys were driven out and were (illegible). The man whom I saw with a musket in the Hospital must loose free there all along. He could not have come across of the plain in the face of the two Guns from which a bid situated (sic) suppose that he was either of the sick or on their attendant."

W. Mcpherson
28 November, 1857

বঙ্গীয় পঞ্চম পদাতিক বাহিনীর লেফটেন্যান্ট ক্লিনলেস আর্থার হিটোবিয়াসের জবানবন্দি

I was a Lieutenant of the late 5th Bengal Native infantry Regiment and an Executive Officer at Dacca. On Sunday morning my guard was disarmed at 5. o'clock by the sailors and I was included in the Native body of the sailors (illegible) to within about a quarter of mile of the Lallbagh where was (illegible) present, men giving notice to the sepoys of the Sailors approach. I reached the Lallbagh Gate about the same time as the sailors. When I heard one or two shots fired by the sepoys followed up by a volly from the whole body of the sepoys in the lines. These men were principally collected about the (illegible). The Sailors then charged forth after the sepoys who made considerable resistance firing their muskets and by guns at us. They fired not only to grape but would shot, one of which through the Barrack. After about an hour fighting the sepoys were diven from the Guns and out of the Lallbagh altogather (....illegible) shots cause from the direction of the Hispital but I cannot say that I saw any are (Sic) fled from there

Did you apprehend any sepoy during the day time?

Yes I apprehend the man is (...illegible) of me (Witness persual Reis-17). After the Mutin was quelled. I went to the Treasury with the Volunteers when it was (...illegible) that sepoys was hiding in a house close by I took charge of a party of 6 men of Volunteers and proceediding to the house found him in a hut outside. He was unaccused and dressed in plain cloths. He made us (illegible) resistance.

Clenless Arthur Hitobeous
(Signed) Robert Abercromble
28 November, 1857

ঢাকা কলেজের তৃতীয় শিক্ষক স্যামুয়েল রবিনসনের জবানবন্দি

I was one of the Volunteer guard on Sunday morning last and came a few minutes after 5. a.m. After the volunteers had marched into the treasury compound. I was posted with the volunteers under the Portico. About a minute of 2 after we had taken out posts the sepoys of the guard at the Executive Officer's house (sic) We (...illegible) in without arms. I saw 2 or three men came up to Lieutenant

Rynd and (..illegible) permission to go back under (...illegible). They were passed out by Mr. Harris order and Lieutenant request (sic). I was told that they dètained about ten minutes but did not see them. After this two (2) other men were allowed by Lieutenant Rynd to go out but in what sound I am not aware. I did not see their return. After having stood a while until the main body of the volunteers made the Portico. I was directeed by Mr. Harris to keep guard at the back of the Treasury. I arrive the south side in company with Mr. Nolen Poggose. The disarmd sepoys from the Executive Officer's guard was at first paraded befóre the volunteers, but afterwards (...illegible) by Lieutenant Rynd to force the companies at the door of the sleeping (...illegible). A great number of the men entered the (...illegible) and were partly concealed the noise of the volunteers I was (...illegible) up and down by post when I heard firing at Lallbagh, and looking before (...illegible) which appeared to be floutest up by wind while a man was in act of escaping on the wall adjascent to the southern extemest of the sleeping (...illegible). I am mediated from the alarm. Mr. Nolen who was a guard at the lowest side a man up to one of the door and discharged his (sic) at a man who was in the act of jumping out of the window behind Mr. Poggose then came up and fired at another man in the act of escaping out at when he expired. Before and after that I saw a number of sepoys (illegible) forcibly out of the window at the south and all ran away. The man who run away were the sepoys of the Treasury and the Executive Officer's guard.

Shots fired at the sepoys by the volunteers securities before the men commenced running away.

Sammual Robinson
28 November, 1857
Additional Judge.

ঢাকা কমিশনারের এজেন্ট ও বেসরকারি কর্মচারী জন জারকাসের জবানবন্দি

I was a Commissioner's agent and a civilian at present in Dacca. I was ordered by Mr. Forbes to be present at the Bank on sunday morning 1st at 4 O' clock. I went there accordingly. About 5 O'clock we were (illegible) in the compound of the Bank by the Commandant

of the Infantry Volunteers. Mr. Harris and on a certain signal being fall from the outside we were ordered to march towards the treasury which I did in company with about 19 other volunteers. When we appeared to gate way we meet Lieutenant Lewis and his party carrying out of the forth gate and we were directed to go into the compound of the treasury and take charge of the disarmed men. When we got side of the (illegible) of the treasury, Mr. Harries ordered men of the volunteers to the forth gate and the rest with myself about 8 in number. I think they were assembled in front of the treasury (illegible) which I suppose the sepoys were sleeping in particular. About this time a native commissioned Officer came in front of us and said something which I did not understand, but it appeared from his gesture to be (illegible) and passed out the Treasury. He afterwards came out and went back to the man. About this time Lieutenant Rynd marched in the disarmed men (...illegible) and then with all of his men to whom he addressed a few words which I did not hear. Then he returned towards us. About this time Mr. Harris ordered 2 volunteers to stand as security on the East side of the house. The Native Commissioned Officer who had spoken before now sat himself down at the head of the bench before soldier, and there were other sepoys in front of him seated on the bench and standing when Lieutanant Rynd walked up to the men who did not receive him but a chair was placed (...illegible) him were Lieutenand Rynd occupied. After holding a little conversation Lieutenant Rynd left them again and went towards the west gate. About this time firing was heard towards the Lallbagh and the patrol Officer was not seen any (...illegible) on the bench (...illegible). I suppose he must have (...illegible) by the wondar. There was then a (...illegible) amongst the Sepoy's towards the godown. The firing at the Lallbagh continued where about a few Sepoys were left on the bench the rest having put into the Godown. About this time I heard one of the Volunteers cry (sic) out from the last of the Godown that the Sepoys were escaping from the right hand (...illegible) in the room. When a few shots were fired by the Volunteers in the direction of the (...illegible) of the Godown. When Mr. Harris went towards the right of the Godown and called out 'Don't fire.' The man on the bench were seen making for the left win-

dow in the godown out of which they escaped. The Sepoys all made their escape from the Treasury guard I suspect they must have commanced escaping before the firing at the Lallbagh was heard or the alarm given by the Volunteers from it (...illegible). None of the Volunteers fired until the man had commenced (...illegible) and escaped.

বিদ্রোহী সিপাহিদের মোকদ্দমা সংক্রান্ত বাংলা নথিপত্র*

Roll 1/1857
S.T.No. I for December, 1857
Emperor Vs. Gafur Khan Sepoy and others.

একজন সম্বন্ধে ফাঁসির ও অন্যান্য বিবাদীগণের সম্বন্ধে জীবনের (যাবজ্জীবনের) হুকুম ইতি ১৯/১০/৫৮(।)

....মকদ্দমা ১ নং সেসন বাং মাস দিজাম্বর (ডিসেম্বর) সন ১৮৫৭ সন ইং সং ১ নং মকদ্দমা বাং মাসে দিজাম্বর (ডিসেম্বর) সন ঐ ঢাকার শ্রীযুক্ত মেজেষ্টর (ম্যাজিষ্ট্রেট) সাহেবের প্রেরিত (।)

হাকিম—বাদী গফুর খাঁ সিপাই গং প্রতিবাদি আসামী

ফর্দ
ইং ১লা ৯ নং
রোয়েদাদ ও জওয়াব ও
সাক্ষীর জবানবন্দী—

নও (৯) ফর্দ্দ মাত্র

পরে যে নরসিংহ ওলদে সেন নিও সাকীন একবালপুর বএষ আন্দাজ ২৫ বৎসর পেসা বসকন্দাজী হাজির হইল (।) ১৮৪০ সনের ৫ আষ্ট (এ্যাকট) মতে ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিল (।) শং (শওয়াল) তুমি এই মকদ্দমার কী জান (?) । জং। (জবানবন্দি) চলতি অগ্রান মাসের তারিখ শরন (স্মরণ) নাই মঙ্গলবার দিবস টোকচান্দপুরের গুদারাঘাটে দুইজন শীফাই (সিপাহী) অর্থাৎ হাজিরা গফুর খাঁ ও জীউলাল শীফাই

* ঢাকা জেলা জজ কোর্ট রেকর্ড রুম হতে বাংলা দলিল পাঠোদ্ধারে আমাকে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাণ্ডুলিপি বিভাগের মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া।

জাইতেছিল (।) আমি ঐ টোকচান্দপুরে গুদারাঘাটে মোতাইন (মোতায়েন) ছিলাম (।) আমি শীফাই দুই ব্যক্তিকে দেখিল। তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করার নিমিত্তে.... জে উক্ত শীফাইগণ দৌড় দিল (।) আমিহ (আমিও) তাহাদিগের পীছে ২ দৌড়িয়া জাইয়া এছলামপুর মৌজাতে জমিদারের কাছারির পীছে জমিনে জাইল (।) প্রথম জীউলাল মীফাইকে ধরিয়া জমিদারের গোমস্তার নিকট জিম্মা করিয়া দিল.... তাহার আন্দাজ ৫০ হাত তফাৎ জাইয়া হাজিরা (জাহির) গফুর খাঁ শীফাইকে গ্রেপ্তার করিয়া ঐ দুই শীফাইকে কাপাসীয়ার দারোগার নিকট নিয়া হাজির করিয়া দিলাম (।) আমি এই জানি (।) ইতি (।)

নিসান
নরসিংহ

পরে যে আনু বরকন্দাজ ওলদে মহম্মদ শফী সাকীন এগারসিন্দু বএষ আন্দাজ ৩০ বৎসর পেসা বরকন্দাজী হাজির হইয়া ১৮৪০ সন ৫ আক্ট মতে ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিল (।) শং (শওয়াল)। তুমি এই মকদ্দমার কী জান (?)। জং। (জবানবন্দি) আমি সদর থানার বরকন্দাজ বটী (।) এই অগ্রান মাসে তারিখ শরন (স্মরণ) নাই সোমবার আমাকে টোকচান্দপুরের গুদারঘাটে মোতাইন করাতে আমি তথায় ছিলাম (।) তাহাতে জে তারিখে ঢাকায় শীফাইগণ সহিত লড়াই হয় তাহার পর মঙ্গলবার দিবশ বেলা ১০/১১ ঘণ্টার সময় হাজির গফুর খাঁ ও জীউলাল আসামি অনেকে জাইতে দেখিল (।) আমি ও নরসিংহ বরকন্দাজ দৌড়িয়া জাইয়া টোকচান্দপুরে বাজারের উপর উক্ত শীফাইগণকে গ্রেপ্তার করিয়া ছিলাম (।) শীফাইগনহ আমার দিগকে দেখিয়া দৌড়িয়াছিল (।) পরে উক্ত শীফাইগণকে কাপাসীয়ার দারোগা জে ঐ বাজারে ছিল তাহার নিকট হাজির করিয়া দিলাম এই জানি (।) শং (শওয়াল) উক্ত শীফাইগণ একত্র দৌড়িয়াছিল কীনা (?) জং। (জবানবন্দি) তাহারা দুই জন একত্র দৌড়িয়া পলাইতেছিল। প্রথমতঃ নরসিংহ বরকন্দাজ জীউলাল অগ্রে ধরিলেক (।) পরে আমরা দুইজনে গফুর খাঁকে ধরিয়াছিলাম (।) ইতি (।) আসামীগণ কেহ শওয়াল করিল ন (।) ইতি (।)

শ্রী আনু বরকন্দাজ

পরে যে গুপীনাথ চন্দ ওলদে মদন চন্দ সাকীন ধামরাই বএষ আন্দাজ ৩৫ বৎসর পেষা হালুটা হাজির হইল। (।) ১৮৪০ সনের ৫ আক্ট মতে ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিলেক(।) শং (শওয়াল) জং। (জবানবন্দি) আমি ধামরাইর উত্তরাধিকে জাইতে ছিলাম (।) তাহাতে দুইজন শীফাই জাইতেছে দেখিল(।) আমি হাকিমের দোহাই দেওয়ায় ঐ দুইজন শীফাই আমার নিকট আসিলেক (।) আমি তাহারদিগকে লইয়া ফাঁড়ির দিকে জাইতেছিলাম (।) ধামরাইর বাজারে রাজা খাঁ চৌকীদারকে পাইয়া তাহার একসঙ্গে ফারিতে জাইয়া পরে থানায় পৌছাইয়া দিলাম (।) আমি এই জানি (।) পরে স্বাক্ষী হাজির হিরামন ও শঙ্কররাম শীফাইকে দেখিয়া কহিল জে এই দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার

করিয়া ছিলাম (।) আমি আন্দাজ ১৪ দিন হইলেক তাহারদিগকে গ্রেপ্তার করিয়াছিলাম (।) ইতি (।)

নিসাম
শ্রী গুপীনাথ চন্দ

পরে যে রাজা খাঁ ওলদে নাজিম খাঁ সাকীন ধামরাই বএষ আন্দাজ ৩০ বৎসর পেসা চৌকিদারী হাজির হইল (।) সন ১৮৪০, ৫ আক্ট মতে ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিল (।) শং (শওয়াল) তুমি এই মকদ্দমার কী জান (?)। জং। (জবানবন্দি) তারিখ শরন নাই আন্দাজ ১০/১২ রোজ হইল ধামরাইর বাজারে আমার নিকট গুপীচন্দ্র দুইজন শীফাই আটকাইয়াছে বলাতে আমি হাকিমের দোহাই দিয়া ঐ শীফাইগণ ও গুপীচন্দকে সমেত থানায় নিয়া হাজির করিয়া দিলাম(।) পরে শাক্ষী হাজির হিরামন ও শঙ্কররাম শীফাইকে দেখাইয়া কহিল যে এই দুইজনকে গুপীচন্দ আটকাইয়াছিল ইহারদিগকে থানায় হাজির করিয়া দিয়াছিলাম (।) ইতি (।) আসামি আর কোন শওয়াল করিল না (।) ইতি (।)

নিসান
শ্রী রাজা খাঁ

Emperor Vs. Abdul Khan Sepoy

জাবৎজীবন

১৯/১০/৫৮

...মকদ্দমা ৪নং সেসন...ডিজাম্বর সন ১৮৫৭ ইং সং ২ নং মকদ্দমা ডিজাম্বর সন ঐ জিলা ঢাকা শ্রী যুক্ত মেজেষ্টর সাহেবের প্রেরিত।

হাকিম— বাদী আবদুল খাঁ সিফাই গং প্রতিবাদী

ইং ১লা ১৪নং

রোয়েদাদ ও জওয়াব ও স্বাক্ষীর

জবানবন্দী নং ১৪

১৪

— — — — — — — — —

মং চৌদ্দ ফর্দি মাত্র

পরে যে আবু চাপরাসি পিং আনু চাপরাসি সাকীন আকুয়া জিলা নছিরাবাদ বয়েষ আঠাশ ২৮ বৎসর পেসা নছিরাবাদের ফৌজদারী চাপরাসি হাজির হইল(।) ১৮৪০ সনের ৫ আক্ট মতে ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিলোক(।) সওয়াল মতে কহিল যে গত অগ্রায় মাষে তারিখে আমার শরন নাই আবদুল খাঁ ছিপাই আকুওয়া গ্রামের রাস্তার পর আমার পিসাত ভাই শেখ... জামালপুর জাওয়ার রাস্তা জিজ্ঞাসা করাতে যে উত্তর দিলে রাস্তা দেখাইয়া দিল (।) আমি তখন ঐ জায়গাতে খাড়া ছিলাম (।) আমরা ২/৩ রসি তফাহুত সিফাই মজকুর গিয়াছিল (।) আমি এই... ছিপাই...ধরিয়া মেজেষ্টার সাহেবের কুঠীতে নিয়া গেলাম (।) শং (শওয়াল) সেফাই মজকুরের সঙ্গে আর কেহ ছিল কিনা এবং

তাহার হাতে কোন হাতিয়ার ছিল কিনা (?) তাহার সঙ্গে কেহ ছিল না (।) এ তাহার ঠাই কোন হাতিয়ার ছিল না (।) ইতি (।)

শ্রী আবু চাপরাসি।

পরে যে ইছফ আলী ওলদে শেখ (কালু) সাকিন হার সোয়ারী ঘাট বএষ আন্দাজ ৩২ বৎসর পেসা মং নছিরাবাদের মেজেষ্টর সাহেবের আরদালির চাপরাসিগিরি... হাজির হইল। ১৮৪০ সনের ৫ আষ্ট মতে ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিল (।) শওয়াল মতে কহিল যে মং আমি মোং নছীরাবাদের মেজেষ্টর সাহেবের আরদালির চাপরাসিগিরি করি। গত অগ্রান মাসে তারিখ আমার মনে নাই আন্দাজ আট ঘণ্টার সময় নছিরাবাদের রামা মুদীর দোকানে পান ষুপারি আনিতে গিয়াছিলাম তখন দেখিলাম যে হাজির ষুজান সিংহ ও নিরাঞ্জন সিংহ সিফাইগণ ঐ মুদীদোকানে খাড়া আছে আর চিড়াগুড়া চাহিতেছে (।) মুদী কহিল যে চিড়া নাহি চাউল ডাইল আছে নিতে পার (।) এহাতে সিফাইগণ কহিল যে আমারদিগের ঠাই পএষা (পয়সা) নাহি ৩.৪... (।) এহাতে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে তোমরা জেথা হইতে আসিয়াছি (।) এহাতে এহারা কহিল জে আমরা আড়াড় জিলা হইতে অসিয়াছি (।) এহাতে আমার তাহাদের প্রতি শোভা (সন্দেহ)... (।) মালিকে থানায় খবর দিতে পাঠাইলাম হাকিম আসামিগণ তথা হইতে জাওয়ায় উদ্যত হওয়াতে আমি হাকিমের দোহাই দিয়া এহারাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়াছ (অস্পষ্ট) গণ সঙ্গে দেখা হওয়ায় তাহার কথা অনুসারে মেজেষ্টের সাহেবের কুঠীতে মুই ছিফাইকে নিয়া গেলাম ও মেজেষ্টার সাহেবের হুকুম মতে এহারদিগকে ফাঠকে পৌঁছাইয়া দিলাম (।) শং (শওয়াল) আসামীগণের সঙ্গে আর কোন লোক ছিল কী না এবং এহাদের হাতে কোন হাতিয়ার ছিল কী না (?) জং (জবানবন্দি) এহাদের সঙ্গে আর কোন লোক ছিল না ও কোন হাতিয়ার ছিল না। (।) ইতি (।)

আসামী আর কোন সওয়াল করিলেক না (।) ইতি (।)

লিং লেখক
(অস্পষ্ট)

পরে যে যুবল মালি ওলদে লাল চান্দ মালি সাং পাচদোনা বএষ আন্দাজ ৩০ বৎসর পেষা চাকুরী... হাজির হইয়া ১৮৪০ সনের ৫ আষ্ট মতে ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিলেক (।) সওয়াল মতে কহিল যে আমি মং নছিরাবাদ রামা মুদীর দোকানের নিকটে বাসা করিয়া... ছিলাম (।) গত অগ্রহায়ন মাসে তারিখ আমার শরণ নাই এক দিন রাত্র আন্দাজ ৭/৮ ঘণ্টার সময় হাজিরা নিরঞ্জনসিংহ ও শুজান সিংহ ছিফাইগণ আমার বাসার দরওয়াজায় যাইয়া আমাকে বলিলেক যে আমরা অদ্য ১২ (দিন?) জাবত আহার করিনা। (।) আমাদিগের আহারের সামিগ্রি দেও (।) আমি ঐ দুই জন ছিফাইকে রামা মুদীর দোকানে ইছফ আলী চাপরাসিকে খবর দিয়া ডাকিয়া আনিয়া ঐ দুই জন ছিফাইর নিকট চাপরাসিকে সফিয়া (সঁপিয়া) আমি থানায় খবর দিতে গেলাম (।) দারোগা এই খবর শুনা মাত্র দারোগা বরকন্দাজ... আমার সঙ্গে চলিলেক (।) রাস্তায় দেখি যে চাপরাসি ঐ ছিফাইগণকে নিয়া মেজেষ্টর সাহেবের কুঠিতে চলিয়াছে (।) এহাতে

আমরাও ঐ চাপরাসির সঙ্গে নিয়া মেজেষ্টর সাহেবের কুঠিতে পৌছাইয়া দিয়াছি (।) আসামি... সঙ্গে আর কোন লোক ছিল না এবং এহাদের সঙ্গে কোন হাতিয়ার ছিল না (।) আসামি কোন সওয়াল করিলেন না (।) ইতি (।)

ধ্রুবল মালি

পরে যে মিং রাজ কিসোর দে ওলদে রাধা মাধব দে সাং....বএষ আন্দাজ ৭০ বৎসর পেশা চাকুরী সাক্ষী হাজির হইয়া ১৮৪০ সনের ৫ আক্ট মতে ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিলেক (।) শওয়াল মতে কহিল জে আমি কেলেক্টরী...মধ্যে মহরের গিরিতে আছি (।) জে রবিবার পল্টনে লড়াই হয় তাহার পূর্বদীন (দিন) শনিবার হাজিরা নিরাঞ্জন সেফাই জে কেলেক্টরীতে...পহরা দিতে দেখিয়াছি (।) সিফাইগণের বদলীর দস্তুর (দরুন) এই সমবার দিন বদলী হইয়া আসিয়া আর এক সমবার জাএ (।) শনিবার জে দেখিয়াছি এই মনে আছে (।) এহার পূর্বে ঐ কএদিন দেখিয়াছি কী না মনে হয় না (।) ইতি (।)

শ্রীরাজ কিসোর দে

পরে যে গোবিন্দ চন্দ্র বসাখ পিং গুরু প্রসাদ বসাখ সাকীন ইসলামপুর বএষ আন্দাজ ৩২ বৎসর পেষা কেলেক্টরী মোহরের গিরি... হাজিরা হইয়া ১৮৪০ সনের ৫ আক্ট মতে ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিলেক (।) সওয়াল মতে কহিল যে আমি হাজিরা নিরাঞ্জন সিংহ সেফাইকে চিনি (।) জে রবিবার পল্টনে লড়াই হয় তাহার পূর্ব সপ্তাহে অন্য ২ সিফাইগণের সঙ্গে হাজিরা নিরাঞ্জন সিংহ সেফাই ...পহরা দিয়াছে দেখিয়াছি (।) সিফাইগণ প্রতি শমবার বদলি হইত (।) ইতি (।)

শ্রী গোবিন্দ চন্দ্র বসাখ

Emperor
Vs.
Hossen Baksha & Others

জাবৎ জীবন

১৯/১০/৫৮

ফেরস্ত কাগজাত মোকদ্দমা ৬নং শেশন (সেসন) বাং মাহে নওয়াম্বর (নভেম্বর) সন ১৮৫৭ ইং মমাং ২নং... বাখানে নওয়াম্বর সন ঐ জিলা ঢাকার শ্রীযুক্ত মেজেষ্টর সাহেবের প্ররিত। হাকিম বাদী শেখ হোসেন বক্স পাঠক গোনেন প্রতিবাদী আসামী

ফর্দ্দ দাগ নং--

ইং ১লা ৩৩নং

রোয়েদাদ ও জওয়াব ও শাক্ষির

জবান বন্দি নং ৩৩

মং (মবলগ) তেত্রিশ ফর্দ্দমাত্র

পরে যে ঠাকুর প্রসাদ তৈয়ারী (তেওয়ারী) ওলদে শঙ্কর লাল তেওয়ারী সাকীন হাল

ঢাকা বএষ আন্দাজ ৪০ বৎসর পেশা চাকুরী হাজির হইল সন ১৮৪০ সনের ৫ আক্ট মতে ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিল (।) শং। (শওয়াল) তুমি এই মোকদ্দমার কী জান(?) জং। (জবানবন্দি) জে দিবস পল্টনে গোলমাল হয় ঐদিন দিবাগত শন্ধ্যার (সন্ধ্যার) পর মেজেষ্টর সাহেব নদি কীনাররাতে শড়কে বেড়াইতেছিলেন (।) আমি তাহার শঙ্গে (সঙ্গে) ছিলাম (।) এমত শময় (সময়) (।) হাজিরা দিল আলি শীফাই ঐ নদি পাড়ের রাস্তা দিয়া জাইতেছিল (।) মেজেষ্টর সাহেবের জিজ্ঞাসা মতে কহিলেক জে আমি শিফাই দিনের বেলা পলাইয়া জঙ্গলে ছিলাম (।) রাত্রে আমি হাজির হইতে আসিয়াছি(,) কিন্তু কাহার নিকট হাজির হওয়ার কথা বলিলেক তাহা শরন (স্মরণ) নাই (।) তাহাতে মেজেষ্টর সাহেব আমাকে উক্ত আশামীকে গারদ নিতে বলায় আমি তাহাকে গারদে নিয়াছিলাম (।) আশামী শওয়াল করিল জে আমি পূর্ব্বে আপন নাম বলিয়াছিলাম কী শাহেব...পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন (।) জং (জবানবন্দি) শাহেবি (সাহেবই) পূর্ব্বে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এমত শরন (স্মরণ) পরে (।) আর ইহার নিকট কোন হাতিয়ার ছিল না ইতি (।)

শ্রীঠাকুর প্রসাদ

পরে যে কৈলাশ সীংহ ওলদে স্বরুপ সীংহ সাকীন... বএষ আন্দাজ ২৫ বৎসর পেশা চাকুরী হাজির হইল ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিল (।) শং (।) (শওয়াল) তুমি এই মকদ্দমার কী জান)? জং (।) (জবানবন্দি) গত শমবার (সোমবার) বেলা দুই প্রহরের সময় একজন চৌকিদার সাভারের থানায় আসীয়া দোহাই দিয়া কহিলেক জে এই জঙ্গল দিয়া একজন সিফাই জায় (।) ইহা ষুনিয়া (শুনিয়া) দারোগা ও মোহরের ও আমি ও আর জে কেহ থানায় ছিল জঙ্গরমুখী দৌড়ি দিয়া জাইয়া দেখীলাম যে হাজিরা পীর বক্স জঙ্গল দিয়া দৌড়িয়া জাইতেছে (।) আমরা পীছে ২ দৌড়িয়া জাইয়া ইহাকে ধরিলাম (।) এই ব্যক্তি কহিলেক জে আমাকে মারিও না এবং গোড়া দিনের (গোড়া সিপাহী দীন দয়াল?) নিকট নিলাম (।) পরে থানায় আনিলাম দারোগা চালান দিয়া দিল (।) ইতি (।) আশামী শওয়াল করিল না (।) ইতি (।)

কৈলাশ চন্দ্র সিংহ

পরে যে মৃত্যুঞ্জয় চৌকিদার ওলদে বৃন্দাবন...বএষ আন্দাজ ৪০ বৎসর সাকীন কৈলাশপুর পেশা চৌকিদারি হাজির হইল (।) সন ১৮৪০ সনের ৫ আক্ট মতে ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিল (।) শং। (শওয়াল) তুমি এই মকদ্দমার কী জান(?) জং। (জবানবন্দি) গত সমবার বেলা দেড় প্রহরের শময় কোন্ডা হইতে আপন বাড়ী জাইতেছিলাম তাহাতে জনানা লোকে কহিলেক জে একজন শীফাই- উত্তরমুখী জায় (।) ইহা শুনিয়া আমি দৌড়িয়া জাইয়া বাড়িগাওর চরে একজন শীফাই জাইতে দেখীয়া তাহার পীছে ২ জাইয়া থানার নিকট হইতে শীফাই জঙ্গলমুখী জাওনে থানায় খবর দেওয়াতে দারোগা প্রভিতি (প্রভৃতি) আশীয়া ঐ শীফাইকে গ্রেপ্তার করিল (।) হাজিরা পীর বক্স কে দেখাইয়া কহিল জে ঐ ব্যক্তিকে আমরা ধরিয়াছিলাম (।) আশামি কোন শওয়াল করিল না (।) ইতি (।)

নিশান

মৃত্যুঞ্জয়

পরে যে শ্যাম সীংহ ওলদে গোপি সীংহ ওলদে গোপি সীংহ শাকীন ষূতরাপুর (সুত্রাপুর) বএষ আন্দাজ ৩০ বৎসর পেশা বরকন্দাজি হাজির হইয়া সন ১৮৪০ সনের এ্যাক্ট মতে ধৰ্ম্মত প্রতিজ্ঞা করিল (।) শং। (শওয়াল) তুমি এই মকদ্দমার কী জান(?)। জং। (জবানবন্দি) আমি থানা কাপাশীয়ার বরকন্দাজি কর্ম করি (।) দারোগা শহিত (সহিত) গত মঙ্গলবার নয়ান বাজারে (বর্তমান নয়া বাজার?) গীয়াছিলাম (।) তাহাতে গ্রামিক লোক খবর দিলেক যে দুইজন শীফাই পশ্চীম তরফ হইতে পূর্বমুখী আশীতেছে ইহা ষুনিয়া (শুনিয়া) দারোগার শহিত জাইয়া নয়ান বাজারের পশ্চীম তরফ শড়কে হাজিরা দিন দয়াল মিশ্রও ধূপন সীংহকে গ্রেপ্তার করিয়াছিলাম (।) তখন আসামিগণ কীছু কহে নাই (।) পরে দারোগার নিকট হাজির করিয়াছিলাম (।) আশামি আর কোন শওয়াল করিল না (।) ইতি (।)

শ্রী শ্যাম সীংহ বরকন্দাজ।

পরে যে হালাখুরি ওলদে শেখ আরিফ শাকীন দোলেশ্বর বএষ আন্দাজ ৩৫ বৎসর পেশা বরকন্দাজ হাজির হইয়া সন ১৮৪০ সনের ৫ অ্যাক্ট মতে ধৰ্ম্মত প্রতিজ্ঞা করিল (।) শং। (শওয়াল) তুমি এই মকদ্দমার কী জান (?) জং। (জবানবন্দি) আমি কাপাশীয়ায় থানায় বরকন্দাজী করি (।) ঐ থানার দারোগার (সাথে) গত মঙ্গলবার নয়ান বাজারে মোকামে ছিলাম (।) বেলা অনুমান এক প্রহরের সময় গ্রামীক লোকে ডাক দিয়া কহিল যে দুইজন শীফাই জাইতেছে (।) এই শুনিয়া দারোগা ও আমি ও অন্য ২ বরকন্দাজ দৌড়িয়া জাইয়া হাজিরা ধূপন সীংহ ও দীন দয়াল মিশ্র শীফাইকে ঐ বাজারের পশ্চীম তরফ বান্ডাতে গ্রেপ্তার করিলাম (।) দারোগার জিজ্ঞাসা মতে কহিল জে আমার দিকে সঙ্গের লোক পলাইয়া গিয়াছে (।) আমরাও পলাইয়া জাই। (।) আমি এই জানি (।) আশামিগণের সঙ্গে কোন হাতিয়ার তখন ছিল না (।) ইতি (।) আশামি অন্য কোন শওয়াল করিল না (।) ইতি

শ্রীহালখুরি

পরে যে শেখ এছমাইল ওলদে নুর মোহাম্মদ শাকীন কলিকাতা হাল গোড়া পল্টনের ডাক্তারখানা ঢাকা মোকাম বএষ আন্দাজ ৩০ বৎসর পেশা ডাক্তারি হাজির হইয়া ১৮৪ সনের ৫ আক্ট মতে ধৰ্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিল (।) শং। (শওয়াল) দিন দয়াল মিশ্র শীফাই গোলমালের পূর্ব তারিখ অথবা গোলমালের দিবস প্রাতে পল্টনের হাষপাতালে (হাসপাতালে) ছিল কীনা। (?) জং (জবানবন্দি) না সে ছিল না (।) সে ১৯ নবম্বর হাষপাতাল হইতে বিদায় পাইয়াছিল (।) ইতি (।)

Shaik Ismail
Docter (Doctor?)

ঢাকার সিপাহীদের বিচার সম্পর্কিত ফার্সী দলিল-পত্রের অনুবাদ

সম্রাট
বনাম
কফুর খান সিপাহী ও অন্যান্য

বাদী	বিবাদী	অপরাধ	
সরকার	১। কফুর খান	প্রথমতঃ,	সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও যুদ্ধ করা
			দ্বিতীয়তঃ পলায়ন করা
			তৃতীয়তঃ, সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা অপরাধ
	২। জীউলাল রাম সিপাহী		
	৩। হিরামন রাম সিপাহী		পলায়ন করা
	৪। শঙ্কর রাম সিপাহী		

এই ঘটনা সংঘটিত হয় ১৮৫৭ সালের ২২শে নভেম্বর মোতাবেক ১২৬৪ সনের ৮ই অগ্রাহায়ণ রোজ রবিবার। ১৮৫৭ সালের ৭ই ডিসেম্বর মোতাবেক ১২৬৪ সনের ২৩শে অগ্রাহায়ণ রোজ সোমবার আজ মোকাদ্দমা ফৌজদারীর কোর্টের নাজিরের মাধ্যমে এই আসামীদিগকে আদালতে হাজির করা হল।

আমি ৭৩ নং রেজিমেন্টের কফুর খান সিপাহী পিতা, নূর খান, সাকিন ফায়েজ বাদ, বয়স প্রায় ২৮ বছর, পেশা সৈনিকতা, উপস্থিত। প্রশ্ন সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করা, সমকক্ষতা ঘোষণা করা এবং যুদ্ধ করা; দ্বিতীয়তঃ পলায়ন করা, তৃতীয়তঃ, সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে যুদ্ধ করা—অপরাধ করেছে কিনা? উত্তর ঃ না।

আমি জিউলাল রাম সিপাহী, পিতা মথুরাম, সাকিন বিধা, বয়স প্রায় ৪-বছর, পেশা—সৈনিকতা, উপস্থিত। প্রশ্ন ঃ তুমি পালিয়ে ছিলে কিনা? উত্তর ঃ না।

আমি হিরামন রাম পিতা, তেওয়ারী রাম সাকিন ঃ চম্পা, জেলা গাজীপুর, বয়স ২৪ বছর, পেশা সৈনিকতা, উপস্থিত। প্রশ্ন ঃ তুমি পালিয়েছিলে কিনা? উত্তর হ্যাঁ, আমি পালিয়েছিলাম।

আমি শঙ্কর রাম সিপাহী, পিতা—ভগতরাম, সাকিন লোগিবান্দির পুরুয়া, জেলা গোরকপুর, বয়স প্রায় বিশ বছর, পেশা—সৈনিকতা, উপস্থিত প্রশ্ন ঃ তুমি পালিয়েছিলে কিনা? উত্তর ঃ হ্যাঁ আমি পালিয়েছিলাম।

আমি কফুর খান সিপাহী। অভিযোগের উত্তরে বলছি যে, যখন সিপাহীদের মধ্যে যুদ্ধ হচ্ছিল তখন আমি লাইনের বাইরে ইছা মিয়ার বাড়ীর নিকট লাইন থেকে প্রায় দেড়শ' কদম দূরে এক বাড়ী ভাড়া নিয়ে থাকতাম। এর কারণ এই যে আমি অসুস্থ

* ঢাকার সিপাহিদের বিচার সম্পর্কিত ফার্সি দলিলপত্রের পাঠোদ্ধার ও বঙ্গানুবাদ করেছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আবদুস সাঈদ।

ছিলাম হাসপাতাল থেকে ঔষধ নিয়ে খেতাম এবং সেখানে থাকতাম। আমি কখনও সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিনি—এই আমার উত্তর। প্রশ্নঃ আরো কিছু বলবে কি? উত্তর ঃ না।

আমি জীউলাল রাম আসামী। অভিযোগের উত্তরে বলছি যে, আমি বখশী থানায় চাকুরিতে নিয়োজিত ছিলাম। যেদিন সিপাহীদের সাথে যুদ্ধ হলো সেদিন সকালে কাপ্তান সাহেব এসে আমাদের বললেন যে, সদর থেকে আদেশ এসেছে তোমরা অস্ত্রশস্ত্র ছেড়ে দাও। সেই অনুসারে আমরা তোপদান ও বন্দুক ছেড়ে দিলাম। আমরা কাপ্তান সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ আমরা এখন কী করবো? কাপ্তান সাহেব সেখান হইতে বাইরে চলে গেলেন। আর গোরারা (ইউরোপীয় সৈন্যবাহিনী) আমাদের দিকে বন্দুক হতে গুলি ছুড়তে লাগলো....এবং একজন সিপাহী আহত হয়ে পড়ে গেল। তার অবস্থা দেখে আমি প্রাণ ভয়ে পালিয়েছিলাম। প্রশ্ন ঃ আরো কিছু বলবে কি? উত্তর ঃ যদি আবার চাকুরী পাই তাহলে আমি আবার চাকুরী করবো। প্রশ্ন আরো কিছু বলবে কি? উত্তর ঃ না।

আমি হিরামন রাম সিপাহী আসামী। অভিযোগের উত্তরে বলছি যে, আমি কমিশনারের কার্যালয়ে নিয়োজিত ছিলাম। অগ্রাহায়ণ মাসের একদিন সকালে একজন সাহেব সেখানে গিয়ে আমাদের বললেন ঃ তোমরা বন্দুক ও তোপদান ইত্যাদি অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণ কর। সেই অনুসারে আমি হাবিলদারকে জিজ্ঞাসা করে বন্দুক আর তোপদান সমর্পণ করি এবং হাবিলদারকে বলে নদীর ধারে বাহ্যত্যাগে যাই। সেখানে হতেই আমি বন্দুকের গুলির শব্দ শুনি এবং ফিরে এসে দেখি গারদে কেউ নেই। তখন আমি ভয়ে পালিয়ে একটা ঘরে লুকিয়ে ছিলাম, সেখানে তখন কোন মানুষ ছিল না। সন্ধ্যার সময় জঙ্গলে গিয়েছিলাম এবং সেখান হতে উত্তর দিকে চলে যাই। এই আমার উত্তর। প্রশ্ন ঃ আরো কিছু বলবে কি? উত্তর ঃ না।

আমি শঙ্কর রাম সিপাহী। অভিযোগের উত্তরে বলছি যে, আমি ব্যারাক মাষ্টারের কাছে চাকুরিতে নিয়োজিত ছিলাম। একদিন সাহেব ও গোরাগণ আমাদের নিকট বন্দুক ও অস্ত্রশস্ত্র চাইলেন এবং আমরা ছেড়ে দিলাম। তারা সিপাহীগণকে বখশী থানায় নিয়ে এলেন। সিকি ঘণ্টা পরে আমরা লালবাগের দিকে গোলাগুলীর শব্দ শুনলাম, আমরা মনে মনে ভাবলাম যে, এখনই গোরাগণ আমাদেরকে মারবে। তাই ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিলাম। এই আমার উত্তর। প্রশ্নঃ আরো কিছু বলবে কি? উত্তর ঃ না।

রায়

উপরোক্ত কফুর খান সিপাহীর অপরাধ সরকারের বিরুদ্ধে সমকক্ষতা ও বিরুদ্ধাচরণ করা এবং পলায়ন করা—জীউলাল রাম, হিরামন রাম ও শঙ্কর রাম সিপাহীর অপরাধ পলায়ন করা প্রমাণিত হল। আদেশ করা যাচ্ছে যে, কফুর খান সিপাহীকে ফাঁসী দেয়া হোক। জীউলাল রাম, হিরামন রাম ও শঙ্কর রাম সিপাহীদেরকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দরিয়ার অপর তীরের কারাগারে দেয়া হোক, এই মর্মে ঢাকা জেলার ফৌজদারের নামে আদেশ জারী করা হোক। লিখিত হল, ১লা ডিসেম্বর, ১৮৫৭ সাল।

সম্রাট
বনাম
আবদুল খান সিপাহী ও অন্যান্য

বাদী — বিবাদী

সরকার — ৫। আবদুল্লাহ খাঁন সিপাহী
৬। সুজান সিংহ সিপাহী
৭। নিরঞ্জন সিংহ সিপাহী

অপরাধ ঃ পলায়ন করা

আমি আবদুল্লাহ খান সিপাহী, পিতা মুসা খান, বয়স প্রায় ২২ বছর, পেশা সৈনিকতা, সাকিন-সাহারুনপুর-পরগনা, পাটনা, বর্তমানে জিলা ফতেপুর, আসামী উপস্থিত। প্রশ্ন ঃ তুমি সরকারী চাকুরে হওয়া সত্ত্বেও পালিয়ে গিয়েছিলে কিনা? উত্তর ঃ হ্যাঁ ভয়ে পালিয়েছিলাম (...পাঠ দুষ্কর)।

আমি সুজান সিংহ পিতা, গন্ডারী সিংহ, বয়স ২০ বছর, পেশা—সৈনিকতা, সাকিন-জগদীশপুর, প্ররগনা হাওড়া মোতাল্লিকা, জেলা লক্ষ্মৌ আসামী উপস্থিত। প্রশ্ন ঃ তুমি সরকারী চাকুরে হওয়া সত্ত্বেও পালিয়েছিলে কিনা? উত্তর ঃ হ্যাঁ, ভয়ে পালিয়েছিলাম।

আমি নিরঞ্জন সিংহ, পিতা বাহুরী সিংহ, বয়স প্রায় ৩-বছর, সাকিন কারিসাথা, পরগনা রবুহে, জিলা আরা পাশা সৈনিকতা, আসামী উপস্থিত, প্রশ্ন ঃ তুমি সরকারী চাকুরে হওয়া সত্ত্বেও পালিয়েছিলে কি না? উত্তর ঃ হ্যাঁ, ভয়ে পালিয়েছিলাম।

আমি তেজাওর খান, পিতা, মঈন খান, সাকিন বর্তমান পাটুয়াটুলী, বয়স প্রায় ৩০ বছর, পেশা চাকুরী, চাপরাশী উপস্থিত হয়ে ১৮৪০ সালের আইন অনুসারে নিজ ধর্মের সাথে শপথ নিলাম। প্রশ্ন ঃ তুমি এ ঘটনার কি জান? উত্তর ঃ আমি ব্যারাক মাষ্টারের নিকট চাপরাশীর চাকুরী করি। যে রবিবার সকালে লাইনে যুদ্ধ হয় তার আগের সপ্তাহে উপস্থিত আবদুল্লাহ ও সুজন সিংহ সিপাহী আসামীগণ ব্যারাক মাষ্টারের কুঠীর প্রহরী ছির। রবিবার দিন সকালে গোরাগণ এসে এ দুজন আসামীর এবং গারদের প্রহরায় নিয়োজিত সিপাহীদের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র বখশী থানার গারদে নিয়ে গেল। সেখানকার সিপাহীর অস্ত্রশস্ত্র ব্যারাক মাষ্টারের কুঠীতে ছিল। আসামীগণ কোন প্রশ্ন করেনি।

আমি গোবিন্দ হারদোয়ার, পিতা রঘুনাথ সিং, সাকিন রেহানপুর, বর্তমানে বাংলাবাজার, বয়স প্রায় ২৮/২৯ বছর, পেশা চাকুরী, উপস্থিত। ১৮৪০ সালের আইনানুসারে নিজ ধর্মের সাথে শপথ নিলাম। প্রশ্নঃ তুমি এ ঘটনার কি জান? উত্তর ঃ প্রশ্ন অনুসারে উত্তর দিচ্ছি যে, আমি ব্যারাক মাষ্টার সাহেবের কুঠীতে থাকি। ডোয়েল সাহেবের প্রহরী ছিলাম। যে রবিবার সকালে পল্টনে যুদ্ধ হয়েছিল সে রবিবারের আগের সপ্তাহে উপস্থিত সিপাহী দু'জন আবদুল্লাহ খান ও সুজান সিংহ ব্যারাক মাষ্টারের কুঠীতে প্রহরায় নিয়োজিত ছিল। রবিবারের পরের দিন সকালে সাহেবগণ এই আসামীদের ও আরো অনেক সিপাহীদের বন্দুকসহ কালেক্টরির বখশী থানায় নিয়ে আসেন। আমি ইহাই জানি। ইতি। আসামীরা কোন প্রশ্ন করেনি।

আবদুল্লাহ খান সিপাহী আমি প্রত্যুত্তরে বলছি যে, ৭৩ নং পল্টনের আবদুল্লাহ খান সিপাহী আসামী বলছি যে, আমি ৭৩ নং পল্টনের সিপাহী হিসেবে ঢাকায় চাকুরী করতাম। আমার মনে নেই যে, কি কারণে সকালবেলা কাপ্তান সাহেব ও গোরাগণ গিয়ে আমাদের অস্ত্রশস্ত্র ছেড়ে দিতে বললেন। আমরা তখনই বন্দুক ও তোপদানসহ সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র জমা দিলাম। তারপর আমরা যারা ব্যারাক মাষ্টাররের কুঠিতে প্রহরায় নিয়োজিত ছিলাম তাদেরকে বখশী থানায় নিয়ে আসা হল। এ সময় লাইনে ও বখশী থানায় বন্দুকের আওয়াজ হল। তখন ভয়ে বখশী থানা হতে পালালাম। কাছারীর দক্ষিণ দিকে একটা নর্দমায় লুকিয়ে ছিলাম। সন্ধার পর উত্তর দিকের রাস্তা দিয়ে চলে যাই। কয়েক দিন পরে ফকিরাবাদে গ্রেপ্তার হই। আমি ব্যারাক মাষ্টারের প্রহরী হিসেবে চাকুরীতে নিয়োজিত ছিলাম এবং কাপ্তান সাহেবের আদেশ অনুসারে তখনই অস্ত্রশস্ত্র জমা দিয়েছিলাম।

আমি সুজন সিংহ সিপাহী আসামী। অপরাধের উত্তরে আর্জি এই যে, যেদিন পল্টনে যুদ্ধ হল তার আগে থেকেই আমার চাকুরী ব্যারাক মাষ্টারের কুঠীতে ছিল। যেদিন রবিবার সকালে পল্টনে যুদ্ধ হল সেদিন কাপ্তান সাহেব ও গোরাগণ গিয়ে আমাদের অস্ত্রশস্ত্র চাইলেন। আমরা তখনই অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণ করি। আমাদেরকে খালি হাতে বখশী থানার গারোদে নিয়ে আসা হল। তারপর বন্দুকের শব্দ শুনে প্রাণের ভয়ে বখশী থানা হতে পালালাম। জেলখানার নিকট থেকে উত্তর দিকে চলে যাই। কয়েক দিন পর ফকীরাবাদে গ্রেপ্তার হলাম। গোরা সৈন্যগণ জানে যে, সেদিন আমার কর্মস্থল ব্যারাক মাষ্টারের কুঠীতে ছিল।

আমি নিরঞ্জন সিং সিপাহী আসামী। অভিযোগের উত্তরে বলছি, যে রোববার দিন পল্টনে যুদ্ধ হয়েছিল তার আগের সপ্তাহের সোমবার দিন থেকে আমার চাকুরী বখশী থানায় ছিল। সেই রোববার দিন সকালে কাপ্তান সাহেব ও গোরাগণ বখশী থানায় গিয়ে আমাদের অস্ত্রশস্ত্র চাইলেন। আমরা তখনই আমাদের অস্ত্রশস্ত্র ছেড়ে দিলাম এবং কাপ্তান সাহেবের আদেশানুসারে আমরা বখশী থানায় নিজ নিজ বিছানায় শুয়ে থাকলাম। সকালে যখন পল্টনে গোলাগুলি আরম্ভ হল এবং বখশী থানায় যখন গোরা সৈন্যগণ গোলাগুলি শুরু করে তখনই আমরা প্রাণ ভয়ে সারাদিন পিলখানার দিকে লুকিয়ে থাকি। তার পরের দিন উত্তরদিকে ফকিরাবাদে গিয়ে গ্রেপ্তার হলাম। আমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে গোরাগণ জানে যে আমরা যুদ্ধের দিন বখশী থানার চাকুরিতে নিয়োজিত ছিলাম।

আমি হনুমান পাটোয়ারী, পিতা মহতাবচন পাটোয়ারী, সাকিন তাজপুর, জেলা মানপুর, এলাকা-লক্ষ্ণৌ বয়স প্রায় ৩৭ বছর, পেশা চাকুরী, সিপাহী উপস্থিত। ১৮৪০ সালের আইনানুসারে ধর্মের শপথ নিলাম। প্রশ্ন ঃ তুমি আবদুল্লাহ খান এবং সুজন সিং কে চেন কি না? উত্তর ঃ চিনি। প্রশ্ন ঃ তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে কি জান? উত্তর ঃ গত নভেম্বর মাসের ১৬ তারিখ সোমবার আমি, করন্ট সন্ন্যাসী, একজন হাবিলদার ও একজন নায়েক ব্যারাক মাষ্টারের কুঠীতে দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলাম ব্যারাক মাষ্টারের

কুঠীতে অন্য সিপাহীর পরিবর্তে উপস্থিত আবদুল্লাহ খান ও সুজন সিং সিপাহী চাকুরিতে নিয়োজিত ছিল। ২২শে নভেম্বর রোববার সকালে কাপ্তান সাহেব. ব্রিগেড মেজর ও গোরাগণ সেই কুঠীতে গিয়ে আমাদের অস্ত্রশস্ত্র চাইলেন। আমরা তখনই অস্ত্রশস্ত্র ছেড়ে দিলাম। সাহেবগণ আমাদের বখশী থানায় নিয়ে আসেন এবং তাদের আদেশানুসারে আমরা সেখানেই ছিলাম। উপস্থিত আসামী দুজনও বখশী থানায় ছিল, কিন্তু তারা সেখান হতে পালিয়ে গিয়েছিল। এই দুজন আসামীর সঙ্গে আমি ছিলাম না।

আমি শঙ্কর রাম, পিতা—ভগৎরাম. সাকিন—বর্তমান জেলখানা, ঢাকা, বয়স—আনুমানিক ২০ বছর, পেশা—চাকুরী-দারোয়ান, উপস্থিত। ১৮৪০ সালের আইন অনুসারে নিজ ধর্মের সাথে শপথ নিলাম। প্রশ্ন ঃ তুমি উপস্থিত সুজন সিং আসামীকে চেন কিনা? উত্তর ঃ চিনি। প্রশ্ন ঃ তার কার্যকলাপ সম্পর্কে কি জান? উত্তর ঃ পল্টনে যখন যুদ্ধ চলছিল তখন সুজন সিং ব্যারাক মাষ্টারের কুঠীতে চাকুরীতে নিয়োজিত ছিল। রোববার দিন সকালে সাহেবগণ সেখানে গিয়ে অস্ত্রশস্ত্র চাইলে আমি, সুজন সিং এবং অন্যান্য সিপাহীগণ নিজ নিজ অস্ত্রশস্ত্র ছেড়ে দিলাম। পরে বখশী থানায় এসে সুজন সিং এবং আমরা সকলে পালিয়ে গিয়িছেলাম।

আমি নাদের বক্স সামান, পিতা (অনুল্লেলিত), পেশা—চাপরাশী, সাকিন—বাংলাবাজার, বয়স—আনুমানিক ৩৫ বছর, উপস্থিত। ১৮৪০ সালের আইনানুসারে নিজ ধর্মের সাথে শপথ নিলাম। প্রশ্ন ঃ তুমি সুজন সিং সিপাহীকে চিনো কিনা? উত্তর ঃ না। আমি সুজন সিংকে চিনি না।

আমি রাম রাজ সিং, পিতা—গিরীধারী সিং, সাকিন—বর্তমান জেলখানা, বয়স—আনুমানিক ৩৫ বছর, উপস্থিত। ১৮৪০ সালের আইনানুসারে নিজ ধর্মের শপথ নিলাম। প্রশ্ন ঃ তুমি উপস্থিত নিরঞ্জন সিং আসামীকে চেনো কিনা? উত্তর ঃ হ্যাঁ। চিনি। প্রশ্ন ঃ আসামীর কার্যকলাপ সম্পর্কে তুমি কি জান? উত্তর ঃ যে সপ্তাহে পল্টনে গোলমাল হল সেই সপ্তাহের পূর্ব সপ্তাহে নিরঞ্জন সিং আমার সাথে বকশী থানায় প্রহরী হিসেবে দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল।

আমি ধোবন সিং, পিতা—উপিয়ান সিং, সাকিন—বর্তমান জেলখানা, বয়স—প্রায় ৩৫ বছর উপস্থিত। ১৮৪০ সালের আইনানুসারে নিজ ধর্মের শপথ নিলাম। প্রশ্ন ঃ তুমি উপস্থিত নিরঞ্জন সিং আসামীকে চেন কিনা? উত্তর ঃ হ্যাঁ। চিনি। প্রশ্ন ঃ আসামীর কার্যকলাপ সম্পর্কে তুমি কি জান? পল্টনে যখন গোলমাল হয় তখন আমি ও নিরঞ্জন সিং বখশী থানার প্রহরী হিসেবে নিয়োজিত ছিলাম।

আমি জীউলাল রাম, পিতা—পখোরী রাম , সাকিন—বর্তমান জেলখানা, বয়স—২৬ বছর, উপস্থিত। ১৮৪০ সালের আইনানুযায়ী নিজ ধর্মের সাথে শপথ নিলাম। প্রশ্নানুসারে উত্তর দিচ্ছি যে আমি আসামী নিরঞ্জন সিংকে চিনি। পল্টনে যখন তর্কাতর্কি এবং গোলমাল হয় তখন নিরঞ্জন সিং আমার সাথে বখশী থানায় চাকুরীতে নিয়োজিত ছিল।

আমি প্রভু ওঝা, পিতা—শিব সন্ন্যাসী ওঝা, সাকিন—বর্তমান জেলখানা, বয়স—

আনুমানিক ২৫ বছর, উপস্থিত। ১৮৪০ সালের আইনানুসারে নিজ ধর্মের সাথে শপথ নিলাম। প্রশ্নানুসারে বলছি যে আমি উপস্থিত আসামী নিরঞ্জন সিংকে চিনি। পল্টনে যখন তর্কাতর্কি হচ্ছিল, তখন নিরঞ্জন সিং আমার সাথে বখশী থানার চাকুরীতে নিয়োজিত ছিল।

রায়

উপরোক্ত আবদুল্লাহ খান সিপাহী, সুজন সিং সিপাহী এবং নিরঞ্জন সিং সিপাহী সরকারী চাকুরে হওয়া সত্ত্বেও পলায়নের অপরাধ প্রমাণিত হল। আদেশ দেয়া যাচ্ছে যে তাদেরকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হল। জিঞ্জিরা নদীর অপর পাড়ে সোর নদীর কারাগারে তাদের রাখা হোক এবং এ সম্পর্কিত আইনানুসারে ঢাকা জেলা ফৌজদারের নামে আদেশ জারী করা হোক। লিখিত হল, ২১শে ডিসেম্বর, ১৮৫৭ সাল।

সম্রাট
বনাম
হোসেন বক্স ও অন্যান্য

বাদী	বিবাদী	অপরাধ
সরকার	৮। হোসেন বক্স নায়েক গোলন্দাজ	প্রথমতঃ সরকারের সমকক্ষতা বিরুদ্ধাচরণ।
৯।	শেখ দীন আলী— সিপাহী	
১০।	শেখ পীর বক্স ঢাকি	দ্বিতীয়তঃ পলায়ন করা;
১১।	দীন দয়াল মিশ্র— সিপাহী	তৃতীয়তঃ অস্ত্রশস্ত্রসহ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।
১২।	বলদেব রাম— সিপাহী	
১৩।	প্রভুরাম বক্স— সিপাহী	
১৪।	এলাহী বক্স— সিপাহী—পলায়ন করা।	
১৫।	ধোবন সিং— সিপাহী	
১৬।	রামরাজ সিংহ— সিপাহী	
১৭।	রমজান খান— সিপাহী	

এরা সবাই বিবাদী। এই ঘটনা সংঘটিত হয় ১৮৫৭ সালের নভেম্বর মাসের ২২ তারিখ মোতাবেক ৮ই অগ্রহায়ণ, ১২৬৪ বঙ্গাব্দ। ১৮৫৭ সালের ২৮শে নভেম্বর মোতাবেক ১২৬৪ বঙ্গাব্দের ১৪ অগ্রহায়ণ রোজ মঙ্গলবার এই আসামীদের ফৌজদারী আদালতের নাজিরের মাধ্যমে আদালতে হাজির করা হয়।

আমি শেখ হোসেন বক্স, নায়েক গোলান্দাজ, পিতা-শেখ মোয়াজ্জেম, উত্তর শহরের অধিবাসী, বয়স প্রায় ২৭ বৎসর , পেশা-চাকুরী হাজির হয়েছি।

প্রশ্ন ঃ ১। সরকারের সাথে সমকক্ষতা ও বিরুদ্ধাচরণ করা;
২। পলায়ন করা ;
৩। অস্ত্রশস্ত্রসহ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এতদসংক্রান্ত অপরাধ করেছ কি না?

উত্তর ঃ না।

আমি শেখ দীন আলী সিপাহী, পিতা-শেখ মোহাম্মদী, জিলা-আরার অধিবাসী, বর্তমানে পল্টন, জিলা-ঢাকা, বয়স প্রায় ২৫-২৬ বছর, পেশা সৈনিকতা উপস্থিত।

প্রশ্ন ঃ ১। সরকারের সাথে সমকক্ষতা ও বিরদ্ধাচরণ করা;
২। পলায়ন করা;
৩। অস্ত্রশস্ত্রসহ্ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা— এতদসংক্রান্ত অপরাধ করছে কি না?

উত্তর ঃ না।

আমি শেখ পীর বক্স ঢাকী, পিতা-শেখ বাওয়ার বক্স, জিলা-লুধিয়ানার অধিবাসী, বয়স-২৫-২৬ বছর, পেশা-চাকুরী, উপস্থিত।

প্রশ্ন ঃ ১। সরকারের সাথে সমকক্ষতা ও বিরদ্ধাচরণ করা;
২। পলায়ন করা;
৩। অস্ত্রশস্ত্রসহ্ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা— এতদসংক্রান্ত অপরাধ করছে কি না?

উত্তর ঃ না।

আমি দীন দয়াল মিশ্র, পিতা-রামনাথ মিশ্র, সাকিন আওরেশ্বর, জিলা-আরা, বয়স প্রায় ৩০ বছর, পেশা চাকুরী সৈনিকতা, আদালতে উপস্থিত।

প্রশ্ন ঃ ১। সরকারের সাথে সমকক্ষতা ও বিরদ্ধাচরণ করা;
২। পলায়ন করা;
৩। অস্ত্রশস্ত্রসহ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা— এতদসংক্রান্ত অপরাধ করছে কি না?

উত্তর ঃ না।

আমি বলদেব রাম, ৭৩ নং পল্টন রেজিমেন্টের সিপাহী, পিতা গঙ্গাদয়াল রাম, সাকিন সাহুলে, জিলা আরা, বয়স প্রায় ২৫ বছর, পেশা সৈনিকতা, আদালতে উপস্থিত।

প্রশ্ন ঃ তুমি পালিয়েছিলে?

উত্তর ঃ না

আমি প্রভু ওঝা, পিতা শিব সন্ন্যাসী ওঝা, সাকিন লওয়াদা, জিলা গোরক্ষপুর, বয়স প্রায় ২৪-২৫ বছর, পেশা-চাকুরী, সৈনিকতা উপস্থিত।

প্রশ্ন ঃ তুমি পালিয়েছিলে কিনা?

উত্তর ঃ না।

আমি এলাহী বক্স সিপাহী, সাকিন-সুলতানপুর, জিলা-সুলতানপুর, বয়স প্রায় ২৫ বছর, পেশা চাকুরী, সৈনিকতা, উপস্থিত।

প্রশ্ন ঃ তুমি পালিয়েছিলে কিনা?

উত্তর ঃ না।

আমি ধোবন সিং, ৭৩ নং রেজিমেন্টের সিপাহী, পিতা-রামায়ণ সিং, সাকিন গৌড়েশ্বর, জিলা-ভোজপুর (আরা), বয়স প্রায় ২০ বছর, পেশা সৈনিকতা, উপস্থিত।

প্রশ্ন ঃ তুমি পালিয়েছিলে কিনা?

উত্তর ঃ আমি ভয়ে পালিয়েছিলাম।

আমি রামরাজ সিং, পিতা, গিরিধারী সিং, সাকিন ভোজপুর (আরা), বয়স প্রায় ২২ বছর, পেশা সৈনিকতা, উপস্থিত।

প্রশ্ন ঃ তুমি পালিয়েছিলে কিনা?

উত্তর ঃ আমি ভয়ে পালিয়েছিলাম।

আমি রমজান খান সিপাহী, পিতা কায়েম খান, কেশারীর অধিবাসী, জিলা এলাহাবাদ, বয়স প্রায় ২৫ বছর, পেশা চাকুরী, উপস্থিত।

প্রশ্ন ঃ তুমি পালিয়েছিলে কিনা?

উত্তর ঃ না।

আমি টমাস জন, পিতা-বারল্যান্ড, সাকিন মাদ্রাস-বর্তমানে ঢাকা কুঠী ব্যারাক মাষ্টার, বয়স প্রায় ২০ বছর, পেশা চাকুরী, উপস্থিত হয়ে বাইবেল হাতে শপথ করলাম।

প্রশ্ন ঃ তুমি এই ঘটনার কি জান?

উত্তর ঃ গত রোববার দুপুরে আমি জেনারেল ডাক্তার সাহেবের কুঠীতে আসি। সেখান থেকে ব্যারাক মাষ্টারের বাংলায় গিয়ে দেখি হোসেন বক্স সিপাহী ও কবির সর্দার সেখানে উপস্থিত। কবীর আমাকে বলল যে হোসেন বক্স নায়েক এখানে আসায় আমি তাকে আটক করে রেখেছি। তুমি গিয়ে সাহেবকে খবর দাও। আমি তখন গিয়ে ১ম ক্যাপ্টেন সাহেবকে সংবাদ দেই। ওয়েষ্ট সাহেব সেই বাংলোর নীচে এসে আমাকে বললেন যে হোসেন বক্সকে তুমি কালেক্টর সাহেবের কাছে নিয়ে যাও। পশ্চাতে অবস্থানরত হোসেন বক্সকে নির্দেশ করে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে এই লোকটিকে কি আমি কালেক্টর সাহেবের নিকট পৌঁছে দিয়েছিলাম? আসামী কিছু জিজ্ঞাসা করেনি। প্রশ্নানুসারে বললাম যে হোসেন বক্স সিপাহীর হাতে কিছু অস্ত্রশস্ত্র দেখেছিলাম। কবীর সর্দার বলেছিল যে তার (হোসেন বক্স) হাতে একটি তরবারী ছিল। সেটা তার কাছ থেকে নিয়ে বরকন্দাজের হাতে সমর্পণ করেছিল।

আমি কবীর, পিতা-রঘুনাথ সিং, সাকিন— অমৃতসর, বর্তমানে ঢাকা কুঠী ডওয়েল সাহেব, বয়স প্রায় ২৮ বছর, পেশা চাকুরী, উপস্থিত। ১৮৪০ সালের আইনানুসারে শপথ করছি।

প্রশ্ন ঃ তুমি এই মামলার কি জান?

উত্তর ঃ গত রোববার সন্ধ্যায় আমি জেনারেল ডাক্তার সাহেবের কুঠীতে বিছানা ঠিক করার কাজে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে আমি যখন আমার সাহেবের কুঠীর দ্বারে পৌছুলাম, তখন সদর দরজায় হোসেন বক্সকে উপস্থিত দেখলাম। আমার প্রশ্নের উত্তরে হোসেন বক্স নায়েক বলল যে সে সাহেবের সাক্ষাৎপ্রার্থী। সে আরো বলল যে সাহেবের যা ইচ্ছা তাই করুন— আমি সাহেবকে ছেড়ে কোথায় যাব। হাবিলদারজী সর্দার সেখানে আসায় আমি তাকে বললাম যে তুমি সাহেবকে খবর দাও। খবর দিলে সাহেব এসে নায়েকের সঙ্গে আলাপ করলেন। তিনি হোসেন বক্সকে কালেক্টর সাহেবের নিকট নিয়ে যাবার জন্য আমাদের আদেশ দিলেন। সেই মোতাবেক মাদ্রাজী সর্দার ও আমি হোসেন বক্সকে কালেক্টর সাহেবের নিকট নিয়ে গেলাম। আসামী কিছুই জিজ্ঞাসা করেনি। প্রশ্নানুসারে বললাম যে হোসেন বক্সের হাত হতে কিরীচ নিয়ে বরকন্দাজের হাতে সমর্পণ করেছিলাম।

আমি হাসান খাঁ বক্স, পিতা জুমলা খাঁ, সাকিন-আজমগড়, বর্তমানে ডওয়েল সাহেবের কুঠীতে, বয়স প্রায় ২২ বছর, পেশা—চাকুরী বরকন্দাজী, উপস্থিত হয়ে শপথ নিলাম।

প্রশ্ন ঃ তুমি এই মামলার কি জান?

উত্তর ঃ গত রোববার সকাল আটটায় ডওয়েল সাহেব ও সুপারিনটেন্ডেন্ট সাহেব আমাকে আদেশ দিলেন যে বাংলাবাজারে এক আত্মীয়ের বাসায় একজন সিপাহী অবস্থান করছে, তাকে নিয়ে আসতে হবে। এই আদেশানুসারে আকবর খান ও আমি সেই আত্মীয়ের বাসায় গিয়ে উপস্থিত বলদেব রাম সিপাহীকে আহত অবস্থায় দেখতে পেয়ে কালেক্টরীর কাছারিতে নিয়ে আসি। আসামী কোন প্রশ্ন করেনি।

আমি আকবর খান, পিতা-মেহের খান, সাকিন আজমগড়, বর্তমানে ঢাকা, বয়স প্রায় ৩০ বছর। পেশা চাকুরী উপস্থিত হয়ে শপথ নিলাম।

প্রশ্ন ঃ তুমি এই মামলার কি জান?

উত্তর ঃ গত রোববার আটটার সময় সুপারিনটেন্ডেন্ট সাহেব এবং ডওয়েল সাহেব হাসান বক্স ও আমাকে আদেশ দিলেন যে বাংলা বাজারে কোন আত্মীয়ের বাসায় একজন সিপাহী আহত অবস্থায় অবস্থান করছে—আমরা যেন তাকে নিয়ে আসি। সেই আদেশ অনুযায়ী হাসান বক্স ও আমি উপস্থিত বলদেব রামকে আহত অবস্থায় খাটিয়ায় তুলে কালেক্টরির কাছারির হাজতে পৌছে দেই। আমি এই জানি। আসামী কোন প্রশ্ন করেনি।

আমি বাহাদুর খান, পিতা-সফদর বক্স খান, সাকিন-সারলে, বর্তমানে ঢাকা কুঠীর ক্যাপ্টেন ম্যাকমিলন সাহেবের কাছে বয়স প্রায় ২৮ বছর, পেশা চাকুরী উপস্থিত হয়ে শপথ নিলাম।

প্রশ্ন ঃ তুমি এই মামলার কি জান?

উত্তর ঃ উপস্থিত এলাহী বক্স সিপাহী ক্যাপ্টেন সাহেবের কুঠীতে আর্দালী ছিল। প্রায়ই রাত্রে সে ক্যাপ্টেন সাহেবের বাংলোতে ঘুমাত। রোববার ভোরে সে বদনা হাতে বাংলো থেকে পায়খানা করতে গেল। সমস্ত দিন সে আসে নাই। সন্ধ্যার পর সে বাংলায় ফিরে আসে এবং আমাকে বলে ঃ আমি পল্টনের গোলমাল শুনে ভয়ে সমস্ত দিন লুকিয়ে ছিলাম। এখন উপস্থিত হয়েছি, সাহেবকে খবর দাও। আমি রিড সাহেবের পাহারাদারকে বললাম যে সিপাহী এসেছে এ সংবাদ সাহেবকে দাও। আমি এই জানি, এই আর কিছু জানি না। আসামী কোন প্রশ্ন করেনি।

আমি শের খান, পিতা-ইয়াদ আল্লা খান, সাকিন মাসরুরাবাদ, জিলা আগ্রা বর্তমানে ঢাকা কুঠী রেঙ্ক সাহেব বয়স প্রায় ২৬ বছর, পেশা চাকুরী বরকন্দাজী উপস্থিত হয়ে শপথ নিলাম।

প্রশ্ন ঃ তুমি এই মামলার কি জান?

উত্তর ঃ উপস্থিত এলাহী বক্স সিপাহী ম্যাকমিলন সাহেবের আর্দালী ছিল। সে লোক নিজ ইচ্ছায় গত রবিবার সন্ধ্যার পর উপস্থিত হয়। আমার প্রশ্নের উত্তরে জানায় যে সে সকালে পায়খানায় গিয়েছিল, এমন সময় পল্টনে কামানের গর্জন শোনা গেলে সে ভয়ে লুকিয়ে ছিল। সে উপস্থিত হলে রেঙ্ক সাহেবকে খবর দেয়া হল। আমি এই জানি। আসামী কোন প্রশ্ন করেনি।

আমি রাম বর্মা ভগৎ, পিতা শ্রী নারায়ণ ভগৎ, সাকিন-জিওনপুর, বর্তমানে ঢাকা ইসলামপুর, বয়স প্রায় ১৭ বছর, পেশা চাকুরী উপস্থিত হয়ে শপথ নিলাম।

প্রশ্ন ঃ তুমি এই মামলার কি জান?

উত্তর ঃ আমি থানা কুশাসার বরকন্দাজীতে নিয়োজিত ছিলাম। একদিন মামলার তদন্তের জন্য মহুরীর সঙ্গে মফঃস্বলে গিয়েছিলাম। গত মঙ্গলবার খুব সকালে (...অস্পষ্ট) কেদারঘাটে উপস্থিত রামরাজ এবং রমজান সিপাহীর সাথে দেখা হল। বুঝলাম এরা সব কিছুই জানে এবং তখনি তাদের উভয়কে গ্রেপ্তার করে থানার মহুরীর কাছে নিয়ে গেলাম। মহুরী তাদের চালান করে দিল। তাদের কাছে কোন অস্ত্রশস্ত্র ছিল না। আসামী কোন প্রশ্ন করেনি।

আমি হোসেন বক্স নায়েক আসামী। অভিযোগের উত্তরে বলছি যে আমি কামান বাহিনীর নায়েক গোলন্দাজ। গত রোববার সকালে যখন গণ্ডগোল শুরু হয়, তখন গোলন্দাজ ও সৈনিকগণ আমার কাছে আসে। আমি তাদের বললাম ঃ "তোমরা কি করছো, কামানে হাত দিও না। ক্যাপ্টেন সাহেব এসে

যে আদেশ দেবেন সেভাবেই তোমরা কাজ করো"। ফলে ২/৪ জন গোলন্দাজ আমাকে গালাগালি শুরু করলো। তাদের নিজ জাতির দোহাই দিলাম। ফলে দু'জন সিপাহী আমাকে তুলে মাটির উপর আছাড় দিল এবং ২/১টা লাথিও মারল। তারা বললো যে নিজ জাতির দোহাই দেয়, তাকে জঙ্গলে নিয়ে যাও। তাদের মারধরের ফলে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লাম। গোলন্দাজ ও সিপাহীগণ আমাকে টেনে হিঁচড়ে জঙ্গলে নিয়ে গেল। যখন অজ্ঞান অবস্থায় জঙ্গলে পড়ে ছিলাম তখন তারা লাইনের উত্তর দিকের জঙ্গলে আমায় ফেলে রেখে চলে গিয়েছিল। সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়লে আমার জ্ঞান ফিরল পরে ৬টার দিকে ক্যাপ্টেন সাহেবের কাছে ফিরে এসে আমার অবস্থা বর্ণনা করলাম। ক্যাপ্টেন সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "তুমি কেন আমার কাছে চলে এলে না?" প্রত্যুত্তরে আমি আমার অজ্ঞান অবস্থার বর্ণনা দিলাম।

প্রশ্ন ঃ আরো কিছু বলবে?

উত্তর ঃ না

আমি দীন আলী সিপাহী, অভিযোগের উত্তরে বললাম যে আমি লান্স নায়েক। সিপাহীদের আমি আইন কানুন শিক্ষা দেই এবং আমি লাইনে (অস্পষ্ট) ঘরে থাকতাম। আমার বাসা থেকে ১৫/২০ কদম দূরে কোথ (অস্ত্রাগার) ও ম্যাগজিন ঘর। গত অক্টোবর মাসে তারিখ মনে নেই একদিন রাত দুপুরে কোন চাপরাশী বা অন্য কেউ লাইনে খবর দিল যে গোরা সৈন্যগণ (ইংরেজ সৈন্যগণ) কামান দাগার জন্য প্রস্তুত। সে সময় ব্যারাকের শিব বক্স সিং জমাদার এবং অন্য প্রায় ৪০ জন মানুষ ও সিপাহী কোথের কাছে এসে গোলমাল শুরু করে। ফলে আমি মখদুম বক্স সুবেদারকে ঘুম থেকে তুলে বললাম যে জমাদার আর সিপাহীগণ অনর্থক গোলমাল শুরু করেছে, তুমি তাদের বিরত রাখ। ফলে সুবেদার সিপাহীদের গালাগালি দিয়ে শিব বক্স সিংকে ডাকল এবং বলল যে ক্যাপ্টেন সাহেব এক্ষুণি আসবে তোমরা সব গ্রেপ্তার হবে। ফলে সে গণ্ডগোল থেমে যায়। পরদিন সকালে ক্যাপ্টেন সাহেবের কাছে শাহজাদ খান জমাদার গিয়ে বলল যে এইসব গণ্ডগোল হচ্ছে আপনি লাইনে এসে এদের নিবৃত্ত করুন। এরই প্রেক্ষিতে ক্যাপ্টেন সাহেব (রেঙ্ক সাহেব) লাইনে গিয়ে ঘুমাতেন। এরপর যে কোন সিপাহী কোন গণ্ডগোল করলে আমি নিজ নিজ সর্দারের কাছে তা বলে দিতাম। ফলে সিপাহীগণ আমার উপর রাগান্বিত ছিল এবং সর্বদা আমার উপর প্রতিহিংসা পরায়ণ ছিল। গত রোববারে আমি পায়খানার জন্য যখন লাইনের পায়খানায় গেলাম, তখন বখশী থানা থেকে ৪ জন সিপাহী লাইনে গিয়ে হট্টগোল শুরু করে এবং বখশী থানার সিপাহীদের অস্ত্রশস্ত্র তারা ছিনিয়ে নিয়ে সিপাহীদের মেরে ফেলে। গোরা সৈন্যগণ লালবাগের দিকে এগিয়ে আসছে শুনে আমি হাসপাতালের সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে ছিলাম পরে ব্যারাক হতে কয়েকজন

সিপাহী আমাকে গালি দিয়ে বলে যে এখনও প্রস্তুত হয়নি, একেও মারব। ফলে ভয়ে আমি লাইন থেকে পালিয়ে উত্তর দিকের জঙ্গলে যাচ্ছিলাম। যখন লাইন থেকে বের হলাম, তখন গোলাগুলি শুরু হল। আমি জঙ্গলে চলে গেলাম। সিপাহীদের ভয়ে সমস্ত দিন জঙ্গলে ছিলাম। সন্ধ্যার সময় ক্যাপ্টেন সাহেবের কাছে উপস্থিত হবার জন্য আমি নদীর তীর দিয়ে যাচ্ছিলাম । তখন মহুরী সাহেবের সাথে দেখা হলে সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করায় বললাম যে আমি সিপাহী নিজ ক্যাপ্টেন সাহেবের কাছে যাব। মুহুরী সাহেব আমাকে নিজ জমাদারের নিকট সোপর্দ করে কিছু খাবার দেবার জন্য বলল। সারারাত হাজতে ছিলাম। সকাল বেলা মুহুরী সাহেবের নিকট উপস্থিত হয়ে জবাব লিপিবদ্ধ করলাম।

প্রশ্ন ঃ আরো কিছু বলবে কি?

উত্তর ঃ না।

আমি শেখ পীর বক্স ঢাকী আসামী। অভিযোগের উত্তরে বলছি যে যেদিন সকালে যুদ্ধ হল তার আগের রাতে কোন এক অজ্ঞাত আত্মীয়ের (বেশ্যা?) বাসায় ছিলাম এবং সেখানেই রাতে আহারাদি সেরেছিলাম । তার বাড়ীর পূর্ব দিকে অর্ধঘড়ি দূরে নরসিংহ বাবুর বাজার আছে। সকাল বেলা যখন কামানের শব্দ শুনলাম এবং আমাকে সেই বেশ্যাটি বলল যে লালবাগে কামানের শব্দ শোনা যায়। প্রথম আমার মনে হল যে গোরাদের প্রশিক্ষণ হচ্ছে। পরে বুঝলাম যে আজ রোববার এবং রোববারে প্রশিক্ষণ হয় না। লাইনেই এই গোলমাল হচ্ছে। ভয়ে সেই বেশ্যার বাসা থেকে পালিয়ে প্রথমে লাইনের কাছে গিয়ে গোরাদের দেখে আবার সেই বেশ্যার বাসায় চলে এলাম। সমস্ত দিন সেই বাসায় থেকে রাতে সেখান থেকে আধ-ক্রোশ দূরে একটা মসজিদ পেলাম এবং সেখানে থাকলাম। পরের দিন হেঁটে হেঁটে পশ্চিম দিকে যাচ্ছিলাম। এক থানার কাছে এলে চৌকিদার আমাকে ডেকে দারোগার কাছে নিয়ে গেল। আমাকে দারোগা চালান করে হুজুরের নিকট পাঠিয়ে দিল। এই আমার বিবরণ।

প্রশ্ন ঃ আরো কিছু বলবে?

উত্তর ঃ না।

আমি দীন দয়াল মিশ্র আসামী। অভিযোগের উত্তরে বলছি যে আমি ৭৩ নং পল্টনের সিপাহী। রোববার সকালে যখন লাইনে গোলাগুলি শুরু হল তখন আমি লাইনের হাসপাতালের পায়খানায় গিয়েছিলাম। সেখান হতে ভয়ে পল্টন থেকে বেরিয়ে উত্তর দিকে জঙ্গলে চলে গেলাম। সমস্ত দিন শহরেই ছিলাম। দুপুরে উত্তর দিকের রাস্তা ধরে আস্তে আস্তে যাচ্ছিলাম। চারদিনের দিন থানার একজন বরকন্দাজ আমাকে রাস্তা থেকে গ্রেপ্তার করে আনে। এই আমার বিবরণ।

প্রশ্ন ঃ আরো কিছু বলবে?

উত্তর ঃ না।

আমি বলদেব রাম সিপাহী। অভিযোগের উত্তরে বলছি যে গত রোববার সকালে ম্যাকমিলন সাহেব বললেন ঃ "আদেশ এসেছে, তোমরা অস্ত্রশস্ত্র ছেড়ে দাও। বখশী থানা হাজতের সিপাহীদের তুলে নাও এবং লাইন পূর্ণ কর।" লাইন পূর্ণ হলে ক্যাপ্টেন সাহেব আদেশ দিলেন ঃ "তোমরা অস্ত্রশস্ত্র ছেড়ে দাও।" আমরা অস্ত্রশস্ত্র ছেড়ে দিলে ক্যাপ্টেন সাহেব আমাদের বন্দুক থেকে পৃথক করে বন্দুকগুলি নিজেই রেখে দিলেন। আমি বললাম ঃ "এতদিন আপনার নিমক খেয়েছি আদেশ দিলে বন্দুক আমরাই রেখে দিতাম। আপনি কেন কষ্ট করলেন"? তারপর আমরা সাহেবের আদেশ অনুসারে সেখানে বসলাম। যখন লালবাগে গোলাগুলি শুরু হল তখন আমরা সবাই ভয় পেলাম এবং হাজতে বসে থাকা উত্তম মনে করেই বসে ছিলাম। সেই হাজতের পেছনে একটা জানালা ছিল। সেই জানালা দিয়ে সব সিপাহীগণ পালাতে শুরু করে। আমি ও একজন নায়েক দরজার ওপরই বসেছিলাম। সিপাহীগণ কোন দিকে গেল তা দেখার জন্য আমি যখন সেই জানালার মত দরজার কাছে গেলাম, সে সময় আমার প্রতি দু'টি গোলা নিক্ষেপ করা হয়। কিন্তু কে করল তা আমি দেখিনি। সেই গোলার আঘাতে আমি ভূপতিত হই। পরে সে অবস্থায় আমি এক আত্মীয়ের বাসায় গেলাম, ক্যাপ্টেন সাহেব সেখান হতে বরকন্দাজ পাঠিয়ে আমাকে তুলে আনেন।

প্রশ্ন ঃ আরো কিছু বলার আছে?

উত্তর ঃ না।

আমি প্রভু ওঝা আসামী। অভিযোগের উত্তরে বলছি যে আমি পল্টনের বখশী থানায় চাকুরীতে ছিলাম। গত রোববারের আগের রাতে ঘুমাচ্ছিলাম। যখন পাঁচটা বাজে তখন হাবিলদার আমাকে ঘুম হতে তুলে প্রস্তুত হয়ে আসতে বলল। সে অনুযায়ী আমি বাইরে এলাম। ক্যাপ্টেন সাহেব ও জমাদার মিল গুণতে লাগলেন। লাইন পূর্ণ হল না। ক্যাপ্টেন সাহেব বললেন যে অন্য সিপাহীগণ কোথায় আছে। প্রত্যুত্তরে জমাদার বলল যে অন্য সিপাহীগণ প্রহরায় আছে। তারা ফিরে এলে লাইন পূর্ণ হবে। ক্যাপ্টেন সাহেব প্রহরী সিপাহীদেরও নিয়ে আসতে আদেশ দিলেন ফলে সিপাহীগণ এসে পড়ে এবং লাইন পূর্ণ হয়। তখন ক্যাপ্টেন সাহেব বললেন ঃ "আদেশ এসেছে—তোমরা সব বন্দুক রেখে দাও।" জমাদার বলল ঃ "হুজুর! রাতে কেন কষ্ট করলেন। দিনে বললেই তো সেই সময় ছেড়ে দিতাম"। যাই হোক, সিপাহীগণ বন্দুক ও তোপদান সমর্পণ করল। জমাদার ক্যাপ্টেন সাহেবকে বলল যে আমরা এখন কি করবো। ক্যাপ্টেন সাহেব আমাদের সেখানেই বসে থাকতে বললেন। পরে আমি বাইরে এসে দাঁড়িয়ে থাকলাম। গোরা সৈন্যগণ আমাকে

জিজ্ঞাসা করল যে অন্যান্য সিপাহীগণ কোথায় আছে। আমি বললাম যে ওরা সবাই কম্পাউন্ডে আছে। পরে গোরাগণ গোলাগুলি শুরু করে। দু'জন সিপাহীর গায়ে গুলি লাগতে আমি দেখেছি। গোরাগণ সেখানে গেল এবং গিয়ে কাউকে দেখতে পেল না। আমিও ভয়ে লাফিয়ে পড়ে গিয়ে পালালাম। এতে আমি ভীত হলাম এবং বখশী থানা থেকে আধক্রোশ রাস্তা পূর্বদিকে এক গোয়াল ঘরে আত্মগোপন করলাম। পরের দিন সেই গোয়ালা আমাকে বলল যে ব্যারাক মাষ্টার এবং আরো চারজন গোরা আমাকে ডেকেছেন। আমি একথা শুনে নিজেই সাহেবের কাছে উপস্থিত হলাম। সেখান থেকে আমাকে কালেক্টরীতে বসান হল। আমি সমস্ত দিন কালেক্টরীতেই ছিলাম। রাতে গোরা সৈন্যগণ আমাকে সেখান থেকে নিয়ে এক কুঠুরীতে বন্দী রাখল। পরের দিন দুপুরে আমাকে জেলখানায় নিয়ে যাওয়া হল।

প্রশ্ন ঃ আর কিছু বলার আছে?

উত্তর ঃ না।

আমি এলাহী বক্স আসামী। অভিযোগের উত্তরে বলছি যে আমি ক্যাপ্টেন ম্যাকমিলন সাহেবের আর্দালী ছিলাম। রাতে প্রায়ই আমি ক্যাপ্টেন সাহেবের বাসায় থাকতাম। গত রোববার সকালে ক্যাপ্টেন সাহেব আমাকে বললেন যেন তার রক্ষী এলে তাকে যেন ডওয়েল সাহেবের নিকট পাঠিয়ে দেই। সাহেব বাইরে গেলেন এবং আমি পায়খানার জন্য গেলাম। এ সময় কামানের শব্দ শুনে আমি ভয়ে বসে থাকলাম। যদি বের হই তবে পল্টনের সিপাহীগণ আমাকে গ্রেপ্তার করবে এই ভয়ে আমি সারাদিন সেখানে বসে থাকলাম। সন্ধ্যার পর আমি সাহেবের নিকট এলাম এবং সাহেবকে খবর দিলাম। তখন সাহেব আমাকে একখানা চিঠিসহ থানায় পাঠিয়ে দিলেন। আমাকে কোতয়ালীতে নিয়ে আসা হল। ক্যাপ্টেন সাহেব বললেন ঃ "তুমি কেন ঘাবড়াচ্ছো? তোমার বন্দুক ও তোপদান সব আমার ঘরে আছে"। এই আমার বিবরণ।

প্রশ্ন ঃ আর কিছু বলার আছে?

উত্তর ঃ না।

আমি ধোবন সিং আসামী। অভিযোগের উত্তরে বলছি যে আমি কালেক্টরীর প্রহরায় নিয়োজিত ছিলাম। ক্যাপ্টেন ম্যাকমিলন সাহেবের আদেশানুসারে বন্দুক ও তোপদান ইত্যাদি ছেড়ে দিয়েছিলাম। এরপরে অন্যান্য সিপাহীদের সাথে আমি সেখান হতে দূরে গিয়ে বসে থাকলাম। কিছুক্ষণ পর গোরা সৈন্যগণ বন্দুকের আওয়াজ করলো। ফলে প্রাণের ভয়ে পালালাম এবং শহরের বাইরে জঙ্গলে আশ্রয় নিলাম। রাতে হেঁটে প্রায় দু' ক্রোশ দূরে গিয়ে পুনরায় জঙ্গলেই আশ্রয় নিলাম। তার পরদিন সন্ধ্যায় সানকা চাপরাশী (অস্পষ্ট) পুলের নিকট হতে গ্রেপ্তার করে। আমার নিকট যে পয়সা কড়ি ছিল

সেগুলো দারোগা মোয়াল্লিকা (?) করে হুজুরের নিকট পাঠিয়ে দেন। এই আমার বিবরণ।

প্রশ্ন ঃ আরো কিছু বলবে?

উত্তর ঃ না।

আমি রামরাজ সিং সিপাহী। অভিযোগের উত্তরে বলছি যে আমি বখশী থানার চাকুরীতি ছিলাম। গত শনিবার ভোর ৫টায় ক্যাপ্টেন ম্যাকমিলন সাহেব এবং গোড়া সৈন্যগণ বখশী থানায় গিয়ে সিপাহীদের সংখ্যা গণনা করে সকলের নিকট হতে বন্দুক ও তোপদান নিয়ে নেন। সকলকে গার্ডে বসিয়ে রাখলেন। পরে যখন লালবাগে কামান চলা শুরু হল তখন (...পাঠ দুষ্কর)—যেহেতু আমি নতুন সিপাহী যুদ্ধ দেখিনি। ভয়ে পালিয়ে লোহার পুলের উপর থেকে জঙ্গলে চলে গেলাম। গোরাদের ভয়ে আমি সরাসরি উত্তর দিকে যেতে লাগলাম। মঙ্গলবার ভোরবেলা থানার একজন বরকন্দাজ আমাকে পেয়ে গ্রেপ্তার করে আনে। রাস্তায় রমজান খান সিপাহীর সাথে সাক্ষাৎ হওয়ায় আমরা দুজনেই একত্রেই ছিলাম। বরকন্দাজ উভয়কেই গ্রেপ্তার করেছিল। তারপর আমরা স্বেচ্ছায় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে এসেছি।

প্রশ্ন ঃ আর কিছু বলবে?

উত্তর ঃ না।

আমি রমজান খান সিপাহী। অভিযোগের উত্তরে বলছি যে আমি বখশী থানায় চাকুরীতে নিয়োজিত ছিলাম। গত রোববার রাত ৫টায় ক্যাপ্টেন সাহেব গার্ডে গিয়ে বললেন ঃ "গার্ড প্রস্তুত কর"। পরে ক্যাপ্টেন সাহেব ও শিব বক্স সিং জমাদারকে বললেন ঃ "আদেশ এসেছে। তোমরা সব অস্ত্রশস্ত্র ছেড়ে দাও"। এরপর আমরা সব অস্ত্রশস্ত্র ছেড়ে দিলাম এবং ক্যাপ্টেন সাহেবের আদেশানুসারে আমরা গার্ডে গিয়ে বসে থাকলাম। সেই গার্ডের পেছনে জানালা ছিল। আমি যেহেতু নতুন সিপাহী, গোলমাল দেখে জানালা থেকে পালিয়ে এক জঙ্গলে গিয়ে লুকিয়ে ছিলাম। গত মঙ্গলবার সকাল ৮টায় আমি স্বেচ্ছায় থানায় গিয়ে উপস্থিত হলে দারোগা সাহেব আমাকে একদিন থানায় রেখে পরের দিন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

প্রশ্ন ঃ আরো কিছু বলবে?

উত্তর ঃ না।

জিজ্ঞাসা করলে সে উত্তর দিল যে ৬ বছর পূর্বে পল্টনে যোগ দেয়।

রায়

যেহেতু হোসেন বক্স—নায়েক গোলন্দাজ, শেখ দীন আলী সিপাহী ও দীন দয়াল মিশ্রের প্রথম অপরাধ হচ্ছে সরকারের বিরুদ্ধাচরণ, বিদ্রোহ ও সমকক্ষতা আনয়ন এবং পীর বক্স ঢাকী, বলদেব রাম সিপাহী, প্রভু ওঝা, এলাহী বক্স, ধোবন সিং, রামরাজ সিং

ও রমজান খান সিপাহীদের বিরুদ্ধে পলায়নের অভিযোগ প্রমাণিত হয় সেহেতু আদেশ দেয়া যাচ্ছে যে হোসেন বক্স—নায়েক গোলন্দাজ, শেখ দীন আলী সিপাহী ও দীন দয়াল মিশ্র—এদের সবাইকে ফাঁসি দেয়া হোক এবং পীর বক্স আলী, বলদেব রাম, প্রভু ওঝা, এলাহী বক্স, ধোবন সিং, রামরাজ সিং ও রমজান খান সিপাহী—এদের সবাইকে জিঞ্জিরার অপর তীরে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হোক। বৃটিশ শাসনের নিয়মানুসারে ঢাকা জেলার ফৌজদারী হাকিমের নামে আদেশ জারী করা হোক।

২৮শে নভেম্বর, ১৮৫৭ সালে লিখিত।*

---

* ঢাকার বিদ্রোহী সিপাহিদের মোকদ্দমা সংক্রান্ত নথিপত্র ঢাকা জেলার বিচার বিভাগীয় রেকর্ডরুমে পাওয়া যায়। এইসব নথিপত্র যেভাবে পাওয়া গেছে সেভাবেই এই গ্রন্থে সংযোজিত করা হয়েছে। কেবলমাত্র ফার্সি নথিপত্র বঙ্গানুবাদ করা হয়েছে। রতনলাল চক্রবর্তী, **সিপাহীযুদ্ধ ও বাংলাদেশ**, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ২০৫-২৩৪।

সংকলন—৪

ব্রেনান্ডের রোজনামচা
(১৮৫৭-৫৮)

১২ জুন ॥ ১৮৫৭ ইউরোপীয়ানরা খুব শঙ্কিত। কারণ, গুজব রটে গেলো যে মার্চের শুরুতে ৭৩-এর যে দুটি কোম্পানী ঢাকার পথে রওয়ানা হয়েছিলো মাঝপথে তারা ব্যারাকপুরের ছাঁটাই করা কিছু সিপাহীর সঙ্গে একত্রিত হয়ে বিদ্রোহ করেছে এবং ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করে লালবাগের সিপাহীদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। তারা বাজার লুট করেছে এবং মুক্তি দিয়েছে জেল বন্দীদের।

ম্যাজিস্ট্রেট মি. জেনকিনসের বাসায় মিলিত হলো বেশ কিছু ইউরোপীয়ান। নদীতে নৌকায় আশ্রয় নিলেন কিছু মহিলা। সংগ্রহ করা হলো তথ্য। পুরো শহরে উত্তেজনা। বাঁধের উপর নেটিভরা জমায়েত হয়ে অবাক চোখে সব দেখছিলো।

লেঃ ম্যাকমোহন ও রিণ্ড লালবাগের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন যেখানে ছিল সিপাহীরা। ফিরে এসে তাঁরা জানালেন, সিপাহীরা শান্ত এবং গুজব ভিত্তিহীন।

বিকেলে নেটিভরা আবার আমাদের দেখে অবাক হয়ে গেলো। তারা শুনেছিলো ভাগ্যের হাতে তাদের ছেড়ে দিয়ে আমরা পালিয়ে গেছি।

১৩ জুন ॥ সবকিছু শান্ত। কাজকর্ম চলছে আবার আগের মতো।

২৩ জুন ॥ সরকার লেঃ লুইসের অধীনে ভারতীয় নৌবাহিনীর একশো সেনা পাঠিয়েছে নগররক্ষার জন্য। ব্যাপটিষ্ট চ্যাপেলের রাস্তার অপর পাশে একটি বাড়িতে তারা আস্তানা গেড়েছে।

২৮ জুন ॥ শহরতলিতে পুলিশ ধরেছিলো দু'জন দলত্যাগীকে। সিপাহীরা তাদের উদ্ধার করে নিয়ে গেছে। দু'টি কোম্পানিকেই প্যারেড করানো হলো, কিন্তু বরকন্দজরা দোষীকে চিহ্নিত করতে পারলো না বা ভয়েই করলো না। অন্যদিকে সিপাহীরা জানালো পুলিশের জন্যে তারা শহরে আসতে পারছে না।

৫ জুলাই ॥ কুমিল্লা থেকে মেটকাফরা পালিয়ে এসেছে। তারা শুনেছে চাটগাঁর সিপাহীরা বিদ্রোহ করেছে এবং এখন ঢাকার পথে। যাক ব্যাপারটা ভিত্তিহীন। নৌ-সেনারা আসার ফলে ঢাকা এখন শান্ত।

লেঃ লুইস প্রতিদিন তাঁর সেনাদল নিয়ে র‍্যাকেট কোর্ট আর কলেজের সামনে মহড়া দেন। মাঝে মাঝে কালেক্টরেটেও এই প্রক্রিয়া চলে। পাহারাদার সিপাহীরা এ ব্যাপারে খুব ক্ষুব্ধ। তারা বলছে, 'ইয়ে কেয়া ডর দেখলাতা?' বোঝাই যাচ্ছে নৌ-সেনাদের তারা পছন্দ করছে না।

আজ সিপাহীদের মনে খানিকটা আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এখানকার সেনাধিপতি ডওয়েল লালবাগে কামান বসানোর জন্যে স্ক্রুর খোঁজে পাঠিয়েছিলো। সিপাহীদের ধারণা তাদের বোধহয় নিরস্ত্র করা হবে।

৩০ জুলাই ॥ কলেজে ইউরোপীয়ান ও ইষ্ট ইন্ডিয়ানদের (দেশীয়দের) মিটিং হলো। প্রায় ষাটজন উপস্থিত ছিল। ঠিক হলো দু'ধরনের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তোলা হবে, পদাতিক এবং ঘোড়সওয়ার। মেজর স্মিথ হবেন পদাতিক বাহিনীর অধিনায়ক আর লে. হিচিনস ঘোড়সওয়ার বাহিনীর।

বকরী ঈদের তিনদিন ঃ

১, ২, ৩ আগষ্ট ॥ তিনদিন, রাতে স্বেচ্ছাসেবকরা টহল দিয়ে বেড়ালো। ধারণা করা হয়েছিলো, মুসলমানরা গণ্ডগোল করতে পারে। দুই তারিখ ছিল বুধবার। গীর্জায় যাঁরা উপাসনা করতে গেছেন তাঁদের রক্ষার জন্যে কলেজে কিছু স্বেচ্ছাসেবক ছিল। আর্মেনিয়ান এবং ইউরোপীয়ানরা বেশ ভয় পেয়ে গেছে, বিশেষ করে যাদের সঙ্গে পরিবার পরিজন আছে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের সংবাদ শুনে মনে হয় যে-কোনো আকস্মিক বিদ্রোহের জন্যে প্রস্তুত থাকা উচিত।

১১ আগষ্ট ॥ অনেক আর্মেনিয়ান কলকাতা চলে যাচ্ছে। অনেক ইউরোপীয়ান ফলিস মিলকে দুর্গের মতো সুরক্ষিত করার কথা চিন্তা করছে। প্রতিদিন বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে স্বেচ্ছাসেবকরা ড্রিল করে এবং ড্রিলে তারা বেশ পারদর্শিতা অর্জন করেছে। খুব শীঘ্রই তারা টার্গেট প্র্যাক্টিস শুরু করবে। সাহেবদের মধ্যে এতো উত্তেজনা কেন নেটিভরা তা বুঝতে পারছে না এবং স্বেচ্ছাসেবকদের রাতের টহল দেখেও তারা অবাক হচ্ছে।

১৪ এবং ১৫ আগষ্ট ॥ জন্মাষ্টমীর উৎসব। যেমনটি হয় সবসময় তেমন ভীড় হয়েছিল। বিপদ ঘটলে তার মোকাবেলা করার জন্য হাতিতে চড়ে ঘোড়সওয়ার বাহিনীর লোকজন টহল দিলো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে।

পদাতিকরাও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে কলেজে ছিল। সবকিছু শান্ত।' '৭৩-এর হেডকোয়ার্টার জলপাইগুড়ি থেকে চিঠি এসেছে। অফিসাররা আশঙ্কা করছে ঘটনাপ্রবাহ যে খাতে প্রবাহিত হচ্ছে তাতে করে নিজের লোকের ওপর আর নিয়ন্ত্রণ রাখা সম্ভব হবে না। তারা ঠিক করেছে জলপাইগুড়ির সিপাহীরা যদি বিদ্রোহ করে তবে এখানকার সিপাহীদের তখুনি নিরস্ত্র করা হবে।

কালেক্টরেটে পঞ্চাশ জন সিপাহী আছে। প্ল্যান করা হয়েছে প্রথমে তাদের নিরস্ত্র করে, লালবাগের সিপাহীদের নিরস্ত্র করা হবে এবং অস্ত্রশস্ত্র সব দখল করে নেয়া হবে।

২২ আগষ্ট ॥ 'মিল' সুরক্ষিত করার কাজ এগিয়ে চলছে। এবং খুব শীঘ্রই তা শেষ হবে। দু'শো লোক সেখানে কাজ করছে।

২৭ আগষ্ট ॥ সুরক্ষিত করার কাজ চলছে। এই কাজ শেষ হলে পাঁচ-ছ'হাজার লোকের আক্রমণ ঠেকানো যাবে। শহরতলী এবং গ্রামাঞ্চল শান্ত। তবে শোনা যাচ্ছে, নদীপথে বেশ কিছু লোক অনুপ্রবেশ করছে এবং বিভিন্ন জায়গায় অবতরণ করছে। ম্যাজিস্ট্রেট জানিয়েছেন, এক মাসের মধ্যে ঢাকায় দু'কোম্পানি ইউরোপীয়ান সৈন্য, ঘোড়সওয়ার ও গোলন্দাজ বাহিনী আসবে।

৩০ আগষ্ট ॥ গতকাল, রোববার ছিল মহররম। ঘোড়সওয়ার স্বেচ্ছাসেবকরা সারারাত টহল দিয়ে বেড়িয়েছে। তাদের ভাষ্য অনুযায়ী শহর পুরোপুরি শান্ত। অবশ্য, গতবার মহর্‌রমে যতো লোক হয়েছিলো এবার তা হয়নি। হোসেনী দালানে মাত্র পঞ্চাশজন উপস্থিত ছিল। অনেকের মতে, মুসলমানরা ভয় পেয়েছে।

১৪ সেপ্টেম্বর ॥ জলপাইগুড়ি ৭৩ [ডিভিশন] এখনও শান্ত। আমরা আশা করছি তারা শান্ত থাকবে। যদি তারা শান্ত না থাকে তাহলে আমরা এখানে জড়িয়ে পড়বো; তবে, সিপাহীদের আমরা বেশ ভালোভাবে প্রতিরোধ করতে পারবো এবং বোধ হয় তারা প্রতিরোধের সম্মুখীন হলে পালাবে। ইদানীং তারা আমাদের বেশ সমীহ করছে।

১২ অক্টোবর ॥ ঘোড়সওয়ার স্বেচ্ছাসেবকরা পদাতিক স্বেচ্ছাসেবকদের জন্যে আয়োজন করেছিলো বল নাচের। যা আশা করা গিয়েছিলো লোক ততো হয়নি। দশজনের মতো মহিলা উপস্থিত ছিলেন। ইউনিফর্ম পরিহিত প্রায় বিশজন পদাতিক স্বেচ্ছাসেবক নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে এসেছিলো। তবে, সামগ্রিকভাবে পার্টিটা হয়েছিলো বেশ মনোরম।

১৯ অক্টোবর ॥ কিছু সিপাহীকে শাস্তি দেয়া হলো [কেন, তা উল্লেখ করা হয়নি], কিন্তু অবস্থা শান্ত।

১ নভেম্বর ॥ গীর্জার পাশে যে প্রচারকরা থাকতেন সেখানে নৌ সেনাদের

স্থানান্তরের ফলে গত রোববার বেশ উত্তেজনা দেখা গিয়েছিলো। সিপাহীরা অস্ত্রাগার থেকে গুলি-গোলা বের করেছিলো। সবাই আশঙ্কা করছিলো। এই বুঝি বিস্ফোরণ ঘটলো।

শোনা গেছে তারা [সিপাহীরা] নাকি জলপাইগুড়িতে চিঠি লিখে জানতে চেয়েছে তাদের যদি নিরস্ত্র করা হয় তবে তারা বাধা দেবে কিনা। আমাদের বিশ্বাস, আমাদের বিশেষ কোন ক্ষতি না করে তাদের নিরস্ত্র করা সম্ভব। তবে, আশঙ্কা করা হচ্ছে, এদের নিরস্ত্র করলে চাটগাঁ, সিলেট এবং জলপাইগুড়িতে অবস্থানরত সিপাহীদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে। সকলের ধারণা, ঢাকা শান্ত থাকলে অন্যান্য অঞ্চলও শান্ত থাকবে। এরা বেশ ভদ্র, কিন্তু আমাদের সামনে যখন তাদের 'ভাই-বোনের' উদাহরণ আছে [ভ্রাতৃত্ব বোধ বোঝাতে চেয়েছেন] তখন আমাদের উচিত হবে না তাদের বিশ্বাস করা।

৯ই নভেম্বর পদাতিক স্বেচ্ছাসেবকরা একটি ডিনার দিলো। আমার ঘরের বিরাট হলে এর আয়োজন করা হয়েছিল। ঢাকায় এর আগে ভদ্রলোকদের এত বড় পার্টি আর হয়নি। প্রায় সত্তরজনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিলো। এসেছিলো পঞ্চাশজন। সবাই ভেবেছিলো আমার এখানে বুঝি জায়গা হবে না। [ছাব্বিশে নভেম্বরের দিনলিপিতে, এর পর ব্রেনান্ড সেই ভয়ংকর দিনের বর্ণনা দিয়েছেন যে দিন শান্ত, বাধ্য এবং নিরস্ত্র সিপাহীদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। ব্রেনান্ডের বর্ণনা পড়ে স্পষ্ট বোঝা যায় ইংরেজরা জুজুর ভয়ে আত্মহারা হয়ে বাধ্য সিপাহীদের হত্যা করে। ব্রেনান্ড এক জায়গায় বলেছেন, সিপাহীরা আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলো। কিন্তু তার এই বর্ণনাতেই এক জায়গায় দেখা যাচ্ছে, ট্রেজারীর গার্ডরা বলছে, হুমকির কোনো দরকার ছিল না, তাদের বললেই তারা অস্ত্রসমর্পণ করতো। এছাড়া আছে উকিল হৃদয়নাথ মজুমদারের আত্মকথা। তিনি জানিয়েছেন, সিপাহীরা এ ধরনের কোনো রকম বিপদের আশঙ্কা করেনি।

২৬ নভেম্বর ॥ যে ঝড় ভারতবর্ষের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছিলো, তা মাত্র কিছুক্ষণ আগে বয়ে গেলো ঢাকার ওপর দিয়ে। সুখের বিষয়, অন্যান্য অঞ্চলে এ পরিপ্রেক্ষিতে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ঢাকায় তা হয়নি। আমরা এখন আমাদের 'বিশ্বস্ত ও অনুগত বন্ধু' সিপাহীদের ঝামেলা থেকে বেঁচেছি।

গত শনিবার পর্যন্ত সবকিছু আগের মতো চলছিলো বিকেলে ক্রিকেট খেলা হলো আর স্বেচ্ছাসেবকরাও তাদের মহড়া চালিয়ে

গেলো। প্রতিদিনের মতো বিকেলে হাওয়া খেয়ে বেড়ালাম। কিন্তু চাটগাঁ থেকে ডাকে খারাপ খবর এলো। গোয়েন্দা-ডাকে খবর এলো ব্যারাকপুরে সিপাহীরা বিদ্রোহী হয়ে ট্রেজারী লুট করে লাখ টাকা ছিনিয়ে নিয়েছে এবং বেশ কিছু ইউরোপীয়ানকে হত্যা করেছে।

সন্ধ্যে ছ'টায় ঠিক হলো, এখানকার সিপাহীদের নিরস্ত্র করতে হবে। তাদের কাছে দুটি ছোট কামান আছে এবং তাদের ঘাঁটিও বেশ শক্তিশালী। শোনা যাচ্ছে, তাদের নিরস্ত্র করার কোনো রকম উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে তারা বাধা দেবে। নৌ-সেনারা দেখতে ছোটখাটো, তাই তারা এদের পাত্তাই দেয় না। নৌ-সেনাদের সংখ্যামাত্র পঞ্চাশজন।

স্বেচ্ছাসেবকদের বলা হলো, পরদিন বাইশ তারিখ অর্থাৎ রোববার তারা যেন নিশ্চুপে সকাল পাঁচটায় জড়ো হয়। [কোথায়, তা উল্লেখ করা হয়নি]

ঠিক সময়ে, কমিশনার, বিচারক, কিছু সিভিলিয়ান এবং বিশ থেকে তিরিশ জন স্বেচ্ছাসেবক জড়ো হলো। তখনও ভোরের আলো ফোটেনি এবং আমরা সংকেতের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম।

প্ল্যান ছিল, প্রথমে ট্রেজারী গার্ডদের নিরস্ত্র করে তাদের জায়গায় স্বেচ্ছাসেবকদের বহাল করা হবে। নৌ-সেনারা অতঃপর লালবাগের দিকে রওনা হবে এবং সবাই আশা করছিলো লালবাগের সিপাহীরা আত্মসমর্পণ করবে।

সবকিছু মসৃণ গতিতে এগোলো। ট্রেজারীর গার্ডদের নিরস্ত্র করা হলো। সবসুদ্ধ তাদের সংখ্যা বোধহয় ছত্রিশ, তবে ডিউটিতে ছিল জন পনেরো। তাদের খুব অসন্তুষ্ট মনে হলো, তারা জানালো, এসবের কোনো দরকার ছিল না তাদের অফিসাররা নির্দেশ দিলে এমনিতেই তারা অস্ত্র সমর্পণ করতো।

নৌ-সেনারা লালবাগে পৌঁছে দেখলো সিপাহীরা প্রস্তুত। তারা বোধহয় আগেই খবর পেয়েছিলো। শান্ত্রী গুলি ছুড়লো। আমাদের একজন মারা গেলো; এর পর অন্যান্য সিপাহীও গুলি ছোড়া শুরু করলো। নৌ-সেনারা দক্ষিণ দিকের ভাঙা ফটক দিয়ে অগ্রসর হলো। এই ফটক রক্ষা করার জন্যে বিবি পরীর কবরের সামনে বন্দুক (কামান?) বসানো হয়েছিলো এবং সেখান থেকে গুলি ছোড়া শুরু হলো নৌ-সেনারা ভেতরে ঢোকা মাত্রই একঝাঁক গুলি উড়ে এলো। লেঃ লুইস সৈন্যদের নিয়ে বাঁ দিকে দুর্গ প্রাচীরের ওপরে উঠে বেয়নেট চার্জ করে সিপাহীদের পিছু হটাতে লাগলেন।

সিপাহীরা নিজেদের আস্তানায় আশ্রয় নিলো কিন্তু সৈন্যরা সেখান থেকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তাদের বের করতে লাগলো। এই সময় মেয়ো নামে এক মিডশিপম্যান আটজনের এক দল নিয়ে দুর্গ প্রাচীর থেকে নিচে যারা (সিপাহী) বন্দুক চালাচ্ছিলো তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। সিপাহীরা তখন দিগবিদিক পালাতে লাগলো; কিছু সিপাহী বেয়নেট বিদ্ধ হলো।

ভয়ংকর যুদ্ধের পর সিপাহীরা জঙ্গলে পালালো। পিছে রেখে গেলো প্রায় চল্লিশটি মৃতদেহ। মারাত্মকভাবে আহত অনেকেও পালিয়েছিলো। আমাদের পক্ষে ঘটনাস্থলেই একজন মারা যায় এবং চারজন মারাত্মক ও ন'জন অল্প আহত হয়।

পলায়নরত কিছু সিপাহীকে ধরা হলো। চারজনকে ঝোলানো হলো ফাঁসিকাষ্ঠে। বাকিদেরও এই শাস্তি পেতে হবে।

সোমবারের মধ্যে সব শান্ত। যেন কিছুই হয়নি। এমনভাবে আমরা আবার কাজে যেতে লাগলাম।

[ব্রেনান্ড লিখেছেন, এই খণ্ডযুদ্ধে সিপাহীদের প্রায় চল্লিশজন নিহত হয়। লর্ড ক্যানিং তাঁর মিনিটসে লিখেছেন যুদ্ধে মারা গেছে একচল্লিশজন সিপাহী, নদী পেরুতে গিয়ে ডুবে মরেছে আরো তিনজন। ইংরেজ পক্ষে তিনি আহতদের সংখ্যা উল্লেখ করেছেন আঠারো জন। হৃদয়নাথের মতে, পঞ্চাশ জন। ক্যানিং আরো লিখেছেন, কেল্লা দখলের পর বিশজনকে গ্রেফতার করা হয়। এর মধ্যে ফাঁসি দেয়া হয় দশজনকে এবং বাকি দশজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

সিপাহীদের বিচারের বর্ণনা দিয়েছেন ব্রেনান্ড তাঁর রোজনামচায়, খুব সাধারণভাবে, যেন এটাই ছিল বক্তব্য। তাঁর মনোভাবটা ছিল একরকম, সিপাহীরা বিদ্রোহ করেনি, কিন্তু করতে তো পারতো। সুতরাং তাদের ফাঁসি হবে না তো আর কার হবে? এরপর দেখা যাক ব্রেনান্ড কি লিখেছেন।

২৯ নভেম্বর ॥ শোনা যাচ্ছে, পলায়নপর সিপাহীরা ময়মনসিংহ ও সিলেটের দিকে রওনা হয়ে গেছে। তবে ভাগ্য ভালো যে তারা একত্রে যাচ্ছে না। সবচেয়ে বড় দলটি টৌক রোড ধরে ময়মনসিংহ যাচ্ছে, বিশজন সশস্ত্র লোক সামনে, পেছনে নিরস্ত্র লোক, মহিলা ও শিশু, তারপর আহতরা যাদের সংখ্যা অসংখ্য এবং সবশেষে আরো ত্রিশজন সশস্ত্র লোক।

ময়মনসিংহের কাছে আসতেই ম্যাজিস্ট্রেট তাদের রুখবার জন্যে বরকন্দাজ নিয়ে তৈরী হলেন কিন্তু সিপাহীরা লড়াই না করে

জামালপুরের দিকে চলে গেলো।

চাটগাঁর বিদ্রোহীরাও ঢাকার পথে, তাদের উদ্দেশ্য ৭৩-এর সঙ্গে মিলিত হওয়া। আবার শোনা গেলো, তারা ত্রিপুরার পাহাড় ডিঙিয়ে সিলেটের দিকে যাবে। ইতিমধ্যে তারা নাকি ত্রিপুরার রাজাকে খবর পাঠিয়ে জানিয়েছে তিনি যদি বিদ্রোহ না করেন তবে তাকে সিংহাসনচ্যুত করা হবে।

৩০ নভেম্বর ॥ তিনজন বিদ্রোহীকে আজ সকালে ফাঁসি দেয়া হলো। আগে দেয়া হয়েছিলো আটজনকে। সব মিলিয়ে ফাঁসি দেয়া হলো মোট এগারোজনকে।

আমরা মনে করি এ সময় এ ধরনের উদাহরণের একান্ত প্রয়োজন ছিল। এ ধরনের উদাহরণ সাধারণ মানুষের মধ্যে চমৎকার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। এখন নেটিভরা যেমন ভদ্র, আমার মনে হয় না আগে কখনও তাদের এমন ভদ্র ব্যবহার করতে দেখেছি।

১৮ ডিসেম্বর ॥ শোনা যাচ্ছে ঢাকার বিদ্রোহীরা ভূটানের কোনোখানে নাকি আস্তানা গেড়েছে।

[যা হোক, ব্রেনান্ড কিন্তু বিদ্রোহ চুকে বুকে যাওয়ার পরও মাঝে মাঝে রোজনামচা লিখেছেন। সেই দিনলিপির বিদ্রোহের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কিছু অংশ।]

২৪ জানুয়ারী ঃ ১৮৫৮ ॥ ইউরোপীয়ান সেনারা কলকাতার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেছে। সবকিছু এখানে শান্ত। তবে নৌ সেনারা বোধহয় আরো কয়েক মাস থাকবে।

১৭ মার্চ ঃ ১৮৫৮ ॥ সবকিছু শান্ত, ঠিক বিদ্রোহের আগের মতো। সরকার কলকাতা-চট্টগ্রাম ভায়া ঢাকা টেলিগ্রাফ বসানোর কথা চিন্তা করছে। ইতোমধ্যে এ নিয়ে কাজ করার জন্যে একদল লোক এসেছে এবং চার্চের সামনে ত্রিকোণাকার জায়গায় তাঁবু ফেলেছে।

৩ এপ্রিল ঃ ১৮৫৮ ॥ ১৮৫৬ সালে ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগের জন্যে রেলওয়ে প্রবর্তনের কথা উঠেছিলো, তা আবার এখন সরকারী মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। হয়ত খুব শীঘ্রই এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৩০ মে ঃ ১৮৫৮ ॥ গুজব শোনা যাচ্ছে, পাঁচশো শ্বেতাঙ্গ সৈন্য ঢাকায় রাখা হবে।

৯ জুন ঃ ১৮৫৮ ॥ গত শনিবার কমিশনার ডেভিডসন প্রেসিডেন্ট, ইন-কাউন্সিলের মিটিং-এর এক কার্যবিবরণী পাঠিয়ে নির্দেশ দিলেন যে, কলেজ বিল্ডিং-এ ১৯ রেজিমেন্টের চারশো পঞ্চাশজনকে জায়গা দিতে হবে। যাদের জায়গা হবে না তারা মিটফোর্ডে থাকবে। এ জন্যে ছাত্রদের দশ দিনের ছুটি দিয়ে দিলাম।

১২ জুলাই ঃ ১৮৫৮ ॥ ১৯ নভেম্বরে তিনটি কোম্পানি এসেছে। বেশির ভাগকেই কলেজে

জায়গা দেয়া হয়েছে। বাকিরা থাকবে ফৌজদারী কোর্টে।

শহর এখন উচ্ছল। গণি মিঞার ওখানে বলনাচের আসর, কার্নেগীদের ওখানেও তাই, তারপর হবে ব্যাচেলারদের একটি আসর। কলেজের দক্ষিণ পাশে যে জনউদ্যান আছে সেখানে একটি মিলনায়তন, লাইব্রেরী, থিয়েটার এবং বিলিয়ার্ড রুম ইত্যাদি স্থাপনের জন্যে একটি জয়েন্ট স্টক কোম্পানীকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

১৫ আগষ্ট ঃ ১৮৫৮ ॥ শহর খুবই উচ্ছল। পর পর তিনটি বলনাচের আসর। ঢাকা-কলকাতা টেলিগ্রাফ লাইন বসানোর কাজ শেষ। রেলওয়ে নির্মাণের প্রকল্পটি এখনও বিবেচনাধীন।

৫ নভেম্বর ঃ ১৮৫৮ ॥ গত সোমবার কলেজের সামনের প্রাঙ্গণে, ভারতবর্ষের শাসনভার রাণীর কাছে হস্তান্তরের ঘোষণা ইংরেজী এবং বাংলায় পাঠ করে শোনানো হলো।

পরদিন বিকেলে, ছাত্ররা কলেজ সাজালো, বাজি পোড়ালো ঃ নিজেদের আনুগত্য প্রকাশে মনে হলো তারা খুব উৎসাহী। *

* রূপান্তর ঃ মুনতাসীর মামুন
আর্থার লয়েড ক্লে, *ঢাকা : ক্লের ডায়েরী,* (অনুবাদ : ফওজুল করিম),
সম্পাদনা ও ভূমিকা, মুনতাসীর মানুন, ঢাকা, ১৯৯০।

ঢাকার টুকিটাকি

ঢাকার আদি জাদুঘর

আজকের জাতীয় জাদুঘর কয়েক বছর আগেও পরিচিত ছিল ঢাকা জাদুঘর নামে। ১৯১৩ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলা সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ঢাকা জাদুঘর। এতোদিন পর্যন্ত আমরা জেনে এসেছি এ অঞ্চলে তো বটেই, ঢাকা শহরেও প্রথম প্রতিষ্ঠিত জাদুঘর, ঢাকা জাদুঘরের শুরু ১৯১৩ সালে। কিন্তু, আমাদের এ ধারণা ঠিক নয়। ঢাকা জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পঞ্চশ বছর আগে, ঢাকায় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল একটি জাদুঘর। তার নামও ছিল ঢাকা জাদুঘর। এটি ঢাকার এবং এ অঞ্চলের আদি জাদুঘর বা প্রথম জাদুঘর। ঢাকা জাদুঘরের প্রস্তাব প্রথমে করা হয় ঢাকার একটি সাপ্তাহিক ইংরেজি সংবাদপত্রে। 'ঢাকা নিউজ' নামে এই সংবাদপত্রটি পূর্ববঙ্গের ও ঢাকা শহরের প্রথম ইংরেজি সংবাদপত্র। এর সম্পাদক ছিলেন আলেকজান্ডার ফর্বেস। ফর্বেস ১৮৫৬ সালের নভেম্বরে তাঁর লেখা এক সম্পাদকীয়তে জাদুঘরের প্রস্তাব করেন। সে হিসেবে বলা যায়, ঢাকা জাদুঘরের প্রস্তাবক ছিলেন আলেকজান্ডার ফর্বেস।

তিনি লিখেছিলেন, পূর্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকায় কেন একটি জাদুঘর থাকবে না? যে ঢাকায় আছে ব্যাংক, ছাপাখানা, কলেজ সেখানে একটি জাদুঘর থাকবে না এ কেমন কথা? তাঁর ভাষায় 'a city and museum are kindered and associate names, and reflect lustre one upon the other.' তাঁর মতে, একেবারে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতেই জাদুঘর স্থাপন করতে হবে এমন কোন কথা নেই। বিভিন্ন ধরনের জিনিসপত্র, কয়লা থেকে কাচ, মোটা সুতা থেকে পশু-পাখি যা পাওয়া যায় তাই সংগ্রহ করা হোক না কেন? ঢাকা যেমন অনেক বিষয়ে পথিকৃত তেমনি জাদুঘর প্রতিষ্ঠায়ও পথিকৃত হোক। তাঁর ভাষায়' '...Let it take another step in progressive advancement, and by it museum give an increased impulse, and lend an enlightened guiding hand to the expansion of commerce, adding at the sametime to the material comfort of the people and tending to ameliorate their moral condition. A well funnished and arranged museum would serve on a pioneer to extended Commercial under takeng...'

এ প্রস্তাব ঢাকার ইউরোপীয়দের মনঃপূত হয়েছিল। নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে তারা একটি কমিটি গঠন করেছিলেন। কমিটির অবৈতনিক সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছিলেন স্যামুয়েল রবিনসন। রবিনসন ছিলেন ব্যাপটিস্ট মিশনের প্রধান।

পরবর্তীকালে রবিনসনের সঙ্গে প্রধান উদ্যোক্তা হিসাবে আমরা ঢাকার সিভিল সার্জন ডা. ডব্লিউ. এ. গ্রিনের নাম পাই। সে থেকে অনুমান করে নিতে পারি কমিটির সভাপতি ছিলেন ডা. গ্রিন।

কমিটি গঠিত হওয়ার পর সংগ্রহ এবং তা রাখার জন্য জায়গার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ প্রিন্সিপাল ব্রেনান্ড তাঁর বাসভবনের তিনটি কক্ষ ছেড়ে দেন জাদুঘরের জন্য। ব্রেনান্ডের বাড়ি ছিল ঢাকা কলেজের কাছেই। সুতরাং বলা যেতে পারে, ব্রেনান্ডের বাসার তিনটি কক্ষ নিয়ে যাত্রা শুরু করে ঢাকা জাদুঘর।

এবার সংগ্রহের পালা। ১৮৫৭ সালের জানুয়ারি মাসে রবিনসন একটি চিঠি পাঠান অনেকের কাছে। চিঠির বিষয়বস্তু ছিল, ঢাকায় একটি জাদুঘর গঠনের উদ্দেশ্যে বস্তু নিদর্শন সংগ্রহ '... for the purpose of making more fully known as the resources of the country. 'কি কি বিষয় সংগ্রাহকরা দান করতে পারেন জাদুঘরে তার একটি 'অসম্পূর্ণ তালিকা' চিঠিতে দেয়া হয়েছিল। সেই তালিকাটি পড়লে বোঝা যাবে সংগ্রাহকরা কি কি বিষয়ের দিকে জোর দিতে চেয়েছিলেন।—

সবজিজাত দ্রব্য
খাদ্য তৈরির উপাদান
আঠা, রঞ্জন
রং
বাকল ও চামড়া শুকোবার উপাদান
পশুজাত উপাদান
উল, সিল্ক, তসর সিল্ক
চুল, পালক, পশু চামড়া
শিং, হাতির দাঁত, কচ্ছপের খোল
চামড়া, স্টেইনগ্লাস
বীজ, ড্রাগ, তেল
তন্তুজাতীয়
তুলা, পাট, শন
মৌমাছির মোম
প্রাণিবিদ্যা সংক্রান্ত যাবতীয় উপাদান
কাঠ এবং কাঠের অলংকরণ
খনিজ সংক্রান্ত
মুদ্রা ও প্রাচীন বস্তুসামগ্রী
সিল্ক, সুতি, শন থেকে উৎপাদিত দ্রব্য
দামি বস্ত্র
কাগজ প্রস্তুত প্রণালী, তামায় অলংকরণ, অলংকার
অস্ত্রশস্ত্র ও নতুন তৈরি যন্ত্রপাতি।

জানুয়ারি থেকে মে মাসের মধ্যে মনে হয় বেশকিছু জিনিসপত্র সংগ্রহ করা হয়েছিল। কারণ, জুন মাসের এক সংবাদে জানা যায়, একজন মন্তব্য করছেন, ঢাকার (১৮৫৭) বিদ্রোহে ব্যবহৃত কিছু কার্তুজও সংগ্রহে রাখা হোক। তবে, জাদুঘর কখন খুলে দেয়া হয়েছিল দর্শকদের জন্য তা জানা যায়নি। অনুমান করে নিতে পারি ১৮৫৭ সালের নভেম্বর মাসের আগে জাদুঘর খুলে দেয়া হয় কিন্তু সংগ্রহের কাজ চলতে থাকে। ঢাকার বিদ্রোহ চুকেবুকে গেলে একটি পার্টির আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে ঢাকা জাদুঘর প্রতিষ্ঠার জন্য ডা. গ্রিন-কে বিশেষভাবে অভিনন্দন জানানো হয়েছিল। ডা. গ্রিন বলেছিলেন উত্তরে— '...In coupling the Dacea Museum with the other part of the toast, you have done much honor to Mr. S. Robinson and myself, and have touched a chord which vibrates with thrilling interest.' তিনি উপস্থিত সবাইকে ঢাকা জাদুঘর পরিদর্শনে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এবং কী কী বস্তুসামগ্রী প্রদর্শিত হচ্ছে তার একটি বর্ণনা দিয়েছিলেন। তাঁর বক্তৃতা থেকে অনুমান করা যায় আদি প্রদর্শনীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল প্রকৃতি বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিভিন্ন উপাদান, যেমন— পাথর ও খনিজের নমুনা, বিভিন্ন তন্তুর নমুনা। পার্বত্যবাসীদের ব্যবহৃত উপাদান ইত্যাদি। ডা. গ্রিন আরও জানিয়েছিলেন, ইন্ডিয়া হাউসে যে সংগ্রহশালা গড়ে উঠেছে, ঢাকা জাদুঘরটি সেই আদলেই গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন। তাঁর ভাষায় 'In our scheme of the Dacea Museum we are following out, although at an immense distance, and on a miniature scale, the grand show carrying out at the India House, of collecting together all the Productions of this vast country, Animal, Vegetable,s and Mineral and shewing the purposes to which these may be supplied in the arts and every day concems of life.' ডা. গ্রীনের বক্তৃতায় উৎসাহিত হয়ে এরপর অনেকে যান জাদুঘর দেখতে। এ সংবাদ জানা যায় ১৮৫৭ সালের সংবাদপত্রের রিপোর্টে। ফর্বেস লিখেছিলেন, ডা. গ্রিনের বক্তৃতা শুনে তাদের মনে হয়েছিল ডাক্তার সাহেব অতিরঞ্জন করছেন। কারণ, যে প্রতিষ্ঠানের পেছনে অর্থশালী বিশ্ববিদ্যালয় বা শক্তিশালী সরকার নেই সেই প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে কিভাবে? কিন্তু জাদুঘর দেখে তারা অবাক হয়েছেন। ডা. গ্রিনের পরিশ্রমের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। ফর্বেস লিখেছেন, শত মাইল ভ্রমণ করে বা বই পড়ে যা না জানা যাবে, ঢাকা জাদুঘর দেখে তার থেকে বেশি শেখা যাবে—'A stranger or traveller who may visit Dhaka will learm more by visiting this Museum, in its infancy as it is of the Products, and customs, and natural history, of the country, than he would do by travelling hundreds of miles and reading hundreds of books–if they were written which they have not been.'

এরপর ফর্বেস জাদুঘর পরিদর্শনের এক বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন যা থেকে আমরা অনুমান করে নিতে পারি আদি জাদুঘরে প্রদর্শনীর জন্য কি কি রাখা হয়েছিল। ফর্বেসের বর্ণনা থেকে—

১. সীমান্তে বসবাসরত গারো, নাগা এবং অঙ্গামী নাগাদের ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র। পালক দ্বারা সজ্জিত ঢাল। এসব দেখে ফর্বেসের মন্তব্য, আমাদের জাদুঘরে শিল্পকলার নিদর্শন থেকে অস্ত্রশস্ত্রের নিদর্শন বেশি—"... is more conspicuous in weapons of offence and defence than in the products of the arts."
২. আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে ব্যবহৃত জাগ পাইপ (বিজয় ভেরির জন্য সম্ভবত ব্যবহার করা হয়)।
৩. '...The museum contains numberless specimens of articles which conduce to his health, and wealh and wisdom.' এর মধ্যে ছিল বিভিন্ন উপাদান থেকে প্রস্তুত বিভিন্ন রকমের তেল।
৪. বিভিন্ন তন্তুর নিদর্শন।
৫. ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত চায়ের নমুনা।
৬. কিছু প্রাণীর কংকাল; Stuffed animals-এর নিদর্শন। শেষোক্তটির পর্যায়ে একটি বোয়া কনসট্রিক্টর (সাপ) ও একটি শুঁইসাপের নিদর্শন প্রশংসিত হয়েছে। এটি প্রস্তুত করেছিলেন ঢাকার সার্জন উমেশ চন্দ্র দত্ত। তাঁকে সহায়তা করেছেন নবীশ মির্জা নওয়াজ জান ও সওদাগর নামে এক চাপরাশি। ফর্বেসের মতে এ নিদর্শন তুলে ধরে ঢাকার, 'highest credit upon the medical profession in Dhaka.'
৭. পাখির বাসা।
৮. বিভিন্ন ধরনের সাপ, বৃশ্চিক, সরীসৃপ।
৯. মাটির নিদর্শন প্রভৃতি।

এরপর ফর্বেস আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, জাদুঘরটি টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে। ব্রেনান্ড যতদিন ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ আছেন ঠিক আছে কিন্তু তিনি বদলি হয়ে গেলে? পত্রিকায় অনুযোগ করে বলা হয়েছিল ঢাকা শহরে যাবতীয় প্রতিষ্ঠান ঢাকাবাসীদের দানে হয়েছে। সরকার কি ঢাকাবাসীর জন্য কিছুই করে দিতে পারে না! এ পরিপ্রেক্ষিতে ফর্বেস অনুরোধ করেছিলেন, মিটফোর্ড হাসপাতাল হয়ে গেলে, চ্যারিটেবল হাসপাতাল থেকে রোগীদের মিটফোর্ডে সরিয়ে নেয়া হবে। তখন চ্যারিটেবল হাসপাতালটি যেন ঢাকা জাদুঘরকে প্রদান করা হয় এবং দান করা হয় হাজার বিশেক টাকা। বাংলার তৎকালীন ছোট লাট ছিলেন হ্যালিডে। ইংরেজরা বিশেষ করে 'ঢাকা নিউজ' সম্পাদকের নিতান্ত অপছন্দের ছিলেন তিনি। তাই বোধহয় ফর্বেস তাঁর নিবন্ধের শেষে উল্লেখ করেছিলেন—"...Let him now do this slight justice to Dacca. Let him help but a little those who have done so mucch to help themselves and we will forgive his having called Dacea a 'decaying city.'

কিন্তু, হ্যালিডে বা সরকারি সাহায্য জাদুঘরটি পায়নি। কারণ, তখন পরিস্থিতি অনুকূল ছিল না। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে ডা. গ্রিন আহত হন, সরকারি সম্মাননাও লাভ করেন। কিন্তু, ১৮৫৮ সালের পর গ্রিন, ব্রেনান্ড, ফর্বেস ঢাকা ত্যাগ করেন। এই

জাদুঘরের সঙ্গে জড়িত ছিলেন প্রধানত ইংরেজরা। তাদের ছিল বদলির চাকরি। সুতরাং অনুমান করে নিতে পারি যারা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন জাদুঘর তারা জাদুঘর স্থাপনের পাঁচ বছরের মধ্যেই বদলি হয়ে গিয়েছিলেন। ব্রেনান্ড চলে গেলে হয়তো নতুন অধ্যক্ষের পক্ষে নিজের বাসগৃহের একাংশও ছেড়ে দেয়া সম্ভব ছিল না। সব মিলে বিলুপ্ত হয়েছিল জাদুঘর। হয়তো এর নিদর্শনসমূহ পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল ইন্ডিয়া হাউসে অথবা হারিয়ে বা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কারণ ১৮৫৮ সালের পর ঢাকায় যে একটি জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সে খবর এখন পর্যন্ত আর কেউ দেননি।

তথ্যসূত্র

১. জাদুঘরের প্রস্তাব করে 'ঢাকা নিউজ' লিখেছে—"Why should not Dacca, the capital of Eastern Bengal, have its Museum? Who will impugn the assertion of the valve, and very great usefulness of placing under one coup d'oeil a well selected assemblage of the productions of the province, its animal, vegetable and numeral wealth its textile and other manufactures, specimens of the inventive powers and ingenious arts of the people, of their luxuries and elegancies. Argument is not needed to give weight to this matter, a city and museum are kindred and associate names, and reflect lustre the one up on the other..."
<u>Dacca News,</u> 1856-1857.

সার্ভে স্কুল থেকে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির আদি ইতিহাস জানা কষ্টকর। কারণ অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুরনো নথিপত্র সংরক্ষণ করেনি। সংরক্ষণের বিষয়টিই যেন আমাদের সংস্কৃতিতে অনুপস্থিত। যেমন—ধরা যাক প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা। এর আদি ইতিহাস অনেকের কাছে জানতে চেয়েছি। বিস্তারিত কেউই বলতে পারেননি। এক যুগ আগে প্রকাশিত প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মরণিকায় এর আদি ইতিহাস সম্পর্কে যা লেখা হয়েছে তাও ত্রুটিমুক্ত নয়।

কিছুদিন আগে ঢাকা ও দিল্লির অভিলেখগারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির আদি ইতিহাস খোঁজার সময় বর্তমান প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের আদি ইতিহাস সংক্রান্ত কিছু নথিপত্র চোখে পড়ে। ১৯০৪-৫ সালে প্রতিষ্ঠানটিতে একজন ইউরোপীয় হেডমাস্টার নিযুক্তির জন্য বাংলা সরকার, ভারত সরকার ও ব্রিটেনের পররাষ্ট্র দফতরের মধ্যে যে চিঠিপত্র আদান-প্রদান হয় তাতে এ সংক্রান্ত বেশ কিছু তথ্য জানা যায়। ১৯১২ সালের প্রতিবেদনেও কিছু তথ্য আছে। সব মিলিয়ে জানা যায়, প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনের ইতিহাস, শিক্ষকদের বেতন কাঠামো, বার্ষিক ব্যয় ইত্যাদি সম্পর্কে।

অনেকেই জানেন, বর্তমান প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শুরু ঢাকা সার্ভে স্কুলের মাধ্যমে। কিন্তু এর বাইরে আর কোন তথ্য কেউ জানাতে পারেননি। সার্ভে স্কুলইবা হলো কিভাবে? এ সম্পর্কিত কিছু তথ্য আমরা পাই সংবাদপত্রের রিপোর্ট থেকে। স্থানীয় সরকার বিভাগই প্রথম ঢাকায় ১৮৭৬ সালে একটি বিশেষ সার্ভে স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গ্রহণ করে। শুধু তাই নয়, সিদ্ধান্ত হয়েছিল ঐ স্কুলের শিক্ষার মাধ্যম হবে বাংলা। এখানে উল্লেখ্য যে, মেডিক্যাল স্কুল, সার্ভে স্কুল—সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই শিক্ষার মাধ্যম ছিল বাংলা এবং সিদ্ধান্ত ঔপনিবেশিক সরকারের। স্কুল ছুটি থাকবে শুধু দুর্গাপূজার সময়। প্রতিবছর ভর্তি করা হবে মাত্র পঁয়ত্রিশ জন ছাত্র। ভর্তির যোগ্যতা মাইনর বা ভার্নাকুলার স্কলারশিপ একজামিনেশন। যারা স্কলারশিপ পাবে তাদের বেতন লাগবে না, অন্যদের বেতন দিতে হবে বছরে এক টাকা মাত্র। প্রতি বছর পাঁচ টাকার ছয়টি বৃত্তি দেয়া হবে। প্রথম বছরের ফলের ভিত্তিতে সেরা ছাত্ররা এই বৃত্তি পাবে।

আশ্চর্য হলেও সত্যি যে, সার্ভে স্কুলের বাৎসরিক ব্যয় ধরা হয়েছিল মাত্র ২৯২ টাকা। ব্যয়ের হিসাব ছিল এ রকম :

১. হেডমাস্টারের বেতন : ১৫০ টাকা। ক্রমান্বয়ে বেড়ে তা পৌছবে ১৭৫ টাকায়।

২. সেকেন্ড মাস্টার : ৭৫ টাকা [বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি ৫ টাকা]।

এছাড়া মাঠ পর্যায়ে কাজের সময় বাড়তি আরও ১০০ টাকা বরাদ্দ করা হবে। স্কুলের পরিদর্শক নিযুক্ত হয়েছিলেন বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী এবং স্থানীয় সরকার আশা করছিল তাদের উৎসাহে স্কুলটি ধীরে ধীরে গড়ে উঠবে।

নলগোলায় একটি ভাড়া করা বাড়িতে ১৮৭৬ সালে যাত্রা শুরু করে সার্ভে স্কুল। ১৮৯৭ সাল পর্যন্ত এ স্কুলে দু'বছরের একটি কোর্স চালু ছিল। এই কোর্স পাস করলে সার্ভেয়ার, কানুনগো বা আমিন হওয়া যেতো। ১৮৯৭ সালে কোর্সে খানিকটা পরিবর্তন আনা হয়। ঠিক হয়, প্রথম বছর পাস করলে আমিনের সার্টিফিকেট দেয়া হবে, দ্বিতীয় বছরের পরীক্ষায় পাস করলে পাওয়া যাবে সার্ভে ফাইন্যাল সার্টিফিকেট। অর্থাৎ দুই বছরের বদলে তিন বছরের কোর্স চালু করা হয়। তৃতীয় বছরের পর যদি কেউ আরো পড়তে চান তাহলে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের এপ্রেন্টিস বিভাগের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারবেন। ১৮৯৮ সালে সরকার শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলের জেএস স্লেটারকে দায়িত্ব দেয় বাংলা প্রদেশে 'টেকনিক্যাল এডুকেশন' উন্নয়নে কোন পদক্ষেপ নেয়া যায় কিনা সে বিষয়ে একটি রিপোর্ট প্রণয়নের জন্য। স্লেটার তাঁর রিপোর্টে জানালেন, ঢাকা সার্ভে স্কুলে তিন বছরের কোর্স শেষ হওয়ার পর কেউ যদি আরও পড়াশোনা করতে চায় তাহলে তাকে শিবপুর যেতে হয়, যা অনেকের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং এই ঘাটতি মেটাবার জন্য ঢাকা সার্ভে স্কুলের উন্নীতকরণ প্রয়োজন যাতে অন্তত ওভারসিয়ার পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করা যায়।

বাংলা সরকার স্লেটারের রিপোর্টকে বেশ গুরুত্ব দিয়েছিল। ১৯০২ সালে সরকার সিদ্ধান্ত নেয়, ঢাকা সার্ভে স্কুলকে 'স্কুল অব ইঞ্জিনিয়ারিং'-এ রূপান্তর করা হবে, যাতে ওভারসিয়ার পর্যায় পর্যন্ত একজন ছাত্র শিক্ষা লাভ করতে পারে এবং তারপর ইচ্ছা করলে সরাসরি শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে 'প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং'-এর ফাইন্যাল কোর্সে ভর্তি হতে পারে। কলেজের জায়গা, ইমারত নির্মাণ ও যন্ত্রপাতির প্রস্তাবিত ব্যয় ধরা হয় ১,৭২,০০০ টাকা। কিন্তু সরকার বরাদ্দ করল মাত্র ৬০০০০ টাকা। এখন বাকি টাকা আসবে কোত্থেকে? সরকার এ বিষয়ে কোন উচ্চবাচ্য করল না।

পরিকল্পনা প্রায় ভেস্তে যায়। এমন সময় এগিয়ে এলেন নবাব আহসানউল্লাহ। এক লক্ষ বারো হাজার টাকা দান করলেন তিনি। শুধু অনুরোধ জানালেন, স্কুল কর্তৃপক্ষ যেন তাঁর পরলোকগত পিতা নবাব আবদুল গনির স্মরণার্থে কিছু একটা করে।

অর্থের যোগান হওয়ার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদুল্লা হলের পাশে স্কুলের নতুন ভবন স্থাপনের জন্য ভিত্তি স্থাপন করলেন স্যার জন উডবার্ন। তারিখ আগস্ট, ১৯০২। ঠিক করা হয়েছিল ১৯০৪ সালের নভেম্বরে স্কুল তার কাজ শুরু করবে।

প্রস্তাব ছিল, স্কুলের জন্য প্রাদেশিক শিক্ষা সার্ভিসের চতুর্থ গ্রেডের একজনকে হেডমাস্টার নিয়োগ করতে হবে। এছাড়াও নিযুক্তি পাবেন ষষ্ঠ গ্রেডের একজন (৭৫ টাকা) এবং সপ্তম গ্রেডের দুইজন (৫০ টাকা)।

সম্পূর্ণ স্কুল কাঠামোর জন্য যে ব্যয় ধরা হয়েছিল তা এখানে উল্লেখ করছি। বেহার ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে বেতন কাঠামোর অনুসরণ করা হয়েছিল এ ক্ষেত্রে।

১. হেডমাস্টার : ৪০০ টাকা
২. সহকারী হেডমাস্টার : ১৫০
৩. সহকারী মাস্টার : ১২৫
৪. ঐ : ৭৫
৫. ঐ : ৭৫
৬. ঐ : ৫০
৭. ঐ : ৫০
৮. ঐ : ৪০
৯. ফোরম্যান মেকানিক : ১৫০
১০. স্টোরকিপার : ৩০
১১. হেড ব্ল্যাকস্মিথ : ৪০
১২. সেকেন্ড ব্ল্যাকস্মিথ : ১৮
১৩. হেড কার্পেন্টার : ২৫
১৪. সেকেন্ড কার্পেন্টার : ২২
১৫. ফিটার : ৩৫
১৬. টার্নার : ২৫
১৭. টিন্ডাল : ১৫
১৮. স্টোকার : ৮
১৯. টুল জমাদার : ৮
২০. মোল্ডার : ৩৫
২১. প্যাটার্ন মেকার : ৩০
২২. হেড ক্লার্ক : ৩৫
২৩. সেকেন্ড ক্লার্ক : ১৫
২৪. থার্ড ক্লার্ক : ১২
২৫. মেকানিক কুলি : ৬-৮ আনা
২৬. ঐ : ৬-৮ আনা।

বেহারে স্কুলে খরচ ছিল ১,৪৩৯ টাকা আর ঢাকা স্কুলে খরচ হবে ১,৪৮১ টাকা। সরকারি কর্মকর্তা তাঁর নোটে আশা প্রকাশ করে লিখেছিলেন—

'I do not think we are called upon to pursue the matter in to greater detail than that furnished by the Bengal Govt's letter and recommend that the proposals should be supported to the secretary of state.'

বাংলা সরকারের প্রস্তাব গৃহীত হলো। এখন হেডমাস্টার খোঁজার পালা। অনেকে শুনে হয়তো অবাক হবেন, মফস্বলের সামান্য একটি স্কুলের হেডমাস্টার খোঁজার জন্য সরকার যে শ্রম ও সময় ব্যয় করেছিল এখন একজন উপাচার্য নিয়োগের সময়ও এতো শ্রম ও সময় ব্যয় করা হয় না। এ পরিপ্রেক্ষিতে লন্ডন থেকে সম্রাজ্ঞীর সরকারের পক্ষে জন ব্রডরিক ভারতের গভর্নর জেনারেলকে লিখেছিলেন— 'There has been considerable difficulty in finding a suitable candidate for the post.'

এভাবে ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলের প্রথম হেডমাস্টার হিসেবে নিযুক্তি পেয়েছিলেন মি. আর্নল্ড। তাঁর সম্পর্কে যা জানা যায় তা হলো— জন্ম; ১৮৭৩ সালে। ডিগ্রি পেয়েছিলেন বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাসন কলেজ থেকে (১৮৯৪-৯৬)। ঢাকা স্কুলে যোগ দেয়ার আগে মিডলসবারো মিউনিসিপ্যাল টেকনিক্যাল ক্লাসেস অ্যান্ড হাই স্কুলের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চিফ লেকচারার ছিলেন।

১৯০৬ সালে সার্ভে স্কুল স্থানান্তর করা হয় নতুন ভবনে। তখন এর নতুন নামকরণ করা হয় 'ঢাকা স্কুল অব ইঞ্জিনিয়ারিং'। এখন সেই সার্ভে স্কুলের কোন চিহ্ন আর নেই। তবে, স্মৃতি হিসেবে দাঁড়িয়ে ছিল উঁচু একটি চিমনি। স্কুলের ওয়ার্কশপের কাজে ব্যবহৃত হতো তা। এর পাশেই একতলা ভবন ছিল স্কুলের। ছাত্ররা থাকতেন বর্তমান শহীদুল্লাহ হলের [তৎকালীন ঢাকা হল] একতলায়। ১৯২০ সালে স্কুলটি সরিয়ে আনা হয় বর্তমান ক্যাম্পাসে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের সময় এখানে সরকারি ছাপাখানার জন্য যে বিল্ডিংটি নির্মিত হয়েছিল তাই বরাদ্দ করা হয় সার্ভে স্কুলকে।

সরকারি রিপোর্ট অনুযায়ী প্রথম ছয়-সাত বছর স্কুলের অবস্থা খুব একটা ভাল ছিল না। পাঁচ বছরে আট বার হেডমাস্টার বদল হয়। আর্নল্ড মারা যান ১৯০৭ সালে। তারপর বিভিন্ন জন সাময়িকভাবে এর ভার গ্রহণ করেন। ১৯১০ সালে স্থায়ীভাবে পাওয়া যায় আইইএস সিএফ হেন্ডারসনকে। ১৯১৩ সালে স্কুলে মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল ডিপ্লোমা কোর্স চালু হয় কিন্তু তিন বছর পর তা বাতিল করা হয়। ঐ সময় স্কুলটি সংশ্লিষ্ট ছিল ঢাকা কলেজের সঙ্গে। পরে এর মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়। অর্থাৎ এর প্রধান হেডমাস্টারের বদলে হন প্রিন্সিপাল এবং তার ভার ন্যস্ত করা হয় ডিপিআইয়ের ওপর। এ বদলটি কবে হয়েছিল সে সম্পর্কে কোন তথ্য পাইনি। তবে অনুমান করছি, এ বদলটি হয়েছিল ত্রিশের দশকে। অ্যান্ডারসন ছিলেন প্রধান প্রিন্সিপাল। খুব সম্ভব প্রথম বাঙালি প্রিন্সিপাল বিসি গুপ্ত (১৯৩২-৩৮)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সরকার 'কমিটি অব হায়ার টেকনিক্যাল এডুকেশন' নামে একটি কমিটি করেছিল। কমিটি প্রস্তাব করেছিল স্কুলটিকে কলেজে উন্নীত করতে। সে প্রস্তাবানুসারে ১৯৪৬-৪৭ সালে ১৯০ জন ছাত্র নিয়ে যাত্রা শুরু করে নতুন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। সেশন শুরু হয় ১৯৪৭ সালে।

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মরণিকায় জানা যাচ্ছে, ১৯৪৮ সালে আহসানউল্লাহ স্কুল অব ইঞ্জিনিয়ারিংকে আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ নাম রাখার অনুমোদন দেয়। তথ্যটিতে সামান্য ত্রুটি আছে। ১৯৪৮ সালের আগে প্রতিষ্ঠানটি সব সময় পরিচিত ছিল 'ঢাকা স্কুল অব ইঞ্জিনিয়ারিং' নামে। আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রথম

প্রিন্সিপাল জনাব হাকিম আলী। এই কলেজটিই ১৯৬২ সালে রূপান্তরিত হয় 'ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি'তে।

তথ্য সূত্র

১. Government of India, Dacca Survey School, *Proceedings,* Home-Ed. 144-146A, May, 1904;
Government of India, Appointment of Mr. Arnold as Headmaster of Dacca School of Engineering, *Proceedings,* Home. Ed. 18-19 A, May, 1905.
পূর্বোক্ত রিপোর্টে স্কুলের মান উন্নীতকরণ সম্পর্কে শিক্ষা বিভাগের মহাপরিচালক এইচ ডব্লিউ অরেঞ্জের একটি সুপারিশও (১৫.২.১৯০৪) ছিল। সুপারিশটি ছিল নিম্নরূপ :
"The Dacca School at present teaches engineering up to the standard which qualifies men to become Suboverseers (Lower Subordinate Service of the PWD), and it is proposed to raise it to the standard which will qualify them to become overseers (Upper Subordinate Service), thus bringing it up to the level of Behar School of Engineering. I think that this should be approved. The Proposal as to the headmaster follows the precedent of Behar School. There is no other precedent in point, as elsewhere (viz, at Rurki, Madras, Poona and Sibpur) the classes of this grade are part of the Engineering Colleges. Mr. Pedlar has furnished me with the attached statement showing the cost of the establishment at the Behar School at Rs.1,439 at the present time, and that proposed at Dacca at 1,481, I do not think we are called upon to pursus the matter into greater detail than that furnished by the Bengal Government's letter, and recommend that the proposals should be supported to the Secretary of State."

২. ১৯০১-৬ সাল পর্যন্ত ঢাকা সার্ভে স্কুলের ফলাফল, শিক্ষক ও হেডমাস্টারের নাম—

TABLE K—Results of Survey Final Examination.

Session	Number	Pass	Session	Number	Pass
1901-02...	50	38*	1906-07...	39	35
1902-03...	59	42*	1907-08...	33	28
1903-04...	54	38*	1908-09...	33	25
1904-05...	27	23*	1909-10... Not yet out.		
1905-06...	38	34*			

* Including S.O. classes.

TABLE L—Staff of the School of Engineering

	Qualifications.	Service	Length of service at school	Pay.	REMARKS
Employed Sub Overseer and Overseer classes				Rs.	
C.F. Henderson, Esq.		IES.	Just joined.	-	
Babu Radha Raman Guha	L.C.E	S.E.S.	33 years	250	Assistant head Master; also teaches in Survey classes.
" Samares Ray Chaudhuri	B.A.B.E.	S.E.S	$4/^{1}/_{2}$ years	125	
" Prasanna Kumar Dey	F.M and U.S.	S.K.S. S.P.t	1 year	100	Also teach in Survey classes.
" Satis Chandra Saha	B.E. fail	S.E.S.	11 months	75	
" Biswaranjan Guha	B.A.B.	S.E.S	$1/^{1}/_{2}$ years	50	Takes Science of all classes
Employed in Survey classes					
Babu Rajender Lal Banerji	Passed Students				
Ishan Chandra Mazum dar	of The class...	--	--	--	Assisted partly by three other
Hari Pada Banerji	They are teaching				teachers.

Note- The sruvey classes appear to be better off for teachers than those of the Engineering School proper.

DACCA SCHOOL OF ENGINEERING

Inspected by Messrs. Walford and Heaton on 8th and 9th April with the assistance of Mr. Sweet on the latter date.

The institution has had an unfortunate career since it was raised to the Overseer Standard, and it has had as yet no chance of setting down and of consolidating itself. It was removed into new buildings specially constructed for it only a few years ago, and has sadly needed the guidance of a permanent experienced technical head. It has eight changes of head master in the last five years, namely :-

Appointed from—

Mr. F.W. Arnold	... ...	11th May 1905 (died 5th July 1907)
Babu R.R. Guha (offg.)	... ...	6th July to 2nd August 1907.
Mr. J. V. Francis (offg.), lent by Civil Engineering College	... ...	2nd August to 23rd November 1907,
Mr. F.G. Turner (offg.)	... ...	24th November 1907 to 30th April 1908
Babu R.R. Guha (offg.)	... ...	1st May to 23rd May 1908.
Mr. W.G. Duncan	... ...	24th August to 23rd December 1908.
Mr. G.S. Marsh, lent by Public Works Department	... ...	1st March 1909 to 10th March 1910
Mr. C.F. Henderson	... ...	11th March 1910 (now in charge).

Govt. of India, *Proceedings*, General Department, No. 29-39, 1912.

৩. *Bengal Times, Dacca, 1876.*

ঢাকায় বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ইতিহাস

১৮৬৪ সালে ঢাকা পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত খুব কম ক্ষেত্রেই প্রশংসিত হয়েছে। অথচ পৌরসভা ইতিবাচক অনেক কাজ করেছে যা আমরা ভুলে যাই। আমরা ক'জন জানি যে, ঢাকা শহরের অনেক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল, নাগরিক সুবিধা সম্প্রসারিত হয়েছিল পৌরসভা ও মানুষের দানে। সরকারি সাহায্য এক্ষেত্রে খুবই কম। ঢাকা পৌরসভার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ ঢাকাবাসীকে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা।

স্বাস্থ্যকর শহর হিসেবে কখনই ঢাকার সুনাম ছিল না। এ কারণে, নিয়মিত প্রতি বছর মহামারীতে ঢাকা শহরে অনেকের মৃত্যু হতো। মহামারীর কারণ ছিল বিশুদ্ধ পানির অভাব। ১৮৭৮ সালের পূর্ব পর্যন্ত, ঢাকায় খাবার পানির উৎস ছিল বুড়িগঙ্গা, বিভিন্ন পুকুর-ডোবা ও নোংরা পাতকুয়ো। পৌরসভা যদিও স্থাপিত হয়েছিল ১৮৬৪ সালে, কিন্তু তাদের এমন কোন সামর্থ্য ছিল না যে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করে।

ঢাকায় খাবার পানি কিভাবে সরবরাহ করা যায় সে নিয়ে ঢাকার কমিশনার ও বাংলা সরকারের মধ্যে বেশ চিঠি আদান-প্রদান হয়। ১৮৭২ সালে এ ধরনের একটি প্রতিবেদন পেশ করেন ঢাকার কমিশনার এবারক্রম্বি।

তাঁর চিঠি থেকে জানা যায়, ১৮৭১ সালে ঢাকার নবাব আবদুল গনি কে. সি. এস. আই উপাধি পান। একই সময় প্রিন্স অব ওয়েলসও অসুস্থ অবস্থা থেকে সুস্থ হয়ে ওঠেন। আবদুল গনি এ কারণে পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করেছিলেন এবং ঢাকাবাসীর মঙ্গলার্থে তা ব্যয়ের অনুরোধ জানিয়েছিলেন। ১৮৭১ সালের ডিসেম্বরে ঢাকার কমিশনার সিমসন সরকারকে তা অবহিত করেন এবং ঢাকাবাসীদের নিয়ে একটি কমিটিও গঠন করা হয়। অনেক আলোচনার পর কমিটি ঠিক করে নবাব গনির দানকৃত অর্থে নগরবাসীর জন্য বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করাই হবে উত্তম কাজ। এ জন্য তারা যে ব্যয়ের হিসাব ধরেন তার পরিমাণ ছিল ছত্রিশ হাজার টাকা।

এবারক্রম্বি তাঁর এক বছর পর জানাচ্ছেন যে, কমিটির অনেকেই মনে করছে এ পরিমাণ যথাযথ নয়। এ পর্যায়ে কমিটির সদস্যদের সঙ্গে নবাব আহসানউল্লাহর আলোচনা হয়। আহসানউল্লহ জানান, এ পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্য যদি আরো অর্থের প্রয়োজন হয় তাহলে তিনি তা দেবেন এবং এ পরিপ্রেক্ষিতে তিনি আরো পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করেন। পিতা-পুত্রের সম্মিলিত দানের পরিমাণ দাঁড়ায় এক লক্ষে।

এরপর কমিটি আবার প্রকল্প ব্যয় নিয়ে আলোচনা শুরু করে এবং তখন প্রশ্ন ওঠে, কমিটি না হয় প্রকল্পটি সমাপন করল কিন্তু তারপর এর মেইনটেন্যান্স করবে কে? প্রকল্প

চালু রাখার খরচ আসবে কোত্থেকে? তাছাড়া নবাব গনি ও আহসানউল্লাহ উভয়েই জানিয়েছেন যে, এ কারণে ঢাকাবাসীর ওপর কর আরোপ করা যাবে না। সুতরাং পৌরসভার সঙ্গে আলোচনা অপরিহার্য হয়ে ওঠে। অবশ্য কমিটি ঠিক করেছিলো, প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হলে তা পৌরসভার হাতে তুলে দেয়া হবে।

যাহোক পৌরসভার কমিশনারদের সঙ্গে আলোচনা হলো কমিটির সদস্যদের। কমিশনাররা জানালেন, না প্রকল্প চালু রাখার মতো অর্থ তাদের নেই।

কমিটি তখন আবার বৈঠকে বসলো। অনেকে বললেন, এতোই যখন অসুবিধা তখন একটা শিল্প স্কুল খোলা (স্কুল অব আর্টস) যাক। অনেকে বললেন, ধনী লোকদের থেকে চাঁদা নিয়ে একটি ফান্ড গঠন করা হোক। সে টাকা বিনিয়োগ করে যা পাওয়া যাবে তা দিয়ে 'মেইনটেন্যান্স' খরচ চালানো যাবে। কিন্তু আহসানউল্লাহ চান ঢাকাবাসীদের বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করার জন্যই যেন টাকাটি ব্যবহৃত হয়। কমিটি কোন মীমাংসা করতে পারল না।

আহসানউল্লাহ জানালেন, তিনি আবার তাঁর পিতার সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনা করবেন। পিতার সঙ্গে আলোচনার পর আহসানউল্লাহ কমিশনার এবারক্রম্বিকে জানালেন যে 'মেইনটেন্যান্স' ব্যয়ের জন্য নবাব গনি আরো পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করবেন। তবে, এ টাকাটা 'সেফ ইনভেস্টমেন্ট' হতে হবে। অর্থাৎ এমন সব ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে হবে যেখান থেকে ভালো 'ইন্টারেস্ট' পাওয়া যাবে।

ফলে, ঢাকা নগরে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ প্রকল্প যাত্রা শুরু করলো। এবারক্রম্বি গভর্নরকে লিখলেন, আবদুল গনি এবং আহসানউল্লাহ যে ধরনের উদারতা দেখান আজকাল আর তা দেখা যায় না কিন্তু এর এক ধরনের স্বীকৃতি পাওয়া উচিত। লে. গভর্নর জর্জ ক্যাম্পবেল দু'জনকে ধন্যবাদ জানিয়ে লিখলেন, আপনারা যা করেছেন তা লোক দেখানোর জন্য নয় এবং সাধারণ মানুষের মঙ্গলার্থে। আমি মনে করি, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ঢাকার জন্য সবচেয়ে বড় কাজ। এরপর ক্যাম্পবেল নির্দেশ দিলেন এ ব্যাপারে সরকারের সঙ্গে যে চিঠিপত্র আদান-প্রদান হয়েছে তা গেজেটে প্রকাশের জন্য। এটি ছিল নবাবদের দানের সরকারি স্বীকৃতি।

ঢাকায় বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য লর্ড নর্থব্রুক ১৮৭৪ সালে ওয়াটার ওয়ার্কসের ভিত্তি স্থাপন করেন। কাজ চলেছিলো ঢিমেতালে। তারপর এক সময় দেখা গেল পৌরসভার টাকা শেষ কিন্তু প্রকল্পের কাজ শেষ হয়নি। সরকার তখন প্রকল্প শেষ করার জন্য আরো ৯৫,৩৫০ টাকা দিল। মোট ১৯৫,৪৫০ টাকায় ওয়াটার ওয়ার্কসের কাজ সমাপ্ত হলো।

ওয়াটার ওয়ার্কসের দৈনিক পানি সরবরাহের ক্ষমতা ছিল ২০০,০০০ গ্যালন। ২৪ মে ১৮৭৮ সালে ঢাকার কমিশনার পিকক উদ্বোধন করলেন বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার। ঢাকার প্রভাবশালী ইংরেজি পত্রিকা 'বেঙ্গল টাইমস' মন্তব্য করলো— 'We are glad to see on Thursday last, that the water was running freely through the town. The little native children appeared to revel in it. It

appeared to us scarcely fit for drinking purposes, having an earthly taste, and being rather thick, but in time we have no doubt this defect will be remedied and the munificence of our kind hearted nawab be carried to a succesful end. During the distressing hot weather of the last few days, a plentiful water supply has been a boon to the thirsty thousands of Dacca.'

প্রথমদিকে পানির পাইপের দৈর্ঘ্য ছিল চার মাইল। একটি পাইপ চক, কোতোয়ালি হয়ে গিয়েছিল মিটফোর্ড হাসপাতাল পর্যন্ত। কোতোয়ালি থেকে একটি লাইন টানা হয়েছিল নারিন্দা হয়ে লোহারপুল পর্যন্ত। আরেকটি শেষ হয়েছিল জেলে। পুরো পথে লাগানো হয়েছিল পঁচিশটি হাইড্রেন্ট।

এই বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ যে ঢাকাবাসীর জন্য অপ্রতুল ছিল তা বলাই বাহুল্য। ওয়াটার ওয়ার্কস কাজ শুরু করার চার বছরের মধ্যেই দেখি চাহিদার তুলনায় পানি সরবরাহ অপ্রতুল। শুধু তাই নয়, সরবরাহ ব্যবস্থারও উন্নতি করা দরকার। ঢাকা পৌরসভা বাংলা সরকারের কাছে এ পরিপ্রেক্ষিতে এক লক্ষ টাকা ঋণ খোলা বাজার থেকে গ্রহণের অনুমতি চাইলো। বাংলা সরকার আবেদন জানালেন ভারত সরকারের কাছে। বাংলা সরকার জানালেন, পৌরসভা বিশ হাজার করে পাঁচ কিস্তিতে খোলা বাজার থেকে ঋণ গ্রহণে ইচ্ছুক। প্রতি বছর সাড়ে চার ভাগ সুদ দেয়া হবে এবং প্রতি বছর দু'কিস্তিতে মোট পঁচিশ কিস্তিতে ঋণ শোধ করা হবে। প্রস্তাবটি অনুমোদন করার জন্য লে. গভর্নর ভারত সরকারের কাছে জোর সুপারিশ করেন।

বাংলা সরকারের কাছে পৌরসভা যে আবেদন করেছিল তাতে ব্যয় বিভাজন করা হয়েছিল এভাবে—

১. ঢাকা শহরে পানি সরবরাহ বিস্তৃত করা ও রিজার্ভয়ার মেরামত; খরচ ৮৩,৯৯৭ টাকা। মেরামত বাবদ ৩০০০ টাকা। বিবিধ— ১৩,০২৩ টাকা।

এ কারণে পৌরসভার বিভিন্ন ফান্ডের আয় জামানতস্বরূপ রাখার কথা বলা হয়েছিল। তখন কি ধরনের ফান্ড ছিল এবং তার আয় কি ছিল নিম্নের বিবরণে তা বোঝা যাবে—

[আনা, পয়সার অংক বাদ দেয়া হয়েছে। টাকার অংকে]

১. গৃহকর ৫০,৮৭৭
২. গাড়ি, ঘোড়া অন্যান্য পশুর ওপর কর ৫,৫৩৮
৩. ঘোড়ার গাড়ির লাইসেন্স ১৪০
৪. বিভিন্ন খালের ওপর টোল ৬,৭২৫
৫. ফেরি পারাপারে টোল ৪৮৩
৬. গরুর খোঁয়াড় থেকে ১,৮২৯
৭. গৃহ সার্ভিস ফি ২৫,৬১১
৮. ১৯৬ ধারা অনুযায়ী আবর্জনা পরিষ্কার বাবদ ফি ৯৫৩

৯. শহরের জমির খাজনা ২,৫৫০

১০. পৌর জরিমানা বাবদ ১,২২৫

১১. বিবিধ ৬,২১৪

১২. পানি কর ১৫

১৩. সুদের আয় ৪,২২৫

আবেদনপত্রে যেসব কমিশনার সই করেন তাঁরা হলেন— ই.ভি. ওয়েস্টম্যাকট (চেয়ারম্যান), এ,সি, টুট (ভাইস চেয়ারম্যান), ঈশ্বর চন্দ্র দাস, দীননাথ ধর, গোবিন্দ চন্দ্র দাস, গোলাম মোস্তফা আল হুসাইনী, এফ সিলস, এ ক্রম্বি, গোপী মোহন বসাক এবং এফটি প্ল্যাটস। সরকার প্রস্তাব অনুমোদন করেন। ক্যালকাটা গেজেটে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। কমিশনাররা তখন আবেদন জানালেন এ বলে যে, তারা ৫০,০০০ টাকা ঋণ নেবেন শতকরা ৬ ভাগ সুদে। তাদের ধারণা ছিল সুদের হার বাড়ানোয় হয়তো অনেকে আগ্রহী হবে। বাকি পঞ্চাশ হাজার তারা নওয়াব গনির সেই দান থেকে খরচ করা হবে। ঐ টাকা সরকারি প্রমিসারি নোটে বিনিয়োগ করা হয়েছিল, বছরে যা থেকে পৌরসভা দু'হাজার টাকা পেত। প্রস্তাব করা হলো, ওয়াটার ওয়ার্কস মেইনটেইনের খরচ পৌরসভা বহন করবে এবং প্রতি বছর তিন হাজার টাকা করে পৌরসভা শোধ করবে যতদিন না সেই পঞ্চাশ হাজার পূর্ণ হয়। আহসানউল্লাহও এ ব্যবস্থা অনুমোদন করেছেন।

১৮৮৩ সালে ভারত সরকার এ প্রস্তাব অনুমোদন করে এবং এভাবে পর্যায়ক্রমে ঢাকা পৌরসভা ঢাকাবাসীদের বিশুদ্ধ পানি সরবরাহে সমর্থ হয়।

১৮৮৪ সালে নবাব আহসানউল্লাহ ও ১৮৯৩ সালে মদনমোহন বসাক পানি সরবরাহের জন্য দুটি পাইপ লাইনের খরচ বহন করেন। আহসানউল্লাহ একটি লাইন নওয়াবপুর থেকে তাঁর বাগানবাড়ি দিলখুশা পর্যন্ত নিয়ে যান। ঠাটারিবাজার হয়ে গিয়েছিল লাইনটি। রাজপরিবারের 'ডিউক অব কনটের' কলকাতা আগমন স্মরণ রাখার জন্য আহসানউল্লাহ পৌরসভাকে অনুরোধ করেন এই লাইনের নাম 'কনট এক্সটেনশন' রাখার জন্য। পৌরসভা তা অনুমোদন করে।

মদনমোহন বসাক নারিন্দার খ্রিস্টান কবরস্থান থেকে জোড়পুল পর্যন্ত লাইনের খরচ বহন করেন। এভাবে দেখি ১৮৯৩ সালের মধ্যে পৌরসভা ও দানের মাধ্যমে প্রায় ষোলমাইল পাইপ বসানো হয়। বিশুদ্ধ পানি ঢাকাবাসীদের জন্য যে কি আশীর্বাদ ছিল তা হয়তো এখন আমাদের পক্ষে অনুধাবন করা কঠিন। শুধু এটুকু বলা যায়, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ শুরুর এক দশকের মধ্যে ঢাকায় মহামারীর প্রকোপ হ্রাস পেয়েছিল।

তথ্য সূত্র

১. আবদুল গনির দানের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার কমিশনার জানিয়েছিলেন সরকারকে—
"It will be observed that, under the terms of the deed of gift made by Nawabs Abdool Gunny, C.S.I. and Ahsan Ullah, no rate can be levied for water-supply, but Rule 4 of the revised rules under the Local Authorities Loan Act lays down that no loan shall be granted to or raised by any district committee for the construction of any public work unless it be estimated that direct net revenue will be derived there from equal to at least 4 percent, per annum on its capital cost. It appears to me that this rule applies to district committees, and not to municipal committees. If, however, if it held to apply to municipal committees also, I would beg to recommend that the rule may be relaxed in this instance as a special case and the loan applied for granted."
Govt. of India, ***Proceedings,*** Home Municipal, 1882.

২. বাংলার লে. গভর্নর জর্জ ক্যাম্পবেল খাজা আবদুল গনিকে ধন্যবাদ জানিয়ে লিখেছিলেন (১৯৭২)—
"....I believe that your chief motive in this has been not a mere desire for notoriety, or display, but a true sympathy with your humbler fellow citizens. I entirely concur in the opinion that a proper water-supply will be of greatest possible benefit to Dacca. The experience of Calcutta has shown that such a scheme may have the most marked effect upon the improvement of the public health, and I shall be ready to assist by every means in my power in giving effect to the munificent scheme which your liberal spirit has desired."
Govt. of India, ***Proceedings,*** Home Public, 1872.

ঢাকার প্রথম কৃষি মেলা

গত শতকের ষাটের দশকে বাংলা সরকারের মনে হয়েছিল, মানুষজনকে কৃষি এবং দেশীয় পণ্য সম্পর্কে উৎসাহী করে তোলা দরকার। ১৮৬৪ সালে, তাই দেখি, সরকারের সচিব প্রতিটি বিভাগের কমিশনারকে এক চিঠিতে জানালেন, নিজ নিজ বিভাগে কৃষি মেলা করতে হবে। শুধু চিঠি নয়, সঙ্গে তিন হাজার টাকাও পাঠিয়ে দিলেন। সরকার থেকে টাকা পাওয়া কতো কঠিন, তা কেবল ভুক্তভোগীরাই জানেন। কিন্তু কৃষি মেলার ব্যাপারে সরকার অতি আগ্রহী ছিলেন, অগ্রিম তিন হাজার টাকা প্রদান তারই উদাহরণ। ঢাকার কমিশনার ছিলেন তখন সি. টি. বাকল্যান্ড। ঐ বছরই তিনি ঢাকার কমিশনার হিসেবে নিযুক্তি পেয়েছিলেন।

পাঁচ বছর ছিলেন তিনি ঢাকায়। তাঁর আমলে, সরকারি উদ্যোগে বাড়িঘর নির্মাণ, পূর্তকার্জ প্রভৃতিতে বেশ জোর দেওয়া হয়েছিল। এ কারণে, তিনি যখন ঢাকা ত্যাগ করেছিলেন, তখন ঢাকার ইংরেজ, আর্মেনী, মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে তাঁকে একটি অভিনন্দনপত্র দেওয়া হয়েছিল। 'ঢাকাবাসী'র পক্ষ থেকে এই অভিন্দনপত্রটি দিয়েছিলেন নবাব আবদুল গনি, আহসানউল্লাহ, জি. এম. রেলি, সি. এন. পোগজ ও গোবিন্দচন্দ্র দত্ত। এ ধরনের অভিনন্দনপত্র গ্রহণে সরকারি বিধিনিষেধ থাকায় বাকল্যান্ড সরকারের কাছে অনুমতি চেয়েছিলেন এটি গ্রহণ করার জন্য কিন্তু সরকার অনুমতি দেননি। 'ঢাকাবাসী'রা বাকল্যান্ডকে বিশেষভাবে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন বুড়িগঙ্গা নদী বরাবর পাকা রাস্তা তৈরি করে দেয়ার জন্য। এ রাস্তাটি এখন আমাদের কাছে পরিচিত 'বাকল্যান্ড বাঁধ' নামে।

সরকারি চিঠি পেয়ে বাকল্যান্ড প্রথমে ঢাকার বেসরকারি কর্মচারি ও 'নেটিভ' বা দেশীয়দের মনোভাব যাচাই করতে চাইলেন। বাকল্যান্ডের মনোভাব ছিল, মেলাটি হবে দেশীয় এবং 'বেসরকারি' লোকদের জন্য। এ কারণে হাঙ্গামা পোয়াতে হবে সরকারি কর্মচারীদের। বাড়তি শ্রমও দিতে হবে। সুতরাং যাদের 'কল্যাণার্থে' মেলা তারা আগ্রহী না হলে মেলা না করাই ভালো।

ওয়াইজ তখন ঢাকার একজন প্রভাবশালী নাগরিক। নীলকর ছিলেন তিনি। তাঁর বাসভবনই এখন বুলবুল ললিতকলা একাডেমি। ওয়াইজ তাঁর বাসায় এ ব্যাপারে একটি বৈঠক ডাকলেন। ঢাকার মান্যগণ্য ব্যক্তিরা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। সবাই এতে খুব উৎসাহ দেখালেন। উৎসাহ এতো প্রবল ছিল যে, খাজা আবদুল গনি, আহসানউল্লাহ ও ওয়াইজ নিজে প্রত্যেকে কৃষি প্রদর্শনী/মেলার জন্য এক হাজার টাকা করে চাঁদা দিলেন।

পরে ভাওয়ালের জমিদার কালীনারায়ণ চৌধুরী ও বালিয়াটির জমিদার জগন্নাথ রায় চৌধুরীও দিলেন এক হাজার করে। ঠিক হয়েছিল প্রথম বিভাগীয় কৃষি মেলাটি হবে ঢাকায়। ময়মনসিংহের কালেক্টর হেন্ডারসনও বাকল্যান্ডের চিঠি পেয়ে একই কারণে একটি বৈঠক ডেকেছিলেন। ময়মনসিংহের বৈঠকও সফল হয় এবং সেখানেও প্রায় ছয় হাজার টাকা চাঁদা ওঠে।

ওয়াইজের বেসরকারি বৈঠক সফল হওয়ার পর বাকল্যান্ডকে সভাপতি করে কৃষি মেলা সফল করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। এতে প্রশাসন ও প্রশাসনের বাইরের ব্যক্তিদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কমিটির সদস্যরা ছিলেন আর এবারক্রম্বি, লে. কর্নেল ফিশার, ই. ড্রামন্ড, জি. এল হ্যারিস, জে. পি. ওয়াইজ, ক্যাপটেন বার্লো, এস. এ. স্টুয়ার্ট, ডব্লিউ. নিভেট, এন. পোগজ, ভি. এস. রবার্টসন, ডব্লিউ ব্রেনান্ড, জি. ব্যালেট, এম ডেভিড, ডবিলউ বেল, খাজা আবদুল গনি, খাজা আহসানউল্লাহ, সৈয়দ আবদুল মজিদ খান, বাবু মৃত্যুজিৎ সিংহ, কালীনারায়ণ রায় চৌধুরী, জগন্নাথ রায় চৌধুরী, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, মধুসূদন দাস, ভগবানচন্দ্র রায়, রামকুমার বোস, কাশীকান্ত মুখোপাধ্যায়। কমিটির সচিব ছিলেন ডান ও লায়াল। ডান বেসরকারিদের আর লায়াল ছিলেন তখন জেলার কভেনান্টেড এ্যাসিস্ট্যান্ট। নামের তালিকা দেখে বোঝা যায়, দেশীয় সদস্যদের অধিকাংশ ছিলেন জমিদার অথবা সরকারি কর্মচারী।

মেলার জায়গা ঠিক করা হয় রেসকোর্সের পুকুরের পাশে (পুকুরের মাপ ছিল পাশে একশো গজ, দৈর্ঘ্যে দু'শো গজ)। পুকুরটি ছিল তখন ক্যাসুরিনা গাছে ঘেরা। পুকুরের পাশে ৩২৫x৪০ গজ জায়গা ঘিরে ফেলা হয়। ঘেরাও জায়গার চারদিকে তৈরি হয় শেড। টিকেট করে মেলায় ঢুকতে হবে। সিজন টিকেটের বন্দোবস্ত ছিল।

৬ ডিসেম্বর ১৮৬৪ সালে বেশ জাঁকালোভাবে মেলার উদ্বোধন করা হলো। রানী ভিক্টোরিয়ার নামে জজ এবারক্রম্বি উদ্বোধন করলেন মেলার। লাইট নেটিভ ইনফেনট্রির পঞ্চম রেজিমেন্ট কুচকাওয়াজ করল। মেলা কয়দিন ছিল তা অবশ্য জানা যায়নি, জানা যায়নি টিকেটের হারও। তবে, সরকারি রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে টিকেট বিক্রি হয়েছিল ১,৭৭৪ রুপির। বিনামূল্যে একদিন প্রদর্শনীতে মানুষজনকে ঢুকতে দেয়া হয়েছিল। সেদিন হাজার দশেক দর্শক গিয়েছিলেন মেলায়। অবশ্য ঐদিন ছিল ঘোড়দৌড়। ঘোড়দৌড়ে এমনিতেই ঢাকাবাসীরা ভিড় জমাত। অফিস আদালত খালি হয়ে যেত। রেস শেষে সবাই ঢুকে পড়েছিলেন হয়তো মেলায়।

এই প্রদর্শনী উপলক্ষেও কিন্তু প্রটোকলের ঘাটতি হয়নি। উদ্বোধনের দিন স্থানীয় গণ্যমান্যদের বিশেষভাবে সম্মান দেখানো সম্ভবপর হয়নি। সে কারণে, দু'দিন পর কমিশনার দেশীয় গণ্যমান্যদের জন্য আলাদাভাবে দরবার বসালেন। বিভাগের স্থানীয় গণমান্যদের মধ্যে প্রধান ছিলেন ময়মনসিংহের সুসংয়ের রাজা যিনি প্রদর্শনী উপলক্ষে মোটা চাঁদা দিয়েছিলেন, দিয়েছিলেন বিভিন্ন ধরনের পণ্য ও জন্তু জানোয়ার। হিন্দুদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন কালীনারায়ণ রায় ও মৃত্যুজিৎ সিং, মুসলমানদের মধ্যে নবাব গনি ও আহসানউল্লাহ, শায়েস্তাবাদের জমিদার সৈয়দ তোজাম্মেল আলী এবং

শামসউদ্দিন চৌধুরী। কমিশনার বক্তৃতা দিলেন ইংরেজিতে, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আবদুল মজিদ খান উর্দুতে, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রামকুমার বসু ও স্কুল পরিদর্শক কালীকান্ত মুখোপাধ্যায় বাংলাতে। ডিসেম্বর দশ তারিখে প্রদর্শকদের সাত হাজার টাকা নগদ পুরস্কার দেয়া হয়। শনিবার বিকেলে মেলা প্রাঙ্গণ ছোট ছোট বাতি দিয়ে সাজোনো হয়, পোড়ানো হয় আতশবাজি।

সরকারি রিপোর্টে বাকল্যান্ড প্রদর্শনী সম্পর্কে মন্তব্য রেখেছেন। তাঁর মতে, ষাঁড় ও গরুগুলি ছিল ভালো আর পোলট্রির (যেমন, হাঁস, মুরগি) মান এতো চমৎকার ছিল যে, দেশীয়রাই অবাক হয়ে গিয়েছিল। বাকল্যান্ড বিশেষভাবে নতুন ধরনের এক তন্তুর উল্লেখ করেছেন যা অনেকটা পাটের মতো। ভাওয়ালের জঙ্গলে এগুলি জন্মে। ভাওয়ালের জমিদার কালীনারায়ণ এ তন্তু প্রদর্শন করেন। বাকল্যান্ড বলেছেন, এ তন্তু লাভজনক ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। বাকল্যান্ড বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন ঢাকা জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী এসএ স্টুয়ার্টের কথা। তিনি নতুন ধরনের একটি 'ব্রিক মলডিং ও টাইল মেকিং মেশিনারি' উদ্ভাবন করেছিলেন। প্রদর্শনীতে তা ছিল। এ যন্ত্র দিয়ে নির্মাণকার্জে সময় বাঁচানো যেতে পারে। পূর্ত বিভাগ যাতে এই যন্ত্রটি পরীক্ষা করে কাজে লাগায় তার অনুরোধ করেছেন বাকল্যান্ড।

প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত পশুর মধ্যে ষাঁড় এবং গরুর সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি—৮৪টি। ভালো জাতের ষাঁড় ও গরু ছিল—'আপ কানট্রি'র। এ বিভাগে অধিকাংশ পুরস্কার পেয়েছিলেন আবদুল গনি। ঢাকা বিভাগের ষাঁড়, দুগ্ধবতী গাভী, গাভী, বলদ. দেশী বলদ বিভাগে আবদুল গনির ষাঁড়, বলদ, গাভী যথাক্রমে তৃতীয়, দ্বিতীয় এবং প্রথম হয়েছিল। প্রথম পুরস্কার ছিল ৫০ টাকা, দ্বিতীয় ৩০ টাকা এবং তৃতীয় পুরস্কার ২০ টাকা। এছাড়া ওয়াইজের ষাঁড়ও একটি বিভাগে প্রথম হয়েছিল।

মোরগ, মুরগি, কবুতরের ক্ষেত্রে আহসানউল্লাহই প্রথম পুরস্কার পেয়েছিলেন। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রথম, দ্বিতীয় এবং কবুতরের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম সব পুরস্কারগুলিই ছিনিয়ে নিয়েছিলেন আহসানউল্লাহ। অবশ্য পুরস্কারের পরিমাণ ছিল কম, ১২ টাকা, ৬ টাকা ও ৪ টাকা। এছাড়া নানারকম রবিশস্যও প্রদর্শিত হয়েছিল। তবে অধিকাংশ পুরস্কার পেয়েছিলেন জমিদার ও সরকারি কর্মচারীরা। রিপোর্টে আক্ষেপ করে বলা হয়েছিল দেশীয় উৎপাদকরা তেমনভাবে মেলায় অংশগ্রহণ করেনি। করলে হয়তো দেশীয় পণ্যাদি সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যেত।

সুতিবস্ত্রের বিভাগটি ছিল আকর্ষণীয়। বিচারকরা মন্তব্য করেছিলেন, প্রদর্শিত বস্ত্র দেখে তাঁরা মুগ্ধ এবং মনে হচ্ছে মসিলনের গৌরবরবি এখনও অস্তমিত হয়নি। সুতিবস্ত্রের বিভিন্ন শাখায় ঢাকা জেলের কয়েদিদের কাজও প্রশংসিত ও পুরস্কৃত হয়েছিল।

ঢাকার ফিলিগ্রি বা তারের কাজ ছিল বিখ্যাত। প্রদর্শনীতে রুপোর কিছু ফিলিগ্রি প্রদর্শিত হয়েছিল। এ বিভাগে পুরস্কৃত হয়েছিলেন গঙ্গাচরণ, ফিসার এবং মোহন বসাক। সেন্ট থমাস, চার্চের কাঠের কারুকাজ করা বেদির জন্য পুরস্কৃত হয়েছিলেন স্টুয়ার্ট।

ফলপাকুড়, বেত-বাঁশ আরো নানারকম পণ্য প্রদর্শিত হওয়া ছাড়াও প্রদর্শিত হয়েছিল ড্রইং। এ বিভাগে প্রকৌশলী বিভাগের ড্রাফটসম্যান গুলজার সিংহের ড্রইংয়ের প্রশংসা করা হয়েছে। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার এক্ষেত্রে একটি রঙিন ড্রইংয়ের জন্য শ্রেষ্ঠ পুরস্কারটি পেয়েছিলেন একজন মহিলা। নাম উত্তম সুন্দরী। তিনি এঁকেছিলেন একটি ঈগল পাখি।

ঢাকার প্রথম কৃষি মেলা কি সফল হয়েছিল? সরকারি হিসেবে জানা যায়, মেলায় চাঁদা ও টিকেট থেকে আয় হয়েছিল ২৪,৬৭৪ টাকা আর ব্যয় ১৬০০০ টাকা। সরকারের কোন ব্যয়ই হয়নি। সরকার প্রেরিত অগ্রিম তিন হাজার টাকা খরচই হয়নি। এতে উৎসাহিত হয়ে সরকার প্রতি বছর প্রতি বিভাগে কৃষি মেলা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

এরপর নিয়মিত কৃষি মেলা হয়েছিল কি না জানা যায়নি, তবে ১৮৭৮ থেকে নবাব আহসানউল্লাহ আবার এ ধরনের মেলা আয়োজনের চেষ্টা করেছিলেন। রানী ভিক্টোরিয়ার ভারত সম্রাজ্ঞী উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে ১৮৭৮ সালে নিজ উদ্যোগে আহসানউল্লাহ মেলার আয়োজন করেন, পুরস্কারও দেওয়া হয় প্রথম কৃষি মেলার অনুকরণে। পরের বছরও আয়োজন করা হয় এ মেলার। সংবাদপত্রের ভাষ্য অনুযায়ী—

"শ্রীযুক্ত নবাব আসানুল্লাহ খাঁ বাহাদুর সর্বসাধারণকে অবগত করাইতেছেন যে, শ্রী শ্রী ভারতেশ্বরীর ভারতবর্ষের সম্রাজ্ঞী উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে সাহবাগে গত সন ১লা জানুয়ারী তারিখে যে এক মেলা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ এ বৎসরও মেষ ইত্যাদির জাতি ও তাহাদের ভূমির উৎপন্ন ও কৃষিকর্ম সম্বন্ধীয় অস্ত্রশস্ত্র আদির উৎকর্ষ সাধন বিষয়ে উৎসাহ প্রদানের জন্য এক কৃষি প্রদর্শনের মনস্থ করিয়াছেন। অতএব তিনি সর্বসাধারণকে আহবান করিতেছেন যে, তাহাদের ঐ সকল দ্রব্যসহ মেলাতে উপস্থিত হইয়া নিম্নে যে পুরস্কার ফর্দ্দ দেওয়া গেল, তজ্জন্য প্রতিযোগিতা করে। তিনি আরও অভিলাষ করেন যে, এই জেলাস্থ রাজকর্মচারী এবং জমিদার তাহাকে এই হিতজনক কার্য্যে তাহাদের সৎপরামর্শ এবং সহযোগিতা দ্বারা তাহার সহায়তা করেন।"

তথ্য সূত্র

১. Govt. of India, *Proceedings,* Home Public, 1865.

২. *ঢাকা প্রকাশ,* ১৮৭৯। 'ঢাকা প্রকাশ'-এ নবাব আহসানউল্লাহ আয়োজিত কৃষিপ্রদর্শনীর বিজ্ঞাপন—

উক্ত প্রদর্শন ৩০শে ডিসেম্বর আরম্ভ হইয়া ১লা জানুয়ারি পর্যন্ত সর্বসাধারণের দর্শনার্থে খোলা থাকিবে। যে সকল লোক ঐ সকল পুরস্কার পাইতে চেষ্টা করিতে চাহে, তাহাদের গো, মেষ আদি ও কৃষিকর্মের অস্ত্রশস্ত্র আদি ও ভূমির উৎপন্ন দ্রব্য সকলের আদর্শ উক্ত প্রদর্শনের স্থানে ২৯শে ডিসেম্বর তারিখে পাঠাইয়া দিতে হইবে। অতঃপর যাঁহারা বিচারক নিযুক্ত হইবেন, তাঁহারা প্রতিযোগী ব্যক্তিগণ মধ্যে কে কৃতকার্য্য হয় তাহার বিচার করিয়া পুরস্কার বিতরণ করিবেন।

যে সকল ব্যক্তি এই প্রদর্শনে দ্রব্যাদি উপস্থিত করিবে, তাহাদিগকে এতদ্বারা জানান

যাইতেছে যে, তাহারা যেসকল [অস্পষ্ট], মেষ ও অন্যান্য দ্রব্যাদি প্রদর্শনের জন্য উপস্থিত করে, তদুপরি নিম্নপ্রকারে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত টিকেট বসাইয়া [অস্পষ্ট] আর যে কাল পর্যন্ত গো, মেষ আদি প্রদর্শনের স্থানের মধ্যে থাকে, তৎকালের আহার যোগাইবার বন্দোবস্ত করিয়া রাখে।

টিকেটের ফরম

শ্রেণী	
প্রদর্শনকারীর নাম	
বাসস্থান	পরগনা
বর্ণনা	

১ম বিভাগ

১ম শ্রেণী

এই জেলাতে জাত উত্তম ষাঁড় যাহা এই দেশের প্রয়োজনীয় কার্য্যে উপযোগী হয়, তজ্জন্য পুরস্কার	২০্
এই জেলাতে জাত উত্তম দুগ্ধবতী গাভী তৎসঙ্গে উত্তম বৎস।	২০্
এই জেলাতে জাত চাষের উত্তম জোড়া বলদ।	২০্
	৬০্

২য় শ্রেণী

এই জেলাতে জাত উত্তম সোয়ারি অথবা বোঝারু টাটু ঘোড়া তের হাত অথবা তাহার কম উচ্চ	২৫

৩য় শ্রেণী

এই জেলাতে জাত উত্তম মেষ ————	৫
এই জেলাতে জাত উত্তম ৪টী ভেড়ী	৮্
	১৩্

৪র্থ শ্রেণী ————

এই দেশে জাত উত্তম পাঁঠা	৫
এই দেশে জাত উত্তম পাঁঠী	৫
	১০্

৫ম শ্রেণী

এই জেলায় জাত উত্তম ১ মোরগ ও ৪টি মুরগি	৪্
যে কোন জাতি হউক উত্তম ১ মোরগ	৪্
উত্তম ৪ খাশী মোরগ	৫
উত্তম ১ রাজহংস ও ৪ রাজহংসী	৪্

উত্তম ১ পাঁতিহংস ও ৪ পাঁতিহংসী	২
	১৯

২য় বিভাগ

১ম শ্রেণী

দেশীয় গোয়ালের প্রস্তুতি দ্রব্য

উত্তম টাটকা মাখন নমুনা ও ওজনে এক সেরের কম না হয়	৩
উত্তম গাওয়া ঘৃত ওজনে 10 সেরের	১০
উত্তম মহিষা ঘৃত 10	১৫
	২৮

২য় শ্রেণী

শস্য যাহা প্রদর্শনকারীগণের আপন চাষের ভূমির উৎপন্ন তাহার নমুনা 10 সেরের কম হইবে না

উত্তম মেজের চাউল	১৬
ঐ সাধারণ চাউল	৮
ঐ দেশীয় মাখৈ	৪
	২৮

৩ শ্রেণী

মটর কলাই ইত্যাদি ঐরূপ উৎপন্ন হইবে—

উত্তম বুট	১০
ঐ মটর	৫
ঐ অড়হর	৫
পাঁচ কিংবা অধিক প্রকারের ডালের সংগ্রহ প্রত্যেক প্রকারের নমুনা দুই সেরের কম না হয়	৮
	২৮

৪র্থ শ্রেণী

আলু ইত্যাদি যাহা পূর্বের ন্যায় উৎপন্ন হইবে এবং ১/এক মণ করিয়া দেখাইতে হইবে।

উত্তম আলু	৫
ঐ সকরকন্দ আলু	৫
ঐ হরিদ্রা	৫
ঐ আদা	৫
এরারুট	৪
ভিন্ন স্থান হইতে আমদানি আলু	৫
	২৮

৫ম শ্রেণী

শন পাট ইত্যাদি পূর্বের ন্যায় উৎপন্ন এবং প্রত্যেক প্রকার ৫ সের করিয়া দেখাইতে হইবে—

উত্তম পাট	২০
শন	৫
মসাব্বরের আঁশ	৫
	৩০

৬ষ্ঠ শ্রেণী

তুলা যাহা প্রদর্শনকারীগণের আপন চাষের ভূমির উৎপন্ন হইবে এবং পশম যাহা তাহাদের নিজেদের গো, মেষ ইত্যাদির হইবে তাহার প্রত্যেক রকম ওজন ।. সেরের কম হইবে না— বিদেশীয় বীজ হইতে এই জেলাতে উৎপন্ন

উত্তম তুলা	১৫
উত্তম দেশীয় তুলা	১০
	২৫

৭ম শ্রেণী

রঙ্গ [?] প্রত্যেক রকমের নমুনা/৫ পাঁচ সের উত্তম কুসুম ফুল যে কোন জেলায় উৎপন্ন হউক।

	৬
লাহার রঙ্গ [?]	৮
	১৪

৮ম শ্রেণী

তৈল উৎপন্নকারী বীজ যাহা প্রদর্শনকারীদের নিজ চাষের ভূমিতে উৎপন্ন হইবে নমুনা/৫ সেরের কম না হয়

উত্তম তিশি	৪
সরিষা	৪
তিল	৪
ভেরনের বিচি	৪
সিরগুজা	৬
	২২

৯ম শ্রেণী

তামাক যাহা প্রদর্শনকারীগণের নিজ ভূমির উৎপন্ন নমুনা/৫ সের।

উত্তম তামাক পাতা	[অস্পষ্ট]
উত্তম দেশীয় চুরট ১০০ শত	[অস্পষ্ট]

১০ম শ্রেণী

সাধারণ দেশীয় ২ খান উত্তম ইক্ষু	৫
গুড় ১০ দশ সের	৫
	১০

১১শ শ্রেণী

কৃষিকর্ম্মের অস্ত্রাদি

এদেশীয় লৌহ নির্ম্মিত গাছ কাটিবাব উপযোগী অন্যূন ৬ জন কুড়াল	১০
ঐ-ঐ-৬ খান কোদালী	৫
এই জেলার প্রস্তুতি উত্তম নাংগল	৫
ঐ-ঐ-বৈলের গাড়ী	৫
তুলা হইতে বিচি পৃথক কবিবার জন্য এদেশীয় যন্ত্র	৫
দেশীয় কাঁচি অন্যূন ৬ খান	৫
	৩৫

১২ শ শ্রেণী

উত্তম শাক সব্জী

ঐ-ঐ-যে কোন রায়ত কর্ত্তৃক প্রদর্শিত হউক প্রকৃত প্রস্তাবে তাহার নিজ ভূমির উৎপন্ন	৫
নানাবিধ উত্তম ফল	৫
নানাবিধ উত্তম ফুল	১০
	২০

কেবল নবাব সাহেবের জমিদারীর প্রজাগণের জন্য বিশেষ পুরস্কার।

১ম শ্রেণী

নবাব সাহেবের জমিদারীতে উত্তম ষাঁড় যাহা নবাব সাহেবের রাযত প্রদর্শিত হইবে	২৫
ঐ-ঐ-উত্তম দুগ্ধবতী বৎস সহিত	২৫
ঐ-ঐ-চাষের উত্তম ১ জোড়া বলদ	২০
	৭০

২য় শ্রেণী

ঐ-ঐ-উত্তম সোয়ারি অথবা বোমারু টাটু ঘোড়া	২০

৩য় শ্রেণী

গোয়ালের প্রস্তুতি দ্রব্য

ঐ-ঐ-গাওয়া ঘৃত 10 সেরের কম না হয় -	৮
ঐ-ঐ-মহিষা ঘৃত 10 সেরের কম না হয়	৮

৪র্থ শ্রেণী

ঐ-ঐ-উত্তম শস্য অন্যূন ১০ সের উত্তম মেজের চাউল	১০
সাধারণ চাউল	৫

৫ম শ্রেণী

ঐ-ঐ-পাট ইত্যাদি অন্যূন ৫ সের উত্তম পাট	১০

৬ষ্ঠ শ্রেণী

ঐ-ঐ-তৈল উৎপাদক বীজ অন্যূন ৫ সের উত্তম তিশি	৩
সরিষা	৩
তিল	৩
ভেরনের বিচি	৩
পোস্তার দানা	৩
সিরগুজা	৩

৭ম শ্রেণী

ঐ-ঐ ইক্ষু এবং গুড় ২ খানা উত্তম ইক্ষু	৩
গুড় 10 দশ সের	৩

৮ম শ্রেণী

কৃষিকর্ম্মের অস্ত্রাদি

ঐ-ঐ গাছ কাটিবার কুড়াল ৬ খান	৫
ঐ-ঐ কোদালী ৬ খান	৩
ঐ-ঐ উত্তম নাংগল	৪
ঐ-ঐ বৈলের গাড়ী	৩
ঐ-ঐ তুলা হইতে বীজ পৃথক করার যন্ত্র	৩
ঐ-ঐ কাচি অন্যূন ৬ খান	৩

৯ম শ্রেণী

রঙ্গ নমুনা অন্যূন ৫ সের কুসুম ফুল (উপরে যেরূপ লেখা গিয়াছে)	৫

শ্রীচন্দ্রকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় দেওয়ান।

২৩ নবেম্বর, ১৮৭৯।

ঢাকা শহরের শিল্পের চালচিত্র একশ বছর আগে

শিল্পায়ন নিয়ে শুধু বর্তমান সরকারই নয়, একশ বছর আগে ব্রিটিশ সরকারও চিন্তাভাবনা করেছিল। ওই সময় বাংলা প্রদেশ জুড়ে সরকার শিল্পায়নের সম্ভাবনা জানার জন্য জরিপ করেছিল। এ ধরনের জরিপের মধ্যে দুটি উল্লেখযোগ্য জরিপ বা রিপোর্ট হচ্ছে 'দি ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড রিসোর্সেস অব ইস্টার্ন বেঙ্গল অ্যান্ড আসাম' ও 'রিভিউ অব দি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পজিশান অ্যান্ড প্রসপেকট্স ইন বেঙ্গল ইন নাইনটিন হানড্রেড অ্যান্ড এইট উইথ স্পেশাল রেফারেন্স টু দি ইন্ডাস্ট্রিয়াল সার্ভে অব এইটিন নাইন্টি।' প্রথমটির প্রণেতা জি. এন. গুপ্ত। দ্বিতীয়টির জি. কামিং। এ দু'টি রিপোর্টের আগে যে বাংলার শিল্পায়ন সম্পর্কে জরিপ চালানো হয়নি তা নয়, কিন্তু কার্যকর কোন ব্যবস্থা কখনও গ্রহণ করা হয়নি। বর্তমান রচনাটি ঐ দুটি রিপোর্ট এবং অন্যান্য তথ্য বিশেষ করে গুপ্তের রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে রচিত।

গুপ্তের রিপোর্টটি বেশ বড়। পূর্ববঙ্গ বলতে তখন শুধু বর্তমান বাংলাদেশ-ই নয়, আসামকেও বোঝাতো এবং আসাম ও পূর্ববঙ্গের প্রতিটি অঞ্চল তিনি পরিদর্শন করে এ রিপোর্ট দাখিল করেছিলেন। তিনি যেসব বিষয়কে 'শিল্প' হিসেবে উল্লেখ করেছেন, বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে তা অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু, আমাদের মনে রাখতে হবে, সে সময়ের পরিবেশ, সম্পদ এবং কৃৎকৌশলগত অবস্থার কথা। ১৮৯০ সালে ই. এন. কলিন এ ধরনের এক রিপোর্টে উল্লেখ করেছিলেন, বাংলার প্রায় পুরোটা কৃষিনির্ভর। ১৮৮২-৯০ শুমারীতে দেখা যায় জনসংখ্যার ৮.৭৩ শিল্পের সঙ্গে জড়িত এবং শিল্পের সঙ্গে জড়িত অধিকাংশের বাস কলকাতা ও আশপাশের অঞ্চলে। তিনি আরো উল্লেখ করেছিলেন, কাঠ, তামার কাজ, পাটি, মৃৎপাত্র ছাড়া বাংলার উৎপাদকরা সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল ইউরোপের ওপর।

জি.এন. গুপ্ত যেসব শিল্পের উল্লেখ করেছিলেন তার মধ্যে পাট ছাড়া বাকি সবই ছিল প্রায় কুটির শিল্পের অন্তর্গত। এসব কুটির শিল্পের কিছু ছিল ক্ষয়িষ্ণু, আবার কিছু ছিল সম্ভাবনাময়। গুপ্ত সেই সম্ভাবনাময় দিকটির দিকেই গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এ কারণে, প্রতিটি জেলা সফর করে তাঁকে উৎপাদিত পণ্যসমূহ দেখতে হয়েছে। তাঁর উল্লিখিত শিল্পসমূহের মধ্যে সম্ভাবনা দেখা গেছে পাট, বাঁশ ও বেতের পণ্য, কাঠের কাজের। অর্থাৎ স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে এগুলির রফতানির সম্ভাবনা প্রায় ছিল না। কিন্তু, তাঁর মনে হয়েছিল, অভ্যন্তরীণ বাজার বিকশিত হলে এসব শিল্প দাঁড়িয়ে যেতে পারে। তবে, তাঁর মনে হয়েছে এ অঞ্চলের মানুষ শিল্পায়নে আগ্রহী এবং অঞ্চলটি শিল্পের জন্য উপযুক্ত। আজ একশ বছর পর, বাংলাদেশ সরকারও তা বলছে।

ব্রিটিশ সরকার পূর্ববঙ্গের শিল্পায়নে দৃকপাত করেনি। পাকিস্তান সরকারও করেনি। কারণ, দুই সরকারই পূর্ববঙ্গকে বিচার করেছিল কাঁচামালের আড়ত হিসেবে। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার গত ২৫ বছর সর্বতোভাবে শিল্পায়নে পৃষ্ঠপোষকতার চেষ্টা করেছে এবং ব্যর্থ হয়েছে। এ খাতে যে পরিমাণ অর্থ ভর্তুকি ও অপচয় হয়েছে তা কৃষি খাতে বিনিয়োগ করলে হয়তো অপার সম্ভাবনার দ্বার খুলে যেত। এখানে উল্লেখ্য, কৃষি খাতেই আমাদের সবেচেয় বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। তবুও, বাংলাদেশে শিল্পায়ন কেন হলো না বা হচ্ছে না সেটিই এখন মৌল প্রশ্ন।

আমি এখানে গুপ্ত উল্লিখিত পূর্ববঙ্গ নয় শুধু ঢাকা শহরে কী কী 'শিল্প' তখনও বিদ্যমান ছিল তার কথাই উল্লেখ করব।

কাঠের কাজ

কাঠের কাজের চলন আছে পূর্ববঙ্গের সব জেলাতেই। তবে নৌকা নির্মাণের জন্য ঢাকা ছিল তখনও বিখ্যাত। ঢাকায় নৌকা তৈরির কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল মুঘল আমলেই। নানা রকম নৌকা তৈরি হতো ঢাকায়। তবে, বিখ্যাত ছিল ঢাকার বিলাসবহুল আরামদায়ক নৌকা যাকে উনিশ শতকে বলা হতো গ্রিন বোট। দিল্লির বাদশাহরা যে নৌকা ব্যবহার করতেন তা তৈরি হতো ঢাকায়। সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর আত্মজীবনীতে এ কথা উল্লেখ করেছেন এবং ঢাকা ছাড়া আর কোথাও তা নির্মাণ করা যেতো না। এজন্য, নৌকা নির্মাণ ও নির্মাণ কাজ তত্ত্বাবধানের জন্য ঢাকার মিস্ত্রিদের খ্যাতি ছিল সারা পূর্ববঙ্গে। গুপ্ত উল্লেখ করেছেন, উনিশ শতকের শেষার্ধে বা এ শতকের গোড়ায় এক হাজার টাকার মধ্যে ঢাকায় মোটামুটি আরামদায়ক একটি নৌকা নির্মাণ করা যেতো। এ শতকের পঞ্চাশ দশকে আমরা দেখেছি সদরঘাট বা সওয়ারি ঘাটে নৌকা নির্মিত হচ্ছে।

ঐ সময় কাঠের সামগ্রী বিক্রির জন্য সবচেয়ে ভালো দোকানগুলি ছিল ঢাকায়। এ ধরনের দোকানের সংখ্যা ছিল গোটা পঁচিশেক। আর যেসব কারিগর কাজ করতেন এসব দোকানে তারা মজুরি হিসেবে মাসে পেতেন ১৫ থেকে ২৫ টাকা। ঐ সময় এ টাকার অংকটি নেহাৎ কম ছিল না।

মৃৎপাত্র

মৃৎপাত্রও নির্মিত হতো পূর্ববঙ্গের প্রায় সব অঞ্চলে। তবে, বিখ্যাত ছিল ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল এবং দিনাজপুর। ঢাকায় তখন ছিল চারশ' কুমোর পরিবার, যার অধিকাংশই হিন্দু। তারা তখন অভিযোগ করছিল যে, তাদের রোজগার কমে যাচ্ছে কারণ মৃৎপাত্র তৈরির উপাদানসমূহের দাম বাড়ছে। একজন মৃৎশিল্পী মাসে রোজগার করে প্রায় দশ টাকার মতো।

তবে, মৃৎপাত্র তখনই প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছিল তামা, অ্যালমুনিয়াম ও চীনামাটির তৈরি মৃৎপাত্রের সঙ্গে। এছাড়া শ্রমিকের মধ্যে টিনের তৈরি থালা ও মগ ব্যবহার শুরু হয়েছিল। গুপ্ত লিখেছিলেন, এ শিল্পের তেমন কোন ভবিষ্যৎ নেই।

স্বর্ণ ও রৌপ্যের তৈরি পণ্য

পূর্ববঙ্গে 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্টসে'র কেন্দ্র ছিল ঢাকা। যেমন, ঢাকার মসলিন কারিগরদের মতো উৎকর্ষ আর কারো পক্ষে অর্জন সম্ভব হয়নি। ঢাকার স্বর্ণকার ও রৌপ্যকাররাও বিখ্যাত।

মসলিন তৈরিতে খ্যাতি ছিল বসাকদের এবং তারা ধোলাইখালের তীর, তাঁতিবাজার ও নবাবপুরে বসবাস করতেন। মসলিন শিল্প ক্ষয়ের পর তারা স্বর্ণ ও রৌপ্যের কাজ শুরু করেন এবং দক্ষ ও বিখ্যাত হয়ে ওঠেন।

একশ বছর আগে ঢাকায় এ ধরনের শিল্পের তিনটি ধারা ছিল—

১. সাধারণ স্বর্ণ ও রৌপ্য অলংকার
২. স্বর্ণালংকারে পাথর বসানো
৩. স্বর্ণ ও রৌপ্যের ফিলিগ্রি (বা স্বর্ণ-রৌপ্য তারের পণ্য)

তখন স্বর্গ ও রৌপ্য অলংকার তৈরির অবস্থা ছিল ভালো, আগের থেকেও এর অবস্থা ভালো। পাথর বসানো স্বর্ণালংকারের অবস্থা যেমন ছিল তেমন। তবে, ফিলিগ্রি কাজের ক্ষয় লক্ষণীয়। স্বর্ণ অলংকারের চাহিদা তখন বাড়ছিল। ঢাকার স্বর্ণকাররা তাদের নৈপুণ্যের জন্য বিখ্যাত। প্রায় সব জেলাতেই ঢাকার কারিগরদের একটি মহল্লা আছে এবং তারা বেশ লাভজনকভাবে ব্যবসা চালাচ্ছে। গুপ্ত জানিয়েছেন, ঢাকায় স্বর্ণ-রৌপ্যকারদের দোকানের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ এবং প্রতিটি দোকানেই কাজ করে কমপক্ষে একজন শিক্ষানবিস। দোকানের মালিক মাসে আয় করে পঞ্চাশ থেকে আশি রুপি। আর কারিগরদের রোজগার মাসে পনের থেকে কুড়ি রুপি।

গুপ্ত ফিলিগ্রির তৈরি হাতি ও আতরদান দেখেছেন। আসলে ফিলিগ্রির নানা ধরনের জিনিস তৈরি হতো। তবে চাহিদা হ্রাস পাচ্ছে। ঢাকার তৈরি রুপোর হুকোর চাহিদাও বেশ। তবে, এসবের চাহিদা যত বিকশিত হওয়ার কথা ছিল তা না হওয়ার কারণ ধনাঢ্যদের পৃষ্ঠপোষকতা থেকে এসব পণ্য বঞ্চিত। ধনাঢ্যরা তখন বিদেশী পণ্যেরই পৃষ্ঠপোষকতা করছিলেন বেশি।

শাঁখার চুড়ি

শাঁখার চুড়ি ও শাঁখার তৈরি অন্যান্য সব পণ্যের কেন্দ্র ছিল ঢাকা। শাঁখারিদের মুঘলরা এনেই পত্তন করান এবং সেই থেকে শাঁখা শিল্প ঢাকার অন্যতম শিল্প হয়ে ওঠে। এর কারণ, ঢাকায় ও পূর্ববঙ্গে হিন্দু জনসংখ্যাও নেহায়েত কম ছিল না। একটি গেজেটিয়ারে উল্লেখ করা হয়েছে সম্পদের দিক থেকে তাঁতিদের পরই অবস্থান ছিল শাঁখারিদের। অবশ্য উক্তিটি অতিরঞ্জিত বলেই মনে হয়। ঢাকার শাঁখারিরা শাঁখা আনতেন মালদ্বীপ, শ্রীলংকা, মাদ্রাজ থেকে। বাস করতেন তারা শাঁখারিপট্টিতে। বস্তুত মুঘল আমলে গড়ে ওঠা মহল্লাগুলির মধ্যে একমাত্র শাঁখারিপট্টিই তার পেশার লোকদের নিয়ে এখনও বর্তমান।

গুপ্ত উল্লেখ করেছেন, উনিশ শতকের শেষার্ধে ঢাকায় বাস করতেন ১০৫টি শাঁখারি পরিবার। এর মধ্যে ১০০টি ছিলেন শাঁখারিবাজার ও ৫টি ফরিদাবাদে এবং ১০৫টি পরিবারের ওপর নির্ভরশীল ছিল প্রায় ৫০০ জন। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে শাঁখার চুড়ির চাহিদা সামান্য বেড়েছে কিন্তু কারিগরদের অভিযোগ শাঁখার দাম বৃদ্ধির ফলে মুনাফা হ্রাস পাচ্ছে। কারিগরদের মাসিক আয় আট থেকে দশ রুপি। প্রত্যেকে নিজ নিজ পুঁজি খাটাচ্ছেন কারবারে তবে, এর পরিমাণ একশ' রুপির বেশি নয়। গুপ্ত লিখেছেন, শাঁখারিদের জীবনযাত্রার মান খুবই উন্নত নয়। দু'জন নামকরা শাঁখা শিল্পীর কথা উল্লেখ করেছেন তিনি—প্রেম সুন্দর শুর এবং দ্বারিকা নাথ নাগ।

সূচিশিল্প

ঢাকার সূচিশিল্প সেই মুঘল যুগ থেকেই ছিল বিখ্যাত। একজন ঐতিহাসিক লিখেছেন, 'ঢাকার এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত ছিলেন মুসলমান কারিগররা। হিন্দুরা যেমন দক্ষ ছিল তাঁতে, মুসলমানরা তেমন নিপুণ ছিল সূচিশিল্পে।' মসলিনের ওপর যারা এমব্রয়ডারি করতেন তাদের বলা হতো 'চিনকদাজ'। মসলিন শাল ও স্কার্ফের ওপরও এক ধরনের এমব্রয়ডারি হতো যার কদর ইউরোপে ছিল বেশি। এর কারিগরদের বলা হতো জারদোজ। মসলিনের পর কাসিদা ছিল বিখ্যাত। কাসিদা হচ্ছে টুকরো কাপড় এবং এর ওপর আলাদা ধরনের সুঁচের কাজ হতো। এ কাজ করা হতো সাধারণ মুগা সিলেঙ্কর সুতো বা মোচড়ানো সিনু সুতো দিয়ে। শেষোক্তটি দিয়ে করলে একে বলা হতো চিকন কাজ। কাসিদার কাজগুলি করতেন মুসলমান মেয়েরা এবং নকশার ধরন ছিল দামি অলংকরণের মতো। ঢাকার গেজেটিয়ারে উল্লেখ করা হয়েছে, আগে সব তুর্কি সৈন্যরা মাথায় পরতেন কাসিদা পাগড়ি। পরবর্তীকালে অবশ্য সাধারণ সৈন্যরা পরতেন ফেজ আর উচ্চতর কর্মকর্তারা পাগড়ি। প্রায় ৫০/৬০ ধরনের কাসিদা তৈরি হতো ঢাকায়। ১৯১২ সালে ঢাকা কাসদা রপ্তানি করে আয় করেছিল দু'লক্ষ টাকা।

ঢাকার সোনা ও রুপোর সুতো ছিল বিখ্যাত। কাসিদা ও জামদানিতে ব্যবহার করা হতো এ সুতো। গুপ্ত উল্লেখ করেছেন, কাসিদা ছাড়া উনিশ শতকের শেষার্ধে আরেক ধরনের সূচিশিল্পের চল ছিল ঢাকায়—তা হলো কারুকাজ করা টুপি। গেজেটিয়ারে উল্লেখ করা হয়েছে, মখমল ও অন্য ধরনের কাপড়ের ওপর সোনা বা রুপোর তৈরি সুতো দিয়ে অলংকরণ করা হতো যা ছিল অননুকরণীয়। ঘরকন্নার ফাঁকে ফাঁকে মুসলমান মহিলারা টুপির এই কাজগুলি করতেন। গুপ্ত উল্লেখ করেছেন, ঐ সময় প্রায় দু'শ মুসলমান সূচিশিল্পী ছিলেন এর ওপর নির্ভরশীল। তবে, সারাবছর তারা কাজ পেতেন না। মাসে তাদের গড় রোজগার ৮ থেকে ১০ রুপি, তবে মহাজনদের লাভ থাকে বেশি, কিন্তু বেনারস বা লখনৌ বা পাটনার কাজের মতো এখানকার কাজের মান তেমন উন্নত নয়।

শিংয়ের কাজ

ঢাকা ছাড়া বরিশাল ছিল শুধু শিংয়ের কাজের কেন্দ্র। ঢাকার এ শিল্পটি খুব পুরনো। ঢাকায় শিংয়ের তৈরি পণ্যের কেন্দ্র ছিল আমলীগোলা ও নওয়াবগঞ্জ। শিং দিয়ে তৈরি হতো চিরুনি, বোতাম, ছুরির বাঁট প্রভৃতি। আমলীগোলা ও নওয়াবগঞ্জে প্রায় ১৫০ জন মুসলমান ছিলেন এ কাজের ওপর নির্ভরশীল। এখানে শিংয়ের দর মণ প্রতি ১২ রুপি।

কাচের চুড়ি

কাচের চুড়ি তৈরির একটি কেন্দ্র ছিল ঢাকা, কিন্তু তখন এ শিল্পের অবস্থা ক্ষয়ের দিকে। কারণ ফিরোজাবাদের তৈরি চুড়ির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ঢাকার চুড়ি মার খাচ্ছিল। সবচেয়ে ভালো কাচের চুড়ির দাম প্রতি হাজার পাঁচ টাকা। সাধারণ মানের চুড়ির দাম প্রতি হাজার এক টাকা। আর কারিগরদের রোজগারও খুব কম। মাসে পাঁচ রুপির মতো।

মুক্তার বোতাম

স্বদেশী আন্দোলনের সময় ঢাকায় শুরু হয়েছিল এই শিল্প। ১২ আনায় উৎপাদকরা কিনতেন এক হাজার ঝিনুক। বেশ কয়েকজন কায়স্থ জড়িত ছিলেন এ শিল্পের সঙ্গে। দৈনিক উৎপাদন করা যেতে পারে এক হাজার ঝিনুক থেকে দুই গ্রোস ছোট ও আধা গ্রোস বড় বোতাম। কারিগররা মাসে আয় করতে পারেন ১৫ রুপির মতো তবে প্রতিযোগিতার কারণে মুনাফা কম। ঢাকার বাবু এস মিশ্র কলকাতা, বোম্বে, মাদ্রাজে মুক্তার বোতাম রপ্তানি করে ভাল আয় করছেন। অন্য যারা ভালো মুক্তার বোতামের ব্যবসা করছে তারা হলো রূপলাল দত্তের ফার্ম বন্দে মাতরম ও দাস অ্যান্ড কোম্পানির ন্যাশনাল বাটন ফ্যাক্টরি। এছাড়া ছোট বোতামের গ্রোস বিক্রি হয় ১২ আনায়। সাধারণ চাহিদা দৈনন্দিন বাড়ছে। ফলে গুপ্তের মতে, শিল্পের বিকাশের সুযোগ রয়েছে। তবে গুপ্তের এ আশাবাদ সফল হয়নি।

সাবান

কাপড় কাচা সাবানের জন্য ঢাকা ছিল বিখ্যাত। গেজেটিয়ারে উল্লেখ আছে, ফরাশগঞ্জ ও ফরিদাবাদে সাবান তৈরি ছিল কুটিরশিল্পে মতো। উনিশ শতকের শেষার্ধে বা এ শতকের শুরুতেইও এসব এলাকায় প্রায় একশ'র মতো সাবান তৈরির কারিগর বাস করতেন। মালিক ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র সাহা, সত্য মোহন দাস এবং অক্ষয় কুমার দাস। এম ডবিলউ তাকেদা নামে এক জাপানি ভদ্রলোকের সাহায্যে এ কারখানা উৎপাদন শুরু করে। ১৯০৬-৭ সালে ভারতীয় জাতীয় শিল্পমেলায় বুলবুল সোপ ফ্যাক্টরির সাবান গুণগত মানের জন্য প্রথম পুরস্কার (স্বর্ণ পদক) পেয়েছিল। তাকেদা পরে নিমতলিতে নিজেই একটি কারখানা চালু করেন কিন্তু তা বেশিদিন চলেনি। পরবর্তীকালে বুলবুল সোপ ফ্যাক্টরিও আমদানিকৃত সস্তা সাবানের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে ওঠেনি।

জি. এন. গুপ্ত তাঁর রিপোর্টে সামগ্রিকভাবে পূর্ববঙ্গের শিল্পের অবস্থা ও শিল্পায়নের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যা লিখেছিলেন তা উল্লেখ করতে চাই। এ উপসংহার ঢাকার শিল্পায়ন সম্পর্কেও ছিল প্রযোজ্য। তাঁর উপসংহারটি ছিল আশাসঞ্চারী। তিনি লিখেছিলেন, এ দেশের সবেচেয় 'প্রগ্রেসিভ ও প্রসপারাস' অংশ হলো পূর্ববঙ্গ এবং বাঙালিদের মধ্যে সবচেয়ে কর্মঠ, উদ্যোগী ও ধৈর্যশীল অংশের বাস এই অঞ্চলে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ এখানে মুসলমান এবং কৃষিজীবী হিসেবে এদের তুলনা বিরল। অন্যদিকে, ঢাকার বসাকদের মতো কারিগর সারা ভারতে পাওয়া দুষ্কর। কৃষিক্ষেত্রে পাটের কারণে ভারতের অন্যান্য অংশের তুলনায় পূর্ববঙ্গ সচ্ছল ও সম্ভাবনাময় এবং এর তুলনায় পূর্ববঙ্গের অন্যান্য পণ্য বা শিল্প কিছুই নয়। গুপ্ত লিখেছেন, পূর্ববঙ্গে শিল্প বিকাশের চমৎকার সম্ভাবনা বিরাজ করছে। তাঁর ভাষায়—

"The birth of a spirit of industrialism among the leaders of the people of this part of the province, and to some extent among the masses is a most encouraging feature".

কেন তার এ রকম মনে হয়েছে? এর কয়েকটি মূল কারণ তিনি উল্লেখ করেছেন :

১. নিজেদের উৎপাদিত পণ্যের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের সদিচ্ছা। এ কারণে, 'কটন-উইভিং ইন্ডাস্ট্রি' আবার পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে।
২. ধনাঢ্য ব্যক্তিরা শিল্পে পুঁজি খাটাতে চাইছেন। উদাহরণস্বরূপ তিনি উল্লেখ করেছেন ঢাকার নবাব পরিবার, বগুড়ার নবাব, গৌরিপুরের মহারাজ মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দীর কথা যারা সবাই উৎসুক ছিলেন পুঁজি বিনিয়োগে।

গুপ্ত লিখেছেন, যে যে ক্ষেত্রে শিল্প বিকাশে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা সম্ভব সেসব ক্ষেত্রে সরকারের এগিয়ে আসা উচিত। কারণ, মানুষ চায় শিল্পায়ন হোক। এর মাধ্যমে সর্বশ্রেণীর মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব যা পার্থিব অবস্থার পরিবর্তন ঘটাবে এবং অন্তিমে যা সহায়ক হবে রাজনৈতিক শান্তি স্থাপনে।

একশ' বছর আগের আশাবাদ বা উপসংহারের সঙ্গে বর্তমান বাংলাদেশে শিল্পায়ন সম্পর্কিত জরিপের তেমন কোন অমিল নেই। বরং সরকার এগিয়ে এসেছে। তবুও একশ বছর আগে যেমন শিল্পায়ন হয়নি, এখনও হচ্ছে না। এর কারণ কি? হয়তো সামজতত্ত্ববিদ বা নৃতাত্ত্বিকরা এ দিকটি বিশ্লেষণ করে দেখতে পারেন।

তথ্য সূত্র

E. N. Collin, *Report on the Existing Arts and Industries in Bengal*, Calcutta, *1890.*

G. N. Gupta, *The Industry and Resources of Eastern Bengal and Assam*, Calcutta.

ঢাকায় ক্রিকেটের শুরু

ক্রিকেট খেলার পরিপ্রেক্ষিতে 'ব্যাক স্টপ', 'ব্যাটার', 'বাজি', 'দৌড়' প্রভৃতি শব্দগুলি আজকের পাঠকের কাছে বিলক্ষণ অচেনা ঠেকবে। কিন্তু উনিশ শতকের 'বাঙাল' সাংবাদিকরা ক্রিকেট আলোচনায় এই শব্দগুলিই ব্যবহার করতেন। উইকেট কিপারকে তখন বলা হতো 'ব্যাক স্টপ', 'ইনিংসকে' বাজি আর 'রান'কে দৌড়। 'ব্যাটার' হচ্ছে ব্যাটসম্যান, তবে এ শব্দটি ইংরেজি সংবাদপত্রের। বলা যেতে পারে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বাঙালি সাংবাদিকরা যতোটা সম্ভব বাংলা শব্দ ব্যবহার করতে চাইতেন।

ঢাকায় ক্রিকেটের শুরু কবে? জানা যায়নি। তবে, এটুকু জানা গেছে, ঢাকায় ক্রিকেট যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল। কিন্তু ফুটবল? ফুটবলের কি অবস্থা তখন? উনিশ শতকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা, বই-পত্র ঘেঁটেছি কিন্তু ফুটবল সম্পর্কে কোন তথ্য চোখে পড়েনি। ব্যাপারটা আশ্চর্যের। তবে কি ধরে নেব ফুটবল প্রচলিত বা জনপ্রিয় ছিল না? বিষয়টি বিতর্কের তবে বলা যেতে পারে, ফুটবলও প্রচলিত ছিল। কিন্তু কম, জনপ্রিয়তা ছিল না।

জনপ্রিয়তা ছিল ক্রিকেটের। সংবাদ সাময়িকপত্রে ক্রিকেট সম্পর্কে সংবাদ আছে। অর্থাৎ নিয়মিত তা খেলা হতো। এমনকি গ্রামে-গঞ্জেও। দীনেশ চন্দ্র সেন তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন—'বাজারের নিকট খোলা মাঠে আমরা ক্রিকেট খেলিতাম।' সময়টা তখন উনিশ শতকের সত্তর দশক। এলাকাটি হচ্ছে মানিকগঞ্জের গ্রাম।

ক্রিকেট কবে চালু হয়েছিল ঢাকা শহরে সে সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোন তথ্য জানতে পারিনি। হয়তো জানা যেত যদি উনিশ শতকে ঢাকা থেকে প্রকাশিত সেই সময়কার সংবাদপত্রগুলি পাওয়া যেত যা এখন দুর্লভ। বর্তমান নিবন্ধটি লেখা হয়েছে ঐ আমলে ঢাকা থেকে প্রকাশিত কয়েকটি সংবাদপত্রের সংবাদের ভিত্তিতে। বলে রাখা ভালো, কোন সাংবাপত্রেরই সম্পূর্ণ ফাইল পাওয়া যায়নি। সুতরাং অনেক কিছুই অনুমান করে নিতে হবে।

ঢাকার ক্রিকেট সম্পর্কিত সবচেয়ে পুরনো খবরটি ১৮৫৮ সালের। ইংরেজি এক সাপ্তাহিকের সংবাদে জানা যায়, জানুয়ারি মাসের কুড়ি তারিখে একটি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয় 'ঢাকা স্টেশন' ও 'হার ম্যাজেস্টিস ফিফটি ফোর্থ রেজিমেন্ট'-এর মধ্যে। 'ঢাকা স্টেশন' হচ্ছে সরকারের অসামরিক ইংরেজ কর্মকর্তাবৃন্দ। হয়তো, এদের সঙ্গে ঢাকায় বসবাসরত অন্যান্য পেশার ইংরেজও থাকতে পারেন। 'রেজিমেন্টে'র সবাই ছিলেন ইংরেজ সৈনিক যারা ঢাকার বিদ্রোহ (১৮৫৭) দমনে বা পরে এসেছিলেন। 'ঢাকা

স্টেশন'-এর এগারোজন খেলোয়াড় ছিল না। 'রেজিমেন্টে'র কয়েকজন স্টেশনের হয়ে খেলেছিলেন। 'ঢাকা স্টেশন'—প্রথম ও দ্বিতীয় ইনিংসে করেছিল যথাক্রমে ৪৮ এবং ৯২।

'রেজিমেন্ট' প্রথম ও দ্বিতীয় ইনিংসে ১০৮ ও ৮০। উল্লেখ্য, ঢাকা তখন জঙ্গলে আবৃত একটি নগর। এই খেলার বছর দু'য়েক আগের সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদে জানা যায়, রেসকোর্সের পশ্চিমে জঙ্গলে একটি বাঘ মারা হয়েছে। একই বছর সিলেটেও একটি ম্যাচের সংবাদ পাওয়া যায়।

"Perhaps the most interesting event ever recorded in the cricketing annals of Eastern Bengal, was the grand single wicket match between 'service' and 'non service' that came off on the 24th instant on the parade ground of that humidly picturesque station Sylhet".

ঢাকায় ক্রিকেটের চর্চা যে অব্যাহত ছিল তার একটি ইঙ্গিত পাই চার্লস স্টুয়ার্টের স্মৃতিকথায়। ১৮৬৬-৬৭ সালে তিনি ছিলেন ঢাকার জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি লিখেছেন, ঢাকায় একটি ক্রিকেট মাঠ আছে এবং নববর্ষের দিনটি পালিত হতো সে মাঠে ক্রিকেট খেলে। ইংরেজ কর্মচারীরা এ মাঠে কয়েকদিন পোলোও খেলেছিলেন কিন্তু মাঠ নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয়ে সেখানে আর খেলেননি।

এর এক যুগ পর আবার ক্রিকেটের সংবাদ পাই। একটি খেলা হলো ইস্টার্ন বেঙ্গল এবং ক্যালকাটার মধ্যে। খুব সম্ভব ঢাকা এবং অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শ্বেতাঙ্গ খেলোয়াড়দের নিয়ে গঠিত হয়েছিল ইস্টার্ন বেঙ্গল বা পূর্ববঙ্গ দল। এ দলে দু'একজন অশ্বেতাঙ্গও থাকতে পারেন। কলকাতার দল কলকাতাবাসী ক্রিকেটারদের নিয়ে। পূর্ববঙ্গ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় কলকাতার কাছে। পূর্ববঙ্গের ১৭০ রানের বিপরীতে কলকাতা করেছিল ৩১৭।

একই সময়ে আরেকটি সংবাদ পাই 'স্টেশন' বনাম 'আউটসাইডার'দের খেলার। স্টেশনের অন্তর্ভুক্ত ছিল ঢাকার খেলোয়াড়রা। 'আউটসাইডার'-এ খুব সম্ভব ঢাকার বাইরের খেলোয়াড়রা। খেলায় স্টেশন জয়লাভ করে। খেলার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল ভোজ। পত্রিকার ভাষায়— "At about 2. P.M. numbers of ladies and gentlemen sat down and did ample justice to a sumptous tiffin provided by our former commissioner after which the cricket was resumed, and continued unit sunset."

১৮৭৬ সালেরই আরেকটি সংবাদে আমরা প্রথম দেশী খেলোয়াড়দের সম্পর্কে জানতে পারি। খেলার মাঠ ছিল 'ওল্ড লাইনস' যেটিকে আমরা এখন পুরানা পল্টন হিসাবে জানি। খেলা হয়েছিল 'ইউরোপীয়ান' ও 'নেটিভ'দের মধ্যে। প্রথম পক্ষে ছিল ১১ জন, দ্বিতীয় পক্ষে ১৬ জন। বিকেল তিনটায় খেলা শুরু হয়েছিল। 'ইউরোপীয়ান'রা টসে জিতে ব্যাট করতে নামে এবং ১৩০ রান করে। ইংলিশম্যানরা খেলাটিকে বেশ সিরিয়াসলি নিয়েছিল। পত্রিকার ভাষায়—"England expected every man to do

his duty, and nobly did those who had the least pretension to the name of Englishman respond to their country's call." ঐ ম্যাচে মি. লয়াল চমৎকার খেলেছিলেন। খেলার বিবরণ থেকে খানিকটা উদ্ধৃত করছি সে সময়কার ক্রীড়া সাংবাদিকতার নমুনা তুলে ধরার জন্য। মি. লয়াল কিভাবে আউট হলেন তার বর্ণনা—"A cautious fieldsman standing almost under his very nose, and who had escaped the latter's observation in the heat of exitement, bided his time, and the best player of the day was destined to fall an easy prey to a miserable catch right into his opponents hand."

নেটিভরা মোট করেছিল ৬৯ রান। বলের গতিই নেটিভ ব্যাটসম্যানরা অনুধাবন করতে পারছিল না। পত্রিকার মন্তব্য—Poor fellows! They were always wrong, expecting the slow for the quick and vice versa." এ খেলায় আমরা 'নেটিভ' খেলোয়াড় বসন্ত কুমারের নাম পাই।

এসব রিপোর্ট দেখে অনুমান করছি, ঢাকায় ক্রিকেটের শুরু গত শতকের পঞ্চাশ দশকে। খুব সম্ভব ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ দমনে এবং পরবর্তীকালে যেসব অফিসার ও সৈন্য এসেছিলেন শহরে তারাই ক্রিকেট খেলা শুরু করেন। অন্যান্য স্টেশনেও খেলা হতো। তবে, এ খেলা ছিল নিছক বিনোদন, একঘেয়ে সময় কাটাবার উপায় মাত্র। ক্রিকেট খেলা, মাঠে পাড়া-পড়শির সঙ্গে সমবেত হওয়া, একসঙ্গে মধ্যাহ্নভোজ সারা-ছুটির দিনটি কাটাবার এটি ছিল একটি উপায়। সত্তরের দিকে, 'নেটিভ'দের অনেকেও খেলাটি রপ্ত করেন এবং তখন 'নেটিভ' ও 'ইংরেজ' মিলে খেলা শুরু হয় বিভিন্ন দল গঠন করে।

ঢাকায় ক্রিকেট খেলা জোরদার হয়ে ওঠে যখন ঢাকা কলেজে 'ঢাকা কলেজ ক্লাব' গঠিত হয়।·এ ক্লাবটি কখন গঠিত হয়েছিল জানা যায়নি। তবে, অনুমান করে নিচ্ছি, আশির দশকে কলেজের ছাত্র-শিক্ষক মিলে এ ক্লাবটি গঠন করে। ঢাকায় নিয়মত ক্রিকেট চর্চা ছাড়াও তারা বিভিন্ন জায়গায় ম্যাচ খেলতে যেতো এবং সারা বাংলায় প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট ক্লাব হিসেবে ক্লাবটি খ্যাতি অর্জন করেছিল।

১৮৮৩ সালের এক সংবাদে জানা যায় এই ক্লাব কৃষ্ণনগর কলেজের 'ছাত্রদিগকে' পরাজিত করেছিল। "ঐ ক্রীড়ায় মাননীয় লেফটেন্যান্ট গভর্নর বাহাদুর ক্রীড়া চত্বরে উপস্থিত থাকিয়া জেতাদিগকে কেবল বাক্যতঃ উৎসাহ দান করেন নাই, কাহাকে পারিতোষিকও প্রদান করিয়াছেন।"

১৮৮৭ সালের একটি সংবাদে জানা যায়, পুরানা পল্টন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে ঢাকা কলেজ ও জগন্নাথ কলেজের মধ্যে একটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। "উহাতে ঢাকা কলেজের ৯৮ দৌড় ও জগন্নাথ কলেজের ২১ দৌড় হইয়াছিল। সুতরাং ঢাকা কলেজের .সর্বতোভাবে জয়লাভ হইয়াছে।"

ঐ একই বছর কলকাতার প্রেসিডেন্সির সঙ্গে ঢাকা কলেজ ক্রিকেট ক্লাবের খেলা নিয়ে বেশ তর্ক-বিতর্ক হয়। ইঙ্গিত পাওয়া যায়, এ খেলা নিয়ে উভয়বঙ্গের

পত্রিকাগুলিতে বেশ লেখালেখি হয়েছিল। খেলাটি হয়েছিল ইডেন গার্ডেনে। সংবাদপত্রের অগ্রিম খবরে জানা গিয়েছিল ঐদিন, "মাননীয় লেফেন্যান্ট' গভর্নর প্রভৃতি প্রধান প্রধান রাজপুরুষগণ ক্রীড়াস্থলে উপস্থিত থাকিবেন।" এবং "ঢাকা কলেজের প্রিন্সিপাল মেঃ বুথ প্রফেসর মেঃ টেপা ও বাবু সারদারঞ্জন ক্রীড়ক ছাত্রগণ সমভিব্যাহারে কলিকাতায় রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন।" সারদারঞ্জন ছিলেন টিমের ক্যাপটেন।

খেলায় ঢাকা জয়লাভ করে। কলকাতার কিছু পত্রিকা তখন এর সমালোচনা করে বলে আসলে ঢাকারই হার হয়েছে। ঢাকার পত্রিকাগুলি তা মানবে কেন। ঢাকার একটি পত্রিকা এ সম্পর্ক দীর্ঘ মতামত প্রকাশ করে। এক পর্যায়ে লেখক মন্তব্য করেন "সহযোগীর ৩ সংখ্যক মতগুলি সম্পূর্ণ অলীক। দ্বিতীয়দিনে প্রেসিডেন্সীর ক্রীড়কগণ প্রথম দিনের দৌড় বহাল রাখিয়া ব্যাট করিতে অগ্রসর হন। কিন্তু রো ও হুইলার [প্রেসিডেন্সির সাহেব এবং অপর কয়েকটা প্রেসিডেন্সীর ক্রীড়ক একবাক্যে স্বীকার করেন যে দ্বিতীয় দিন হাজার ভাল খেলিলেও পূর্বদিনের ক্ষতিপূরণ প্রেসিডেন্সীর পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব]। তখন সারদা বাবু রো সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেন—"ওকে কি আপনারা স্বীকার করিতেছেন যে, ঢাকা কলেজ ভার্সাস প্রেসিডেন্সী কলেজ ক্রীড়া পূর্বদিনের ক্রীড়া দৃষ্টেই ঢাকার পক্ষে নিষ্পত্তি হইল?" রো সাহেব তাহাই স্বীকার করেন।

সারদা বাবু পুনরায় বলেন, "তাহা হইলে আমরা যে উদ্দেশ্যে ঢাকা হইতে আসিয়াছিলাম তাহা 'সিদ্ধ' হইয়াছে এক্ষণে আর খেলা নিষ্প্রয়োজন। তৎপর সেদিনকার জন্য উভয় দলে স্ক্রাচ ম্যাচ (আপোষে খেলা) খেলিবার প্রস্তাব হয়।"

১৮৯১ সালের এক সংবাদে জানা যায় কলকাতায় ঢাকা কলেজ ও শিবপুর কলেজের মধ্যে দু'দিনব্যাপী এক খেলা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা জয়লাভ করে—"২ বাজীতে ৪ বার খেলা হয়। উহাতে শিবপুরের পক্ষে দৌড়ের সংখ্যা ১৪৫ ও ঢাকার পক্ষে ১৯২ দাঁড়াইয়াছিল। সুতরাং ঢাকা কলেজের দৌড়ের সংখ্যা ৪৭টি বেশী হইয়াছে। এই জয় বস্তুতঃই প্রশংসনীয় বটে।"

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, উনিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে ঢাকায় ক্রিকেট চর্চা শুরু হলেও আশির দশকে তা বিকশিত হয়। নব্বই দশকে মোটামুটি তা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ঢাকায় ক্রিকেটের মাঠটি ছিল পল্টনে। খেলোয়াড়দের মধ্যে শ্বেতাঙ্গরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও আশির মাঝামাঝি অশ্বেতাঙ্গের মধ্যে থেকেও যোগ্য খেলোয়াড় উঠে আসতে থাকেন। ঢাকা কলেজ ক্রিকেট ক্লাব তার প্রমাণ। আশি ও নব্বই দশকে দু'জন বাঙালি খেলোয়াড় বেশ নাম করেছিলেন। একজন বসন্ত কুমার গুহ, অপরজন সারদারঞ্জন রায়। বিক্রমপুর বজ্রযোগিনীর 'জমিদার তনয়' ছিলেন বসন্ত। এক সংবাদে জানা যায় কৃষ্ণনগর কলেজকে পরাজিত করার পর লে. গভর্নর রিভার্স টমসন বসন্ত কুমারকে একটি ব্যাট পুরস্কার দিয়েছিলেন—"তাহার এক পৃষ্ঠে সংলগ্ন রৌপ্যপত্রে এই কয়টি কথা লিখিত আছে "আমি ঢাকা ক্রিকেট ক্লাবের ক্যাপটেন বাবু বসন্ত কুমার গুহের ক্রিকেট ক্রীড়ায় সন্তুষ্ট হইয়া এই ব্যাটখানি উপহার দিলাম।"

সারদারঞ্জন ছিলেন সত্যজিৎ রায়ের ঠাকুরদা উপেন্দ্র কিশোরের বড় ভাই।

লিখেছেন সত্যজিৎ রায় "ঠাকুরদার পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে দু'ভাই ছাড়া সকলেই ব্রাহ্ম হয়েছিলেন। সারদারঞ্জন ও মুক্তিদারঞ্জন ছিলেন বড় ও মেজো ভাই। ওঁদের বলতাম বড় দাদু আর মুক্তি দাদু। ওঁদের বাড়িতে গেলেই দেখতে পেতাম বৌয়েদের সিঁথের সিঁদুর। শাড়ি পরার ঢং আলাদা. পুরুষদের হাতে মাদুলি। পুজোর ঘর থেকে শোনা যেত শাঁখ আর ঘণ্টার শব্দ, খুড়িমাঠাকুমারা প্রসাদ এনে খাওয়াতেন আমাদের। কিন্তু, এই তফাৎ ওঁদের পর-পর মনে হয়নি কখনো। সত্যি বলতে কি, এক ধর্মের ব্যাপারে ছাড়া ঠাকুর দাদাদের ভাইয়ে মিল ছিল অনেক। হিন্দু সারদা মুক্তিদা যেমন খেলাধুলা করতেন, মাছ ধরতেন, তেমনি করতেন ব্রাহ্ম কুলদা। ক্রিকেট শুরু করেন সারদা, তারপর সেটা রায় পরিবারে হিন্দু-ব্রাহ্ম সবদিকে ছড়িয়ে পড়ে"। এক সময়ের বিখ্যাত গায়িকা সুপ্রভা দেবী ছিলেন সারদারঞ্জনেরই মেয়ে! এখানে উল্লেখ্য যে, বসন্ত কুমার ও সারদারঞ্জন—দু'জনেই ঢাকা কলেজ ক্রিকেট ক্লাবের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

ঢাকার ক্রিকেট দলকে ধনীরা সাহায্য করতেন। বিশেষ করে 'বিদেশ' সফরের সময়। ঢাকার দল কলকাতায় প্রেসিডেন্সির সঙ্গে খেলতে গেলে বাংলাবাজারের জমিদার প্রতাপচন্দ্র দাস ৩৫০ টাকা দান করেছিলেন। শিবপুর কলেজের সঙ্গে খেলতে গেলে— "ঢাকার ছাত্রদিগের কলকাতায় গমন ও সেই স্থানে অবস্থানের সমস্ত ব্যয় নির্বাহর্থ ৪৫৮ টাকা চাঁদা উঠিয়াছে। শ্রীযুক্ত রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ রায় বাহাদুর ১৫০ ও বাবু অন্নদা প্রসাদ রায় চৌধুরী ৫০ টাকা দিয়াছেন। অন্যান্য জমিদার, ধনী, উকিল, হাকিম ও শিক্ষক প্রভৃতি ভদ্র-মহাশয়েরাও আশানুরূপ অর্থদান করিয়াছেন।" অর্থ সাহায্য ছাড়াও ঢাকার ক্লাবকে বিশেষ করে স্বদেশী খেলোয়াড়দের সমর্থন জানাতে দর্শক ও সংবাদপত্রগুলি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেনি। একবার স্বদেশীয়দের সঙ্গে খেলা হচ্ছিল ঢাকার ইংজেদের (১৮৭৬)। দর্শকরা সমর্থন জানাচ্ছিল স্বদেশীদের। ইংরেজি একটি পত্রিকা লিখেছিল—The place was densely crowded by Native Spectators who caused great annoyance to the players while the game was going on, by shouting and clapping at any mishap of the oppositie party in a most rude and unbecoming way, while they rather too vociferously applauded any piece of good luck that attended their own countrymen. But what was even wrose, they often managed to obstruct the ball from going as far it would have gone, had it not been stopped on it way by number of noisy Natives."

ঢাকার খেলা বা ক্লাব সম্পর্কে কলকাতার কোন পত্রিকা যদি তির্যক মন্তব্য করতো তাহলে ঢাকার পত্রিকা সঙ্গে সঙ্গেই তার উত্তর দিতো। শুধু ক্রিকেট নয়। সব ক্ষেত্রেই ঢাকা-কলকাতা এ রেষারেষি ছিল। ঢাকা কলেজ ও প্রেসিডেন্সি কলেজের খেলায় প্রেসিডেন্সি পরাজিত হলে কলকাতার কোন একটি পত্রিকা কটাক্ষ করে বলে যে, আদতে হারটি ঢাকারই হয়েছিল। ঢাকার বাংলা পত্রিকা 'ঢাকা প্রকাশ' এ পরিপ্রেক্ষিতে মন্তব্য করে—

"দুঃখের বিষয়, প্রেসিডেন্সীর পক্ষ সূক্ষ্ম লক্ষ্য করিলে পরই সহযোগীর চক্ষে পক্ষপাতের পরদা পড়িল। ঢাকার দিক তিনি আর দেখিতে পাইলেন না। ...তিনি দেখিতে পাইলেন না যে, যে সকল ব্যক্তিকে আউট করা পূর্বদিন প্রেসিডেন্সীর পক্ষে দায় হইয়া উঠিয়াছিল ঢাকার দুর্ভাগ্যক্রমে তাহারা পরদিন রান আউট হইয়া গেলেন। হরি! হরি! পরিশেষে এ সকল দুর্ঘটনা সত্ত্বেও যখন টেলিগ্রাফ বোর্ডে ঢাকার পক্ষে ১০৩ দৌড় উঠিয়া পড়িল তখন আম্পায়ার সাহেবের চক্ষু ও মন অন্যত্র থাকাতে তিনি ঢাকার একটি ভাল খেলুড়েকে অকারণ আউট বলিয়া বসিলেন; দর্শক মাত্রেই সেটি দেখিয়া আম্পায়ারকে ধিক্কার দিতে লাগিল। আমাদের সহযোগী তাহা দেখিলেন না। সহযোগীদিগকে উপসংহারে বলিয়া রাখি যে, প্রেসিডেন্সীর ভাল খেলুড়ে কয়টিই আশৈশব ঢাকা ক্রিকেট ক্লাবে শিক্ষিত।...সম্প্রতি এখানে 'পূর্ববঙ্গ ক্রিকেট ক্লাব' নামে একটি ক্লাব হইতেছে, আমরা স্পর্ধা করিয়া বলিতেছি পশ্চিম ও দক্ষিণবঙ্গ সমবেত হইয়া আগামী বৎসর ইহাদের সহিত প্রতিযোগিতা করুন, তবেই পূর্ববঙ্গ অপেক্ষা ক্রিকেট খেলায় নিজ হীনতা বুঝিতে পারিবেন।"

মধ্যবিত্তের, বিশেষ করে ছাত্ররা যাতে ক্রিকেট খেলার প্রতি মনোযোগ দেয় এ পরামর্শ দিয়ে একটি পত্রিকা লিখেছিল, "ছাত্ররা সারাদিন পড়াশোনা করে 'অকর্মণ্য' হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং যেন তারা খেলাধুলার প্রতি মনোযোগ দেয় বিশেষ করে ক্রিকেট ক্রীড়া উহার অন্যতর। কতিপয় বৎসর যাবৎ ঢাকায় ছাত্রদিগের মধ্যে এই ক্রীড়ার অনুষ্ঠান ও উৎকর্ষ লক্ষিত হইতেছে। ইহারা পুনঃ পুনঃ কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে উপস্থিত হইয়া এইরূপ বলবর্দ্ধক ও আমোদজনক অনুষ্ঠান করিতেছেন।"

তথ্য সূত্র

১. *Dacca News,* Dacca, 1858.
২. *ঢাকা প্রকাশ,* ঢাকা, ১৮৮৩, ১৮৯১।
৩. *Bengal Times,* Dacca, 1876.
৪. সত্যজিৎ রায়, *যখন ছোট ছিলাম,* কলকাতা, ১৯৮২।

নবাব আহ্সানউল্লাহর কামান

নবাব আহ্সানউল্লাহর ছিল একটি স্টিমলঞ্চ, নাম—'ঢাকা'। নদীপথে কোথাও যেতে হলে তিনি সেই লঞ্চটির ব্যবহার করতেন। একবার তাঁর শখ হলো লঞ্চের সামনে একটি কামান বসাবেন। ছোট কামান। কামানের আকার যা-ই হোক সরকারের অনুমিত ছাড়া তিনি তা কিনতে পারেন না। আহ্সানউল্লাহ্ আবেদন করলেন। বেশ কিছু দপ্তরে ফাইল ঘুরল, আমলারা ভেবেচিন্তে অনেক নোট দিলেন, রিপোর্ট অনুমোদনের জন্য পাঠালেন লে. গভর্নরের কাছে। গভর্নর তা নাকচ করে দিলেন। কিন্তু, আমলারা ব্যাপারটা পছন্দ করলেন না। কারণ, তারা জানেন, পূর্ববঙ্গে আহসানউল্লাহ অত্যন্ত সম্মানিত এবং প্রভাবশালী এবং ঐ অঞ্চলে আমলাদের কাজে ইচ্ছে করলে তিনি প্রচুর বাধা সৃষ্টি করতে পারেন। সুতরাং তাঁর সেন্টিমেন্টে আঘাত দেয়া যাবে না। আবার ফাইল চালু হলো। লে. গভর্নর নাকচ করে দিলেও গভর্নর জেনারেল ইন কাউন্সিল আহসানউল্লাহকে অনুমতি দিলেন কামান কেনার। চিঠিতে জানানো হলো সরকারের তোষাখানায় বেশ কিছু কামান পড়ে আছে। তা থেকে স্বল্পমূল্যে চাঁদির একটি কামান কিনতে পারেন তবে তা দৈর্ঘ্য হবে ২২ ইঞ্চি এবং ১ ৩/৮ বোরের। অনুমতি পাওয়ার পর আহ্সানউল্লাহ কামানটি কিনেছিলেন কিনা তা অবশ্য জানা যায়নি। সরকারি মহলে আহ্সানউল্লাহর প্রভাব সম্পর্কে আকেরটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে।

ঢাকার জন্মাষ্টমীর মিছিলে হাতি ব্যবহার করা হতো। এই হাতি ধার দিত খেদা বিভাগ। পিলখানায় ছিল হাতিদের আবাস। ১৮৯৬ সালে, জন্মাষ্টমীর মিছিলের সময় জানা গেল সামরিক বিভাগ নির্দেশ দিয়েছে হাতি না দেয়ার জন্য। তখন সময়ও বেশি নেই আর লে. গভর্নর চলে গেছেন শৈলাবাসে। আহসানউল্লাহ বাংলা সরকারকে জানালেন হাতি ধার দিতে হবে। সচিব গভর্নরকে জানালেন ধর্মীয় মিছিলে অনেকদিন থেকেই হাতি ধার দেয়া হয় পিলখানা থেকে। নবাব আহসানউল্লাহ্ তাকে জানিয়েছেন এই রীতি বন্ধ হলে তা গভীর ক্ষোভের কারণ হবে। তা ছাড়া নবাব নিজেই সরকারকে প্রয়োজনে হাতি ধার দেন। সুতরাং সামরিক বিভাগ কেন ধার দেয়া যাবে না বলে নির্দেশ দিল তা বোধগম্য নয়। কিন্তু তখন আর ব্যাখ্যা চাওয়ার সময় নেই। সরকারের মুখ্য সচিব সরাসরি সামরিক বিভাগকে জরুরি ভিত্তিতে চিঠি দিয়ে জানান, জন্মাষ্টমীর মিছিলে হাতি ধার দিতে হবে। এ নিয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পরে হবে। এবং হাতি ধার দেয়া হয়েছিল মিছিলের জন্য।

তথ্য সূত্র

Proceedings of the Government of India, Home Public. Dec. 1893 এবং ঐ, ১৮৯৬: জন্মাষ্টমীর মিছিলের জন্য মুখ্যসচিব জোরালো ভাষায় যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা ছিল নিম্নরূপ :

"Yes : I strongly recommend that permission be granted this year at all events. No one has lent his elephant to Government more liberally than Nawab Ahsanullah and he feels very strongly on the subject of lending the Kheddah elephants on occassion of religious festivals."

ঢাকায় মেয়ে বিক্রি

ইংরেজ সরকার যে দেশীয় সংবাদপত্রের সংবাদকে গুরুত্ব দিতো তা বোঝা যায় পুরনো সরকারি নথিপত্র দেখলে। সংবাদপত্র-সাময়িকীতে জনগুরুত্বপূর্ণ কোন অভিযোগ প্রকাশিত হলে তার কাটিং নথিভুক্ত করে তদন্ত শুরু হতো এবং এক সময় তা সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছতো। ঔপনিবেশিক আমলে যা সম্ভব ছিল, এখন স্বাধীন হয়ে তা আমরা কল্পনা করতে পারি না, মনে হয় রূপকথা। নিচে এমনি একটি উদাহরণ দিচ্ছি।

'অবলা বান্ধব' ছিল মহিলা বিষয়ক স্বল্প প্রচারিত একটি সাময়িকপত্র। এই সাময়িকীর একটি সংখ্যায় (১২.১.১৮৭০) একবার লেখা হলো, ঢাকায় দরিদ্র মেয়েদের কেনাবেচা চলছে। সরকারের চোখে এ সংবাদ পড়ামাত্র খবরটি যাচাইয়ের জন্য তদন্ত শুরু হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ও জানতে চায়। কারণ, লন্ডনে এ খবর জানাজানি হলে প্রতিক্রিয়া হতে পারে। সংসদে প্রশ্ন উঠতে পারে। এর সঙ্গে জবাবদিহিতার প্রশ্ন জড়িত।

ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট ডি. আর. লয়াল বিষয়টি তদন্ত করে কমিশনার সিমসনকে জানালেন যে, বিষয়টি ঠিক নয়। কমিশনার সিমসনও কিছু তথ্য যোগাড় করলেন এবং সেই তথ্য ও লয়ালের রিপোর্টের ভিত্তিতে তিনি সরকারকে তাঁর প্রতিবেদন পাঠালেন। তাঁর প্রতিবেদনের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বিষয় হলো—

১. পত্রিকায় দরিদ্র মেয়েদের যেভাবে বিক্রির কথা বলা হয়েছে আসলে বেচাকেনা সেভাবে হয় না। তবে, একথা ঠিক যে রক্ষিতা রাখা হয় প্রচুর। এভাবে মেয়েদের রাখা হয় বা পুরুষরা রাখে এবং এ কারণে কোন চুক্তি বা টাকা বিনিময় হয় তা নয়। যতদিন মেয়েটির তার পছন্দসই অর্থ পায় ততদিন সে থাকে, না পেলে চলে যায়।

২. আরেকটি বিষয় একেবারে নিয়মনীতিতে পরিণত হয়েছে। নিম্ন পর্যায়ের (অর্থাৎ বর্ণের) প্রতিটি হিন্দু মেয়ে এবং প্রায় সব মুসলমান মেয়ে যারা বিবাহিত নয়, বেশ অল্প বয়সেই তারা পতিতা হয়ে যায় বা ঐ ধরনের কিছু একটাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে। ঢাকায় এবং এর আশপাশে বেশ বড় একটি ধনী ও অলস শ্রেণী আছে। সুতরাং এ ধরনের মেয়েদের পৃষ্ঠপোষকতার অভাব হয় না। সিমসন আরো উল্লেখ করেছিলেন, প্রত্যেক পতিতা মেয়ে চায় একটি মেয়ে হোক যাকে সে লালনপালন করে তার পেশায় নিয়োগ করবে এবং বৃদ্ধ বয়সে যার ওপর সে নির্ভর করবে। যাদের নেই তারা মেয়ে সংগ্রহ করে, সেটা ক্রয়ও করতে পারে এবং এই রীতি খুব সাধারণ। এটা বন্ধ করার তেমন উপায় নেই।

আসলে দারিদ্র্য এমন ছিল যে, নিম্নবর্ণের বা পর্যায়ের পরিবারদের আর কোন উপায়ও ছিল না এবং ঢাকা হয়ে উঠেছিল পতিতাদের কেন্দ্র। এ সম্পর্কে সমসাময়িক একটি পত্রিকার ১৮৬৪ সালের রিপোর্ট উল্লেখ করা যেতে পারে—

"... ঢাকায় ক্রমে ক্রমে বেশ্যার সংখ্যা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে। বিগত ১০ বৎসর পূর্বে এখানে যে পরিমাণ বেশ্যা ছিল এক্ষণে তাহার চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে অত্যুক্তি হয় না। সদর রাস্তার উভয় পার্শ্বের উত্তম উত্তম যে সকল একতালা ও দোতালা দালান আছে, তাহার সমুদয়ই প্রায় বেশ্যাপূর্ণ হইয়াছে। বেশ্যাবাস সংশ্রব নাই, রাজপথের উভয় পার্শ্বে এরূপ উৎকৃষ্ট দালানই নাই বলিলে হয়। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য স্থলেও অসংখ্য বেশ্যাবাস লক্ষিত হয়। পূর্বে যে সকল স্থলে বেশ্যার নামগন্ধও ছিল না, এক্ষণে তাহার কোন কোন স্থান কলিকাতার মেছো বাজারের প্রতিযোগী হইয়া উঠিয়াছে।..."

তথ্যসূত্র

১. *Proceedings of the Government of India,* Home Public, 1870
২. *ঢাকা প্রকাশ,* ১৮৬৪।

ফিনিক্স পার্ক কোথায় গেল?

কোথায় গেল ঢাকার ফিনিক্স পার্ক? কয়েকজন ইংরেজ সিভিলিয়ানের আত্মজীবনী পড়তে গিয়ে ফিনিক্সি পার্ক শব্দটির মুখোমুখি হয়েছিলাম। এটি কি সবুজ কোন পার্কের নাম? সে পার্ক ছিল কোথায়? ঢাকার পুরনো মানচিত্রগুলোতে কিন্তু ফিনিক্স পার্কের কোন উল্লেখ নেই।

সম্প্রতি, নবাব আহসানউল্লাহর জমিজমা সংক্রান্ত একটি দলিল পড়তে গিয়ে 'ফিনিক্স পার্ক' নামটি চোখে পড়ল। এ দলিল থেকে ফিনিক্স পার্কের সীমানার একটি হদিস পেলাম। তা ছাড়া, ঐ দলিল থেকে আহসানউল্লাহর জমিসংক্রান্ত কিছু খবরও জানা যায়।

১৮৮৫ সালে রাজস্ব বিভাগের সচিব ঢাকার কমিশনারকে একটি চিঠি লেখেন। তিনি জানান, নবাবের জমি ক্রয়-বিক্রয় নিয়ে যে প্রস্তাব সরকারকে দেয়া হয়েছিল সে ব্যাপারে সরকার একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে। সিদ্ধান্তটা হলো—ক্যান্টনমেন্টের কিছু প্লট নবাবকে দেয়া। এ প্লট হচ্ছে, প্লট-এ ও প্লট-বি যা রেলওয়ে বিভাগ অধিগ্রহণ করেছিল ১৮,৮০৫ টাকয়। প্লট-ডি এবং ই-এর জন্য নবাব ইতোমধ্যে সরকারকে ক্ষতিপূরণ দিয়েছেন। নবাব এখন বিসিডিই—এই চারটি প্লটই চান। এ চিঠির সঙ্গে প্লটের যে ম্যাপটি ছিল তা হারিয়ে গেছে।

সরকার প্রস্তাব করছেন—নবাব থেকে ফিনিক্স পার্কটি নিয়ে বি এবং সি দেয়া হোক ১৮,৮০৫ টাকয়। ডি এবং ই-ও দেয়া হবে নবাবকে। ফিনিক্স পার্কের দাম ধরা হয়েছে ১১,২৪২ টাকা এবং মনে হয় প্লট এ-ই ছিল 'ফিনিক্স পার্ক' অর্থাৎ ঐ এক খণ্ড জমির বদলে নবাবকে দেয়া হবে চার খণ্ড জমি।

বিষয়টি ছিল এরকম। ফিনিক্স পার্ক নামক জমিটি নবাব কিনেছিলেন ১১,২৪২ টাকায়। সরকার ঐ জমিটি অধিগ্রহণ করতে চাইছিলেন রেলওয়ে চালু করার জন্য। এর বদলে সরকার পুরনো ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় নব্যবকে চারটি প্লট দিতে চাচ্ছিলেন, যার পরিমাণ ২৪৫ বিঘা ৯ কাঠা। এখানে দুটি ইমারতও ছিল। ইমারত দুটি তৈরি করতে সরকারের খরচ হয়েছিল ১৮,৮০৫ টাকা। সরকার আহসানউল্লাহ থেকে শুধু ১৮,৮০৫ টাকাই চেয়েছিলেন। আহসানউল্লাহ ড্রাফটের মাধ্যমে ঐ টাকা শোধ করে সরকারকে জানিয়েছিলেন, রেলওয়ে বিভাগকে ইতোমধ্যে ফিনিক্স পার্ক তিনি হস্তান্তর করে দিয়েছেন।

নবাব যে ২৪৫ বিঘার চারটি প্লট পেয়েছিলেন তার সীমা ছিল এরকম—উত্তরে এক

খণ্ড পতিত জমি ও দিলখুশা বাগান। দক্ষিণে ঠাটারিবাজার এবং গোপীমোহন পোদ্দার ও মোহন বাবুর জমি। পূর্বে মোহন বাবুর জমি। পশ্চিমে পুরনো ক্যান্টনমেন্টের জমি। এখন দেখা যাক ওল্ড লাইনস বা পুরনো ক্যান্টনমেন্ট বা পল্টন বলতে কোন অঞ্চলটি বোঝানো হচ্ছে। পল্টন নামের উৎপত্তি সেনানিবাস থেকে। পুরানা পল্টন, নয়াপল্টন, তোপখানা তো বটেই, মনে হয় ফুলবাড়ীয়া রেললাইন অব্দি এক সময় ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনানিবাস। ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট চার্লস ড'স তেজগাঁও বেগুনবাড়ি থেকে উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে পল্টন স্থানান্তর করেছিলেন সেনানিবাস। কিন্তু অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য সিপাহি অফিসাররা সবাই রোগে আক্রান্ত হতে থাকেন। অফিসাররা বসবাস করতে অস্বীকৃতি জানান ঢাকা সেনানিবাসে। ঢাকা সেনানিবাসে বদলি হওয়াকে মনে করা হতো শাস্তি হিসাবে।

কর্নেল ডেভিডসন ১৮৪০ সালে এসেছিলেন ঢাকায়। তাঁর বর্ণনায় আছে পল্টন সেনানিবাসের কথায়। লিখেছিলেন তিনি, পল্টন সেনানিবাস খুব সবুজ এবং সুন্দর কিন্তু রেজিমেন্টের সব অফিসারের মধ্যে একজন বা দু'জন থাকেন সেনানিবাসের ভেতরে। বাকিরা জ্বরে ভুগে বা জ্বরের ভয়ে থাকেন শহরে। এ কারণে অফিসারদের অনুমতি দেওয়া হয় শহরে থাকার। সেনানিবাসের ঠিক পাশে ছিল বড় এক জলাভূমি যা মারাত্মক ম্যালেরিয়ার উৎস। সেনানিবাসের ভেতরে ছিল কয়েকটি পুকুর যেগুলির বেলায়ও একই বিশেষণ প্রযোজ্য। বর্ষায় সেনানিবাসের দক্ষিণে জমে ওঠে পানি। শীতের সময় যা শুকোয় ধীরে ধীরে। মনে হয়, উনিশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে সেনানিবাস সরিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল এবং উনিশ শতকের মধ্যভাগের পরও হয়তো সেনানিবাসের কিছু অংশ এ এলাকায় ছিল। পুরানা পল্টন, তোপখানা, নয়া পল্টন নাম এর প্রমাণ। তোপখানায় ছিল সেনাবাহিনীর গোলন্দাজ বাহিনী।

১৮৫১ সালে ঢাকার মানচিত্রে এ এলাকাটিকে উল্লেখ করা হয়েছে পল্টনের লাইন হিসাবে।

পুরানা পল্টন থেকে ক্যান্টনমেন্ট অপসারিত হলে এলাকাটি পরিচর্যার ভার দেওয়া হয়েছিল পৌরসভাকে। তারা এই বিস্তীর্ণ ভূমির খানিকটা অংশে গড়েন বাগান, যা পরিচিত ছিল কোম্পানি বাগিচা নামে। বাকি অংশ ছিল খালি মাঠ যা ব্যবহার করত ঢাকা কলেজের ছেলেরা খেলার মাঠে হিসাবে। ড. শরীফউদ্দিন এখানে যে 'কোম্পানির বাগিচা' ছিল বলে উল্লেখ করেছেন তাতে একটু খটকা লাগছে। কোম্পানির বাগান এর অনেক আগেই ছিল তেজগাঁয়। নাকি কোম্পানি নতুন আরেকটি বাগান গড়েছিল যা এখন পরিচিত সেগুন বাগিচা নামে? শেষোক্ত ধারণাটিই বোধহয় ঠিক।

সুতরাং ১৮৮৫ সালের দলিল ধরে এবার ঢাকার নবাবদের জমির পরিমাণটা দেখা যাক। শাহবাগ আগে থেকেই তাদের অধিকারে ছিল। এর সীমানা শুরু হয়েছিল খুব সম্ভব বর্তমান ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের পর থেকে, যা বিস্তৃত পরীবাগ পর্যন্ত। দিলখুশার বাগানও ছিল তাদের। ১৮৮৫ সালের পর দখলে আসে পুরনো ক্যান্টনমেন্ট। খুব সম্ভব ক্যান্টনমেন্টের প্লটগুলির সীমানা শুরু হয়েছিল বঙ্গভনের পর থেকে; স্টেডিয়াম এলাকা,

পল্টনের একাংশ হয়ে শেষ হয়েছিল রেসকোর্সে। খুব সম্ভবত রেসকোর্সে কিছু জমিও ছিল তাদের। ফিনিক্স পার্কের বদলে তারা এগুলি পেয়েছিলেন।

এবার তাহলে দেখা যাক ফিনিক্স পার্ক কোথায়? আমার প্রথমে ধারণা ছিল এটি একটি পার্ক। অনেক খোঁজাখুঁজির পর কর্নেল ডেভিডসনের বর্ণনায়ই প্রথম নির্দিষ্টভাবে ফিনিক্স পার্ককে খুঁজে পেলাম। বিস্তীর্ণ সীমানা নিয়ে একটি বসতবাড়ির নাম ছিল ফিনিক্স পার্ক। ডেভিডসনের বর্ণনা—

একদিন বিকেলে বেড়ানোর সময় কর্নেল ডেভিডসন দেখলেন 'ফিনিক্স পার্ক'। ঢাকার এক সময়ের জজ মাস্টারের বসতবাড়ির নাম 'ফিনিক্স পার্ক'। মি. গ্লাস নামে এক নীলকার তাঁকে বলেছিলেন, মাস্টার ঘোড়া প্রজনন করতেন এবং তাঁর খামারের অনেক ঘোড়া এখনও বেঁচে আছে। মি. গ্লাসের কাছেও আছে মাস্টার খামারের একটি ঘোড়া, যার বয়স পঁচিশ কিন্তু এখনও কর্মক্ষম। বর্ণনাটি ১৮৪০ সালের।

এবার বলি মাস্টারের কথা। তাঁর পুরো নাম গিলবার্ট কভেনট্রি মাস্টার। রাইটার হিসেবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে যোগ দিয়েছিলেন তিনি ১৭৫৭ সালে। ঢাকার জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন ১৮১০ থেকে ১৮১৮ এবং কালেক্টর ১৮২১ থেকে ১৮২৪ পর্যন্ত। চেরাপুঞ্জিতে পরলোকগমন করেন তিনি ১৮৩২ সালে। বিশপ হেবারের রোজনামচায় মাস্টারের উল্লেখ আছে। ১৮২৪ সালে হেবার যখন ঢাকায় এসেছিলেন মাস্টার ছিলেন তখন ঢাকার কালেক্টর। আর মি. গ্লাস থাকতেন বুড়িগঙ্গার তীরে একটি বাড়িতে।

ডেভিডসন লিখেছেন, ফিনিক্স পার্ক ও তার চমৎকার ফটক পেরিয়ে পৌঁছলেন তিনি স্টেশনের সদর রাস্তায়। তাঁর মনে হয়েছে, ভাল অবস্থায় এটি নিশ্চয় ছিল সুন্দর এক জায়গা। কিছুদূর পর পর সিমেন্টের পিলার দিয়ে পুরো এলাকাটিতে বেষ্টনী দেওয়া হয়েছিল যা এখন ধ্বংসের পথে। ডেভিডসনকে একজন জানিয়েছিলেন এতে খরচ পড়েছিল এক লাখ টাকারও বেশি। এই বেষ্টনীর ভেতর আছে চমৎকার এক রেসকোর্স। এর কাঠের রেলিংয়ের কিছু অংশ এবং স্ট্যান্ডটি এখনও (১৮৪০) টিকে আছে। কারণ, বোধহয় কাঠ এখানে মহার্ঘ নয় এবং নেই উইপোকার উপদ্রব। আহসানউল্লাহর জমির দলিল ও ডেভিডসনের বর্ণনা দেখে ফিনিক্স পার্ক সম্পর্কে এখন খানিকটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে। পুরনো ফুলবাড়িয়া রেলস্টেশন থেকে শুরু করে ওসমানী উদ্যান সচিবালয় হয়ে রেসকোর্সের একটি অংশ ছিল বোধহয় ফিনিক্স পার্কের অন্তর্গত। ডেভিডসন লিখেছিলেন, স্ট্যান্ডের উত্তর পশ্চিম এক সিভিলিয়ান তৈরি করেছিলেন একটি কৃত্রিম পাহাড় ও নিজ বাড়ি। এই কৃত্রিম টিলা এখনও আছে। আর এটি তৈরি করেছিলেন চার্লস ড'স। এই ড'সই রমনার জঙ্গল পরিষ্কার করে স্থাপন করেছিলেন রেসকোর্স।

খুব সম্ভব মাস্টার যখন ঢাকার কালেক্টর (১৮২১) ছিলেন তখন গড়ে তুলেছিলেন ফিনিক্স পার্ক। অর্থাৎ তাঁর বসতবাড়ি ও ঘোড়ার খামার এবং এ কারণেই তিনি করেছিলেন একটি রেসকোর্স। মাস্টার ঢাকা ছেড়ে চলে গেলে এটি পরিত্যক্ত অবস্থায়ই ছিল। ডেভিডসন এসে মাস্টারের তৈরি খামারের পরিত্যক্ত ইমারত, কাঠের রেলিং ইত্যাদি দেখেছিলেন। হয়তো মাস্টারের রেসকোর্সের একটি অংশকে ভিত্তি করেই ড'স

গড়ে তুলেছিলেন রেসকোর্স। ঢাকার নবাবরা কোন এক সময় হয়তো কিনে নিয়েছিলেন ফিনিক্স পার্ক।

ঢাকার এক সময়ের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট আর্থার ক্লে'র বর্ণনায়ও ফিনিক্স পার্কের কথা এসেছে যদিও 'ফিনিক্স পার্ক' শব্দটি তিনি ব্যবহার করেননি। তাঁর বর্ণনা ১৮৬৬ সালের। তখনও ফিনিক্স পার্কের দু'একটি দেয়াল টিকে ছিল বলে মনে হয়। লিখেছেন ক্লে—

"শুরু হলো নতুন মাঠ খোঁজা। ১লা মে ক্রিকেট ফিল্ডের কাছে রেসকোর্স রোডের পাশে একটি মাঠের খোঁজ পাওয়া গেল। লোকেরা এখানে বেড়াতে আসত বিকেলে। র‍্যাকেট-কোর্ট তখনও তৈরি হয়নি। তাই পোলো খেলা চালু না হলে মনমরা হয়ে থাকতে হতো। পুরানো মাঠটি ছিল। খামার বাড়ির মতো বিরাট বড়। পেছনে দেয়াল না থাকায় সামনে খেলা হবে, পেছনে দূরে থেকে খেলা দেখতে হতো। তাই ঠিক হলো পাশের দেয়ালগুলো ভেঙ্গে ফেলে এটাকে একেবারে নতুন করে করা হবে। পেছনের দেয়ালের সঙ্গে একটি দোতলা ভবন থাকবে—যা ক্লাব হিসাবে ব্যবহার করা যাবে আর বিরাট বারান্দাটি হবে গ্যালারি। এই উন্নয়ন কাজের জন্য টাকা তোলা হলো শেয়ার বিক্রি করে।"

এরপর ফুলবাড়িয়া রেলস্টেশন তৈরি হলে ফিনিক্স পার্কের অস্তিত্ব পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়।

তথ্য সূত্র

১. ঢাকার কালেক্টর এফ. ওয়্যার ও নবাব আহসানউল্লাহ এবং বোর্ড অব রেভেনিউর সচিব এই আই এস স্টনের চিঠিপত্র, ১৮৮১, ১৮৮৫, ১৮৮৬ সালের ৯ জানুয়ারি স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্র—"Indenture Secretary, State for India in Council (Vendor) and Nawab Ahson Ullah Khan Bhadoor Phoneix Park taken up by the vendor under Act X of 1870 for the Dacca and Mymensingh State Railways at a cost of 11, 242 Taka."

২ A. L. Clay. *Leaves from a Diary in Eastern Bengal*, Lodnon, 1898.

কর্নেল ডেভিডসন যখন ঢাকায়

বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ার্সের লে. কর্নেল ছিলেন সি জে সি ডেভিডসন। ১৭৯৩ সালে তাঁর জন্ম কলকাতায়। 'ইউরোপ শপ' নামে তাঁর বাবার একটি দোকান ছিল কলকাতায়। আদিসকম্বে ১৮১০-১১ পর্যন্ত তিনি প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন প্রকৌশলী হিসেবে এবং সেনাবাহিনীতে ইঞ্জিনিয়ার ক্যাডেটশিপ লাভ করেছিলেন ১৮১২ সালে। ডেভিডসন চাকরি থেকে অবসর নিয়েছিলেন ১৮৪১ সালে এবং ফিরে গিয়েছিলেন লন্ডন। সেখানেই তিনি পরলোকগমন করেছিলেন ১৮৫২ সালে।

সংক্ষেপে এই হলো কর্নেল ডেভিডসনের জীবনী। কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে এরকম হাজার হাজার কর্মচারী ছিলেন। সুতরাং ডেভিডসনকে বেছে নেয়ার কারণ কি? কারণ একটাই, ১৮৪০ সালে ডেভিডসন এসেছিলেন ঢাকায়। সে সময়ের ঢাকার একটি বিবরণ তিনি রেখে গেছেন তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে। সে বিবরণের কারণেই আমাদের কাছে ডেভিডসন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অন্যান্য কর্মচারী থেকে আলাদা।

অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন, ডেভিডসন এমন কি লিখে গেছেন যা জেমস টেইলরের বিবরণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ? জেমস টেইলরের প্রসঙ্গ আসছে এ কারণে যে ১৮৪০ সালেই প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ—'স্কেচ অব দিট পোগ্রাফি অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিকস অব ঢাকা'। এ বইটি এখনও ঢাকার ওপর প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত যদিও বইটি ঢাকা জেলার ওপর, শহরের ওপর নয়। তবে ঐ সময়ে শহরের কিছু বিবরণও লিপিবদ্ধ করে গেছেন টেইলর। তবে, ডেভিডসন তাঁর বিবরণে শহর সম্পর্কে এমন কিছু তথ্য রেখে গেছেন যা টেইলর বা সমসাময়িক অন্য কোন বিবরণে নেই। এ কারণেই ডেভিডসনের বিবরণটি কৌতূহলোদ্দীপক এবং বাংলাভাষী, ঢাকা চর্চায় আগ্রহী পাঠকদের জন্যে প্রয়োজনীয়।

খুব সম্ভব বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ার্সের ষষ্ঠ এলাহাবাদ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে ১৮৩৯ সালে অবসর গ্রহণ করেছিলেন ডেভিডসন এবং দেশে ফেরার আগে, সম্পূর্ণ লটবহর নিয়ে তিনি ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। এটি অনুমান, কারণ ডেভিডসন সম্পর্কে আর কোন তথ্য পাইনি বা তাঁর রচিত মূল বইটি দেখাও সম্ভব হয়নি। জানা যায়, ৫ ডিসেম্বর ১৮৩৯ সালে তিনি বেরিয়েছিলেন ভ্রমণে। এ জন্য এক হাজার মণ ওজনের দুটো নৌকো ভাড়া করেছিলেন। একটি নৌকোয় ছিল তাঁর কেবিন বা থাকার জায়গা। এ নৌকায় ছিল আবার তার আসবাবপত্র ভরা ৫৬টি বড় বড় বাক্স। অন্যটিতে ছিল তাঁর তিনটি ঘোড়া।

এলাহাবাদের যমুনা থেকে নোঙ্গর তুলেছিলেন ডেভিডসন ১৮৩৯ সালেব পাঁচ-ই

ডিসেম্বর। দিনাজপুর পৌছলেন ১৯ ডিসেম্বর, ২৭ ডিসেম্বর মুঙ্গের। রাজশাহীর রামপুর-বোয়ালিয়ায় পৌছলেন ১৮৪০ সালের ৩ জানুয়ারি। ৬ জানুয়ারি সূর্যাস্তে তাঁর নৌকা পড়লো পদ্মায়। চোখে পড়ছিল তখন সব নীলকুঠি। ৯ তারিখে দেখেছিলেন তিনি নৌকোর লম্বা বহর, চাটগাঁ থেকে সেপাই নিয়ে যাচ্ছে বেনারস। ১১ জানুয়ারি ডেভিডসন পৌছেছিলেন মানিকগঞ্জের এক জনবহুল গ্রামে। এখানে পাশের গ্রামের নীলকুঠি থেকে পেয়েছিলেন খবরের কাগজ। ১৩ জানুয়ারি ১৯৪০ সালে পৌছেছিলেন তিনি ঢাকায়।

ভারতের একাংশ ভ্রমণের পর ডেভিডসন চলে গিয়েছিলেন লন্ডন। সেখানে থেকে ১৮৪৩ সালে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর ভ্রমণ কাহিনী 'ডায়েরি অব ট্রাভেলস অ্যান্ড এডভেঞ্চারস ইন আপার ইন্ডিয়া।'

কলকাতা থেকে প্রকাশিত ইতিহাস বিষয়ক সাময়িকী 'বেঙ্গল পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট'-এ সেই ভ্রমণ বিবরণের ঢাকা অংশটুকু 'ঢাকা ইন এইটিন ফোর্টি' শিরোনামে উদ্ধৃত করা হয়েছিলো। কর্নেল ডেভিডসনের সেই বিবরণ অবলম্বনে রচিত হয়েছে বর্তমান নিবন্ধটি।

এ প্রসঙ্গে জেমস টেইলরের কথা উল্লেখ্য। বাকল্যান্ড ভারতে ইংরেজ সিভিলিয়ান ও ভারতীয়দের যে জীবনী অভিধান রচনা করেছেন তাতে টেইলরের নাম নেই। তাতে বোঝা যায়, কোম্পানির চাকুরেদের মধ্যে তার তেমন নাম-ডাক ছিল না। কিন্তু পূর্ববঙ্গ বা ঢাকা নিয়ে গবেষণা করতে গেলে টেইলরের নাম চলে আসবেই। অথচ তাঁর আমলের ডাকসাইটে চাকুরেদের নাম আজ কেউ জানে না, জানার প্রয়োজনও নেই। টেইলরকে আমরা স্মরণ করি তাঁর 'স্কেচ অব দি টপোগ্রাফি অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিকস অব ঢাকা'র জন্য যা আগেই উল্লেখ করেছি।

গত শতকের ত্রিশের দশকে সিভিল সার্জন হিসেবে ঢাকায় এসেছিলেন টেইলর। শহরটিকে তিনি জানার চেষ্টা করেছেন। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা।

ত্রিশের দশকের শেষের দিকে ফোর্ট উইলিয়ামের মেডিকেলে বোর্ড বিভিন্ন জেলার মেডিকেল অফিসারদের নিজ নিজ জেলা সম্পর্কিত বিবরণ ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ করে পাঠানোর নির্দেশ দেয়। সে অনুযায়ী ঢাকার ওপর তথ্য সংগ্রহ করে ১৮৩৯ সালে টেইলর প্রেরণ করেন পাণ্ডুলিপি, পুস্তকাকারে যা প্রকাশিত হয় পরের বছর। ঢাকা জেলা সংক্রান্ত প্রামাণ্য পুস্তক হিসেবে এ গ্রন্থটি সবেচেয়ে বেশি ব্যবহৃত।

টেইলরের মূল বইটি এখন অতি দুস্প্রাপ্য। কোন এক গ্রন্থাগারে বইটি একবার দেখেছিলাম কিন্তু ব্যবহারের সুযোগ হয়নি। ১৯৭৮ সালে বাংলা একাডেমী বইটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করে। অনুবাদ করেছেন মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান। কিন্তু অনুবাদটি আড়ষ্ট, অনেক জায়গায় অনুবাদ সঠিক হয়নি, মূল শব্দের অর্থ বদলে গেছে। তা সত্ত্বেও বইটি ব্যবহার করতে হয়েছে মূল বইয়ের অভাবে।

ডেভিডসনের বিবরণটি হুবহু অনুবাদ করিনি। ভাবানুবাদ করা হয়েছে। ঐ বিবরণের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে টেইলরের বিবরণ। প্রয়োজনে সংযোজন করেছি

সমসাময়িক অন্য তথ্য। এ বিবরণের উদ্দেশ্য সমসাময়িক ঢাকার একটি চিত্র তুলে ধরা।

১

১৮৪০ সালের ১৩ জানুয়ারি, দূর থেকে আবছাভাবে ডেভিডসনের চোখে পড়লো ঢাকা। চারদিকে ঘন কুয়াশা। এর মধ্যে যে জিনিসটি নজরে এলো তা হলো শহরের বিপরীতে, নদীর পশ্চিম দিকে 'উঁচু ও স্থায়ী' এক দোতলা বাড়ি। ঢাকার নবাব আগে শিকার কুঠি হিসেবে এটিকে ব্যবহার করতেন। শহরটি বুড়িগঙ্গার পূর্ব তীরে, লম্বায় হবে প্রায় দু'মাইল। তিন-চাব মাইল দূর থেকে বা টেলিস্কোপ দিয়ে দেখলেও ভারি সুন্দর দেখায় শহরটিকে। বাড়িগুলি থামওয়ালা, সাদা, জ্বলজ্বল করছে। এগুলির জাঁকালো ভাব দেখে বিস্মিত হবেন যে কোন পর্যটক। পরে অবশ্য কাছে থেকে এর ক্ষয় দেখে হবেন হতাশ। শহরের সীমারেখায় নৌকো ঢোকার পর ডেভিডসনের নজরে এলো অনেকগুলি ধ্বংস-প্রাপ্ত অট্টালিকা যেগুলির কিছু কিছু অংশ পড়ে গেছে নদীতে। নদীকে বেঁধে রাখার সব ধরনের প্রচেষ্টাই ব্যর্থ।

টেইলরের বর্ণনাও প্রায় একই রকম। লিখেছেন তিনি, বুড়িগঙ্গা ও ধলেশ্বরী যেখানে মিলেছে, তার প্রায় মাইল আটেক ওপরে, বুড়িগঙ্গার উত্তরে অবস্থিত ঢাকা। নদীটি সেখানে গভীর ও উপযোগী বড় বড় নৌকো চলাচলের। বর্ষাকালে নদী ভরে যায় এবং বড় বড় মিনার ও অট্টালিকা শোভিত ঢাকা নগরীকে মনে হয় ভেনিসের মতো। ঢাকার পূর্বে শীতলক্ষ্যা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত নিম্নভূমি মুসলমান গোরস্থান, পরিত্যক্ত উদ্যান, মন্দির, মসজিদ ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়িঘরে সমাকীর্ণ জঙ্গলাবৃত এক ভূ-ভাগ। যে অংশটি নিয়ে ঢাকা শহর গঠিত তা কেবল সীমাবদ্ধ নদীতীরেই এবং তীর বরাবর শহরটি দৈর্ঘ্যে চার ও প্রস্থে $১\frac{১}{৪}$ মাইল।[১]

শহরের কাছাকাছি, ডেভিডসনের নৌকো পেরিয়ে গেলো লম্বা একটি ডিঙ্গি। সিলেটের চমৎকার কমলা লেবুতে ভর্তি। তিনি জানিয়েছেন, ঢাকায় কমলা পাওয়া যায় প্রচুর এবং তা খুব শস্তাও। এক পয়সায় চারটি বা দুই শিলিংয়ে ২৫৬টি। কিন্তু জানুয়ারি মাসটি শস্তার সময় নয়। বোম্বাই থাকার সময় ডেভিডসন আওরঙ্গবাদ, জোহানা এবং আগ্রায় কমলা বাগানে গিয়ে কমলা খেয়েছেন কিন্তু তার তুলনায় সিলেটের বনের বুনো কমলা স্বাদে-গন্ধে অতুলনীয়।

ঘরবাড়ি নির্মাণের জন্য প্রচুর কাঠ ফেলে রাখা হয়েছে নদী তীরে। বাজারে সব ধরনের ভারতীয় কাঠ মজুদ। ডেভিডসন লিখেছেন, পরে শহর ঘুরে তাঁর মনে হয়েছে, শহরে কাঠের যা মজুদ তা আরো দশ বছরের চাহিদা মেটাতে পারবে। ঢাকা থেকে কলকাতায় কাঠ যায় কিনা সে সম্পর্কে ডেভিডসন কিছু জানাতে পারেননি তবে তাঁর মনে হয়েছে, ঢাকা শহর ও আশপাশে নতুন কোন বাড়ি নির্মিত হচ্ছে না। নৌকো হয়তো কিছু তৈরি হয়।

ডেভিডসন যে নৌকা নির্মাণের কথা বলেছেন তার বিবরণ আমরা পাই পর্যটক তাভেরনিয়ারের লেখায়। ডেভিডসন ঢাকায় পা দেওয়ার প্রায় দু'শো বছর আগে

এসেছিলেন তিনি ঢাকায়। পাগলা পুলের কাছ দেখেছিলন নৌকো নির্মাতাদের বসতি. তাঁরা ছিলেন ছুতোর মিস্ত্রি। বড় বড় নৌকো বা সব ধরনের জলযান নির্মাণ কবতেন তারা।[১] অষ্টাদশ শতকেও. অর্থাৎ যতদিন পর্যন্ত বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল ঢাকা ততদিন পর্যন্ত নৌকো নির্মাণ এক ধরনের 'শিল্পই' ছিল বলা চলে। ডেভিডসন যখন ঢাকায় এলেন. মনে হচ্ছে তখন এ শিল্পের শেষ অবস্থা। কারণ. তখন ঢাকা এক বিপর্যস্ত নগরী।

আর ডেভিডসন বর্ণিত কাঠের ডিপোগুলি কোথায় ছিল তার খানিকটা আঁচ পাওয়া যায় হৃদয়নাথ মজুমদার নামে এক উকিলের স্মৃতিচারণায়। লিখেছেন তিনি. ফরাশগঞ্জ অনেকদিন থেকে শাল ও সেগুন কাঠের ডিপো হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। রেবতী মোহন. দেবেন্দ্র চন্দ্র দাস এবং অন্যান্য ব্যবসায়ীদের আলাদা গুদাম ছিল ফরাশগঞ্জে। নওয়াবগঞ্জের চরেও ছিল এ ধরনের কাঠের ডিপো।[৩] খুব সম্ভব এ বর্ণনা উনিশ শতকের শেষার্ধের। এখনও ফরাশগঞ্জে আছে কাঠের কয়েকটি ডিপো।

দু'জন স্টাফ অফিসার তাদের বাসাটা ছেড়ে দিয়েছিলেন ডেভিডসনের ব্যবহারেব জন্যে। তাদের একজন গেছেন মনিপুর থেকে সিলেট পর্যন্ত অরণ্য জরিপ করতে। আরেক জন গেছেন অনারেবল কোম্পানির জন্যে চাঁটগার আশপাশে হাতি ধরতে। ডেভিডসনের এই বাড়ির পিছনে একটি বিশাল গথিক ফটক যা আগে ছিল চমৎকার এক সরাইখানার প্রবেশপথ। মূল ইমারতটি তখন ধ্বংসের পথে। তবে. সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলে পুরো শহর এবং শহরতলি খানিকটা অংশ চমৎকার চোখে পড়ে। ইমারতটির উপরে ও নিচে অনেক ঘর। আশপাশে মুসলমানদের তৈরি সৌধসমূহের ধ্বংসাবশেষ যা চালর্স ডয়েলির চমৎকার ড্রইং-এ ধরা আছে। ডেভিডসনের মনে হয়েছে, ঢাকা অনেকটা লখনৌর মতো। লখনৌর রেসিডেন্সির ছাদ থেকে পুরনো লখনৌকে যেমন দেখায়. ঐ ইমারতের ছাদ থেকেও ঢাকা-কে তেমন দেখায়।

যে ইমারতের কথা উল্লেখ করেছেন ডেভিডসন তা ছিল শাহসুজার আমলে ১৬৪৪ সালে নির্মিত বড় কাটরা। ঢাকার এক সময়ের ম্যাজিস্ট্রেট ডয়েলি যিনি ছিলেন একজন খ্যাতনামা চিত্রকরও। লিখেছিলেন ১৮২৯ সালে, ঢাকা শহরের কেন্দ্রে অবস্থিত বড় কাটরা জাঁকালো, সুন্দর এবং বিশাল এক অট্টালিকা।[৪] রেনেলের মানচিত্র থেকে কাটরার মূল পরিকল্পনা সম্পর্কে ধারণা করা যায়। মাঝখানে প্রাঙ্গণ, চারদিকে তা ঘেরা ছিল ঘর দিয়ে। মূল প্রবেশদ্বার ছিল উত্তর ও দক্ষিণে। দক্ষিণের অংশটি নদীর দিকে, দুশো তেইশ ফুট লম্বা। এ অংশের মাঝামাঝি ছিল তিনতলা উঁচু ফটক। তার পাশে দোতলা, ঘরের সারি। একেবারে দু'প্রান্তে আটকোণা দুটি বুরুজ। বড় কাটরার একটি শিলালিপিতে লেখা ছিল স্বর্গের সৌন্দর্য ম্লান এর কাছে। স্বর্গের সুখের স্বাদ পাওয়া যায় এখানেই।[৫]

মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ার পরই খুব সম্ভব বড় কাটরা অবহেলার শিকার হতে থাকে। তবে ১৭৬৫ সালে নিমতলি কুঠি নির্মাণের পূর্ব পর্যন্ত ঢাকার নায়েব নাজিমরা বসবাস করতেন এখানে। তারপর থেকেই বোধহয় অযত্নে পড়ে থাকতো বড় কাটরা। ১৮২৭ সালে লিখেছিলেন ডয়েলি, বড় কাটরা তখনও ছিল সুন্দর। বর্ষাকালে এর রূপ খুলে যেতো। এ সময় বড় কাটরায় বসবাস করতেন গরিবরা।[৬] ডেভিডসন যখন

ঢাকায় তখন মনে হয়, বড় কাটরা অটুট থাকলেও এর উত্তর দিকের ফটক গিয়েছিল প্রায় ধ্বংস হয়ে।

ছাদ থেকে ঢাকা শহর দেখার যে অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন ডেভিডসন তা অতিরঞ্জিত নয়। বছর দশেক আগে একদিন পড়ন্ত বিকেলে গিয়েছিলাম বড় কাটরায়। কাটরার ছাদে উঠে দেখলাম, খানিক দূরে বুড়িগঙ্গা এঁকেবেঁকে চলে গেছে জাফরাবাদের দিকে, পড়ন্ত সূর্যের আলো তার বুকে, আর চারদিকে ছড়িয়ে শহর। সবচয়ে বড় কথা, দৃষ্টি মেলে দেওয়া যায় বহুদূর। কয়েকদিন আগে, আবার গিয়েছিলাম সেখানে। প্রবেশপথ সংকুচিত হয়ে গেছে, কাটরার ঠিক সামনে একাংশে উঠছে একটি মার্কেট, চারদিকে জঞ্জাল। বড় কাটরা যখন নির্মিত হয়েছিল বুড়িগঙ্গা তখন বয়ে যেতো এর দক্ষিণ ফটক ছুঁয়ে। সে পরিবেশ মনে রাখলে দেখা যাবে, বড় কাটরা ছিল ঢাকা শহরের অন্যতম মনোরম অট্টালিকা।

বড় কাটরার পাশের বাড়িটি যেটিতে ডেভিডসন উঠেছিলেন, সেটি খুব সম্ভব নির্ধারিত ছিল সামরিক অফিসারদের জন্যে। স্থানীয় লোকদের কাছ থেকে জানা গেছে, এটি ছিল জনৈক আলেকজান্ডারের। ১৯৪৭ সালের দাঙ্গার সময় এ বাড়িতে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল ইসলামিয়া হাই স্কুল। সম্প্রতি সে বাড়ি ভেঙ্গে নির্মাণ করা হয়েছে মার্কেট।

ডেভিডসন তারপর লিখেছেন, চকবাজার সম্পর্কে-- কাছেই চক, খুব সম্ভব দুশোগজের একটি চত্বর, নীচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা। চারপাশে একটি প্রশস্ত রাস্তা। চত্বরে ঢোকার জন্যে আছে অসংখ্য প্রবেশপথ। মাঝখানে একটি ফ্ল্যাগস্টাফ, তার পাশে একটি উঁচু বাধানো বেদীতে রাখা আছে একটি কামান। ডেভিডসনকে অনেকে জানিয়েছিলেন, নদীর পাশ থেকে কামানটিকে সরাতে অনেকে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন, পরে ম্যাজিস্ট্রেট ওয়াল্টার্স-এর ইউরোপীয় প্রযুক্তির ফলে নদীর পাশ থেকে কামানটিকে সরানো সম্ভব হয়েছে।

টেইলর আর ডেভিডসন চকবাজারের যে বর্ণনা রেখে গেছেন তাতে কোন পার্থক্য নেই। এখানে শুধু উল্লেখ করা যেতে পারে, যে কামানটির কথা তিনি উল্লেখ করেছেন তা হলো বিবি মরিয়ম। এটি ছিল সোয়ারীঘাটে। ১৮২৮ সালে ওয়াল্টার্স কামানটিকে চকবাজারে স্থাপন করেছিলেন হয়তো এ ভেবে যে, চক হলো ঢাকার কেন্দ্র। এর ওজন ৬৪,৮১৪ পাউন্ড। আরো জানা যায়, হিন্দুরা তেল সিঁদুর দিয়ে পূজো করতেন কামানটিকে।

ডেভিডসন লিখেছেন, চকবাজার ঢাকার প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র। অসংখ্য ছোটখাটো দোকান, বিক্রেতা এখানে বিক্রি করে টুপি, সুতি বস্ত্র ও নানা বর্ণের ছিট কাপড়, লোহার জিনিসপত্র, বড়শী, যাঁতা, আয়না, শীতলপাটি, ভ্রমণকারীদের জন্যে বেতের পেঁটরা বা বাক্স, নানা রংয়ের ও ধরনের জুতো, নারকেলী হুঁকো ইত্যাদি। চক থেকে দক্ষিণে গেছে একটি রাস্তা যেখানে সামরিক বাহিনীর লোকজন ও সিভিলিয়ানরা থাকেন।

সেনানিবাসের কথাও উল্লেখ করেছেন ডেভিডসন, যা তাঁর মতে, 'খুব সবুজ এবং সুন্দর কিন্তু রেজিমেন্টের সব অফিসারের মধ্যে একজন বা দু'জন থাকেন সেনানিবাসের

ভেতরে। বাকিরা জ্বরে ভুগে বা জ্বরের ভয়ে থাকেন শহরে। এ কারণে, অফিসারদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে শহরে থাকার। সেনানিবাসের ঠিক পাশে আছে বেশ বড় এক জলাভূমি যা মারাত্মক ম্যালেরিয়ার উৎস। সেনানিবাসের ভেতরে আছে কয়েকটি পুকুর, যেগুলির বেলায়ও একই রকম বিশেষণ প্রযোজ্য। বর্ষায়, সেনানিবাসের দক্ষিণে জমে ওঠে পানি, শীতের সময় যা শুকোয় ধীরে ধীরে।'

ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট চার্লস ড'স তেজগাঁর বেগুনবাড়ী থেকে উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে পল্টনে স্থানান্তর করেছিলেন সেনানিবাস। কিন্তু অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য সিপাহি, অফিসার সবাই আক্রান্ত হতে থাকে। অফিসাররা তখন সেনানিবাসে বসবাস করতে অস্বীকার করে। ফলে, কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয় অফিসারদের শহরে বসবাস করার অনুমতি দিতে। ঢাকা সেনানিবাসে তখন বদলি হওয়াকে মনে করা হতো শাস্তি হিসাবে। জি, ও, ট্রেভিলিয়ানের একটি উপন্যাসে দেখা যায় নায়ক মার্সডেন, তার প্রেমিকা ফ্যানিকে বলছে 'তুমি এক পাক্কা পরী। তোমার জন্য জান দিয়ে দেবো। তোমার জন্যে ঢাকার ইস্ট ইন্ডিয়া রেজিমেন্টে বিনা বেতনে কাজ করবো।'

ডেভিডসন ঢাকায় আসার বারো বছর পর ১৮৫২ সালে কলকাতার একটি পত্রিকা লিখেছিল ঐ সময়ের পল্টন সম্পর্কে -

'ঢাকা নগরের পার্শ্বে বহুকাল ব্যাপিয়া রাজকীয় এতদ্দেশীয় পদাতিক সৈন্য দলের যে আবাসস্থল নির্দ্ধার্য্য ছিল সম্প্রতি সেনাপতিরা তৎসীমা বিস্তার করা করণার্থ নগরীয় উত্তর দিগ্‌স্থ বহু সংখ্যক প্রজাগণের গৃহাদি ভগ্ন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই ছাউনির উত্তর ভাগে যে বিপুল বিস্তারিত অরণ্য আছে বোধকরি তাহা পরিষ্কার করিলে এমন দুই-তিনশত সৈন্য শিবির স্থাপিত হইতে পারে কিন্তু উক্ত কর্মে নিবিষ্ট অধ্যক্ষ মহাশয়েরা তাহা না করিয়া যে এই দুঃসহ বর্ষাকালে উপায়হীন ধনী প্রজাসমূহকে উৎপাত করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন ইহা নিতান্ত আক্ষেপের বিষয়। ঐ অধ্যক্ষ মহাশয়গণ বলেন যে নগরের লোকদের দ্বারা নির্গত মলীনত্ব ও ষড়িত স্থান সকলের দুর্গন্ধ দ্বারা পল্টনের সিপাহিরা সর্বদা পীড়িত হয়, এই হেতুক ঐ লোকদের গৃহাদি ভগ্নপূর্বক স্থানান্তরিত করণের আবশ্যক হইয়াছে, ফলতঃ তদর্থে এই নগর একেবারে উৎখাত করিলে ঐ কথার পোষকতা হয়'।'

ডেভিডসন এরপর জানিয়েছেন ঢাকার ঘরবাড়ি সম্পর্কে। তাঁর মতে, মসলিন যখন ঢাকাকে বিখ্যাত করে তুলেছে তখন প্রধানত ইউরোপীয় বাসগৃহগুলি নির্মিত হয়েছিল। বাড়িগুলি বড়সড়। দোতলা, কিন্তু তা সত্ত্বেও এদের ভাড়া মাসিক ষাট থেকে একশো পঁয়ত্রিশের মধ্যে। এসব বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠতমটিতে থাকেন কমিশনার যার ভাড়া একশো পঁয়ত্রিশ টাকা। অধিকাংশ বাড়ির সঙ্গে আছে ছোটখাটো সুন্দর বাগান। আর যে বাড়িগুলি নদী তীরে সেগুলি সবচেয়ে সুন্দর এবং এসবের চাহিদাও সবচেয়ে বেশি। টেইলর লিখেছেন, এসব বাড়ির ছাদেও ছিল বাগান।'

একদিন ডেভিডসন চাইলেন ঢাকার নবাবকে সালাম জানাতে। ঢাকার নবাব বলতে ডেভিডসন বুঝিয়েছেন ঢাকার শেষ নায়েব নাজিম গাজিউদ্দিন হায়দারকে। কিন্তু শেষ

পর্যন্ত তিনি যাননি। কারণ তাঁর ভাষায়- 'আমাকে একজন ভারী বুদ্ধিমান লোক জানালেন, নবাব এখন খুবই দরিদ্র, দেখা করে কোন লাভ নেই। তিনি একজন অশিক্ষিত তরুণ তবে তাঁর বয়সী ও বংশের তরুণদের থেকে খারাপ নয়। ইংরেজী তিনি একেবারে জানেন না। তিনি এতো উচ্ছৃঙ্খল এবং চিন্তাহীন যে তাঁর আয় এখন পাঁচ হাজার থেকে দুশোতে দাঁড়িয়েছে যার অর্থ বছরে ছয় হাজার টাকা থেকে দুশো চল্লিশ টাকা। কারণ, তাঁর আয় তিনি বন্ধক রেখেছেন। তাঁর পূর্ব পুরুষরা যে বাড়ীতে বসবাস করতেন তিনিও সেখানে বসবাস করেন, তবে খুব খারাপভাবে। মাঝে মাঝে দেখা যায়, পুরনো ধরনের শিরস্ত্রাণ পরে কয়েকজন ঘোড়সওয়ারসহ ঘোড়ায় চড়ে তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন..."

গাজীউদ্দিনের পিতা ছিলেন কামার উদদৌলা। পিতার মৃত্যুর পর তরুণ নাজিম উদদৌলা কমর উল মূলক নওয়াব সৈয়দ গাজী উদ্দিন খান বাহাদুর ফিরোজ জঙ্গ স্বীকৃত হলেন নায়েব নাজিমের পরিবারের কর্তা হিসেবে। তাঁর ভাতা ধার্য করা হয়েছিল মাসিক সাড়ে চার হাজার সিক্কা টাকা। এই নতুন নবাবের দারোগা ছিলেন তাঁর নানা মীর জীবন। তাঁর প্ররোচনায় গাজীউদ্দিন লেখাপড়া ছেড়ে দেন। নবাব একমাত্র সমীহ করতেন তাঁর শিক্ষক মীর গোলাম আলীকে। মীর জীবনের প্ররোচনায় তাঁকেও বরখাস্ত করা হয়। এরপর নবাব তাঁর নানার পরামর্শে শুরু করেন উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন। এমন কোন নেশা ছিল না যাতে তাঁর আসক্তি ছিল না। বিশেষভাবে আসক্ত ছিলেন তিনি রমণীদের প্রতি এবং তাঁর হারেমে নিত্য নিয়ত নতুন রমণী আমদানি ও পুরনোদের দেওয়া হতো খারিজ করে। এ ছাড়া ভালোবাসতেন তিনি ঘুড়ি ওড়াতে, মোষ এবং মোরগের লড়াই দেখতে, বুলবুলি, কুকুর ও বেড়ালের বিয়ে দিতে এবং ইউরোপীয় মহিলাদের মতো পোশাক পরতে। এ কারণে, ঢাকাবাসীরা তাঁকে ডাকতেন পাগলা নবাব বলে। উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনের জন্যে সরকারি ভাতায় তাঁর কুলোতো না। ফলে, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক দিতে লাগলেন তিনি মহাজনদের কাছে। তার দাদি ও কোম্পানি সরকারও গাজীউদ্দিনকে কয়েকবার শোধরাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন।

১৮৪৩ সালে অত্যধিক ব্যভিচারের কারণে খুব অল্প বয়সেই নবাব গাজীউদ্দিন পরলোক গমন করেন। তাঁকে সমাহিত করা হয় হুসেনী দালানে এবং তাঁর মৃত্যুর সঙ্গেই লুপ্ত হয়ে যায় ঢাকার নায়েব নাজিম বংশ।[১১]

২

একদিন সকালে ডেভিডসন ঘুরে বেড়াবার সময় দেখেন, এক জায়গায় বেশ কিছু পালকি দাঁড় করানো। যদিও সেদিন সপ্তাহান্ত নয়, জানলেন তিনি, কাছের আর্মেনী গির্জায় চলছে উপাসনা এবং সে কারণে এ জমায়েত। চৌদ্দ ফুট প্রশস্ত এক বারান্দা দিয়ে ডেভিডসন ঢুকলেন গির্জায়। দালানের ভেতর মেঝে বিভক্ত তিন ভাগে;, রেলিং দিয়ে ঘেরা একটি বেদী; মাঝখানের অংশে আছে দুটি ফোল্ডিং দরজা; তৃতীয় ভাগটি বেষ্টনী দিয়ে আলাদা করা যাতে শুধু বসেছিল মহিলা ও শিশুরা। এর ওপরে আছে আবার একটি গ্যালারি।

দেয়াল থেকে চার ফুট দূরে অর্ধবৃত্তাকার বেদী, মনে হয় তা কাঠের তৈরি এবং দশ ফুটের মতো উঁচু সিঁড়ি আছে উপরে ওঠার। সিঁড়িতে তিন ফুট করে লম্বা চব্বিশটি মোমবাতি আর চকচকে ধাতুর কিছু ক্রুশ। রোদালো সকাল, তবুও মোমবাতিগুলি সব জ্বলছিল।

বেদীর সামনে, বাঁ দিক ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছেন পাদ্রী, বয়স পঞ্চাশের মতো, চোখে চশমা, মাথা ঠিক সোয়া দুই ইঞ্চির মতো বৃত্তাকারে কামানো। তাঁর অন্তর্বাস জমকালো রুপালি গোলাপের নকশায় অলংকৃত; বাইরের পোশাকটি কিংখাবের যার নিচের দিকের বর্ডারের চার ইঞ্চি সাধুসন্ত ও দেবদূতদের এমব্রয়ডারিতে ভরা। ছোট একটি পড়ার ডেস্কের সামনে তিনি দাঁড়িয়ে, পবিত্র জলের একটি বড় আধারও রাখা আছে সামনে। তাঁর পড়ার সময় মাঝে মাঝে চার-পাঁচজন তরুণ বলছে 'আমেন, আমেন'। পরনে তাদের দারুচিনি রংয়ের সিল্কের আলখাল্লা। পড়ার ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে উৎসাহের সঙ্গে বাজানো হচ্ছে গির্জার ঘণ্টা।

পাদ্রীর উপাসনা শেষ হলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সামনে নিয়ে আসা হলো। বড়রা বাইরের রুপালি ক্রুশে চুমো খেয়ে যেতে লাগলো। পাদ্রীর সহকারী বিভিন্ন রকম পাত্র যার মধ্যে সাধারণ বিয়ার বোতল থেকে রুপার কাপও ছিল, সব ভরে দিতে লাগলেন পবিত্র জলে।

অনুষ্ঠান শেষে ডেভিডসন বেরিয়ে এলেন। বারান্দায় বিভিন্ন আর্মেনী খ্রিস্টানের কবরে লাগানো হয়েছে স্মৃতিফলক। আগে এই শহরে, লিখেছেন ডেভিডসন, বেশ কিছু আর্মেনী ছিলেন এবং এখনও তারা ধনী ও প্রভাবশালী সম্প্রদায়।

গির্জার পনেরো ফুটের মধ্যে, আলাদা দাঁড়িয়ে একটি স্থূল বর্গাকার টাওয়ার, চূড়োয় আছে চারটি শঙ্খিল মিনার। চার দেয়ালের মাঝে, মাটি থেকে কয়েক ফুট উঁচুতে দেয়ালে লাগানো একটি মার্বেল ফলক। আর্মেনী ও ইংরেজি ভাষায় তাতে লেখা যার মূল কথা মি. সার্কিস ঈশ্বরকে উৎসর্গ করছেন এই চমৎকার জাঁকালো মিনার।

ডেভিডসন পরে জানতে পেরেছিলেন, তিনি যা দেখেছেন গির্জায়, সেটি আর্মেনীদের ক্রিসমাস পালনের অনুষ্ঠান।

ডেভিডসনের এ বর্ণনায় একটি বিষয় লক্ষণীয়। ঢাকায় তখনও উচ্চবর্গ ব্যাপক না হলেও বেশ ব্যবহার করতেন পালকি। টেইলর জানিয়েছেন, ১৮৪০-এ ঢাকা জেলায় চাকার প্রচলন হয়নি। তবে, বিশপ হেবারের বিবরণে জানতে পারি ১৮২৩ সালে ঢাকায় একটি হলেও ঘোড়াটানা গাড়ি ছিল যা ব্যবহার করতেন নায়েব নাজিম শামসউদদৌলা এবং তা আমদানি করা হয়েছিল কলকাতা থেকে।[১] পরে ১৮৫৬ সালের দিকে, আর্মেনী সিরকো প্রচলন করেছিলেন ঠিকাগাড়ির।

আর্মেনীরা ঢাকায় এসেছিলেন কবে জানা যায়নি। তবে, ধরে নিতে পারি মুঘল আমলে ভাগ্য বদলাতে বিদেশ থেকে যখন অনেকে এসেছিলেন ঢাকায়, আর্মেনীরাও এসেছিলেন তখন। তেজগাঁও পর্তুগিজ গির্জায় কবর আছে কয়েকজন আর্মেনিয়ানের যাঁদের মৃত্যু হয়েছিল ১৭১৪ থেকে ১৭৯৫ সালের মধ্যে।[২] সুতরাং ধরে নিতে পারি

সপ্তদশ শতকেই আর্মেনীরা দু'একজন করে আসতে থাকেন ঢাকায় এবং বসবাস শুরু করেন এ অঞ্চলে।

অষ্টদেশ ও উনিশ শতকের প্রথমার্ধে অতি ক্ষুদ্র একটি সম্প্রদায় হওয়া সত্ত্বেও ঢাকা শহরে ছিলেন আর্মেনীরা প্রভাবশালী। কারণ, তাদের ছিল বিত্ত। ঢাকার আর্মেনীদের অনেকের ছিল জমিদারি। এছাড়া লবণের ঠিকাদারি, ধান, পাট ও কাপড়ের ব্যবসায় ছিল তাঁদের কর্তৃত্ব। ঢাকা শহরের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে, সভা-সমিতিতেও আর্মেনীরা যুক্ত করেছিলেন নিজেদের। বর্তমান আর্মেনীটোলায় থিতু হয়ে বসার পর আর্মেনীরা এখানেই নির্মাণ করেছিলেন তাদের গির্জা। বর্তমানে যে গির্জাটি আর্মেনীটোলায় নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে আছে ডেভিডসন তাতেই গিয়েছিলেন। এটি নির্মিত হয়েছিল ১৭৮১ সালে। এর আগে, এখানে ছিল গোরস্থান। গির্জা নির্মাণের জন্য গোরস্থানের আশপাশে যে বিস্তৃত জমি তা দান করেছিলেন আগা মিনাস ক্যাটচিক। লোকশ্রুতি অনুযায়ী, জানিয়েছেন ফার্মিঙ্গার, গির্জাটি নির্মাণে সাহায্য করেছিলেন চারজন- –মাইকেল সার্কিস, অক্টোভাটসেতুর জিভর্গ, আগা এমনিয়াজ এবং মার্কার পগোজ।[১১]

১৮৩৮ সালে, জানিয়েছেন টেইলর, ঢাকা শহরে বসবাস করতেন মাত্র চল্লিশটি আর্মেনীয় পরিবার।[১৪]

৩

বাড়ি ফেরার পথে ডেভিডসনের চোখে পড়লো প্রাচীর ঘেরা একটি বিলিডিং যার চূড়োর অলংকার দেখে তাঁর মনে হলো, এটি বোধহয় কোন রোমান ক্যাথলিক ভজনালয়। ডেভিসন ঢুকলেন ভেতরে, দেখলেন - না এ কোন ক্যাথলিক ভজনালয় নয়, এটি কালীমার মন্দির। দরজার সামনে গিলোটিনের মতো কাঠের একটি যন্ত্র যেখানে ছাগল ছানা উৎসর্গ করা হয়। ছাগল ছানার মাথাটি পুরোহিতের প্রাপ্য। ডেভিডসন খোঁজ নিয়ে জানলেন, কালো ছাগল ছানার চাহিদা প্রচণ্ড যার ফলে অন্য রংয়ের ছাগল ছানা থেকে কালো রংয়ের ছাগল ছানার দাম কয়েকগুণ বেশি। ঢাকা শহরে মন্দির আছে পঞ্চাশটির মতো এবং সবখানে এ রংয়ের ছাগল ছানার চাহিদা। মনে হয়, এখানে ডেভিডসন খানিকটা ভুল করেছেন। শহরে সব মন্দির কালীমন্দির ছিল কিনা এবং সব খানে ছাগল বলি হতো কিনা তা নিয়ে সন্দেহ আছে।

একদিন বিকেলে বেড়ানোর সময় কর্নেল ডেভিডসন দেখলেন 'ফিনিক্স পার্ক'। ঢাকার এক সময়ের জজ মাস্টারের বসতবাড়ির নাম 'ফিনিক্স পার্ক'। মি. গ্লাস তাঁকে জানালেন, মাস্টার ঘোড়া প্রজনন করতেন এবং মাস্টারের খামারের অনেক ঘোড়া এখনও বেঁচে আছে। মি. গ্লাসের কাছেও আছে মাস্টার খামারের একটি ঘোড়া যার বয়স পঁচিশ এবং এখনও কর্মক্ষম।

ডেভিডসন যে মাস্টারের কথা উল্লেখ করেছেন তার পুরো নাম গিলবার্ট কভেনট্রি মাস্টার। রাইটার হিসেবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে যোগ দিয়েছিলেন তিনি ১৭৯৭ সালে। ঢাকার জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন ১৮১০ থেকে ১৮১৮ এবং কালেক্টর ১৮২১

থেকে ১৮২৪ পর্যন্ত। চেরাপুঞ্জিতে পরলোকগমন করেন তিনি ১৮৩২ সালে। বিশপ হেবারের রোজনামচায় মি. মাস্টারের উল্লেখ আছে। হেবার যখন ঢাকায় এসেছিলেন মাস্টার ছিলেন তখন ঢাকার কালেক্টর। আর মি. গ্লাস যিনি ডেভিডসনকে মাস্টারের ঘোড়ার কথা বলেছিলেন তিনি ছিলেন ঢাকার একজন নীলকর, থাকতেন বুড়িগঙ্গার তীরে একটি বাড়িতে।

ফিনিক্স পার্ক ও তার চমৎকার ফটক পেরিয়ে ডেভিডসন পৌঁছলেন স্টেশনের সদর রাস্তায়। তার মনে হয়েছে, ভালো অবস্থায় এটি নিশ্চয় সুন্দর এক জায়গা। কিছুদূর পর পর সিমেন্টের পিলার দিয়ে পুরো জায়গাটিতে বেষ্টনী দেওয়া হয়েছিল যা এখন প্রায় ধ্বংসের পথে। ডেভিডসনকে একজন জানিয়েছিলেন এতে খরচ পড়েছিল এক লাখ টাকারও বেশি। এই বেষ্টনীর ভেতর আছে চমৎকার এক রেসকোর্স, এর কাঠের রেলিংয়ে কিছু অংশ ও স্ট্যান্ডটি এখনও টিকে আছে। কারণ, বোধহয় কাঠ এখানে মহার্ঘ নয় এবং নেই উইপোকার উপদ্রব।

স্ট্যান্ডের উত্তর-পশ্চিমে সেই ভদ্রলোক [মসলিন উৎপাদনের তুঙ্গ সময়ের একজন সিভিল সার্ভেন্ট যিনি মাঠটিকে ঘিরে দিয়েছিলেন, তৈরি করেছিলেন একটি কৃত্রিম পাহাড় আর বপন করেছিলেন সুন্দর সব গাছ] সকালে যারা রেসকোর্সে বেড়াতে আসতেন তাদের আপ্যায়ন করতেন চা বা কফি দিয়ে। পুরো জায়গাটি নেপাল থেকে আনা দুষ্প্রপ্য গাছ, যেমন ক্যাসুরিনা, মিমোসা দিয়ে সাজিয়েছিলেন। অদূরে তাঁর বাসগৃহ যা এখন ম্যালেরিয়ার কারণে অবসবাসযোগ্য ও পরিত্যক্ত।

১৮২৫ সালে জেলের কয়েদিদের দিয়ে রমনার জঙ্গল পরিষ্কার করিয়েছিলেন ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট চার্লস ড'স। তিন মাসের মধ্যে রমনার জঙ্গল পরিষ্কার করে স্থাপন করেছিলেন রেসকোর্স। ডেভিডসন বর্ণিত ঐ ঘরটিও ড'সের এবং তা ছিল গথিক রীতিতে তৈরি। ড'সের টিলাটি এখনও আছে, গথিক রীতির বাড়ির ধ্বংসাবশেষ কিছুদিন আগেও ছিল। তখনকার ঢাকার শিক্ষিত লোকজন বাড়িটির নাম দিয়েছিলেন 'ড'স ফলি' বা ড'সের ভুল নামে।[১৫] কেন এই নামকরণ তা অবশ্য জানা যায়নি। তবে ধরে নিতে পারি, প্রচলিত ধারা উপেক্ষা করে, শহরে ঘর তৈরি না করে, শহরের বাইরে টিলা ও ঘর তৈরির জন্যই বোধহয় সবাই ভেবেছিলেন লোকটি কি বোকা!

৪

ঢাকা শহরের অবনতির মূল কারণ মসলিন ব্যবসার অবলুপ্তি, লিখেছেন ডেভিডসন। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের অবশ্য একই মত। তিনি আরো লিখেছেন, তখনও ১৫০ রুপি বা ১৫ পাউন্ড খরচ করলে দশ গজ লম্বা উৎকৃষ্ট মানের এক টুকরো মসলিন পাওয়া যেতো। টেইলর জানাচ্ছেন, পাঁচ গজ লম্বা এবং নয় সিক্কা বা ১৬০০ গ্রেন ওজনের এক টুকরো উৎকৃষ্ট মানের মসলিনের দাম ছিল ১০০ রুপি।[১৬] এ ক্ষেত্রে টেইলরের হিসাবটিই মেনে নেওয়া ভালো। তবে, ডেভিডসন জানিয়েছেন, এতো দাম হলে চাহিদা কম থাকবে এবং বিক্রি কম হবে।

সূক্ষ্মসুচের কাজ করা সিল্কের শালের কথা উল্লেখ করেছেন ডেভিডসন, যা প্রচুর পরিমাণে বাঁকে করে পাঠানো হতো কলকাতায়। খাঁটি রুপোর তৈরি বিভিন্ন ধরনের কানের দুল, যুক্তিযুক্ত দামে কম সময়ে সরবরাহ করা হয়।

আগে, ঢাকার শহরতলিতে হাজার হাজার মসলিন তাঁতি বসবাস করতেন। মসলিন তৈরির ব্যাপারটা এমনই ছিল যে সব সময় সদা সতর্ক থাকতে হতো। সূর্যের আলো ও আবহাওয়ার বিভিন্নতার কারণে এদের কাজ করতে হতো গভীর গর্ত করে। মসলিন উৎপাদন যখন বন্ধ হয়ে গেলো তখন তাদের কর্মস্থলগুলি পরিত্যক্ত অবস্থায় রইলো। এখন বৃষ্টি হলেই এগুলি ভরে যায় এবং হয়ে ওঠে বিষাক্ত। কৃষি কাজের অন্বেষণে অধিকাংশ তাঁতি এখন ত্যাগ করেছেন ঢাকা। তাদের পরিত্যক্ত জমি সামান্য দামে পুঁজিপতিদের (ধনাঢ্যদের) অনুরোধ করা হয়েছে কিনে নেওয়ার জন্যে। কিন্তু কেউই আগ্রহ দেখায়নি কারণ তাদের মতে, ঐ পরিত্যক্ত ভূমি চাষাবাদের আওতায় আনতে গেলে যে খরচ পড়বে তাতে পোষাবে না। ফলাফল হচ্ছে, শহরের আধামাইলের মধ্যে ভারতবর্ষের সবচেয়ে বিষাক্ত জঙ্গল অবস্থিত। শুধু তাই নয়, শহর প্রান্ত দেখলেও বোঝা যায় এ শহরে দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে জনসংখ্যা।

ডেভিডসন যে সময়ের মসলিন ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেছেন প্রায় ঠিক ঐ সময়ের [১৮৩৮] কিছু বিবরণ আমরা পাই টেইলরের গ্রন্থেও। জানিয়েছেন তিনি, ঐ সময় তাঁতিরা কাজ করতেন শর্তাধীনে। পাইকারের কাজ থেকে গ্রহণ করতেন তারা অগ্রিম। যারা দৈনিক বা মাসিক মজুরির বিনিময়ে কাজ করেন তাদের গড়পড়তা পারিশ্রমিক হলো আড়াই টাকা। এর সঙ্গে খুচরো কাজ করে আরো দশআনা পর্যন্ত উপার্জন করা সম্ভব। দশ থেকে বারো বছরের যেসব বালক শিক্ষানবিস দু'বছর কাটানোর পর পায় মাসে চার আনা। সুতাকাটার কাজেও সামান্য উপার্জন। অক্লান্ত পরিশ্রম করে একজন সুতাকাটিয়ে বছরে দুই সিক্কার বেশি সুতা তৈরি করতে পারে না। এ সুতা বিক্রি করে সে পায় ষোল টাকা বা বত্রিশ শিলিং। দিনে মাত্র এক পেনির মতো উপার্জন। অথচ টেইলর বলছেন, এই এক পেনি নাকি কাঁচামালের মূল্যের বারোশত গুণ অপেক্ষাও বেশি।[১৭] একটু অবিশ্বাস্য মনে হয় না কি? তবে, এ হিসাব থেকে বোঝা যায় কেন তাঁতিরা মসলিন উৎপাদনের সঙ্গে আর জড়িত থাকতে চাননি।

ডেভিডসন যে জঙ্গলের কথা লিখেছেন তার উল্লেখ পাই রেভারেন্ড রবিনসনের লেখায়। রবিনসন ছিলেন ব্যাপটিস্ট মিশনের পাদ্রী। ১৮৩৯ সালে মার্চ মাসে কাটরা থেকে তিনি গিয়েছিলেন তেজগাঁর পর্তুগিজ গির্জায়। লিখেছেন তিনি—ঢাকার দু'মাইল দূরে একটি গ্রাম—তেজগাঁ। একসময় এটি ছিল বর্ধিষ্ণু গ্রাম, বর্তমানে প্রায় পরিত্যক্ত। ঢাকা থেকে তেজগাঁ যেতে হলে ঘন এক জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যেতে হয়। এক সময় এ জায়গাটুকুতেও ছিল অসংখ্য সুন্দর বাগান। কোনও কোনও জায়গায় এখনও সেসব বাগানের প্রাচীর চোখে পড়ে। এ জঙ্গল দেখতে সুন্দর, কিন্তু বিপদও আছে এতে ওৎ পেতে। কারণ, বাঘের দেখা পাওয়া যায় এ জঙ্গলে।[১৮]

এ প্রসঙ্গে তৎকালীন ঢাকার লোকসংখ্যারও কিছুটা উল্লেখ করা যেতে পারে। অবশ্য

এ হিসাবটা আনুমানিক। ১৮২৪ সালে ঢাকার লোকসংখ্যা ছিল ৩০,০০০, ১৮৩৭ সালে মাত্র ৬৮,৩৩৮।[১৮]

ডেভিডসন নীলকরদের কথাও উল্লেখ করেছেন। শহরে, তাঁর মতে, আছেন বেশ ক'জন 'ধনী ও শ্রদ্ধেয়' নীলকর যারা নীল উৎপাদন ছাড়াও সরকারি জমির স্পেকুলেট করেন যা তারা ভাড়া দেন জমিদার ও রায়তদের। বেশ আগে, এরা কফির চাষও শুরু করেছিলেন এবং তা ভালোও হতো কিন্তু রায়তদের অনাগ্রহের ফলে এখন তা লুপ্ত। এখানকার আবহাওয়া ও মাটি কফির জন্যে উপযোগী। টেইলর জানাচ্ছেন, প্রায় ১,০০,০০০ বিঘা জমি নীলচাষের অন্তর্গত এবং বাৎসরিক নীলের উৎপাদন আড়াই হাজার মণ। এর পেছনে পুঁজির পরিমাণ প্রায় তিন লাখ রুপি বা ত্রিশ হাজার পাউন্ড। শহরে আছে ষোলজন নীলকর এবং ব্যবসায়ী।[২০]

ঢাকায় সুপারির আধিক্যের কথা উল্লেখ করেছেন ডেভিডসন। লিখেছেন তিনি, এর উৎপাদন প্রচুর। শহরের কাছে অনেক ভারতীয় বাড়ি ঢেকে আছে সুপারির গাছে। এর ঋজু 'এলিগ্যান্স' দেখার মতো।

৫

ঢাকার তিনটি উৎপাদনের নাম এখন করা যায় কিন্তু আশ্চর্য যে, এ তিনটির কোনটিই প্রচলিত পণ্য নয়। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো বেহালা, জানিয়েছেন ডেভিডসন। প্রচুর বেহালা তৈরি করা হয় ঢাকায় এবং তা বিক্রি করা হয় খুব শস্তায়। দু'টাকা বা চার শিলিংয়ে কেনা যাবে একটি বেহালা। চারশিলিংয়ে চমৎকার কাঠের তৈরি বেহালা ও ছড়! আশ্চর্য হয়ে গেছেন ডেভিডসন। ঢাকায় যারা আসেন তারা একটি বেহালা সংগ্রহ না করে গেছেন এমন শোনা যায়নি। দিনরাত সব সময় বেহালার শব্দ শোনা যাবেই। বাংগালীরা আসলে প্রচণ্ড গানপাগল [মিউজিক্যাল পিপল]। রাতে ঢাকার রাস্তায় হাঁটার সময় যদি কোন দোকানে উঁকি দেন তাহলে হয়তো দেখবেন একজন অক্লান্ত কারিগর বেহালা তৈরি করছেন, আরেকজন হয়তোবা বেহালা বা সারেংগী বাজাচ্ছেন। আরো দেখা যাবে দলবেঁধে উঁচুস্বরে অনেকে গান গাইতে গাইতে হেঁটে যাচ্ছেন।

দ্বিতীয়টি হলো বিভিন্ন আকারে চুড়ি। মহিলা ও শিশুদের জন্যে তৈরি করা হয় এ সব শাঁখার চুড়ি। কলকাতা থেকে প্রতি শ' আড়াই আনা করে কিনে আনা হয়। তিনশোর বেশি কারিগর এই কৌতূহলোদ্দীপক উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত। কোতোয়ালির পিছে একটি রাস্তা দখল করে আছে এদের পুরো একটি দল। তাদের বাড়িগুলি ঢাকার সবচেয়ে পুরনো এবং সুন্দর। বাড়িগুলি মনে হয় যেনো তাসের তৈরি। সব বাড়িগুলিই অলংকৃত ডরিক এবং করিনথিয়ান পিলার দ্বারা।

তৃতীয় উৎপাদিত পণ্যটি বাণিজ্যিক দিক থেকে উল্লেখ করার মতো নয়। তবুও ডেভিডসন উল্লেখ করেছেন সেই পণ্যের কথা। সেটি হচ্ছে মূর্তি এবং তাও হঠাৎ করে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। একদিন সকালে হাঁটার সময় দেখলেন পাথর কাটাইয়ের

ঘরের সামনে ভিড়। সবাই ব্যস্ত ঘর থেকে একটি [শিব] লিঙ্গ বের করে। এটি বিক্রি করা হয়েছে একশো পঁচিশ টাকায়। কালো পাথরে তৈরি চকচকে পালিশ করা, তিন ফুট লম্বা ছিল লিঙ্গটি।

আর একদিন শহরতলিতে হাঁটার সময় ডেভিডসনের নজরে পড়লো ছোট এক নদীর ওপর ছিমছাম ঝুলন্ত এক সেতু। ১৮৩০ সালে মি. ওয়ালটার্স যখন ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট তখন তিনি জনসাধারণের চাঁদায় নির্মাণ করেছিলেন পুলটি। ডেভিডসন অবাক হয়ে মন্তব্য করেছেন পুলে ইংরেজি ও ফার্সি ভাষায় লেখা আছে, কিন্তু বাংলায় নেই যা এদেশের মাতৃভাষা।

ডেভিডসন ঢাকার বেহালা সম্পর্কে যে তথ্য দিয়েছেন সে ধরনের তথ্য আর কোথাও পাইনি। তবে এটা ঠিক ঢাকা ছিল সঙ্গীতের পুরনো পীঠস্থান। সে কারণে, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সঙ্গীতজ্ঞ ও বাঈজীরা আসতেন ঢাকায়। এ ধারা আরো প্রবল হয়েছিল ১৮৫৭ সালের পর। সংক্ষেপে এটুকু বলতে পারি, লখনৌ শহর বিখ্যাত ছিল কণ্ঠ সঙ্গীতের জন্য। আর তবলা ও সেতার বাদনের জন্যে ঢাকা ছিল বিখ্যাত। উনিশ শতকের মধ্যভাগে ঢাকার সেতার বাদকরা সৃষ্টি করেছিলেন এ নিজস্ব ঘরানার। এ ঐতিহ্যের শুরু মুসলমান শাসকদের সময় থেকে, যখন ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে ওস্তাদরা আসতেন তাদের দরবারে আশ্রয় নিতে। ইংরেজরা বাংলায় আসার পরও একশো বছর ধরে এই ধারা অব্যাহত ছিল।[২১]

ঢাকার শাঁখারিরা সব সময়ই পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, দলগত ভাবে বসবাস, তাদের নির্মিত বাড়িঘর এবং উৎপাদিত শাঁখার তৈরি জিনিসপত্রের জন্য।

জেমস ওয়াইজ লিখেছেন, কিংবদন্তি অনুসারে, পূর্ববঙ্গে শাঁখারিরা এসেছিলেন বল্লাল সেনের সঙ্গে, বিক্রমপুরে তাদের সেই স্মৃতি বহন করছিল একটি বাজার—শাঁখারিবাজার। সপ্তদশ শতকে মুঘলরা ঢাকায় এলে শাঁখারিদের নতুন শহর ঢাকায় নিয়ে আসা হয়েছিল লাখেরাজ জমির প্রলোভন দেখিয়ে। ঢাকায় এসে শাঁখারিরা যে অঞ্চলে বসবাস শুরু করেছিলেন তাই আমাদের কাছে বর্তমানে পরিচিত শাঁখারিবাজার নামে। সেই ১৬৬৬ সালে ট্যাভারনিয়ার যখন ঢাকায় এসেছিলেন তখন তিনি এ অঞ্চলে বসবাস করতে দেখেছিলেন শাঁখারিদের।[২২] সেই থেকে এখনও পেশাদারি একটি গ্রুপ হিসেবে, শাঁখারিরা পুরনো রীতিনীতি প্রায় অক্ষুণ্ন রেখে এখনও ঠিক একই জায়গায় বসবাস করছেন।

শাঁখারিদের বাসগৃহের স্থাপত্য একটু স্বতন্ত্র ধরনের। ওয়াইজ অবশ্য এর একটি কারণ উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, যে লাখেরাজ জমি দেয়া হয়েছিল শাঁখারিদের তা ছিল আয়তনে ক্ষুদ্র। সেই আয়তন মেনেই নির্মিত হতো বাসগৃহ। সাধারণত এগুলি ছিল দোতলা। সামনের মূল ফটক হতো ছ'ফিটের মতো। তারপর বিশ-ত্রিশ ফুটের মতো লম্বা করিডোর চলে যেতো ভিতরে।[২৩]

টেইলর লিখেছেন, সেখানে বহু চারতলা দালানের সম্মুখ ভাগে মাত্র আট বা দশ ফুটের মতো জায়গা রয়েছে। অপরদিকে পার্শ্ববর্তী দেয়ালসমূহ দরজা-জানালাহীন

নিশ্ছিদ্র এবং পশ্চাৎ দিকে বিশ গজ পর্যন্ত প্রসারিত। এসব দালানের কেবলমাত্র শেষ প্রান্তগুলো ছাদ দ্বারা আচ্ছাদিত এবং একতলার উপরে মধ্যবর্তী স্থান একটি ছোট প্রাঙ্গণের ন্যায় খোলা রাখা হয়। ১৭৯৩ সাল পর্যন্ত শাঁখারিদের জমির জন্যে কোন খাজনা দিতে হয়নি। কিন্তু ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় শাঁখারিরা তাদের লাখেরাজ জমির সনদপত্র দেখাতে না পাবায় তাদের খাজনা দিতে বলা হয়েছিল। টেইলর আরো জানিয়েছেন, ঐ সময় (১৮০৮) ঢাকা শহরে জমির দাম বেশি ছিল শাঁখারিবাজার ও তাঁতিবাজারে।[২৪]

ওয়াইজ জানিয়েছেন, শাঁখারিদের অধিকাংশ ছিলেন নিরামিষভোজী এবং বিষ্ণু বা কৃষ্ণের অনুসরণকারী। ভাদ্রের শেষ সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হতো তাদের প্রধান উৎসব। সে সময় পাঁচদিন তারা কাজ করতেন না এবং পূজো করতেন অগস্ত্য ঋষির। তাদের মতে, শংখ অসূর নামে এক দানবকে অগস্ত্য মুনি হত্যা করেছিলেন। হত্যার জন্য ব্যবহার করেছিলেন সে ধরনের করাত যে ধরনের করাত দিয়ে শাঁখারিরা শাঁখা কাটেন। শাঁখারি বাজারের বাইরে কোন শাঁখারি বসবাস করলে তাকে করা হতো সমাজচ্যুত। সে কারণেই বোধহয় একই এলাকায় তারা বসবাস করছেন যুগ যুগ ধরে। তাই প্রায়ই মহামারী দেখা দিতো তাদের মধ্যে। পৌরসভা সে কারণে তাদের বাধ্য করতো প্রতিষেধক হিসেবে টিকা নিতে। শাঁখারি মহিলারা ছিলেন পর্দানশীন। শাঁখারিরা খুব অপমানিত বোধ করতেন কেউ যদি তাদের আবদুর রাজ্জাক বা রাজা রাম রায়ের পোলা বলতেন। আবদুর রাজ্জাক ছিলেন একজন জমিদার। দ্বিতীয়জন ছিলেন বাংলার দেওয়ান রাজা রাজবল্লভের দ্বিতীয় পুত্র। কথিত আছে, তাঁরা নাকি প্রায়ই সুন্দরী শাঁখারি মহিলাদের নিয়ে যেতেন অপহরণ করে এবং তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে কেউ কিছু বলার সাহস পেতো না।[২৫]

ডেভিডসন যখন ঢাকায় এসেছিলেন তখন ঢকা শহরে শঙ্খ কারিগরের সংখ্যা ছিল প্রায় পাঁচশো। এ তথ্য জানিয়েছেন টেইলর। তাঁর মতে, শাঁখার অলংকার তৈরির জন্য তিন ধরনের কারিগর ছিলেন। যারা শাঁখা ভেঙ্গে পৃথক ও পরিষ্কার করতেন তারা চারশো বিশটি শাঁখার জন্য মজুরি পেতেন এক টাকা। মাসে এরা তিন থেকে চার টাকা উপার্জন করতেন। শাঁখার করাতিরা একশো শাঁখের জন্য দু' থেকে চার টাকা পর্যন্ত আয় করতেন। শাঁখা মসৃণ, খোদাইকারীদের নিয়োগ করা হতো চুক্তির ভিত্তিতে। টেইলর আরো জানিয়েছেন, কলকাতা থেকে ঢাকায় আমদানিকৃত শাঁখের গড়পড়তা পরিমাণ ৩,০০,০০০।[২৬]

ডেভিডসন যে পুলের কথা লিখেছেন তা আমাদের কাছে পরিচিত লোহার পুল নামে। এটি তৈরি করেছিলেন ঢাকার এক সময়ের জনপ্রিয় ম্যাজিস্ট্রেট ওয়ালটার্স। ১৮২৫ থেকে ১৮৩০ পর্যন্ত ছিলেন তিনি এ পদে। ঢাকার সাধারণ মানুষ তাঁকে পছন্দ করতেন এ কারণে যে, শহর উন্নয়নের জন্য আন্তরিকভাবে তিনি বিভিন্ন কাজে হাত দিয়েছিলেন।

লোহার পুল নির্মাণ করা হয়েছিল ধোলাইখালের ওপর। এখানে পুল না থাকায়,

খালের দু'ধারের লোকজনকে নানা ঝঞ্ঝাট পোহাতে হতো। তা ছাড়া তখনকার উঠতি নারায়ণগঞ্জের সঙ্গে যোগাযোগের জন্যও একটি পুল প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল। সরকারি নথিপত্র অনুযায়ী মুঘল আমলে এখানে একটি পুল ছিল, কোম্পানি আমলে যা গিয়েছিল ধ্বংস হয়ে।

ওয়ালটার্স পরিকল্পনা নিলেন ধোলাইখালের ওপর পুল তৈরি করার। এর জন্য দরকার টাকার। ঢাকাবাসীর কাছে আবেদন জানালেন তিনি চাঁদার। ঢাকাবাসীরাও এ আহবানে সাড়া দিতে কার্পণ্য করেনি। ১৮২৮ সালে শুরু হয়েছিল পুল নির্মাণের কাজ। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আনা হয়েছিল ইংল্যান্ড থেকে। উদ্বোধনের দিন প্রথমে একটি হাতি পার করানো হয়েছিল পুল মজবুত হয়েছে কিনা দেখার জন্যে। বর্তমানে আমরা যে লোহার পুল দিয়ে ধোলাইখাল পার হই তা কিন্তু ওয়ালটার্সের তৈরি আসল পুল নয়, যদিও আদি নামটি রয়ে গেছে। ঢাকাবাসীরা তখন ওয়ালটার্সকে নিয়ে একটি ছড়া বেঁধেছিল—

ওয়ালটার্স সাব নে পুল বানায়া
উসকে নিচে গঞ্জ বসায়া
আওর চক ধারি কামান লাগায়
গুর গুর চল............[২৭]

৬

লোহার পুল পেরিয়ে কর্নেল ডেভিডসন পৌছলেন সুন্দর এক রাস্তায়। নদীর ধার ঘেঁষে পাগল পুল বা বোকার পুলের (ফুলস ব্রিজ) দিকে গেছে রাস্তাটি। রেভারেন্ড শেফার্ডের নির্দেশনায় নির্মিত হয়েছে পুলটি। ডেভিডসন খুঁজে বার করার চেষ্টা করেছেন কেন পুলটির নাম বোকা বা পাগলা পুল। তাঁর মতে, যে নদীর ওপর এটি নির্মিত হয়েছিল তা গতি বদল করে ফেলেছিল। এ ধরনের চিন্তার অবশ্য কোন যৌক্তিকতা নেই। ডেভিডসন জানিয়েছেন, শহরের এটিই সবচেয়ে সুন্দর রাস্তা, তবে পূর্বের ঘন জঙ্গল তাঁর মনোপূত হয়নি। পুরো রাস্তায় চোখে পড়ে মাঝে মাঝে গরিব কিন্তু ছবির মতো গ্রাম ও নিঃসঙ্গ কুটির।

এই পাগলা পুলের কথা ডেভিডসন ছাড়াও আরো অনেকের স্মৃতি কাহিনীতে উল্লেখিত হয়েছে। ১৬৬৬ সালে ট্যাভারনিয়ার যখন ঢাকয় এসেছিলেন, তখন লিখেছিলেন, ঢাকা থেকে আধক্রোশ ভাটিতে আছে আরেকটি নদী—পাগলা। নদীর ওপর আছে সুন্দর একটি পুল যা তৈরি করেছিলেন মীর জুমলা। আরো লিখেছিলেন তিনি, নদীর দু'পাশে আছে বেশ কিছু টাওয়ার যেখানে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে ডাকাতদের মুণ্ডু।[২৭]

ডেভিডসনের কয়েক বছর আগে কলকাতার লর্ড বিশপ হেবার, ১৮২৪ সালে ঢাকায় আসার পর পাগলা পুলের খ্যাতি শুনে গিয়েছিলেন তা দেখতে। কিন্তু তখন তা পরিণত হয়েছিল প্রায় ধ্বংসস্তূপে।[২৮] এখনও নদীর তীরে পড়ে আছে পুলের একটি অংশ।

একদিন সকালে ডেভিডসন গেলেন গ্রিকদের গির্জা পরিদর্শনে। গির্জাটিতে এমন কিছু ছিল না যা উল্লেখ করার মতো। এর চূড়োয় আছে একটি ক্রশ। পাদ্রী একজন ইউরোপীয় গ্রিক, দেখতে বেশ হ্যান্ডসাম, থাকেন গির্জার আঙ্গিনায় ছোট একটি ঘরে। ডেভিডসনের কেরানি ডেভডসনকে জানিয়েছিলেন, শহরে এখন গ্রিকদের সংখ্যা কম কারণ তারা বাঁচে না বেশি দিন। তবে ইঙ্গিত দিলেন যে, ভারতীয় রমণী ও গ্রিকদের মধ্যে বিয়ের চল ছিল। পুরোহিতদের দ্রুত মৃত্যুর কারণ যে কেউ-ই বলে দিতে পারবে। কারণ তাদের বাড়ি বদ্ধ এক গলির মধ্যে। যার আশপাশে বিষাক্ত নর্দমা কখনও যা পরিষ্কার করা হয়নি। গির্জাটি ত্রিশ ফুট লম্বা আর বিশ ফুট চওড়া। ঘরের পূর্ব কোণে মাঝামাঝি দুটি বড় মোম জ্বলছে। মাঝামাঝি টাঙ্গানো ভার্জিন মেরির একটি ছবি; তাকিয়ে আছেন তিনি বিছানায় শুয়ে থাকা যিশুর দিকে, যার বয়স দেখলে মনে হয় তেরোর মতো। পাশে যোশেফ। এর বাঁ দিকে সাত আট ফুট উঁচু কুমারী মেরির ছবি, দেখলে মনে হয় পঁয়ত্রিশ বছর বয়স হবে তাঁর। এ ছাড়া আরো আছে যিশু, জিবরাইল ও আরো দেবদূতের ছবি, এগুলি আঁকা হয়েছে কাঠ বা তামার ওপর। বাড়িটি তেলরংয়ে করা মিনিয়েচারের মতো, চমৎকারভাবে বার্নিশ করা। বছর পাঁচেক আগে গ্রিস থেকে এগুলো যোগাড় করা হয়েছে। এ ছাড়াও আছে রাফায়েলের অনুকরণে 'লাস্ট সাপার' এর একটি ভালো প্রিন্ট। ছবিগুলি নিচে, মেঝেতে আছে একটি পাথর যাতে জনৈক গ্রিক ভদ্রলোকের স্মৃতিতে উৎকীর্ণ করা আছে ইংরেজি ও গ্রিক লিপি।

ডেভিডসন আরো জানিয়েছেন, রেসকোর্সের পাশে আছে গ্রিকদের একটি কবরস্থান। সমাধিগুলো অলংকৃত বা সুন্দর কোনটিই নয় বরং সবগুলি কবরই নোংরা ও অবস্থা খারাপ। এগুলি দেখাশোনার জন্য দারোয়ান থাকা সত্ত্বেও পুরো চত্বরটি গরু বাছুর আর ছাগলে পূর্ণ।

আরেকদিন ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট মি. স্কিনারের সঙ্গে হাতিতে চড়ে যাচ্ছিলেন ডেভিডসন। তখন তিনি তাঁকে জানালেন, ঢাকায় আছে একটি হর্টিকালচারাল সোসাইটি এবং সমিতির একটি বাগানও আছে। বাগান বলে তিনি যা দেখলেন তা একটি অপরিচ্ছন্ন মাঠ। বাগানে সেচের ব্যবস্থা করতে গিয়ে চাঁদার টাকা গেছে শেষ হয়ে। বাগানে আছে মরিশাসের কিছু আখ এবং কিছু চারা যা দেখতে 'কটন বুশ'-এর মতো। তবে, লিখেছেন ডেভিডসন, স্কিনার না দেখালে এ বাগান তার চোখে পড়তো না।

এ সময় মজার একটা দৃশ্য দেখলেন ডেভিডসন। কিছু বাঙালি, চুল তাদের অদ্ভুত ভাবে আঁচড়ানো—দূর থেকে মনে হয় যেনো ইউঝোপ।

বেশ কয়েকদিন ডেভিডসনের চোখে পড়েছে, মহিলারা মাথায় করে বিরাট বিরাট কচ্ছপ নিয়ে যাচ্ছেন বিক্রি করার জন্যে। এর একটির ওজন বিশ থেকে ত্রিশ পাউন্ড। দাম পাঁচ পয়সা বা দুই পেন্সের মতো। জেলেদের এটি খেতে বাধে না এবং নিম্নবর্ণের লোকেরাই গ্রহণ করে এ ধরনের অপবিত্র খাদ্য। ডেভিডসনের মনে হয়েছে, বোম্বের মতো এখানেও ঝড়ের সময় সামুদ্রিক কচ্ছপ তীরে এসে মাঝে মাঝে আছড়ে পড়ে।

৭

একদিন ঘোড়ায় চড়ে রাস্তায় বেড়াচ্ছেন ডেভিডসন। এমন সময় চোখে পড়লো একজন বৃদ্ধ চীনা, তারপর আরেকজন, এমনি করে প্রায় ডজন খানেক। ডেভিডসন চীনে ভাষায় তাদের সম্বোধন করলে তারা খুব অবাক হয়ে গেলো। থেমে গেলো সবাই, উজ্জ্বল হয়ে উঠলো আনন্দে আর চিৎকার করে বলতে লাগলো, 'চীন, চীন!' তাঁরা চা উৎপাদক; যাচ্ছেন আসাম। সেখানে আসাম চা কোম্পানিতে যে সব দেশীয়রা আছেন তাঁদের শেখাবেন চা-এর উৎপাদন কৌশল। ডেভিডসন তাঁদের শুভেচ্ছা জানিয়ে ভবিষ্যদ্ববাণী করলেন যে, পঞ্চাশ বছরের মধ্যে তাঁদের শ্রমের ফলে শুধু চায়ের দাম কমবে না, ইউরোপে যে চা পান করা হয় তার গুণগত মানও বৃদ্ধি হবে, এমনও হতে পারে এখানে এক সময় এমন চা তৈরি হবে এবং সে সব দেশে ভারতীয় চা-এর বিরাট বাজার হবে, যে বাজারে এখন এক হাজার পাউন্ডের বেশি চা বিক্রি হয় না।

মি. ওয়াইজের সঙ্গে কথা বলার সময় ডেভিডসন বেশ কৌতূহলোদ্দীপক একটি তথ্য জানতে পেরেছিলেন। ত্রিপুরাবাসীরা অনেকদিন থেকে চা পান করে। ঐ অঞ্চলে চা গাছ জন্মে। চা-এর পাতা তোলার পর তারা তা একটি বাঁশের ফোকরে রাখে। সাত-আট দিন 'পর সেই শুকনো পাতা ফুটানো পানিতে ভিজিয়ে সে পানি পান করে।

তা সত্ত্বেও বলতে হয় চা পাতা আবিষ্কৃত হয়েছে মাত্র। আগে জানলে, ফরাসিরা যখন প্রথম এখানে এসেছিল তখনই হয়তো ত্রিপুরায় চা উৎপাদন কারখানা গড়ে তুলতো; ইয়াংকিরা এর সাফল্যের জন্য মন দিতো রেলরোড বা স্টিল বোট নির্মাণে। মন্তব্য করেছেন ডেভিডসন, 'এ দেশের উৎপাদনের প্রতি যে অবহেলা ও আলস্য দেখিয়েছে আমাদের দেশ, বিশ্বের কোন দেশ তা দেখায়নি, এ মুহূর্তে ভারতে আছে অনাবিষ্কৃত সম্পদের ভাণ্ডার।'

ঢাকার পিলখানা দেখতে গিয়েছিলেন ডেভিডসন। চাটগাঁ ও তার আশপাশের অঞ্চল থেকে কুকিরা হাতি ধরে, তারপর এখানে পাঠানো হয় পোষ মানানোর জন্য। ডেভিডসন যখন গেলেন পিলখানা দেখতে তখন সেখানে হাতির সংখ্যা ১২৫; বেশির ভাগই বাচ্চা এবং এগুলিকে কাজে লাগানোর জন্যে প্রস্তুত করতে বেশি খরচ হবে। ডেভিডসনের মনে হয়েছে খোলা জায়গায় এভাবে তাদের না রেখে আশপাশের আম বাগানে রাখলে এদের ভালো হতো কারণ তাহলে সব ধরনের তাপমাত্রার সঙ্গে তারা মানিয়ে নিতো। হাতিগুলোকে স্নান করানোর জন্যে নিয়ে যাওয়া হয় নদীতে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় বছর পঁচিশেক পর, পিলখানার হাতিদের চরাবার জন্য জায়গা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছিল। এর আগে হাতি চড়াবার জন্য জায়গা ছিলো না। ১৮৬৪ সালে. লে. গভর্নর ঢাকায় এলে, 'ঢাকা কমিটি'র সদস্যরা জানিয়েছিলেন, হাতিরা শহরে সৃষ্টি করছে 'সিরিয়াস নুইসেন্স'-এর। এর পরিপ্রেক্ষিতে খুব সম্ভব বিস্তীর্ণ রমনা এলাকা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছিল হাতি চড়াবার জন্য। পিলখানা থেকে রমনায় হাতি নেওয়ার জন্য যে পথটি ব্যবহৃত হতো কালক্রমে তাই পরিচিতি লাভ করেছিল এলিফ্যান্ট রোড নামে।[২৯]

১৮৪১ সালের চৌঠা ফেব্রুয়ারি কর্নেল ডেভিডসন রওয়ানা হলেন সুন্দরবনের দিকে। লক্ষ্য কলকাতা। ঢাকা থেকে এ জন্য ভাড়া করেছিলেন তিনি বিরাট এক বজরা এবং 'খুব বড়' দুটি পুলওয়ার। কলকাতায় পৌঁছেছিলেন তিনি একুশে ফেব্রুয়ারি।

ডেভিডসন তাঁর ঢাকা ভ্রমণ শেষে ঢাকা সম্পর্কে একটি মন্তব্য করেছেন যা দিয়ে শেষ করবো এ নিবন্ধ। লিখেছেন তিনি—

'মূল শহরের প্রান্ত থেকেই জঙ্গলের সীমানা। প্রায় দু'মাইল বিস্তৃত অঞ্চলটি ছবির মতো পুরনো মসজিদ, স্মৃতিস্তম্ভে সাজানো যা এ শহরের অতীত গৌরবের সাক্ষী। আগন্তুকরা সকাল বা বিকেলে যখন ঘোড়ায় চড়ে বেড়াবেন তখন, লিখেছেন ডেভিডসন, 'শহরকে ঘিরে আছে যে জঙ্গল তা এড়িয়ে চলবেন বিশেষ করে সূর্যাস্তের সময়। এ বিষয়ে আমি তাদের সতর্ক করে দিচ্ছি। ঐ সময় জঙ্গল ও শহরের সীমান্ত পেরুবার বা শহরে ঢোকার সময় শরীর হঠাৎ কাঁটা দিয়ে ওঠে।'

কিন্তু কেন শরীর শিউরে উঠতো? সেটি কি অশরীরী কোন কারণে, নাকি রাইডার হ্যাগার্ডের নায়ক হিসেবে নিজেকে কল্পনা করে, তা অবশ্য ডেভিডসন উল্লেখ করেননি।

তথ্যপঞ্জী

১. জেমস টেলর, *কোম্পানী আমলে ঢাকা,* ঢাকা, ১৯৭৮, পৃঃ ৫৮।

২. *তাভেরনিয়ের ভারত ভ্রমণ,* অনুবাদ সুধাবসু, কলকাতা, ১৯৭৩, পৃঃ ৮৮।

৩. মুনতাসীর মামুন, *হৃদয়নাথের ঢাকা শহর,* ঢাকা, ১৯৮৫, পৃঃ ১৩।

৪. Charles O'Doyly, *Antiquities of Dacca,* London, 1824, p. 10.

৫. S.M Taifoor, *Glimpses of Dhaka,* Dhaka, 1984, pp 105-7

৬. Charles O'Doyly, *Op cit,* p. 10

৭. S.U. Ahmed, *Dacca,* Dacca, 1986, pp. 131-132.

৮. *সংবাদ,* পূর্ণ চন্দ্রোদয়, ১৮৫২।

৯. জেমস টেইলর, *পূর্বোক্ত,* পৃঃ ৬১।

১০. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, *'নায়েব নাজিম',* মুনতাসীর মামুন, *কর্নেল ডেভিডসন যখন ঢাকায়,* ঢাকা, ১৯৯১।

১১. Reginald Heber, *A Narrative of a Journey through the upper Provinces of India, from Calcutta to Bombay,* 1820-25, London, 1824.

১২. W. K. Firminger, *'Some Old Graves of Dacca',* Bengal Past and Present, Vo. 13, 1916.

১৩. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, W. K. Firminger, *'Armenian Church of the Holy Resurrection,* 'Dacca' Bengal Past and Present, Vo. 13,1916.

১৪. জেমস টেইলর, *পূর্বোক্ত,* পৃঃ ১৯৮।

১৫. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, মুনতাসীর মামুন *'রমনার স্মৃতি', স্মৃতিময় ঢাকা,* ঢাকা, ১৯৮৮।

১৬. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, *'Report on the Decline of the Dacca Muslin Industry',* উদ্ধৃত, আবদুল করিম, ঢাকাই মসলিন, ঢাকা, ১৯৬৫, এবং টেইলর, পৃঃ ২৫২।

১৭. *টেইলর, পূর্বোক্ত,* পৃঃ-২৫২।

১৮. S. U. Ahmed, *op cit,* p. ১২৯.

১৯. ১৭০০ থেকে ১৯৬১ পর্যন্ত ঢাকা শহরের লোকসংখ্যার জন্য দেখুন F. Karim Khan and Nazrul Islam, *'High Class Residential Area in Dacca City,'* The Oriental Geographer, Vol. III, No. I, 1964, p. I.

২০. *টেলর, পূর্বোক্ত,* পৃঃ ৯৭-৯৮।

২১. *হৃদয়নাথের ঢাকা শহর,* পৃঃ ৩৪।

২২. James Wise, *Notes on the Races, Castes and Trades of Eastern Bengal*, London, 1885.

২৩. *Ibid.*

২৪. জেমস টেলর, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ৬০-৬৯।

২৫. James Wise, *op cit.*

২৬. জেমস টেইলর, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ১৩৩, ২৫৪।

২৭. *তাভেরনিয়ের ভারত ভ্রমণ*, পৃঃ ৮৮।

২৮. হেবারের *প্রাগুক্ত গ্রন্থ*। পৃঃ

২৯. Azimusshan Haider, *History and Romance in Place Names* Dacca, 1967.

উনিশ শতকে ঢাকার থিয়েটার

১

ঢাকায় মোগল রাজধানী স্থাপিত হয় ১৬১০ সনে।[১] ঢাকা, কলকাতা, মুর্শিদাবাদ— বিভিন্ন সময়ে স্থাপিত বাংলার এই তিন রাজধানীর মধ্যে ঢাকাই প্রাচীনতম। ঐ সময়, প্রধানত প্রশাসনিক এবং বাণিজ্যিক কারণে ঢাকার বিকাশ শুরু হয়। প্রশাসনিক কারণ প্রধান হলেও, মানুচ্চি, মানরিক বা ট্যাভারনিয়ারের বিবরণ পড়ে মনে হয় বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবেও ঢাকার সুনাম ছিল। ঢাকা বিস্তৃত ছিল তখন নদীর পাড় থেকে মীরপুর পর্যন্ত। অবশ্য এটা ঠিক বর্তমান পুরনো ঢাকা ও মীরপুরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে লোকবসতি কম ছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল ইংল্যান্ডে, ফ্রান্স, হল্যান্ড, গ্রিস, পর্তুগাল, ইরান প্রভৃতি দেশ থেকে বিভিন্ন সময়ে বণিকরা পদার্পণ করেছে ঢাকায়। কেউবা এসেছে ভাগ্যান্বেষণে এবং তারপর থেকে গেছে এই শহরে। বলা যেতে পারে মোগল আমলে ঢাকা পরিণত হয়েছিল একটি কসমোপলিটান শহরে। কিন্তু প্রশাসনিক কেন্দ্র যখন পরিবর্তিত হয়েছে তখন ঢাকার ক্ষয়ও শুরু হয়েছে।

মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ার পর প্রশাসনিক কেন্দ্রও বদল হলো মুর্শিদাবাদে। কিন্তু প্রশাসনিক কেন্দ্র বদল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঢাকার ক্ষয় শুরু হয়নি। কারণ সুবাদারের প্রতিনিধি নায়েব-নাজিম ঢাকায় থেকে পূর্ববঙ্গ শাসন করতেন।

কোম্পানি আমলে বা বলা যেতে পারে উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে শহরের মোটামুটি ক্ষয় শুরু হয় এবং শহরের পরিধিও সঙ্কুচিত হতে থাকে। ঢাকা খুব দ্রুত পরিণত হয় নোংরা, জঙ্গলময়, অস্বাস্থ্যকর একটি শহরে। বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে তার স্থান লুপ্ত হয়। লোকসংখ্যাও কমে যায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে। এক সময় যে ঢাকা ছিল রপ্তানি কেন্দ্র, যে রপ্তানী কেন্দ্র ছিল তার সমৃদ্ধির মূলে ইংরেজ আমলে তার ক্ষয় শুরু হয়। সাম্রাজ্যবাদী শোষণে এ ছাড়া আর অন্য কোন বিকল্প ছিল না। উনিশ শতকের প্রথমার্ধের এই ক্ষয়ের চিত্র পাই আমরা বিভিন্ন পর্যটকের লেখায়।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে শেষ দশক পর্যন্ত ঢাকার যে চিত্র আমরা পাই তা অত্যন্ত করুণ। ১৮৪০ সনে ঢাকা সম্পর্কে ঢাকার সিভিল সার্জন টেলর লিখেছেন— 'যে অংশটি নিয়ে শহরটি গঠিত তা কেবল নদীতীরেই সীমাবদ্ধ এবং তীর বরাবর শহরের রাস্তাঘাট, বাজার ও গলিপথ ইত্যাদি দৈর্ঘ্যে চার মাইল এবং প্রস্থে ১.২৫ মাইল বিস্তৃত।'[২]

১৮৫৯ সনে তৈরি সার্ভেয়ার জেনারেলের ঢাকা ম্যাপ দেখলে ১৮৫৭-এর পর ঢাকা শহরের প্রকৃতিটি বোঝা যাবে। ম্যাপ অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে বুড়িগঙ্গা নদীর পাশেই বসতিপূর্ণ এলাকা বা শহর বলতে যা বোঝায় তা গড়ে উঠছে। ঐ এলাকাগুলো হচ্ছে, ফরাশগঞ্জ, বাংলাবাজার, রোকনপুর, দক্ষিণ মৈশুণ্ডি, যোগীনগর, ঠাটারীবাজার,

কোতয়ালী, কুমারটুলী, জিন্দাবাহার, মালিটোলা, নয়াবাজার, বেচারাম দেউরী, জেল, হোসেনী দালান, আমলিগোলা, নবাবগঞ্জ এবং বুলাই টুলী। শহরতলি বা 'Partialy built up area'গুলো ছিল সরকারি হাতিখেদা বা পিলখানা, ঢাকেশ্বরী; আগাসুর দেউরী, নিমতলী, পুরনো ক্যান্টনমেন্ট। বিরান অঞ্চল ছিল পল্টন, রমনা, ধানমন্ডি, আজিমপুর।

বলা হয়ে থাকে ঢাকা শহরের ক্রমোন্নয়ন শুরু হয়ে ১৮৬৪ সনের পর। কথাটি একদিক দিয়ে সত্য। কারণ ঐ সময় ঢাকা পৌরসভা স্থাপিত হয়। কিন্তু ক্রমোন্নয়ন বলতে আমরা বুঝব শহরের ভার শুধু পৌরসভার হাতে ন্যস্ত করা হলো এবং পরবর্তী পঞ্চাশ বছর পৌরসভা শহরের স্বাস্থ্যোন্নয়নের জন্যই অধিকাংশ সময় ব্যয় করেছে। এ ক্রমোন্নয়ন মানে, ঢাকা শহরে কিছু রাস্তাঘাট তৈরি হয় (খুবই সামান্য) কিছু জলাজঙ্গল সাফ হয় কিন্তু শহরে পরিধি আর বাড়েনি।

সত্তর দশকের ঢাকার অবস্থা সম্পর্কে আমরা জানতে পারি শহরের সহকারী সিভিল সার্জন কাটক্লিফের এক রিপোর্ট। তিনি লিখেছেন[৩] : ঢাকা শহরে ময়লা নিষ্কাষণের কোন বন্দোবস্ত নেই এবং যুগ যুগ ধরে এই মলমূত্র আবর্জনা সঞ্চিত হচ্ছে শহরের লোকদের বাড়ির আঙ্গিনায়, রাস্তায়। শহরের কুয়োর পানি ভয়ানকভাবে দূষিত (বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা তখন ছিল না), এর মধ্যে আবার ময়লা আবর্জনা পড়ছে অহরহ, নদীর দু'পাশে আবর্জনা, ফলে নদীর পানি দূষিত, শহর বিভক্ত অজস্র সরু অন্ধকারাচ্ছন্ন গলি দ্বারা এবং সেখানেও ময়লা উপচে পড়ছে। ফলে বাতাসও দূষিত। আর আছে একটি নোংরা খাল (ধোলাইখাল) দুর্গন্ধময় ড্রেন এবং জঙ্গল। এককথায় বলা যায়, যে বাতাস গ্রহণ করা হয় তা দূষিত, যে পানি পান করা হয় তা দূষিত, যে ভূমিতে লোক বসবাস করে তা নোংরা এবং স্যাঁতসেঁতে এবং এ পরিবেশে ঘুরে বেড়ায় প্রায় দশ হাজার অভুক্ত নেড়ী কুকুর।[৪]

আরো পরে, আশীর দশকে কবি নবীনচন্দ্র সেন লিখেছেন, 'ঢাকায় দুইদিন ছিলাম। ঢাকা দেখিয়া কিছুমাত্র সুখী হইতে পারি নাই। দেখিবার বড় কিছুই ছিল না। রাস্তাগুলি অতিশয় সংকীর্ণ এবং স্যাঁতস্যাঁতে ও দুগর্ন্ধময় যে দু'দিন মাত্র থাকিতে আমার কষ্ট বোধ হইয়াছিল।'[৫]

নবীনচন্দ্র অতিরঞ্জিত করেননি। শহরের প্রধান রাস্তা ছিল ঐ সময় একটি। অবশ্য উনিশ শতকের শেষে আরো কিছু রাস্তা নির্মিত হয়। যানবাহনের মধ্যে প্রধান ছিল ঘোড়ার গাড়ী। তারও চল শুরু হয় ষাটের দশকে। শহরে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ শুরু হয় সত্তরের দশকে। বিদ্যুৎ এলো বিশ শতকে। প্রথমে শহরে অধিকাংশ ছিল কুঁড়েঘর। ষাটের দশক থেকে অবস্থাপন্ন মধ্যবিত্তরা পাকাবাড়ি তুলতে শুরু করে। ১৮৮৮ সনের সংবাদপত্রের রিপোর্টেও দেখা যাচ্ছে শহরের মধ্যভাগ তো বটেই নবাবগঞ্জ, চাঁদনিঘাট ও চকবাজার প্রভৃতি অঞ্চলের অধিকাংশই ছিল কুঁড়েঘর। ইটের তৈরি বাড়ির ফাঁকে ফাঁকে খড়োঘর—দৃশ্যটি নিশ্চয় মনোহর নয়। কিন্তু এই দৃশ্য প্রমাণ করে সমাজে মধ্যবিত্তদের প্রসার ও দরিদ্রের দারিদ্র্য।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যেতে পারে, উনিশ শতকের মধ্যভাগে ভারতবর্ষের

অন্য অনেক শহরের তুলনায় ঢাকা শহর ছিল নিতান্ত গেঁয়ো, অন্ধকারাচ্ছন্ন, অপরিচ্ছন্ন এক শহর। মোগল রাজধানী হিসেবেই লোকে যা এর কথা স্মরণ করতো। উনিশ শতকের সত্তর দশক থেকে ঢাকা আধুনিক অর্থে শহর হয়ে উঠতে থাকে। রাস্তাঘাট-বাড়িঘর নির্মিত হতে থাকে। স্কুল-কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। মুদ্রণযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। সংবাদপত্র/সাময়িকপত্র প্রকাশিত হতে থাকে একের পর এক। নাগরিক সুবিধাদি সম্পর্কে তারা সচেতন হয়ে ওঠে, জনমত গড়ে তুলতে থাকে। নাগরিক কর্মচাঞ্চল্যের স্পন্দন শুরু হয়।

২

অস্বাস্থ্যকর, নোংরা, স্যাঁতসেঁতে এই শহরে লোকসংখ্যা ১৯০১ সনেও এক লক্ষ ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঢাকা ছিল পূর্ববঙ্গের প্রধান শহর, কলকাতার পরই যার স্থান এবং স্বভাবতই পূর্ববঙ্গবাসীদের সব আগ্রহের কেন্দ্র ছিল ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের যারা বড় জমিদার তারা পাড়ি জমাতেন কলকাতায়। ছোটখাটো জমিদারদের জন্যে ছিল ঢাকা। সরকারী কাজের জন্যে মফস্বল থেকে অনেককে অহরহ আসতে হতো ঢাকায়। গ্রাম থেকে উচ্চাভিলাষী ছাত্ররা পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্যে আসতো এ শহরে। এ ছাড়া বিভিন্ন উৎসবাদিতে মফস্বল থেকে লোক পাড়ি জমাতো শহর ঢাকায়। ঢাকায় যারা বসবাস করতো তাদের মধ্যে ছিল কিছু ধনী ভূমধ্যধিকারী এবং ধনী ব্যবসায়ী। যেমন ঢাকার নবাব পরিবার বা রূপলাল দাশদের পরিবার। এদের সংখ্যা খুব একটা বেশি ছিল না এবং নিছক অর্থের জোরেই তারা সামাজিক প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ন রাখছিল। ছোটখাটো জমিদারও ছিল কিছু যারা আবার ব্যবসাও করতো। সাধারণ অসচ্ছল মানুষ ছাড়া আর ছিল প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত চাকরিজীবী, বিভিন্ন পেশাজীবী এবং ছোটখাটো ব্যবসায়ী, শিক্ষক—এক কথায় যাদের আমরা মধ্যবিত্ত বলতে পারি।

অর্থে যারা বড়, জীবন ছিল তাদের ভোগের। জীবন ছিল তাদের জন্যে আহার-বিলাস এবং নিদ্রা। যেমন নবাব আহসানউল্লাই একবার বেলুন ওড়াতে গিয়ে উড়িয়ে দিলেন দশ হাজার টাকা।[৬] আর রক্ষিতা না রাখলে তো তাদের সামাজিক স্ট্যাটাসই থাকত না।

প্রভাবশালী ছিল উচ্চমধ্যবিত্তরা। যাদের কিছু ছিল সরকারি কর্মচারী এবং বিভিন্ন পেশাজীবী যার মধ্যে প্রধান হলো উকিল। এর পর স্থান ছিল শিক্ষক ও অন্যান্যদের। একত্রিত অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে এককভাবে তারা ছিল শহরের প্রভাবশালী শ্রেণী। যেমন ঢাকা পৌরসভার প্রথম নির্বাচিত চেয়ারম্যান আনন্দচন্দ্র রায় ছিলেন একজন জাঁদরেল উকিল।

উচ্চমধ্যবিত্তদের জীবনেও ছিল স্বাচ্ছন্দ্য। শুধু ভোজনে আর অন্যান্য কর্মে তারা টাকা ওড়াত না। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে তা করা তাদের পক্ষে সম্ভবও ছিল না কারণ তাদের সবারই আশ্রিত সংখ্যা নেহাৎ কম থাকত না। অন্যদিকে শিক্ষক বা অন্যান্যদের জীবনযাত্রা ছিল খানিকটা কষ্টের। কারণ তাদেরও আশ্রিত থাকত, কিন্তু আয় ছিল তাদের সীমিত। পনের থেকে চল্লিশ টাকা ছিল একজন শিক্ষকের বেতন।[৭] কিন্তু তা সত্ত্বেও এই ছোট শহরে ছিলেন তাঁরা পরিচিত, সম্মানিত এবং অনেক ক্ষেত্রে প্রভাবশালীও।

কিন্তু এই একঘেয়ে শহরে তারা জীবনযাপন করতেন কিভাবে? একঘেয়ে বলছি এ জন্যে যে, মেতে থাকার মতো কিছু তো এই শহরে ছিল না। ছিল না স্থায়ী বিনোদনের ব্যবস্থা। তাহলে?

কর্নেল ডেভিডসন নামে এক ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ার ১৮৪০-এর দিকে এসেছিলেন ঢাকায়। তাঁর রোজনামচায় তিনি আশ্চর্য হয়ে লিখেছেন,[৮] দিনে রাতে যে কোন সময় ঢাকায় বেহালার শব্দ শোনা যায়। আর বেহালাগুলিও খুব সুন্দর। কিন্তু দামে এতো সস্তা। মাত্র দু'টাকায় একটি বেহালা পাওয়া যায়। তারপর তিনি উপসংহারে পৌঁছেছেন এভাবে : বাঙালীরা আসলেও 'মিউজিক্যাল পিপল'।

হৃদয়নাথ মজুমদার নামে ঢাকার এক আইনজীবী তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন[৯] লখনৌ শহর বিখ্যাত কণ্ঠ সঙ্গীতের জন্যে। আর ঢাকা তবলা এবং সেতারের জন্যে। ঢাকার সেতার তার নিজস্ব ঘরানার সৃষ্টি করেছে। আসলেও তবলা বাদন ঢাকায় খুব জনপ্রিয় ছিল। ওয়াজেদ আলী শা'র তবলিয়ার ছেলে আতা হোসেন, খয়রাতি জমাদার, মিথান খান, সুপান খান—এরা ছিলেন ঢাকার বিখ্যাত তবলিয়া।

গানের জন্যেও ঢাকার কদর ছিল। হোলির সময় ঢাকায় গান নিয়ে প্রতিযোগিতা চলত, এক বছর লক্ষ্মীবাজারে রাজাবাবু ময়দানে ও অন্য বছর উর্দু বাজারে লালাবাবুদের বাড়িতে পালা করে হোলির গান হতো। সুর তাল লয় নিয়ে সে গানের আবার বিচারও হতো।"[১০]

ইন্দুবালা ঢাকায় গান গাইতে আসার আগে কালীঘাটের মন্দিরে প্রার্থনা করতে গিয়ে বলেছিলেন, 'মা ঢাকা যাচ্ছি। ঢাকা তালের দেশ।... মান রাখিস মা।'[১১]

এ জন্যে বোধহয় ঢাকায় ধ্রুপদ সঙ্গীতেরও বেশ সমাদর ছিল। হাকিম রমজান

আলী রমজ এবং খাজা শাহজাদা ছিলেন ঠুমরীর ওস্তাদ। রওশন খান পাঞ্জাবী ঢাকায় টপ্পা চালু করেন। ইমাম বখশ, কানু খান গাইতেন খেয়াল।[১২]

এককথায় বলা যেতে পারে ঢাকায় সঙ্গীতের একটি ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল। তবে উপরোক্ত নামগুলো দেখে মনে হয় এই 'ওস্তাদ'রা বহিরাগত। মোগল যুগে শিল্পীদের প্যাট্রোনেজ করার যে ব্যাপারটি ছিল ঢাকায় বোধহয় তখনও তা চালু ছিল। যেমন ঢাকার নবাব পরিবারের লোকেরা কণ্ঠ সঙ্গীতের ওস্তাদ রাখতেন মাসোহারা দিয়ে। মৌলবী বাজারের জমিদার এবং নবাবপুরের বসাক পরিবার বাদ্যযন্ত্রী রাখতেন।[১৩]

কিন্তু এ বিনোদন বা বিশেষ বিনোদন ছিল গুটি কয় সম্পদশালী পরিবারের জন্যে। সাধারণের সঙ্গে এ বিনোদন মাধ্যমের কোন পরিচয় ছিল না।

অবশ্য সাধারণের জন্যে যাত্রা ছিল এবং যাত্রার জন্যে ঢাকা বিখ্যাতও ছিল।[১৪] কিন্তু সে হতো কালেভদ্রে।

উনিশ শতকের ঢাকার মানুষদের প্রধান বিনোদন ছিল ঘোড়দৌড় এবং বারবনিতা গৃহ।

ঘোড়দৌড়ের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন নবাব পরিবার। নবাব পরিবারের ঘোড়ার সঙ্গে বাজি রেখে দৌড়াবার জন্যে কলকাতা থেকে ঘোড়া আনা হতো এবং ঢাকাবাসীরাও বিলক্ষণ এই দৌড় উপভোগ করতেন। 'ঢাকা প্রকাশ' তো ক্ষোভ জানিয়ে একবার লিখল, 'ঘোড়দৌড় উপলক্ষ্যে এবারও ঢাকার সমস্ত অফিস-আদালত বন্ধ হইয়াছিল। শনিবার একেবারেই বন্ধ। মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার নামমাত্র কিছুকালের জন্যে খোলা ছিল; কোন কার্য্য হয় নাই। মোকর্দ্দমা উপলক্ষ্যে মফঃস্বলবাসীরা বহু অর্থ ব্যয়ে বহুদূর স্থান হইতে আসিয়া সহসা কাছারী বন্ধ দেখিয়া মনস্তাপে গবর্ণমেণ্টকে গালি দিতে দিতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। এরূপ অনিশ্চিতভাবে কাছারী বন্ধ না দিয়া যদি 'হর্সরেস হলিডে' নামে একটা কাছারী বন্ধের ঘোষণা গবর্ণমেন্ট প্রচার করেন, তবে লোকের বহু ক্ষতি নিবারণ হইত।'[১৫]

কিন্তু উনিশ শতকে ঢাকার খ্যাতি ছিল অন্য কারণে এবং এই কারণটিই ছিল ঢাকার বিনোদনের প্রধান মাধ্যম। উনিশ শতকের ঢাকা ছিল বারবনিতাদের ঢাকা । এর সঙ্গে উপাচার হিসেবে ছিল মদ, খেমটা নাচ এবং বাঈজীদের গান।[১৬]

সরকারি হিসেব মতে আগেই উল্লেখ করেছি, এই বিশ শতকের শুরুতে অর্থাৎ ১৯০১ সনে ঢাকার লোকসংখ্যা ছিল ৯০,৫৪২। আর বারবনিতাদের সংখ্যা ছিল ২১৬৪ জন। বেসরকারি হিসেব যে তার কয়েকগুণ বেশি ছিল তার প্রমাণ গনিউর রাজার রোজনামচা।[১৭]

ষাটের দশকে 'ঢাকা প্রকাশ' মন্তব্য করেছিল—'সদর রাস্তার উভয় পার্শ্বে উত্তম উত্তম যে সকল দালান আছে তাহার সমুদায়ই প্রায় বেশ্যাপূর্ণ হইয়াছে। বেশ্যাবাস সংশ্রব নাই, রাজপথের উভয় পার্শ্বে এরূপ উৎকৃষ্ট দালান নাই বলিলেই হয়।'[১৮]

বাই-খেমটা মানুষের জীবনের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল যে, তা সংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এমনকি কবি নবীনচন্দ্র সেন পর্যন্ত তাঁর ছেলের বিয়েতে ঢাকা

থেকে বাই-খেমটার দল নিতে পেরে শ্লাঘা অনুভব করেছিলেন।

কিন্তু বারবনিতা পাড়ায় তো সাধারণ মানুষ কোন কিছুর তোয়াক্কা না করে যেতে পারে। আর জমিদারদের তো রক্ষিতা না থাকলে সামাজিক মর্যাদাই থাকে না। কিন্তু যাদের অবস্থান মাঝামাঝি তাদের কি অবস্থা?

তারা অনেকেই পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এবং ঐ যুগের তুলনায় লিবারেল। তাছাড়া ব্রাহ্ম আন্দোলনও সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলছে। এই মধ্যবিত্তরা স্বাভাবিক কারণেই নিজেদের সমাজের নৈতিকতার ধ্বজাধারী মনে করে এবং সমাজের নিজেদের আসন উঁচুতে রাখতে চায়। ফলে স্বাভাবিক কারণেই অহরহ তারা ঘোড়দৌড়ে যেতে পারে না, বাঈজীদের আসরে তো নয়। সুতরাং নিরানন্দ এই ক্ষুদ্র শহরে তাদের বিনোদনের মাধ্যম থাকে তিনটি—ধর্মচর্চা যা মাঝে মাঝে রক্ষণশীলতার পর্যায়ে চলে যায়, দুই, আডডা অথবা পরচর্চা এবং তিন বাকল্যান্ড বাঁধে ভ্রমণ। তাই এ সবের বিকল্প হিসেবেই ষাটের দশকে ঢাকা শহরে থিয়েটার চর্চা শুরু হয় এই মধ্যবিত্তদের উদ্যোগে। কারণ পুরো জিনিষটাই ছিল এ শহরে অভিনব এবং উত্তেজক কিন্তু অনাচার নয় বা মধ্যবিত্তদের নৈতিকতাবিরোধী নয়। অন্যদিকে তারা আরো ভেবেছে, নাটকের মাধ্যমে সমাজ সংস্কার করা হয়তো সম্ভব।[১৯]

এই পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকায় থিয়েটার চর্চা শুরু এবং পরবর্তী পঞ্চাশ বছর, বায়োস্কোপের প্রচলনের পূর্ব পর্যন্ত থিয়েটারই হয়ে উঠেছিল পুরো শহরবাসীর বিনোদনের প্রধান মাধ্যম। মধ্যবিত্তরা তো বটেই, তথাকথিত অভিজাতরাও এদের অনেক ক্ষেত্রে 'প্যাট্রোনাইজ' করতে চেয়েছেন।

তবে এ কথা ঠিক, শুধু বিনোদনের বিকল্প কারণেই নয়, থিয়েটার চর্চার পিছনে কলকাতার প্রভাবও অস্বীকার করা যায় না। ১৮৭৩ সনে 'ঢাকা প্রকাশ' লিখেছে, 'কলিকাতা অঞ্চলে অভিনয়ের কিরূপ হুজুক পড়িয়াছে, পাঠকগণ অবগত থাকিতে পারেন।... কলিকাতা হুজুকের উতস স্বরূপ, তথা হইতেই উৎসারিত হইয়া অন্যান্য নগরোপনগর ও গ্রামাদিতে উহা পরিব্যাপ্ত হয়। ...আমাদিগের ঢাকা [য়]... আজকাল নাটকাভিনয়ের নিতান্ত ধুম পড়িয়াছে।[২০]

৪

ঢাকায় থিয়েটার শুরু হলো কবে থেকে সে সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোন তথ্য এখনও পাওয়া যায়নি। তবে ঢাকার থিয়েটার সম্পর্কে একটি খবর পাওয়া গেছে কলকাতার 'হরকরা' পত্রিকায়। পত্রিকার ঢাকাস্থ সংবাদদাতা লিখেছিলেন,

"Our native friends entertain themselves with occsaional theatrical performances and the 'Nil Darpan' was acted on one of these occasions...."[২১]

এতে নিশ্চিত হয়ে বলা যায় যে, 'নীলদর্পণ' ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়ে ঢাকায়ই মঞ্চস্থ হয় প্রথম। সন ১৮৬১। সংবাদটির সূত্র ধরে বলা যেতে পারে, 'নীলদর্পণের' আগেও ঢাকায় অভিনয় কার্য কিছু হয়েছে। কিন্তু এসব ছিল শখের অভিনয়। উপরোক্ত স্বল্প তথ্যাদির ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি অনুমানিক ১৮৬০-এর দিকে ঢাকা থিয়েটারের যাত্রা শুরু।

ঢাকার থিয়েটারের ইতিহাসে 'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি' এবং 'পূর্ববঙ্গ নাট্য সমাজ' একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।

শিশির কুমার বসাক লিখেছেন, আনুমানিক ১২৭২ সনে [বাংলাসন] 'পূর্ববঙ্গ নাট্য সমাজ' বা 'East Bengal Dramtic Hall' গড়ে ওঠে।[২২] ১২৭২ সন মানে ইংরেজি ১৮৬৫। আবদুল কাইয়ুম লিখেছেন, '১৮৬৫ সনে পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমির প্রতিষ্ঠা। পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমির বাঁধা স্টেজ ছিল।'[২৩] সৈয়দ মুর্তাজা আলী লিখেছেন, '১৮৬২ সনে পূর্ববঙ্গ নাট্য সমাজ বা East Bengal Dramtic Hall নামে একটি প্রতিষ্ঠান ঢাকা শহরে গড়ে ওঠে।'[২৪] উপরোক্ত তিনজনের কেউই তাদের তথ্য নির্দিষ্টভাবে নির্দেশ করেননি। ফলে তারিখটি কোন ভিত্তিতে গ্রহণ করা হলো তা বোঝা গেল না।

এ ছাড়া মনে হয় আরেকটি ব্যাপার তাঁরা এক করে ফেলেছেন। সেটা হচ্ছে 'রঙ্গভূমি' এবং 'নাট্য সমাজ'। 'নাট্য সমাজ' গড়ে তোলা এবং সম্পূর্ণ ব্যবসায়িক ভিত্তিতে 'রঙ্গভূমি' প্রতিষ্ঠা করা ভিন্ন ব্যাপার। মনে হয়, উদ্যোক্তারা ব্যবসায়িক ভিত্তিতে 'পূর্ববঙ্গ বঙ্গভূমি' স্থাপন করেন এবং তারপর নিজেদের একটি নাট্য দল গড়ে তোলেন যা পরিচিত হয়ে ওঠে 'পূর্ববঙ্গ নাট্য সমাজ' নামে।

'ঢাকা প্রকাশ'-এর একটি সংবাদও এই অনুমান সমর্থন করে—'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি নামে ঢাকাতে একটি নাট্যশালা আছে। যে সময়ে ঢাকার ধনী ও সম্ভ্রান্তগণ রামাভিষেক নাটকের প্রথম অভিনয় করিতে প্রবৃত্ত হন, তখন বহুতর টাকার সংগ্রহে ইহা সুনিশ্চিত হইয়াছিল।'[২৫] অর্থাৎ প্রথম একটি হল তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু 'রামাভিষেক' অভিনীত হয় ১৮৭২ সনে এবং এটিই ঢাকার প্রথম জনপ্রিয় নাটক।

তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি, ১৮৭০-৭২ সনের মধ্যে ঢাকায় ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রথমে একটি হল স্থাপিত করা হয়, সেখানে একটি বাঁধা স্টেজও ছিল। (এ ধারণা যে একেবারে নিশ্চিত তা নয়। কারণ ঢাকার পুরনো সংবাদপত্র কিছু উদ্ধার করা গেলে হয়তো নতুন কোন তথ্য পায়া যেতে পারে। তবে 'ঢাকা প্রকাশ' এর যেসব খণ্ড আমাদের নজরে পড়েছে তাতে উপরোক্ত অনুমান করা যেতে পারে)। এরপর উদ্যোক্তারা গড়ে তোলেন একটি থিয়েটার গ্রুপ। এর একটি সংবাদ এই ধারণাকে আরো দৃঢ় করে '...প্রথমতঃ রাম ভিষেক নাটকাভিনয়ের নিমিত্ত নানা স্থানীয় ব্যক্তিগণ দ্বারা এক প্রধান অভিনেতৃ দলের সৃষ্টি হয়।'[২৬]

পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি স্থাপিত হয়েছিল 'মন্ত্রি সাহেবের কুঠি ও পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যবর্তী স্থানে বর্তমানে যেখানে জগন্নাথ কলেজ অবস্থিত সেই স্থানে উহা ছিল।'[২৭] এটি স্থাপন করেছিলেন, মোহিনী মোহন দাস (সবজী মহলের জমিদার), অভয়দাস (উকিল), মতিলাল চক্রবর্তী (নর্মল স্কুলের পণ্ডিত), রাম চক্রবর্তী (উকিল), দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহেশ গাঙ্গুলী।[২৮]

এই হলে 'পূর্ববঙ্গ নাট্য সমাজ' মঞ্চস্থ করে তাদের প্রথম নাটক 'রামাভিষেক'। মুর্তাজা আলী লিখেছেন, তারা প্রথম অভিনয় করে 'সীতার বনবাস'।[২৯] কিন্তু তিনি উৎস উল্লেখ করেননি। প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে বলা যায় প্রথম অভিনীত নাটক 'রামাভিষেক' এবং তা টিকেট কেটে দেখানো হয়েছিল। টিকেটের হার ছিল চার টাকা, দুই টাকা এবং এক টাকা। সেই সময়ের তুলনায় এই হার যে অত্যন্ত উঁচু ছিল তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। 'অমৃত বাজার পত্রিকা' এই নাটকাভিনয়ের পর চমৎকৃত হয়ে লিখেছিল—'আমাদের দেশে (কলক্যাতায়?) নাটক অভিনয়ের নিমন্ত্রণ প্রায় বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে হয়। যাহার ইচ্ছা সে উহা দর্শন করিতে যাইতে পারে না। ঢাকার অভিনয়ে সেটি হইবে না। অভিনয় কর্তারা উহার নিমিত্ত টিকেট বিক্রি করিবেন। টিকেট চারি, দুই এবং এক টাকা মূল্য লাগিবে।'[৩০]

অন্যদিকে কলকাতায় টিকেট বিক্রি করে নাটক দেখানো হয় ১৮৭২ সনে ৭ ডিসেম্বর।—

"চিৎপুরে ঘড়িওয়ালা বাড়ি নামে খ্যাত মধুসূদন স্যান্নালের সুবৃহৎ অট্টালিকার উঠানে মাসিক ৪০/০০ টাকার ভাড়ায় বিনা আড়ম্বরে ন্যাশনাল থিয়েটার স্থাপন করা হয়েছে। সেই রঙ্গমঞ্চে দীনবন্ধু মিত্রের প্রথম এবং বাংলা সাহিত্যের প্রথম গণনাটক 'নীলদর্পণ' অভিনীত হয়। টিকেটের মূল্য ছিল প্রথম শ্রেণী ১ দ্বিতীয় শ্রেণী।।০'[৩১] এ জন্যেই বোধহয় 'অমৃত বাজার' এর কয়েক মাস আগে মন্তব্য করেছিল, 'আমাদের দেশে নাটক অভিনয়ের নিমন্ত্রণ প্রায় বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যেই হয়।

'রামাভিষেক' ঢাকায় হিট করে। এর কারণ থিয়েটার সম্পূর্ণ এক নতুন ধরনের বিনোদন নিয়ে উপস্থিত হয়। তাছাড়া দর্শনার বিনিময়ে নাটক দেখা—ছোট শহরে সেটাও বোধহয় উত্তেজনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। থিয়েটার কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছিলেন, টিকেট লব্ধ টাকা তারা 'সৎকার্যানুষ্ঠান'-এ ব্যয় করবেন। কিন্তু 'পূর্ববঙ্গ নাট্য সমাজ' কি পেশাদারী নাট্য সংস্থা ছিল? নাকি 'চ্যারিটি'র জন্যে 'শো' করেছিল? এ ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত হতে না পারলেও বলতে পারি যে, ঢাকায় সেই প্রথম দর্শনার বিনিময়ে থিয়েটার প্রদর্শন শুরু হলো এবং পরবর্তীকালেও সেই ধারা মোটামুটি অব্যাহত থেকেছে।

আগেই বলেছি, 'রামাভিষেক' ছিল ঢাকার প্রথম জনপ্রিয় নাটক (পরবর্তীকালে আরো অনেকবার এ নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছে)। 'অভিনয় দেখিতে বিস্তর লোকের সমাগম হয়। অনেক অনেক প্রধান মুসলমান, ঢাকার ডিষ্ট্রিকট সুপারিনটেনডেন্ট, পোগোজ সাহেব এবং অন্যান্য কয়েকজন খৃষ্টান উপস্থিত হন এবং সকলেই অভিনয় দেখিয়া

সত্তরের গোড়ার দিকেই ঢাকায় বেশ ক'টি নাটকের দল গঠন করা হয়েছিল। সবগুলির নাম জানা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবে দু'চারটি নাম জানা গেছে।

১৮৭১ সনে গঠিত হয় 'প্রাইড অব বেঙ্গল থিয়েটার'।[৩৭] এর উদ্যোক্তা ছিলেন রাধাকান্ত চক্রবর্তী, শ্যামাকান্ত গাঙ্গুলী (পালোয়ান), পরেশনাথ ঘোষ (পালোয়ান), ডা. রাজেশ্বর চক্রবর্তী, দ্বারকানাথ চক্রবর্তী, (মুন্সীগঞ্জ স্কুলের রেকটর), আকমল খাঁ ও ইউসুফ খাঁ (সাবান ব্যবসায়ী) এবং জ্ঞানেশ্বর রায়।[৩৮]

এই নাট্য গোষ্ঠী 'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি' ভাড়া নিয়ে অভিনয় করত।[৩৯] তাহলে কি এই নাট্য সংস্থা পেশাদার ছিল। এ সম্পর্কে তথ্যের অভাবে নিশ্চিত হওয়া যায় না। তবে শখের থিয়েটার গোষ্ঠী হলে টাকা খরচ করে নিশ্চয় তারা হল ভাড়া করত না। এই অনুমান সত্য হলে বলতে হয়, 'প্রাইড অব বেঙ্গল থিয়েটার' ঢাকার প্রথম দিককার পেশাদারী নাট্য সংস্থার একটি (যদি আমরা 'পূর্ববঙ্গ নাট্য সমাজ'কে পেশাদার হিসেবে ধরি)।

মুর্তাজা আলীর প্রবন্ধ অনুসারে তারা 'শরৎ সরোজিনী' 'মেঘনাদবধ' 'মহারাষ্ট্র কলঙ্ক' মঞ্চস্থ করেছিল।[৪০] কিন্তু 'ঢাকা প্রকাশ'-এ এই নাট্য সংস্থা সম্পর্কে কোন তথ্য পাইনি।

মুর্তজা আলীর প্রবন্ধ অনুসারে আবদুল কাইয়ুম লিখেছেন, সমসাময়িককালে ঢাকায় 'নবাবপুর এমেটিয়ার থিয়েটার কোম্পানী' নামে একটি নাট্য গোষ্ঠী গঠিত হয় যে নাট্য গোষ্ঠীর উদ্যোগে কালিদাসের 'অভিজ্ঞানম শকুন্তলম' বাংলায় অনূদিত হয় এবং ১৮৭১ সনে তা মঞ্চস্থ হয়।'[৪১]

কিন্তু ১৮৮১ সনের 'ঢাকা প্রকাশ'-এ নবাবপুরের এই দলটি সম্পর্কে সংবাদ পাই এবং ২৪-৭-১৮৮১ সনে পত্রিকা লিখেছে, 'ঢাকা নবাবপুর এমটিয়ার কোম্পানী অভিনয় কার্য্যে সবিশেষ যশ আহরণ করিয়াছেন।' এবং ৪-৯-১৮৮১ সনের সংবাদ দেখা যায় তারা শকুন্তলা মঞ্চস্থ করেছে। তাহলে মুর্তাজা আলী বা আবদুল কাইয়ুমের অনুমান কি সঠিক বলে মেনে নেব?

বসাক পরিবারের চৌদ্দজন সদস্যের সমন্বয়ে (দ্রষ্টব্য ৪-৯-১৮৯১ সনের সংবাদ) এই দলটি গড়ে ওঠে। যদিও এর নামের শেষে কোম্পানী যুক্ত কিন্তু মনে হয় না এটি পেশাদারী সংস্থা ছিল। এদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ছিল তাঁতীবাজারের এক এ্যামেচার থিয়েটার দলের। দলাদলি বা গোষ্ঠীগত কারণেই দলটি গড়ে উঠেছিল। তবে এদের একটি সদিচ্ছা ছিল তা হলো সংস্কৃত নাটকের বাংলা অনুবাদ করে তা মঞ্চস্থ করা।

আরেকটি ব্যাপার উল্লেখযোগ্য। ১৮৯৮ সনের একটি সংবাদে আমরা জানতে পারি 'নবাবপুরে সকের অভিনয় দ্বারা অনেককাল পূর্ব হইতে অনেকবার ঢাকাস্থ ভদ্রমণ্ডলীর প্রীতি সম্পাদন করা হইয়াছে। এবারও উত্তর নবাবপুর সকের থিয়েটারে বুদ্ধদেব চরিতের অভিনয় হইতেছে (২-১০-১৮৯৮।) তাহলে কি ধরে নেব নবাবপুর এমেটিয়ার থিয়েটার এত দীর্ঘকাল ধরে টিকে ছিল। যদি তাই হয় তাহলে ঘটনাটি খুবই আশ্চর্যজনক বলতে হবে।

১৮৮৮ সনে ঢাকায় আরেকটি পেশাদারী নাট্য সংস্থা স্থাপিত হয়—'ইলিশিয়াম থিয়েটার'। এ সম্পর্কে আলোচ্য প্রবন্ধকারত্রয় নতুন কোন তথ্য দিতে পারেনি। ১৮৯১ সনের 'ঢাকা প্রকাশ'-এ একটি সংবাদের সূত্র ধরে এই নাট্য সংস্থা সম্পর্কে কিছু অনুমান করা যায়—ঢাকায় স্থানীয়রূপে আমোদ-আহলাদের কোন বন্দোবস্ত ছিল না; কিন্তু কতদিন হইতে নবাবপুরে অত্রত্য জজকোর্টের পেস্কার বাবু কৃষ্ণ কিশোর বসাকের ঐকান্তিক যত্নে একটি নাট্য সমাজ গঠিত হইয়া সাধারণকে নাট্যাভিনয় প্রদর্শিত হইতেছে।'[৪২]

তাতে মনে হয় নবাবপুর এ্যামেচার থিয়েটারের উদ্যোক্তা বসাক পরিবারের একজন সদস্য কৃষ্ণ কিশোর ঐ এ্যামেচার কোম্পানী ভেঙ্গে গেলে উদ্যোগ নিয়ে 'ইলিশিয়াম' গঠন করেন। তবে প্রথম দিকে 'ইলিশিয়াম'ও শখের দল ছিল। পরে পেশাদার গোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হয়। এই অনুমানের ভিত্তি নীচের সংবাদটি ঃ 'নবাবপুরে পূর্বে কয়বার নাটকাভিনয় হইয়াছে তাহাতে কাহারও নিকট অর্থ গ্রহণ করা হয় নাই, কিন্তু এরূপ সদাব্রত চলা কঠিন। তাই এবার রীতিমত অর্থ গ্রহণ করিয়া অভিনয় প্রদর্শন হইতেছে।[৪৩] নবাবপুরেই কোন একজায়গায় বোধ হয় নাটক মঞ্চস্থ হতো। সপ্তাহে দু'দিন, বুধ ও শনিবার অভিনয় হতো।[৪৪]

মুর্তাজা আলী জানিয়েছেন, 'ইলিশিয়াম', 'বিল্বমঙ্গল', 'শকুন্তলা', 'জটিল চরিত', 'সীতার বনবাস', 'প্রভাসমিলন', 'নীলদর্পণ' ইত্যাদি মঞ্চস্থ করে।[৪৫] এতে মনে হয় 'ইলিশিয়াম' নবম দশকের গোড়ার দিকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছিল।

ইলিশিয়াম থিয়েটারের জনপ্রিয়তা মূলে জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ কুঞ্জলাল নাগের অবদান কম নয়। তিনি ছিলেন এর পরিচালক।[৪৬] কুঞ্জলাল ছিলেন রক্ষণশীল। কিন্তু তিনিই ছিলেন নাট্য সংস্থার পরিচালক। ব্যাপারটি স্ববিরোধী মনে হতে পারে। মনে হয়, পৌরাণিক নাটকের প্রচার মানে ধর্মভাব প্রচার এই ভেবে হয়ত, তিনি নাট্য পরিচালকের পদ গ্রহণ করেছিলেন। কারণ আমরা দেখি, ইলিশিয়ামে মঞ্চস্থ প্রায় নাটকের বিষয় বস্তুই ছিল পৌরাণিক।

'বিল্বমঙ্গল' ছিল ঐ সময়ের জনপ্রিয় নাটক। গিরিশ ঘোষের বিখ্যাত 'বিল্বমঙ্গল' নাটক গীতিনাট্যের আকারে রূপান্তরিত করে কুঞ্জলাল নাগ ১৮৮৮ সনে ৪৭ প্রকাশ করেন।

নাটকটি শুধু মঞ্চায়নের জন্যই নয়, পুস্তকাকারেও জনপ্রিয় ছিল। বইয়ের মুখবন্ধে লেখা ছিল—'নাট্য সমুদয়ের মোহর ও স্বাক্ষর ভিন্ন কোন পুস্তক ক্রয় বিক্রয় নিষিদ্ধ। যদি কাহারও হস্তে এরূপ পুস্তক দৃশ্য হয় তবে ক্রেতা বা বিক্রেতা ধর্মাধিকরণে দণ্ডনীয় হইবেন। কেহ অনুগ্রহ পূর্বক উক্তরূপ ক্রয়-বিক্রয়ের সংবাদ আমাদিগকে জানাইয়া সন্তোষজনক প্রমাণ প্রদর্শন করিতে পারিলে তাহাকে দশ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।'[৪৮]

এই নাটকের একটি গান লোকের মুখে মুখে ফিরতো—

'পর কি আপন চিনলি না মন/পথ ভুলে যাও কোথারে/ওরে মন মূঢ় মন, গরল তুলে

দিচ্ছ মুখে কি করে/আপন হাতে করে/বিষয় বিষে রঙ্গরসে/ভেসে আছরে সুখাবিলাস/কর কি, ভাব কি, যবে ধরবে তোর কেশে/উপায় কি হবে শেষে/রাখে হরি পদে গতি মতিরে (ভবেত রবে যদি)/ যারে তুমি সদা ভাবিছ আপন/সে কি তোর কখন হবেরে আপন/হল কি, কর কি মায়া মোহে অচেতন/ঘোর আঁধারে মগন।'[৫০]

এখানে উল্লেখযোগ্য, যে, 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের অপরাধেই এই দলের নাটক অভিনয় বন্ধ হয়ে যায়। 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের সময় স্থানীয় সরকার পক্ষ থেকে নাটকের বিশেষ অংশ নিয়ে আপত্তি উপস্থাপিত হয় এবং এরপর নবাবপুরের দলটি ভেঙ্গে যায়।

ঐ একই সময় দক্ষিণ মৈশুণ্ডীতে 'সনাতন নাট্য সমাজ' নামে একটি নাট্যদল গড়ে ওঠে। 'ঢাকা প্রকাশ'-এর একটি সংবাদ অনুসারে—'ঢাকায় আর একটা নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দক্ষিণ মৈশুণ্ডীতে ঢাকার শ্রীযুক্ত আনন্দ মোহন সাহা ও মণি মোহন সাহার উদ্যোগ ও অর্থব্যয়ে 'সনাতন নাট্যসমাজ' নামে ঐ নাট্যশালা গঠিত হইয়াছে। সম্প্রতি তথায় প্রহলাদ চরিত্র নামক একখানি নাটক বিরচিত হইয়া অভিনয় হইতেছে।'

শিশির কুমার বসাক উপরোক্ত উদ্যোক্তাদের নামের সঙ্গে আরো দুটি নাম যোগ করেছেন। নাম দুটি হলো ভজহরি সাহা শঙ্খনিধি ও রাখালচন্দ্র বসাক।[৫২]

পেশাদারী নাট্য সংস্থা ছিল না 'সনাতন নাট্য সমাজ'। এর চরিত্র ছিল সৌখিন। একই পরিবারের কিছু উৎসাহী নাট্যকর্মী নিয়ে দলটি গড়ে উঠেছিল সৌখিন কারণে এবং তাই 'প্রহলাদ চরিত্র' অভিনয়ের পর তাদের মতবিরোধ দেখা দেয়।[৫৩] এবং ঐ সময় ঝড়ে ঘর ভেঙ্গে গেলে দলও ভেঙ্গে যায়।

৮৯ সনে 'ঢাকা প্রকাশ'-এ আরেকটি নাট্য গোষ্ঠীর নাম পাই। এই দলটির কথা শিশির কুমার বা মুর্তাজা আলী লেখেননি। পত্রিকার খবরটি এরকম—'ঢাকায় আর একটি থিয়েটার কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অত্রত্য সুবর্ণ বণিক সম্প্রদায়—যাঁহাদের আদি নিবাস পশ্চিমবঙ্গে এবং এখনও তাঁহারা পশ্চিমবঙ্গের কথাবার্তাই ব্যবহার করেন। তাহাদের দ্বারাই উহা সম্পাদিত হইতেছে। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই শিক্ষিত ও পদস্থ ব্যক্তি। ইহারা পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমিতে 'দক্ষযজ্ঞ' নামক নাটকাভিনয় দেখাইতেন।[৫৪]

এর দু'সপ্তাহ পর আরেকটি সংবাদ—"অত্রত্য সুবর্ণ বণিক সম্প্রদায়ের অলিম্পিয়ান থিয়েটারে 'দক্ষযজ্ঞ' নাটক সুন্দর রূপ অভিনীত হইতেছে। প্রতি বুধ ও শনিবারে অভিনয় হইয়া থাকে।"

এই নাট্য সম্প্রদায়ের নাম পরে আর খুঁজে পাইনি। 'অলিম্পিয়ান থিয়েটার' কি তাদের নাম ছিল? কারণ ঐ নামে আর কোন 'হলের' নাম পাওয়া যায় না। তাছাড়া তারা কি শৌখিন না পেশাদার ছিল? সপ্তাহে দু'দিন অভিনয় দেখে মনে হয় এই সংস্থা পেশাদার ছিল।

এখন ঢাকা শহরে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই নাটক মঞ্চস্থ হয় এবং দর্শনীর বিনিময়ে নাটক দেখতে হয়। থিয়েটারের ব্যাপারে প্রফেশনালিজম এসেছে। ঢাকায় সেই জিনিসটির সূত্রপাত ঘটে নব্বইর দশকে। তখন থেকে পরবর্তী দশ বছর, ঢাকায় দুটি পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং একটির পর একটি নাটক অভিনীত হতে থাকে।

এই দুটো দল হলো ডায়মন্ড এবং ক্রাউন।

সত্যেন সেন লিখেছেন, 'কিশোরীলাল রায় চৌধুরী ১৮৮৭ সনে মহারানী ভিক্টোরিয়ার রাজ্য শাসনকালের ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ডায়মন্ড জুবিলী থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন।... ডায়মন্ড জুবিলী থিয়েটার ঢাকার প্রথম পেশাদার নাট্য ভবন...ডায়মন্ড জুবিলী থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হবার বছর চারেক বাদে ক্রাউন থিয়েটারের সৃষ্টি।'[৫৮] উপরোক্ত কোন তথ্যই ঠিক নয়।

'সনাতন নাট্যসমাজ' ভেঙ্গে গেলে তার উদ্যোক্তাদের নিয়েই ক্রাউন থিয়েটার গড়ে ওঠে। সনাতনের ভজহরি ও লালমোহন সাহা এ দলে যোগ দেননি। কিন্তু অন্যান্য সবাই, অভিনেতা দলও ক্রাউন থিয়েটারে যোগ দেয়। উদ্যোক্তাদের মধ্যে নতুন একটি নাম যোগ হয়—কলতাবাজারের হরিদাস বসাক। খুব সম্ভব বসাক পরিবারেরই লোক।

'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি' ভেঙ্গে সেখানে ক্রাউন থিয়েটারের উদ্বোধন করা হয়[৫৭] ('নবাব বাড়ির কাছে ইতিপূর্বে যেই বরফ কলটি ছিল তারই পাশে একটি টিনের বাড়িতে...'[৫৮])। তবে ক্রাউন থিয়েটার কখন স্থাপিত হয়েছিল তার তারিখ পাওয়া যায়নি। 'ঢাকা প্রকাশ'-এ ক্রাউন থিয়েটার সম্পর্কে প্রথম সংবাদ পাওয়া যায় ২১-৫-১৮৯৩ সনে। সনাতন নাট্য সমাজ' ভেঙ্গে যায় আশীর শেষ দিকে। ফলে আমরা ধরে নিতে পারি ১৮৯০-৯২ সনের মধ্যে ক্রাউন থিয়েটার স্থাপিত হয়।

ক্রাউন থিয়েটার শুধু রঙ্গমঞ্চ ছিল না, এদের সঙ্গে নাট্য গোষ্ঠীও সংশ্লিষ্ট ছিল এবং প্রথম থেকেই এরা ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ শুরু করে। শুধু তাই নয় নাটককে সফল করে তোলার জন্যে এবং দর্শকদের 'স্টান্ট' দেয়ার জন্যে তারাই প্রথম ঢাকার মঞ্চে স্থানীয় অভিনেত্রী আনে। ঢাকার নাট্যাভিনয়ে এটি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

১৮৯৩-এর দিকে ক্রাউনে প্রতি সোম, বুধ ও শনিবার অভিনয় হতো।[৫৯] ১৮৯৪ সনে দেখা যাচ্ছে সপ্তাহে দু'দিন শনি ও বুধবার অভিনয় হচ্ছে। প্রথমদিকে সারারাত ধরে অভিনয় চলতো। কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজ ও ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ মণ্ডি এ ব্যাপারে আপত্তি করেন এবং ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট অভিনয়ের সময় রাত এগারোটা পর্যন্ত বেঁধে দেন।[৬০] এসব কারণেই বোধহয় এই রঙ্গমঞ্চ পরে ইসলামপুরে স্থানান্তরিত করা হয়।[৬১]

ক্রাউন ও ডায়মণ্ডে চার ধরনের টিকেট ছিল। প্রথম শ্রেণী (গদি) দুই টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণী (চেয়ার) এক টাকা, তৃতীয় শ্রেণী (টুল) আট আনা এবং চতুর্থ শ্রেণী (গ্যালারি) চার আনা।[৬২]

মুর্তাজা আলী লিখেছেন ১৮৯৪ সনের ফেব্রুয়ারিতে ক্রাউনে গিরিশ ঘোষের 'পূর্ণচন্দ্র' অভিনীত হয়। তথ্যটি ঠিক নয়। কারণ ঢাকা প্রকাশের একটি সংবাদে জানা যায় ১৮৯৩ সনে 'পূর্ণচন্দ্র' অভিনীত হয়—'অত্রত্য পুয়াটুলিস্থ ক্রাউন থিয়েটার মধ্যযোগে চৈতন্য লীলা অভিনীত হইয়া পুনরায় পূর্ণচন্দ্র নাটক অভিনয় হইতেছে।'[৬৩] এই নাটকেই স্থানীয় অভিনেত্রী নামানো হয়। তার নাম ছিল দুনিয়া এবং নায়ক ছিলেন ললিতচন্দ্র দাস।[৬৪] দুনিয়া অবশ্যই বার-বনিতা ছিল। কারণ এছাড়া তখন আর অন্য কোন উপায়ও ছিল না। আর তাছাড়া ঢাকার বাঈজীরা ঐতিহ্যগতভাবেই নৃত্যগীতে পটু ছিল। তবে

মঞ্চে অভিনেত্রীর আগমন নিয়ে ঢাকায় তখন তুমুল হৈচৈ শুরু হয়েছিল। 'ঢাকা প্রকাশ' তখন মন্তব্য করেছিল, 'মনোহরিণী বার-বণিতাগণ' অভিনয় করে বলিয়া যাহারা আপত্তি করেন তাহারা এই নাট্যাভিনয়ের সুখ সৌন্দর্যে বঞ্চিত হইতে পারেন; কিন্তু সর্বসাধারণে যখন তাঁহাদের ভদ্র মহিলাগণের নৃত্যগীতাদি দর্শন শ্রবণে সমর্থ নহে;....অপিচ এই অভাববশত লোককে যখন বাইখেমটা-ওয়ালার নৃত্যগীতে যোগ দিতেই হয় তখন তাহা অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ এই নাটক অভিনয় দর্শন আমরা কাহারও পক্ষে অন্যায় মনে করি না।'[৬৫]

তবে আমাদের মনে রাখতে হবে এই কটাক্ষ পত্রিকা কর্তৃপক্ষ থিয়েটার প্রীতি সঞ্জাত নয়, এই কটাক্ষ ছিল ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি, যারা থিয়েটার বিশেষ করে খেমাটাওয়ালীর আনয়নের বিরুদ্ধে ছিল।

সত্যেন সেন[৬৬] ক্রাউনে তৎকালীন জনপ্রিয় কিছু অভিনেতা অভিনেত্রীর নাম জানিয়েছেন। তারা হলেন, হরিপদ দে, বিনু বাবু, বিনোদ বাবু, নুটুরায়, রাধা মাধব চক্রবর্তী, গৌরচন্দ্র দাস, বর্ধমানের রানী (স্টান্ট নাম), কনক সরোজনী এবং সরলা। কনক সরোজনী ছিল রাখাল দাসের রক্ষিতা।

১৮৯৩ সনে[৬৭] ক্রাউন কলকাতা থেকে অভিনেতা-অভিনেত্রী আমদানি করে। সত্যেন সেন লিখেছেন,[৬৮] অর্ধেন্দু শেখের মুস্তফী কলকাতা থেকে ডায়মন্ডে এসে যোগ দেন। কিন্তু পত্রিকা অনুসারে[৬৯] বলতে পারি, অর্ধেন্দু প্রথমে ক্রাউনে যোগ দেন তারপর বোধহয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় ডায়মন্ডে যোগ দেন।

মুর্তাজা আলী ক্রাউনে অভিনীত বারোটি নাটকের নাম দিয়েছেন। সেগুলি হলো চৈতন্যলীলা, নলদয়মন্তী, কপাল কুণ্ডলা, মৃণালিনী, জনা, লায়লি মজনু, তুলা বাঈ, আনারকলি, সতী সুকন্যা, নৈশবালা বা অষ্টবজ্র মিলন, কেদার রায় ও সুর সুন্দরী।[৭০] 'ঢাকা প্রকাশ' থেকে প্রাপ্ত আরও কয়েকটি নাম এর সঙ্গে যোগ দিতে পারি—সেগুলো হলো—মীরাবাঈ, রাজাবাহাদুর, আবু হোসেন এবং প্রফুল্ল।

ক্রাউনের মালিকানা কয়েকবার বদল হয়। একবার যুগীনগরের দ্বারকানাথ কর্মকার এবং বনগ্রামের ব্রজলাল সাহা রাখালচন্দ্রের কাছ থেকে রঙ্গমঞ্চটি কিনে নেন।[৭১] কিন্তু বেশি দিন তাঁরা তা চালাতে না পেরে ফের রাখালচন্দ্রের কাছে বিক্রি করে দেন।

ডায়মন্ড জুবিলী থিয়েটার চালু হলে ক্রাউনের একাধিপত্য হ্রাস পায়। কিন্তু আস্তে আস্তে ঢাকার থিয়েটার বিলুপ্তির কারণ আমরা খুঁজে পাবো ১৬-৪-৯৮ সনের 'ঢাকা প্রকাশ'-এর এক সংবাদে যেখানে বলা হয়েছে ক্রাউনে বায়োস্কোপ দেখানো হবে। থিয়েটারের জনপ্রিয়তা হ্রাসের প্রধান কারণ হিসাবে এই বায়োস্কোপের কথা বলা যেতে পারে। ১৮৯৭ সনে বালিয়াটির জমিদার কিশোরীলাল রায় চৌধুরী ক্রাউন থেকে কিছু অভিনেতা-অভিনেত্রী ভাঙ্গিয়ে আনেন এবং ক্রাউনের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে ডায়মন্ড জুবিলীর প্রতিষ্ঠা করেন। 'ঢাকা প্রকাশে'-এ সম্পর্কে লেখা হয়েছে,[৭২] 'এখানে ক্রাউন থিয়েটার আছে। ক্রাউনের অধ্যক্ষেরা কলকাতা হইতে যে ক'একজন অভিনেতা আনিয়াছিলেন, মনান্তর হওয়াতে তাঁহারা ক্রাউন থিয়েটার পরিত্যাগ করিয়া এই অপরিচিত স্থানে একটা

বিপদে পড়িয়াছিলেন। সেই বিপদে জগন্নাথ কলেজাধিকারী বাবু কিশোরীলাল রায় চৌধুরীর সাহায্য প্রার্থী হওয়াতে কিশোরী বাবু সাহায্য করিতে সক্ষম হইলেন। তাঁহারা থিয়েটার ব্যবসায়ী—সুতরাং আর একটা নূতন থিয়েটার করার সংকল্প জানাইলে কিশোরী বাবু তাহাতে ক'একশত টাকা ধার দিয়েছেন।......' এবং তাতে 'অপ্রশংসার কি?' পত্রিকা প্রশ্ন তুলেছে। তবে পত্রিকার সংবাদ দেখে মনে হয় কিশোরী লালের প্রতি তাদের কিঞ্চিৎ সহানুভূতি ছিল এবং তাই উপরোক্ত সংবাদটি এভাবে পরিবেশিত হয়েছে। ডায়মন্ড ও ক্রাউনের মতো রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করে নিজেদের একটি দল গঠন করে। প্রথমে তারা অভিনয় শুরু করে রাজাবাবুর মাঠের এক ঘরে। ১৮৯৮ সনে ইসলামপুরে আজ যেখানে লায়ন সিনেমা দাঁড়িয়ে আছে সেখানে তারা নিজেদের রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করে। ডায়মন্ড কলকাতা থেকে অভিনেত্রী এনেছিল এবং প্রয়োজন হলে স্থানীয় বাঈজীদের সাহায্যে তারা কাজ চালিয়ে নিত। 'ঢাকা প্রকাশ'-এ তাদের অভিনীত যেসব নাটকের নাম পাওয়া যায় সেগুলি হলো, দুর্গেশনন্দিনী, দেবী চৌধুরানী, বিজয় সেন, প্রমোদরঞ্জন, আলীবাবা, নবীন তপস্বিনী, স্ত্রী, প্রভাস মিলন, বাবু, বিল্বমঙ্গল এবং নন্দ দুলাল।

১৯০০ সালে ক্রাউনের এককালীন অংশীদার দ্বারকানাথ চক্রবর্তী ডায়মন্ডের মালিক হন। 'ঢাকা প্রকাশ'-এর একটি সংবাদ এই অনুমান সমর্থন করে—'অত্রত্য ডায়মণ্ড জুবিলী থিয়েটারের মালিকের নাম, শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ চক্রবর্তী। লোকে অন্যরূপ কথা রটাইতেছে বলিয়াই এ কথাটা বলিতে হইল।'[৭৩]

বিশ শতকেও পেশাদারী থিয়েটার টিকে ছিল। সখের থিয়েটার দলও অনেক গড়ে উঠেছিল। ১৯২৫-২৬ এর দিকে ঢাকায় পেশাদারী থিয়েটার লোপ পায়।[৭৪]

ঢাকার থিয়েটার চর্চার শুরু হতেই কিছু দর্শক সৃষ্টি হয়েছিল। রুচি বদল এবং নির্মল বিনোদনের জন্যে দর্শকরা থিয়েটার লুফে নিয়েছিল। থিয়েটারে কিছু দর্শক সৃষ্টি হতেই উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কিছু দল ঢাকায় এসে দর্শনীর বিনিময় নাটক মঞ্চস্থ করে। কলকাতার কয়েকটি প্রধান নাট্যসংস্থাও ঢাকায় এসে নাটক মঞ্চস্থ করে গেছে। ১৮৭৩ সনে ঢাকায় প্রথম কলকাতা থেকে দুটি দল এলো থিয়েটার করতে। এরা হচ্ছে সদ্য বিভক্ত 'ন্যাশনাল' এবং 'হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার।' 'ন্যাশনাল' ঢাকায় আরো কয়েক বার এসেছিল কিন্তু কি কারণে যেন দর্শক চিত্ত হরণ করতে পারেনি। বা আরো নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে, 'ঢাকা প্রকাশ' সম্পাদকের হৃদয়ে সহানুভূতি সৃষ্টি করতে পারেনি।

দুটি কোম্পানিই ঢাকায় এসেছিল তিয়াত্তরের মে মাসে। মোহনী-মোহন দাস পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন 'হিন্দু ন্যাশনালে'র। আর তাঁর ভাই রাধিকামোহন পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন 'ন্যাশন্যালে'র।

'ন্যাশনাল' ঢাকায় এসে প্রথম মঞ্চস্থ করেছিল 'নীলদর্পণ। 'হিন্দু ন্যাশনাল' নাটক ও প্রহসন মিলিয়ে মঞ্চস্থ করে—নবীনতপস্বিনী, কৃষ্ণ কুমারী, লীলাবতী, নীলদর্পণ, যেমন কর্ম তেমন ফল, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, পেনটোমাইন, মডেল স্কুল, বিলাতী বাবু, বিধবাবিবাহ, নবনাটক, জামাই বারিক, ভারত মাতার বিলাপ, পরীস্থান এবং মস্তবি (মুস্তফী) সাহেবের বিদায় গ্রহণ। প্রায় এক মাস তারা ঢাকায় ছিলেন। এবং 'অর্ধেন্দুকে লইয়া সমস্ত শহর উন্মত্ত হইয়া উঠিল। আমাদের দেশের থিয়েটারের জন্য কোন অভিনেতাকে অমন করিয়া আর কেহ Lionise করিয়াছে কিনা জানি না।'[৭৫]

এখানে উল্লেখযোগ্য 'যে 'হিন্দু ন্যাশনাল'-এর প্রতিটি নাটকই জনপ্রিয় হয়েছিল। অন্যদিকে 'ন্যাশনাল' 'নীলদর্পণ' এবং 'নয়শো রূপেয়া' মঞ্চস্থ করে কিন্তু দর্শক চিত্ত হরণ করতে পারেনি কারণ 'অভিনয় কার্য্যে অপেক্ষাকৃত অপটুতা প্রদর্শন করাতে কিঞ্চিৎমাত্রও লাভবান হইতে পারেন নাই। প্রত্যুত অপরিণামদর্শিতা, অবিমৃষ্যকারিতা ও অপরিমিত ব্যয়িতাদি নিবন্ধন সাতিশয় ক্ষতিগ্রস্থই হইয়াছেন।... তাঁহারা বাজারে প্রায় ৩/৪ শত টাকা দেনা রাখিয়া পাওনাদারদিগের অজ্ঞাতসারে অকস্মাৎ পলায়ন করিয়াছেন। এতদঞ্চলীয় লোকের কলিকাতা অঞ্চলীয় লোকদিগকে যে 'বোম্বেটিয়া' বা 'জুয়াচোর' বলিয়া বিশ্বাস আছে. সেই বিশ্বাস আরো প্রগাঢ় হইবার কারণ হইয়াছে।'[৭৬]

কিন্তু 'হিন্দু ন্যাশনাল' তাদের সাফল্য সত্ত্বেও আর্থিক দিক থেকে তেমন লাভবান হয়নি। কারণ 'কল্পনামূলক আধুনিক নাটক অপেক্ষা ঢাকায় পুরান ঘটিত উৎকৃষ্ট নাটকের সমাদার অধিক...।'[৭৭] 'ন্যাশনাল' এরপর আবার আসে ঢাকায়। 'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমিতে' মঞ্চস্থ করে 'সীতা'। কিন্তু অভিনয় কাহারও প্রীতিপদ হয় নাই।"

১৮৭৬ সনে নবাব আব্দুল গনির আমন্ত্রণে বোম্বাই থেকে একটি দল আসে ঢাকায়। হিন্দিভাষায় 'রঙ্গভূমিতে' তারা মঞ্চস্থ করে 'ইন্দ্রসভা'। এবং 'উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট দৃশ্য—অতীব চমৎকারজনক, এ পর্যন্ত কোনও অভিনেতৃদল ঢাকায় এরূপ অত্যুকৃষ্ট সীন ও সাজপোষক প্রদর্শন করেন নাই।'

১৮৭৯ সনে 'ন্যাশনাল' আবার ঢাকায় আসে। এবার তারা মঞ্চস্থ করে 'সতী কি কলঙ্কিনী' ও 'চক্ষুদান'। কিন্তু অধিকাংশের অভিনয়ে 'এমন কোন বিশেষ চমৎকারিত্ব ছিল না, তাহাতে দর্শকগণের চিত্ত আকৃষ্ট হইতে পারে।'[৭৯]

কিন্তু ঢাকায় এসে তারা পৌঁছা মাত্র হৈচৈ শুরু হয়। কারণ তারা কয়েকটি 'বারাঙ্গনা অভিনেত্রী লইয়া আসিয়াছেন।' এরাই ছিল ঢাকার মঞ্চের প্রথম অভিনেত্রী।[৮০]

অভিনেত্রী নিয়ে হৈচৈ শুরু করে ব্রাহ্মসমাজ। তখন কেশবচন্দ্রের মেয়ের বিয়ে নিয়ে দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে। ঢাকায়ও এর প্রতিক্রিয়া লক্ষিত হয়। 'ঢাকা প্রকাশ' এ বিরোধে মধ্যপন্থা অবলম্বন করে। ঢাকা কলেজের অধ্যাপক পোপ ও কিছু ছাত্র ছিল থিয়েটার বিরোধী। পরে আর কোন কারণ না পেয়ে দুর্ভিক্ষের কারণে থিয়েটার প্রদর্শন স্থগিত রাখার দাবী জানানো হয়। 'ঢাকা প্রকাশ' এ পরিপ্রেক্ষিতে মন্তব্য করেছে—

'ঢাকা ছাত্রসভা অভিনয় দর্শনের যেরূপ বিরুদ্ধবাদী—সর্বসাধারণকে তদ্দর্শন বিরত রাখিতে যেরূপ অভিলাষী আমরা ততদূর নহি। যখন সাধারণভাবে ঘাটে পথে চলিতে ফিরিতে বারবিলাসিনীদিগের রূপদর্শন ও বাক্যশ্রবণ নিরোধ করিবার উপায় নাই—দেশীয় লোকের রুচি অনুসারে আমোদজনক ব্যাপার মাত্রই প্রায় বাই-খেমটার নৃত্যগীত হইয়া থাকে তখন বারাঙ্গনা দেখিব না বা তাহাদিগের কথাবার্তা কি গীতি কবিতা শ্রবণ করিব না বর্তমান সমাজস্থ কোন ব্যক্তি এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়া থাকিতে পারেন...'[৮১] যা হোক এ নিয়ে ঢাকা শহরে তুমুল হট্টগোল হয়। এমনকি 'ন্যাশনাল থিয়েটার বাড়াবাড়ি করাতে এখানে বিলক্ষণ উত্তম মধ্যম লাভ' করে।

'ন্যাশনাল' তারপর ৮৪ সনে আবার ঢাকায় আসে। কিন্তু 'উক্ত কোম্পানী ঢাকায় অভিনয় করিয়া বড় লাভবান হইতে পারেন নাই। অতএব ইহারা পুনরায় এখানে প্রত্যাবর্তন করিবেন, তাহার সম্ভাবনা অল্প।'[৮২] এবং ঠিকই 'ন্যাশনাল' আর ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেনি।

১৮৮৭ সনে 'কলিকাতা বিডন স্ট্রীটের বিখ্যাত স্টার কোম্পানী' অভিনয়ের জন্যে ঢাকা পদার্পণ করে। সপ্তাহে পাঁচদিন তারা অভিনয় করেছিল এবং 'কোনদিনই অভিনয় ক্ষেত্রটি (ছিল) লোকে লোকারণ্য'। স্টার ঢাকায় চৈতন্যলীলা, নলদময়ন্তী, ধ্রুবচরিত্র, ঝকমারীর মাশুল, সীতার বনবাস এবং বিবাহ বিভ্রাট অভিনয় করে। কিন্তু 'ন্যাশনাল'-এর মতো স্টারকেও রক্ষণশীল সমাজের সম্মুখীন হতে হয়। বিশেষ করে ব্রাহ্মসমাজ ছাত্রদের নিয়ে আন্দোলন শুরু করে। কারণ সেই পুরনো—মঞ্চে অভিনেত্রীর অভিনয়। 'তাহাদের (ব্রাহ্মদের) মতে দুই-তিন ঘণ্টা সমানে মেয়ে সংযুক্ত অভিনয় দেখিলে মানুষের মন উত্তেজিত হয়, সুতরাং সেরূপ অভিনয় একেবারে না দেখাই উচিত।'[৮৩]

অন্যদিকে ব্রাহ্ম সমাজের শ্রদ্ধাভাজন নেতা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মন্তব্য করেছিলেন, 'লোকেরা অযথা গণ্ডগোল্ল করে। তথা হইতে চৈতন্যলীলার যে গান ভাসিয়া আমার কানে আসে তাহাতে আমাকে অতিশয় ভাবান্বিত কবিযা তোলে।'[৮৪]

তবে এই পরিপ্রেক্ষিতে সবচেয়ে সুন্দব মন্তব্য করেছে 'ঢাকা প্রকাশ'। 'অভিনয় ক্ষেত্রে পুরুষাদিরূপে বিকৃত বারঙ্গনাগণকে ২/৩ ঘণ্টা দেখিলেই যাহার দুষ্প্রবৃত্তি হয়, তাহাদিগকে আমরা অসার মনে করি। স্ত্রীলোক মাত্রই তাহাদের পক্ষে অদ্রষ্টব্য। আরও কথা এই যে, এই শহরে বালকগণের বাই-খেমটার নাচ দেখিয়া বেড়ানের সময় কথা হয় না, আর কলিকাতা হইতে থিয়েটার আসিলেই এত আড়ম্বর কথা, নিতান্ত দুষ্টিকটু বোধহয়। ইহার মধ্যে ব্রাহ্ম ভায়াদের কোনরূপ সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে হইতেছে, যেখানে উদ্ধত বালকের চরিত্র শোধন সম্ভব না, সেখানেই ভায়াদের টনক পড়ে।'

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, পত্রিকা মালিকানা তখন ব্রাহ্মদের হাতে ছিল না। যা হোক 'স্টার' এরপর ঢাকা ছেড়ে চলে যায়।[৮৫]

১৮৯৫ সনে নবাব আহসানউল্লাহ নিজ পরিবারের বিনোদনের জন্যে 'স্টার'কে ঢাকায় নিয়ে আসেন। তবে তিনি শুধু নিজের পরিবারকেই নয়, ঢাকার গণ্যমান্য লোকদেরও বিভিন্ন দিন আমন্ত্রণ করে নিখরচায় নাটক দেখার বন্দোবস্ত করে দেন। নবাব বাড়িতে অভিনয় শেষে 'স্টার' 'পটুয়াটুলিস্থ নাটক ঘরে' অভিনয় আরম্ভ করে। তারা তিনটি নাটক মঞ্চস্থ করেছিল—তরুবালা, চন্দ্রশেখর ও বাবু।

এছাড়া ১৮৮৮ সনে ঢাকায় কলকাতা থেকে এসেছিল 'বীণা থিয়েটার'। তারা মঞ্চস্থ করে প্রহ্লাদ চরিত্র, তারকাসুন্দর বধ ও দুর্গেশনন্দিনী। পরে 'বীণা' ভেঙ্গে 'আনন্দ থিয়েটার' নামে নতুন আরেকটি দল হয়। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধেও বারাঙ্গনা দিয়ে অভিনয় করানোর জন্যে বিক্ষোভ শুরু হয় একই পন্থায়।

এরপর ১৮৯৩ সনে এসেছিল মনিপুর থেকে একটি দল। তবে তারা বোধহয় নাটক মঞ্চস্থ করেনি। 'কালচারাল শো'র' মতো কিছু করেছিল।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে উনিশ শতকের ঢাকার কয়েকটি প্রধান এ্যামেচার বা সৌখিন থিয়েটার সংস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ঢাকার পেশাদারী থিয়েটারের প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে শখের নাটক মঞ্চায়নের একটি ধারাও চলছিল। পত্রিকায় এবং অন্যান্য প্রবন্ধে এই ধরনের কয়েকটি শৌখিন নাট্য সংস্থার নাম পাওয়া যায়। নিচে 'ঢাকা প্রকাশ'-এ প্রাপ্ত

এই ধরনের কয়েকটি নাট্য সংস্থা ও তাদের অভিনীত নাটকের নাম দেয়া হলো—

সন	— নাট্য সম্প্রদায়	— মঞ্চস্থ নাটক	— স্থান
১৮৮২	— জনসাধারণ সভা	— ভারত মাতা	—
১৮৮৪	— 'কতিপয় সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য লোক'	— উত্তর রামচরিত	— পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি
১৮৯৪	— 'নলগোলাস্থ বণিক বাবু'	— নন্দবিদায়	— জগন্নাথ কলেজ
১৮৯৯	— 'দি গ্রেট ইম্পিরিয়াল' 'থিয়েটার ঢাকা'	— জনা	— সাধনবাবুর নাটমন্দির
উনিশ শতকের শেষার্ধ [মুর্তাজা আলী ঃ পৃঃ৩৯]	পণ্ডিত প্রসন্নচন্দ্র — বিদ্যাবত্নের উদ্যোগে	— মালতীমাধব	— তাঁতীবাজার
১৯ শতকের শেষার্ধ [সত্যেন সেন : পৃঃ ৩৮—৩৯]	নবাবপুরের — বসাক সম্প্রদায়	— সীতার বনবাস	
ঐ	'একরামপুরের অধিবাসীরা'		স্বপ্নবিলাস —
[শিশির কুমার বসাকের প্রবন্ধ]	বালীয়াটির জমিদার কিশোরীলাল রায় চৌধুরীর উদ্যোগে		নবনারী নিজ বাড়িতে
১৮৬৮-৬৯	রাধামাধব চক্রবর্তীর উদ্যোগে পদ্মাবতী আবু হোসেন এক্রামপুর পদ্মাসার বাড়িতে		

উর্দু নাটকেরও চল ছিল ঢাকায়। খুব সম্ভব মহল্লাভিত্তিক দল গঠন করে অভিনয় হতো। উর্দু নাটকের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সাবান ব্যবসায়ী আকমল খাঁ ও ইউসুফ খাঁ যারা সত্তর দশকে 'প্রাইড অব বেঙ্গল থিয়েটারের' সঙ্গে জড়িত ছিলেন। খুব সম্ভব নব্বই দশকে এ দু'ভাই আবার 'ফেরহাত আবজা' (আফরোজ?) নামে একটি থিয়েটার দল গঠন করে যারা তৎকালীন বিখ্যাত নাট্যকার আলি নফিসের ৩০টি নাটক মঞ্চস্থ করেছিল।[৮৬]

সত্যেন সেন জানিয়েছেন যে, স্থানীয় বারবনিতারা এসব নাটকে স্ত্রী-পুরুষ দু'ভূমিকায়ই অভিনয় করতেন।[৮৭]

শিশির কুমার লিখেছেন, গন্নুবাঈ, আন্নুবাঈ এবং নয়াবন—এই তিন বোন 'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি' ভাড়া করে টিকিট বিক্রি করে 'ইন্দ্রসভা' মঞ্চস্থ করেছিল। তিনি অবশ্য তারিখটি

জানাতে পারেননি। 'ঢাকা প্রকাশ'-এর সংবাদ অনুযায়ী জানতে পারি ঘটনাটি ঘটেছিল ১৮৮০ সনে। এই সংবাদটি আমাদের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ঢাকাতে মহিলাদের দ্বারা অভিনয় এই প্রথম এবং থিয়েটাবের ক্ষেত্রেও শুধুমাত্র মহিলাদের উদ্যোগে নাটকাভিনয়ও বোধ হয় এই প্রথম। 'ইন্দ্রসভা' ছাড়াও তারা 'যাদু নগর' নামে আরেকটি নাটক মঞ্চস্থ করেছিল।[৮৮] ঢাকায় উনিশ শতকের উর্দু নাটক সম্পর্কে এর বেশি তথ্য আর সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

৭

এটা ঠিক যে ঢাকায় দর্শনীর বিনিময়ে প্রথম বাংলা নাটক প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। 'ঢাকা প্রকাশ' লিখেছিল 'কলিকাতায় তিনি [অর্ধেন্দু শেখর মুস্তফী] ব্যবসায়ী নাট্য সম্প্রদায় করিবার পূর্ব্বে ঢাকায় পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি প্রতিষ্ঠিত হইয়া নাটকাভিনয়ের ব্যবসা আরম্ভ করা হইয়াছিল। বাঙ্গলা ১২৮০ সনে [১৮৭৩] আমরা ঢাকায় টিকেট কিনিয়া এলোকেশী নাটকের অভিনয় দেখিয়েছিলাম। এলোকেশী নাটকাভিনয়ের পূর্বে যে রামাভিষেক প্রভৃতি নাটকাভিনয় হইয়াছিল তাহা আমরা ব্যক্তিগতভাবে দেখি নাই, কিন্তু ঢাকা প্রকাশ আমাদের পূর্ব্বে যাহারা সম্পাদন করিয়াছেন, তাহারো দেখিয়াছেন। অতএব কলিকাতায় অর্ধেন্দু বাবু কার্যারম্ভ [পেশাদারী] এক [?] পূর্বে ঢাকায় ঐ কার্যারম্ভ হইয়াছিল।'[৮৯]

কিন্তু পেশাদারী নাট্যসংস্থা বা আরো সঠিক করে বলতে গেলে পেশাদারী মনোভাব বলতে যা বোঝায় তা বোধহয় তখনও ঠিক গড়ে ওঠেনি। অর্থাৎ নাটকাভিনয়ের মাধ্যমে জীবনযাপনের জন্য অর্থ সংগ্রহ; মঞ্চায়নের খরচ নির্বাহ— ইত্যাদি বোধ তখনও কারো হয়নি। কখনও কখনও ঝোঁকের মাথায় একেকটি দল গড়ে উঠেছে, হয়তো নাটক মঞ্চস্থ করেছে, দর্শনী নিয়েছে। সৌখিন নাট্যদলের সংখ্যাই ছিল বেশি এবং প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব নিয়ে একেকটি শখের থিয়েটর দল গঠিত হতো।

ঢাকার থিয়েটার সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যাদরি ওপর ভিত্তি করে বলা যায়, পেশাদারী নাট্যসংস্থা গঠনের মনোভাব নিয়ে প্রথম যে দলটি গড়ে ওঠে, তা হচ্ছে 'প্রাইড অব বেঙ্গল থিয়েটার'। পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি ভাড়া নিয়ে তারা নাটক মঞ্চস্থ করতেন। কিন্তু দর্শনী তারা নিতেন কিনা সে সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়নি। আমরা ধরে নিতে পারি, যেহেতু একটি দল হিসাবে এটি গঠিত হয়েছিল এবং তারা মঞ্চ ভাড়া নিতো, সেহেতু টিকেটের ব্যবস্থা করাই ছিল তাদের পক্ষে স্বাভাবিক। যদি তা ঠিক হয় তবে বলতে হবে, কলকাতার আগেই ঢাকায় পেশাদারী নাট্য সংস্থা গঠিত হয়েছিল।

এ ব্যাপারে আরো তথ্য না পাওয়া গেলে অবশ্য নিশ্চিত হওয়া যায় না। তবে এটা ঠিক সত্তরের দশক থেকে ঢাকায় একটি দুটি করে পেশাদারী নাট্য সংস্থা গড়ে ওঠে। অবশ্য এসবগুলিই ছিল স্বল্পায়ু। এদের স্বল্পায়ুর দুটি কারণ থাকতে পারে— এক, অর্থাভাব এবং দুই, সত্যিকারের পেশাদারী মনোভাবের অভাব।

নব্বই দশকে ক্রাউন এবং ডায়মন্ড প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সত্যিকার অর্থে ঢাকার পেশাদারী থিয়েটার জমে ওঠে এবং সে ধারা বিংশ শতকের বিশ দশক পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

ঢাকায় যারা শখের থিয়েটার বা পেশাদারী নাট্য সংস্থা গঠন করেছিলেন তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন উঠতি ব্যবসায়ী, কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী; শিক্ষক, উকিল, এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে পালোয়ান পর্যন্ত। এ দিক থেকে ঢাকার থিয়েটারের যাত্রা ছিল কলকাতা থেকে ভিন্ন। কলকাতার নাটকের শুরু বাগান বাড়িতে এবং সে বাগান বাড়ি থেকে তাদের মুক্তি পেতে সময় লেগেছে প্রায় চল্লিশ বছর। কিন্তু ঢাকায় যাত্রা ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও ঢাকায় থিয়েটার নতুন কিছু করতে পারেনি।

ঢাকায় যাত্রা ভিন্নতর হলো কেন? তার কারণ বোধ হয় বড় বড় ভূম্যধিকারীদের আকর্ষণ ছিল কলকাতা, ঢাকা নয়। ঢাকায় তখন অবশ্যই কিছু ভূম্যধিকারী ছিলেন কিন্তু বড় বড় [একমাত্র ব্যতিক্রম হয়তো ঢাকার নবাব পরিবার] ভূম্যধিকারীদের তুলনায় তারা কিছু নয়। আর ঢাকার নবাব এসব বিষয়ে, বিশেষ করে বাংলা নাটকে উৎসাহ দেখাবেন এ আশা করা বোধহয় খুব একটা সঙ্গত হবে না। ভূম্যধিকারীদের পরের স্তরে, শহরে ছিলেন বিভিন্ন পেশার লোক এবং ব্যবসায়ী। এরা তখন সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে চাইছেন, সর্বক্ষেত্রে নেতৃত্ব গ্রহণ করতে চাইছেন। এছাড়া এক ধরনের নৈতিকতা বোধের দরুন বাঈজী পালনের বদলে তাঁরা থিয়েটার বেছে নিয়েছিলেন এবং এ কারণেই বিভিন্ন পেশার আঁতাত সম্ভব হয়েছিল, সম্প্রদায়গত মনোভাবও বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। শ্রেণীগত কারণেই এটা সম্ভব হয়েছিল।

তবে ঢাকার থিয়েটার সব সময় প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে। সে প্রতিরোধের সৃষ্টি হয়েছিল রক্ষণশীল মনোভাব থেকে। আমাদের হয়তো আশ্চর্য লাগতে পারে এ ভেবে যে ব্রাহ্ম সমাজ থেকেই নাটকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এসেছিল। কিন্তু এ প্রতিরোধ এসেছিল ব্রাহ্ম সমাজের একটি গ্রুপ থেকে। সত্যেন সেন লিখেছেন—'ব্রাহ্মদের প্রগতিমুখী চিন্তার পাশাপাশি, প্রতিক্রিয়াশীল যদি নাও বলি, অন্ততপক্ষে রক্ষণশীল চিন্তাও ঠাঁই করে নিয়েছিল। সামাজিক উচ্ছৃংখলতার হাত থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য তারা একেবারে বিপরীত প্রান্তে গিয়ে কঠোর নীতিবাগীশ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।... পতিতা মেয়েরা থিয়েটারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকত বলেই তারা থিয়েটার বর্জনীয় বলে মনে করতেন। কিন্তু কার্যত দেখা গেছে মেয়েরা জড়িত থাক আর নাই থাক, কোন থিয়েটারকেই তারা সুদৃষ্টি নিয়ে দেখতেন না।'[৩০]

তৎকালীন সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সরলভাবে আমরা ব্যাপারটিকে বিচার করতে পারি। রক্ষণশীল চিন্তার ধারক—হিন্দু, ব্রাহ্ম, মুসলমান সব সম্প্রদায়ই থিয়েটারকে বাধা

দিয়েছে। অন্যদিকে আবার ঐ সময়ের তুলনায় যারা লিবারেল, সে যে সম্প্রদায়ের হোক না কেন থিয়েটারের পক্ষ অবলম্বন করেছে। তারা থিয়েটারকে দেখেছেন সংস্কারের মাধ্যম হিসাবে। বিনোদনের একটি নির্মল উপায় হিসাবে। অমৃত বাজার পত্রিকায় একটি মন্তব্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—'সমাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নূতন আমোদ আহ্লাদের আবির্ভাব হয়। ইংরেজী সভ্যতায় এ দেশে অন্যান্য আমোদের মধ্যে মদ্য পান এবং নাটকাভিনয় আনয়ন করিয়াছে।...মদ আসিয়া যেমন হিন্দু সমাজে নানা পাপ প্রস্রবণ খুলিয়াছে, সমাজ সংস্কার করিবার নিমিত্ত তেমনি নাটক অভিনয়ের সৃষ্টি হইয়াছে।...'[৯১]

কিন্তু তা সত্ত্বেও অদ্ভুত ধরনের এক নৈতিকতা বোধ এ দুই দলের মধ্যে কাজ করেছে। তা হলো ছাত্রদের থিয়েটার দেখা অপছন্দ করা। এমনকি ১৮৯৯ সনে দেখা যাচ্ছে কমিশনার ছাত্রদের থিয়েটারে যাওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন।

আগেই উল্লেখ করেছি, ভিন্নতরভাবে যাত্রা করা সত্ত্বেও ঢাকার থিয়েটার চর্চা কলকাতার অনুগামীই ছিল। এ পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা থিয়েটারের সঙ্গে আজীবন সংশ্লিষ্ট, শ্যামবাজারের জমিদার ব্রজগোপাল দাসের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন—

'পাশ্চাত্যের নকল থিয়েটারের পীঠ ভূমি কলকাতা। আর কলকাতার নকলের পীঠ ভূমি ছিল ঢাকার থিয়েটার। এ ব্যাপারে এখানে মৌলিকত্ব বলতে কোন কিছুই ছিল না, না জেনে না বুঝে নকল। পরিকল্পনা, মঞ্চ স্থাপত্য—এসবের কোন ধার ধারা হতো না। নকলের নকল যা হয় তাই।... ছিল সখীর পার্ট; গানের প্রাচুর্য। ছিল না সমাজ দায়িত্ববোধ, পারিবারিক জীবনই ছিল নাটকের উপজীব্য।...এন্টারটেনমেন্ট ভ্যালু— এটাই ছিল মূল কথা। ভাল প্রোডাকশন হলে দর্শকরা তার মধ্যেই নিজেদের সত্তা হারিয়ে ফেলতো।'[৯২]

ঢাকায় গত শতকে যে নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে সেগুলোর একটি খতিয়ান নিলে দেখা যাবে অধিকাংশ নাটকের বিষয়বস্তু পৌরাণিক বা অন্য কথায় বলা যেতে পারে যাত্রার উন্নত রূপ যা দেখে 'ঢাকা প্রকাশ' মন্তব্য করেছিল,'কল্পনামূলক নাটক অপেক্ষা ঢাকায় পুরাণ ঘটিত উৎকৃষ্ট নাটকের সমাদর অধিক।[৯৩]

কলকাতাতেও এর খুব একটা রকমফের হয়নি। অজিত কুমার ঘোষ লিখেছেন— 'মাইকেল দীনবন্ধুর নাটকে যে প্রগতিশীল, সমাজ সংস্কারমূলক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল তার সঙ্গেও ১৮৭২ সনের পরবর্তী সামজিক দৃষ্টিভঙ্গীর কোনোই যোগ ছিল না। ওই সময়ে সনাতন আদর্শের পুনঃস্থাপনা ও পুরাতন সামাজিক মূল্যগুলো সংরক্ষণের দিকেই সমাজের ঝোঁক দেখা গিয়েছিল। ... মাইকেল দীনবন্ধু যুগের প্রতিবাদ ও ভাঙ্গনের দিকে তখনকার সমাজের আগ্রহ ছিলো না, আধ্যাত্মিক ভাবের পুনরুদ্বোধন পুরাতন সমাজনীতি ও আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠার দিকেও তখনকার সমাজমনের ঝোঁক দেখা গেল।'[৯৪]

তা ছাড়া কলকাতায় মাঝে মধ্যে অন্য বিষয়বস্তু নিয়ে নাটক অভিনীত হলেও কলকাতার বাইরে যাত্রা ছিল জনপ্রিয় এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে যাত্রারই যোগাযোগ ছিল বেশি এমনকি কলকাতা মঞ্চের অনেক অভিনেতা ও প্রাসঙ্গিকভাবে যাত্রার আঙ্গিকেরই পক্ষপাতী ছিলেন।

স্বাভাবিকভাবেই মফস্বল শহর ঢাকার (কলকাতার তুলনায়) লোকদের মনে যাত্রা তখনও প্রভাব বিস্তার করে ছিল।[৯৫] ফলে দর্শক চিত্ত সন্তুষ্ট করার জন্যে উদ্যোক্তাদের পৌরাণিক বিষযক এমন নাটক মঞ্চস্থ করতে হয়েছে যা হয়তো উন্নত স্তরের যাত্রারই আরেক রূপ।

ফলে ঢাকার থিয়েটার হয়তো আঙ্গিকগত দিক থেকে বা বক্তব্য প্রকাশ নতুন কিছু করতে পারেনি কিন্তু তা 'সাধারণ মানুষকে শিক্ষা দিয়েছে',[৯৬] নির্মল আনন্দ দিয়েছে, বিনোদনের সুস্থ উপকরণ হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করেছে এবং সবশেষে 'তাদের সাংস্কৃতিক মানের উন্নয়ন করেছে'[৯৭] —একথা বোধহয় অস্বীকার করা যায় না।

তথ্য নির্দেশ

১ Abdul Karim : *Dacca, The Mughal Capital,* Dacca, 1964; অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তরিত হয় ১৬০৮ সনে। অধ্যাপক করিম যুক্তিসঙ্গতভাবে দেখিয়েছেন, ইসলাম খাঁ ঢাকায় পদার্পণের পর রাজধানী স্থাপিত হয়, সময় ১৬১০ সন। এখানে অধ্যাপক করিমের মতই মেনে নেয়া হলো। বিস্তারিত বিবরণের জন্যে দেখুন এই গ্রন্থের পৃঃ ৯-১৪।

২ জেমস টেলর : *কোম্পানী আমলে ঢাকা,* (Topography of Dacca'র অনুবাদ; অনুবাদক মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান) ঢাকা, ১৯৭৮, পৃঃ ৫৯।

৩ From Assitant Surgeon H.C. Cutclife F.R.C.S. Officiating Civil Surgeon of Dacca to the Chairman of the Municipal Commissioner of Dacca, No 106, Dated Dacca,7.4. 1869, *Proceedings of Lt. Governor of Bengal,* Judicial Department, September, 1869.

৪ *Procedings of Governer of Bengal,* Judicial Department, September, 1869.

৫ নবীনচন্দ্র সেন : আমার জীবন, *নবীনচন্দ্র* রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পাদনা সজনীকান্ত দাস, কলকাতা, ১৩৬৬, পৃ ঃ ১৫২।

৬ মমিনুল মউজদীন : দেওয়ান গনিউর রাজার রোজনামচা *বিচিত্রা* ৭ম বর্ষ, ১৭ সংখ্যা, ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৮, প ঃ ৩৯।

৭ *School Establishment for the month of January 1878,* Pogose School.

৮ Lt. Col. C.J.C. Davedson: Diary of Travels and Adventure in. Upper India, excerpts published in *Bengal Past and Present,* vol XL11, Part 1, Serial No 83, July-September, 1931, PP. 1-37.

৯ মুনতাসীর মামুন : হৃদয়নাথের ঢাকা শহর, *সাপ্তাহিক বিচিত্রা,* ঈদসংখ্যা ১৯৭৬, পৃঃ ১৪৪।

১০ মানসী মুখোপাধ্যায় ঃ *অতুলপ্রসাদ,* কলকাতা, ১৯৭১, পৃঃ১৪-১৫।

১১ সত্যেন সেন ঃ ঢাকা শহরের নাচ গান, *শহরের ইতিকথা* ঢাকা, ১৯৭৪, পৃঃ ১১২।

১২ S.N.H.R. Glimpses of Dacca's Cultural Facets, *A City and its Civic Body,* Editor : Azimushan Haider, Dacca 1966, P. 70.

১৩ মুনতাসীর মামুন : *প্রাগুক্ত প্রবন্ধ,* পৃঃ ১৪৪।

১৪ *ঐ,* হৃদয়নাথ লিখেছেন, যাত্রার জন্যে ঢাকা ছিল বিখ্যাত। 'সীতার বনবাস' হলো ঢাকার প্রথম যাত্রা। তারপর একরামপুর থেকে 'স্বপ্নবিলাস' নামে একটি যাত্রা মঞ্চস্থ হলো। এই যাত্রা শহরে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। 'স্বপ্নবিলাস'-এর সাফল্যের পর একরামপুর

থেকে পরপর মঞ্চস্থ করা হলো 'রায়-উন্মাদিনী' ও 'বিচিত্রা বিলাস'। নবাবপুরের বাবুদের তখন বেশ নাম ডাক। যাত্রা প্রতিযোগিতায় তারাও পিছিয়ে থাকতে চাইলেন না। তাদের উদ্যোগে মঞ্চস্থ হলো 'নারদ সম্বাদ' ও 'প্রভাস নানা'। তারপর একে একে মঞ্চস্থ হলো 'ধনকুণ্ড', 'নৌকাকুণ্ড'এবং 'ব্রাহ্মণের গীতা।' কিন্তু এর কোনটিই জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি।

ঢাকার শেষ এ্যামেচার যাত্রা 'কোকিল সংবাদ'। সুভাড্যার কয়েকজন ভদ্রলোক মিলে এর আয়োজন করেন। শহরে ছয় মাস এবং গ্রামাঞ্চলে প্রায় এক বছর ধরে 'কোকিল সংবাদ' চলেছিল।

১৫ ঢাকা প্রকাশ, উদ্ধৃত, মুনতাসীর মামুন : *প্রাগুক্ত প্রবন্ধ*, পৃঃ ১৪৫।

১৬ সত্যেন সেন : প্রাগুক্ত প্রবন্ধ: খেমটা গান ও নাচ হলো হালকা, আদিরসাত্মক। একজোড়ার কম হলে খেমটা চলত না। সত্যেন সেন এই প্রবন্ধে জানিয়েছেন ঐ সময় [সন উল্লেখিত হয়নি: ৮০/৯০ দশকের শেষে অনুমান করে নিতে পারি] ঢাকা শহরে কুড়ি/বাইশটি খেমটাওয়ালী ছিল। এদের দৈনিক মজুরী ছিল ৩৫ থেকে ৭০ টাকা। খেমটার দালাল, যারা আবার গানের বাজনাদার হিসেবেও কাজ করত তারা পরিচিত ছিল 'সফরদার' নামে।
বাঈজীরা ছিল খেমটাওয়ালীদের ওপরের স্তরের। বাঈজীরা কখনও বাংলায় গান গাইত না। খেমটাওয়লী থেকে অনেকে আবার বাঈজীদের স্তরে উন্নীত হতো। ঢাকার মুসলমান ওস্তাদ এবং 'বসাক ওস্তাদরা' বাঈজীদের তালিম দিত।

১৭ মমিনুল মউজদীন : *প্রাগুক্ত প্রবন্ধ।*

১৮ *ঢাকা প্রকাশ।*

১৯ অমৃত বাজার পত্রিকার মন্তব্য, উদ্ধৃত, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস*, কলকাতা, ১৩৬৮, পৃঃ ৬৮-৬৯।

২০ *ঢাকা প্রকাশ*, ১৬-৭-১৮৭৩।

২১ হরকরার সংবাদ, ১২-৬-১৮৬১, উদ্ধৃত, সৈয়দ মুর্তাজা আলী, 'উনবিংশ শতাব্দীতে ঢাকায় নাট্য আন্দোলন', *সাহিত্য পত্রিকা*, ১৭ বর্ষ ২ সংখ্যা, ১৩৮০, পৃঃ ৩৪।

২২ শিশির কুমার বসাক : 'ঢাকার নাট্যশালার আদি ইতিহাস', আজাদ সাহিত্য মজলিস, *দৈনিক আজাদ;* ১০-১০-১৯৬৪ পৃঃ ৬-৭।

২৩ মোহাম্মদ আব্দুল কাইয়ুম : 'সাময়িকপত্রে সেকালের ঢাকা', *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, ১৫ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, এপ্রিল, জুন ১৯৭০, পৃঃ ৫১।

২৪ সৈয়দ মুর্তাজা আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৪।

২৫ *ঢাকা প্রকাশ*, ২৮-১১-১৮৮৫

২৬ *ঐ*, ১৬-৭-১৮৭৩।

২৭ শিশির কুমার বসাক, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৬-৭।

২৮ *ঐ।*

২৯ সৈয়দ মুর্তাজা আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৪।

৩০ *অমৃত বাজার পত্রিকা*, ১৮-৩-১৮৭২

৩১ মমতাজ উদ্দীন আহমদ : 'বাংলা থিয়েটারের বিবর্তন', *শিল্পকলা* ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, গ্রীষ্ম, ১৩৮৭, পৃঃ ৪৪-৪৫।

৩২ অমৃতবাজার পত্রিকা, ৪-৪-১৮৭২, উদ্ধৃত, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৬৯।

৩৩ *ঐ*
৩৪ *ঢাকা প্রকাশ*, ২৭ ৪-১৮৬৪।
৩৫ *ঢাকা প্রকাশ*, ১৬ ৭-১৮৭৩
৩৬ *ঐ।*
৩৭ সৈয়দ মুর্তাজা আলী ও শিশির কুমার বসাকের *প্রাগুক্ত প্রবন্ধ।*
৩৮ শিশির কুমার বসাক, *প্রাগুক্ত*, ১০-১০ ১৯৬৪, পৃঃ ২।
৩৯ *ঐ।*
৪০ সৈয়দ মুর্তাজা আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৬।
৪১ মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫২।
৪২ *ঢাকা প্রকাশ*, ১৭-৫-১২৯১।
৪৩ *ঐ*, ২২-৭-১৮৮৮।
৪৪ *ঐ।*
৪৫ সৈয়দ মুর্তাজা আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৮।
৪৬ শিশির কুমার বসাক, *প্রাগুক্ত*, ১০-১০-১৯৬৪ পৃঃ ৩।
৪৭ সৈয়দ মুর্তাজা আলী, *প্রাগুক্ত*, প্রঃ ৩৮।
৪৮ শিশির কুমার বসাক, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩।
৪৯ *ঐ।*
৫০ *ঐ।*
৫১ *ঢাকা প্রকাশ* ৬-১-১৮৮৯।
৫২ শিশির কুমার বসাক, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১।
৫৩ *ঐ*,
৫৪ *ঢাকা প্রকাশ*, ১১-৮-১৮৮৯।
৫৫ *ঐ*, ২৫-৮-৮৯।
৫৬ সত্যেন সেন, ঢাকা শহরের নাট্য আন্দোলন, *শহরের ইতিকথা*, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃঃ ২৪।
৫৭ শিশির কুমার বসাক, *প্রাগুক্ত*, ১৭-১০-১৯৬৪, পৃঃ ১।
৫৮ সত্যেন সেন, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪।
৫৯ *ঢাকা প্রকাশ*, ৩-১২-১৮৯৩।
৬০ শিশির কুমার বসাক, *প্রাগুক্ত*, ১০-১০-১৯৬২, পৃঃ ২।
৬১ সৈয়দ মুর্তাজা আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪০।
৬২ সত্যেন সেন, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫।
৬৩ *ঢাকা প্রকাশ*, ২১-৫-১৮৯৩।
৬৪ সৈয়দ মুর্তাজা আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪০।
৬৫ *ঢাকা প্রকাশ*, ২১-৫-৯৩
৬৬ সত্যেন সেন, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৬ ৭।
৬৭ *ঢাকা প্রকাশ*, ২২, ১৮৯৩।
৬৮ সত্যেন সেন, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৬।
৬৯ *ঢাকা প্রকাশ*, ২-৭ ১৮৯৯
৭০ সৈয়দ মুর্তাজা আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪০।

৭১ *ঐ*.
৭২ *ঢাকা প্রকাশ*. ১৯-১২-১৮৯৭।
৭৩ *ঐ*. ৪-২-১৯০০।
৭৪ সত্যেন সেন, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৭।
৭৫ অমৃতলাল বসুর স্মৃতিচারণ, বিপিন বিহারী গুপ্ত, *পুরাতন প্রসঙ্গ*, কলকাতা, ১৩৭৩, পৃঃ ২৪২-৪৩
৭৬ *ঢাকা প্রকাশ*, ২২-০৬-১৮৭৩।
৭৭ *ঐ*।
৭৮ *ঐ*, ১২-৩-১৮৭৬।
৭৯ *ঐ*, ১০-৮-১৮৮৯।
৮০ সৈয়দ মুর্তজা আলী, *প্রাগুক্ত প্রবন্ধ*, পৃঃ ২৪।
৮১ *ঢাকা প্রকাশ*, ১৭-৮-১৯৭৯।
৮২ *ঐ*, ১৭-৫-১৮৮৪।
৮৩ শিশির কুমার বসাক, *প্রাগুক্ত*, ২৪-১১-১৮৬৪, পৃঃ ১।
৮৪ *ঐ*।
৮৫ *ঢাকা প্রকাশ*, ২২-৮-১৮৮৮।
৮৬ সত্যেন সেন, *প্রাগুক্ত প্রবন্ধ*, পৃঃ ৩৯।
৮৭ *ঐ*।
৮৮ শিশির কুমার বসাক, *প্রাগুক্ত*, ১০-১০-১৮৬৪, পৃঃ ২।
৮৯ *ঢাকা প্রকাশ*, ১৬-১২-১৯০০।
৯০ সত্যেন সেন, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১১।
৯১ অমৃত বাজার পত্রিকা, উদ্ধৃত, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস* কলিকাতা, ১৩৬৮, পৃঃ ৬৮-৬৯। এই পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকায় মঞ্চস্থ দু'একটি প্রহসন বা ব্যঙ্গ নাটকের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। শিশির কুমার বসাক লিখেছেন, ঢাকার ব্যঙ্গ নাটকগুলোতে সমসাময়িক ঘটনাবলী প্রতিফলিত হতো, 'এককথায় সমাজের দুর্নীতিমূলক ব্যবস্থাগুলোর প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া পরোক্ষে সুষ্ঠু পরিবেশ গঠনের ইঙ্গিত দিত।' তিনি 'তাজ্জব ব্যাপার' নামে একটি নাটকে 'নারী জাগরণের চিত্র' উল্লেখ করেছেন এভাবে—"ফাটকে আটক রব না/দিয়েছ শেকল কেটে/এখন মাঠের বাইরে পা দিয়াছি/দখল কর জেনানা/আমরা সব কলেজে যাব 'নলেজ' পাব/টপ্পা গেয়ে করব সুখে বাবুয়ানা/এখন তোমরা কুটনা কোটো বাটনা বাটো/দাও লক্ষ্মী পূজার আলপনা/...ছিলাম অবলা সরলা, সহে বিরহ জ্বালা/এখন পুরুষ জাতি ফুলিয়ে ছাতি কলম চালাই সজোরে।...আমরা কে ডরি অরি/নয়নবানে ভুবন জয় করি/আমরা হয়েছি ভলেনটিয়ার/আর কারে করি কেয়ার/পরেছি ঐ ইউনিফরম হয়েছি মিলিটারী/আসে যদি রুষিয়া/তাড়াইব ঠুষিয়া, কাবুল দখল একদিনে পারি/ আমাদের করে স্বাধীন/মিনষেরা হ'ল অধীন। ব্যাচারারা ভাই রাধে/উনুনে ফুঁ পাড়ে আর কাঁদে। এখন আমাদের আর কেবা পায়/অন্দরের গন্ধমাত্র দেখ আর গায়ে নাই।'
'নগর কৌতুক নামে ব্যঙ্গ কৌতুকের নমুনা—'Gala city Balad.' Blooming fresh in fancy dress/Sing and dance Jump and praise/queen of beauty this

g-ila city/dirty no no pretty municipality/ quite first rate/Its narrow drain its floody lane/grimy grass dreamy cash / Scanty water tax every quarter/blessed blessed Sewage scent Blessed nineteen half percent

৯২ সত্যেন সেন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯।

৯৩ *ঢাকা প্রকাশ*, ২২-৬-১৮৭৩।

৯৪ অজিত কুমার ঘোষ, শতবর্ষের মঞ্চ পরিক্রমা, সংকলিত হয়েছে *শতবর্ষের নাট্যশালা'য়।* উদ্ধৃত Sunil Kumar Chattopadhyay Hundred years of Bengali Natyashala *Nineteenth Century Studies* No 6 p 266

৯৫ মুনতাসীর মামুন প্রাগুক্ত প্রবন্ধ।

৯৬ সত্যেন সেন, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩০

৯৭ *ঐ।*

সংকলিত সংবাদ

অমৃত বাজার পত্রিকা থেকে

সমাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নূতন আমোদ-আহলাদের আবির্ভাব হয়। ইংরাজি সভ্যতা এ দেশে অন্যান্য আমোদের মধ্যে মদ্যপান এবং নাটকাভিনয় আনয়ন করিয়াছে। বিষ ও বিষহরি বিধাতা একেবারে সৃষ্টি করেন। মদ আসিয়া যেমন হিন্দু সমাজে নানা পাপ প্রস্রবণ খুলিয়াছে, সমাজ সংস্কার করিবার নিমিত্ত তেমনি নাটক অভিনয়ের সৃষ্টি হইয়াছে।...

ঢাকার সুশিক্ষিত যুবকেরা সম্প্রতি রামাভিষেক নাটক অভিনয়ে ব্যাপৃত হইয়াছেন। ... ঢাকার যুবকেরা উৎসাহী এবং সরলচেতা। তাঁহারা অভিনয় কার্যে যেরূপ কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহাতে অভিনয়টি সুচারু পূর্ব্বক হইবার সম্ভাবনা। আমরা একদিন ইহাদের কয়েকজন অভিনেতৃগণের অভিনয় দেখিয়াছিলাম এবং আমাদের বিবেচনায় উহা চমৎকার হইয়াছিল। যুবকেরা চাঁদা দ্বারা বিস্তর অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। একটি রঙ্গভূমি প্রস্তুত করিয়া এ কলিকাতা হইতে চিত্রকর লইয়া গিয়ে উত্তম উত্তম চিত্র চিত্রিত হইয়াছে। অভিনেতৃগণের মধ্যে ঢাকার প্রধান প্রধান ব্যাক্তিরা আছেন। পাছে উহার দ্বারা কোন অমঙ্গল হয়, এই নিমিত্ত তাহারা উহাতে স্কুলের কোন ছাত্রকে প্রবেশ করিতে দেন নাই। আমাদের দেশে নাটক অভিনয়ের নিমন্ত্রণ প্রায় বন্ধুবান্ধবের মধ্যে হয়। যাহার ইচ্ছা, সে উহা দর্শন করিতে যাইতে পারে না। ঢাকার অভিনয়ে সেটি হইবে না। অভিনয় কর্তারা উহার নিমিত্ত টিকেট বিক্রি করিবেন। টিকিট চারি, দুই এবং এক টাকা মূল্যের থাকিবে। অভিনয় উৎপন্ন টাকা দ্বারা তাহারা দেশে সৎকার্যানুষ্ঠান করিবেন। প্রকৃত তাহারা টিকিট বিক্রয়ের কথা বাহির করিয়া দেশের একটি অভাব যেমন দূর করিতেছেন, তেমন সৎকার্যানুষ্ঠানের একটা প্রধান পথ বাহির হইতেছে। এরূপ অর্থ উপার্জন দ্বারা উপার্জনকারীদিগের গৌরব লাঘব না হইয়া প্রত্যুত বৃদ্ধি হইবে। ১৮/৩/১৮৭২ [অমৃত বাজার প্রত্রিকা; উদ্ধৃত হয়েছে, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, কলকাতা, ১৩৬৮, পৃঃ ৬৮-৬৯]

অমৃত বাজার প্রত্রিকা থেকে

গত শনিবারে ঢাকায় রামাভিষেক নাটক অভিনয় হইয়া গিয়াছে। এ সম্বন্ধে একজন বন্ধু লিখিয়াছেন--

'অভিনয় দেখিতে বিস্তর লোকের সমাগম হয়। অনেক অনেক প্রধান মুসলমান, ঢাকার ডিস্ট্রিকট সুপারিনটেণ্ডেন্ট, পোগোজ সাহেব এবং অন্যান্য কয়েকজন খৃস্টান উপস্থিত হন এবং সকলেই অভিনয় দেখিয়া অত্যন্ত তৃপ্ত হইয়া গিয়াছেন। সুপারিনটেণ্ডেন্ট সাহেব এমন আনন্দিত হন যে, তিনি বলেন যে, আবার যখন অভিনয় হইবে তখন আমি মেম সাহেবদিগকে আসিতে বলিব। এবং গোগেজ সাহেব বলেন যে, অভিনয়ের টিকিট কিনিতে যে পাঁচ টাকা ব্যয় হইয়াছে, তাহা তিনি অতি সৎকার্যে লাগাইয়াছেন। সকল বিষয় অতি সুচারু পূর্ব্বক নির্ব্বাহ হইয়া গিয়াছে। ....

এত অর্থ, এত যত্ন, পরিশ্রম করিয়া যে ঢাকার অভিনয়টি সুচারু পূর্বক নির্ব্বাহ হইয়াছে ইহা শুনিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইলাম।

৪-৪-১৮৭১

[অমৃত বাজার প্রত্রিকা; উদ্ধৃত: ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৬৯]

[ন্যাশনাল থিয়েটার]

কলিকাতা নেসলেন থিয়েটারের সভ্যগণ গত সোমবার এখানে 'পৌঁছিয়া গত রাত্রিতে নীলদর্পণের" অভিনয় করিয়াছেন। এখন বিদ্যালয়াদি বন্ধ থাকাতে ইহাদের আশানুরূপ লাভ না হইতে পারে। কলেজ খোলা পর্যন্ত ইহারা এখানে মধ্যে ২ অভিনয় করিবেন। ঢাকার ধনাঢ্যগণ ইঁহা উৎসাহ বর্দ্ধন করেন প্রার্থনীয়। ইহাদের দুই দল, অন্য দলও শীঘ্রই ঢাকায় আসিবেন।'

১৮-৫-১৮৭৩

বিজ্ঞাপন

হিন্দু ন্যাশনেল থিয়েটার।

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আগামী ১২ই জুন বৃহস্পতিবার হইতে ১৬ই সোমবার পর্যন্ত পাঁচ দিবস পূর্ব্ব বঙ্গ রঙ্গভূমিতে উপরিউক্ত কোম্পানী নিম্নলিখিত সময়ে নিম্নলিখিত নাটকসমূহের অভিনয় করিয়া ১৭ই জুন তারিখে কলিকাতা যাত্রা করিবেন। বৃহস্পতিবার রাত্রি।

৭॥ হইতে সময়, নবীন তপস্বিনী

শুক্রবার	রাত্রি	ঐ	কৃষ্ণকুমারী।
শনিবার	রাত্রি	ঐ	লীলাবতী।
রবিবার	বেলা ২টা হইতে ৬ ঘটিকা পর্যন্ত		নীলদর্পণ

সোমবার শেষ দিবস

যেমন কর্ম তেমন ফল
বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ
পেনটোমান
ঐ মডেল স্কুল
বিলাতি বাবু
ভারত মাতা
পরীস্থন
মস্তবি সাহেবের বিদায় গ্রহণ

প্রবেশ মূল্য

বিশেষ আসন	৪ টাকা	১৪ টাকা পাঁচ দিবসের জন্য	
১ম শ্রেণী	২ টাকা	৭ টাকা	ঐ
২য় ঐ	১ টাকা	৪।।.ঐ	ঐ

. ৩য় ঐ ।। ১।।.ঐ ঐ
রবিবার দিবস অর্ধেক মূল্যে টিকেট বিক্রয় হইবে।

১৮ ৫ ১৮৭৩

অমৃতলাল বসুর স্মৃতিচারণ

... এমন সময়ে কলিকাতা হইতে ঢাকা যাইবার প্রস্তাব হইল আমাদের সকলেরই খুব উৎসাহ। অর্ধেন্দু, আমি, নগেন, কিরণ, ক্ষেত্র গাঙ্গুলী, বেলবাবু, বিহারী বসু প্রভৃতি সকলেই বিদেশে যাইতে প্রস্তুত। মেয়ে সাজিবার জন্য মহেন্দ্র সিং নামে একটি সুন্দর ছেলে পাওয়া গেল। ঢাকার মোহিনী মোহন দাসের নামে একখানি পত্র বলাই সিং মহাশয়ের নিকট হইতে লইয়া ১৮৭৩ খৃস্টাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের গোড়ায় কলিকাতা পরিত্যাগ করিলাম।

... ঢাকার আতিথ্য-সৎকার আমি কখনও বিস্মৃত হইব না। মোহিনীবাবার হাতে চিঠি দেওয়া হইলে তৎক্ষণাৎ তিনি একটি প্রশস্ত বাগান বাড়ী আমাদের জন্য ছাড়িয়া দিলেন; সেই বাগান বাড়ীটি ঠিক বুড়ীগঙ্গার তীরে অবস্থিত। বুড়ীগঙ্গা তখন কূলে কূলে প্রবাহিত। বড় বড় ষ্টীমার ঢাকা শহরের কিনারায় গিয়া লাগিত। রবিবার দিনে প্রাতে কলিকাতা হইতে ষ্টীমার ছাড়িলে পরদিন বৈকালে উহা ঢাকায় গিয়া পৌঁছিত। ঢাকা শহরে একটি বাঁধা ষ্টেজ ছিল। বেশী কাল-বিলম্ব না করিয়া আমরা সেই স্টেজে 'নীলদর্পণ' লইয়া অবতীর্ণ হইলাম; নবাববাড়ীর ব্যাণ্ড ও মোহিনী বাবুর কন্সার্ট আমাদিগকে সাহায্য করিল; শহরের ছোটবড় সকলেই আমাদের অভিনয় দেখিতে আসিলেন - কালী প্রসন্ন ঘোষ, অভয় দাস, ডাক্তার কেদারনাথ ঘোষ, জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট রাম্পিনী, পুলিসের সুপারিনটেণ্ডেন্ট ওয়েদারল্ ও অন্যান্য অনেকে আসিলেন। একরাত্রেই আমরা কিস্তিমাৎ করিয়া দিলাম।

... প্রায় একমাস আমরা ঢাকায় রহিলাম। অনেকগুলি নাটকের অভিনয় করিলাম। অর্ধেন্দুকে লইয়া সমস্ত শহর উন্মত্ত হইয়া উঠিল। আমাদের দেশের থিয়েটারের জন্য কোন অভিনেতাকে অমন করিয়া আর কেহ Lionise করিয়াছে কিনা জানি না।

বেঙ্গল টাইমস পত্রিকায় আমাদের 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের বিদ্রূপাত্মক সমালোচনা বাহির হইল। আমি একটি ছোট-খাটো ফার্স রচনা করিয়া পরদিন সন্ধ্যার পর মুদ্রিত বেঙ্গল টাইমস কাগজে পেন্টুলান কোট, টাই প্রভৃতি রচনা করিয়া তদ্বারা আপাদমস্তক আবৃত করিয়া স্টেজের উপর দাঁড়াইয়া প্রাণ খুলিয়া কেম্প সাহেবকে বিদ্রূপ করিলাম। মজা এই যে, ম্যাজিস্ট্রেট রাম্পিনী ও পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেন্ট ওয়েদারল বাঙ্গালী দর্শকবৃন্দের হাস্যতরঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন।

আমরা 'হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার' নাম লইয়া ঢাকায় আসিয়াছিলাম [মে ১৮৭৩]। ভাগ্যলক্ষ্মী আমাদের প্রতি সুপ্রসন্না হইলেন। আমাদের দলের খ্যাতির কথা শুনিয়া অপর দলের আমাদের পুরাতন বন্ধুরা ঢাকায় গেলেন। তাঁহারা মোহিনীবাবুর মেজো ভাইয়ের (রাধিকা বাবুর) আশ্রয় লইলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে আগে আমরা আসর লইয়াছিলাম বলিয়া ঢাকায় তাঁহারা আসর জমাইতে পারিলেন না। আমাদেরই বাগানবাড়ীর সন্নিকটে

লক্ষীবাড়াতে তাহাদের আড্ডা হইল। তাহারা জীবন বাবুর বাড়ীতে থিয়েটর করিলেন।

[উদ্ধৃত. অমৃতলাল বসুর স্মৃতিচারণা. বিপিন বিহারী গুপ্ত: পুরাতন প্রসঙ্গ. ২য় সংস্করণ ১৩৭৩ পৃঃ ২৪২-২৪৩]

সংবাদ

... ঢাকার হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার কোম্পানীর নীলদর্পণ নাটক অভিনয় সম্বন্ধে একজন দর্শক আমাদিগকে এইরূপ লিখেন :

'গত শনিবার ঢাকা পূর্ব্ববঙ্গ রঙ্গভূমিতে কলিকাতার হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটারের সভ্যগণ নীলদর্পণ নাটকের অভিনয় করিয়াছেন। অভিনয় যে কত দূর সুন্দর হইয়াছিল বলা যায় না। ঢাকাস্থ সমুদায় ভদ্র সমাজ ও ইংরাজগণ অভিনয় দর্শনার্থ উপস্থিত ছিলেন। রঙ্গভূমি লোকাকীর্ণ হইয়াছিল। চারি ঘণ্টাকাল অভিনয় দর্শন করিয়া আমাদের মনের যে কত দূর পরিবর্তন হইয়াছিল বলা বাহুল্য। আমরা সমস্ত ঢাকাবাসী অভিনয় সন্দর্শন করিয়া যে কতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছি লিখিয়া শেষ করিতে পারিব না।' ২২-৫-১৮৭৩

[অমৃত বাজার পত্রিকা. উদ্ধৃত. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়. প্রাগুক্ত গ্রন্থ. পৃঃ ১২০।]

হিন্দু ন্যাশনেল থিয়েটার

কলিকাতার উক্ত থিয়েটার কর্ত্তৃক অত্রত্য 'পূর্ব্ববঙ্গ রঙ্গভূমিতে' গত পূর্ব্ব শনিবার নীলদর্পণের. গত বুধবার সধবার একাদশীর ৬ এবং গত শনিবার নবীনতপস্বিনীর ৭ অভিনয় কার্য সুসম্পাদিত হইয়া গিয়াছে। নীলদর্পণ যে একখানি অতি প্রসিদ্ধ নাটক. তাহা কাহারো অবিদিত নাই। বঙ্গ ভাষার আর কোন নাটকের ভাগ্যেই এত প্রসিদ্ধিলাভ ঘটে নাই। প্রথমতঃ পূর্ব্ব বাঙ্গালার এই ঢাকা নগরীতে আমাদিগের বাঙ্গালা যন্ত্রেই এই নীলদর্পণের জন্ম হয। তৎপর সমস্ত বঙ্গদেশের –ভারত বর্ষের ইংলণ্ডের এমনকি সমুদায় ইউরোপের প্রধান প্রধান নগরে স্বপ্রভাব বিস্তার করিয়া বিলক্ষণ খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করে। ঢাকাস্থ ব্যক্তিগণ যখন শুনিতে পাইলেন. সেই সর্ব্বত্র বিশ্রুত নীলদর্পণ নাটকের অভিনয় এই ঢাকায়ই হইতেছে, তখন তদ্দর্শনার্থ তাঁহাদিগের কত দূর কৌতূহল জন্মিয়াছিল. তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। যাবতীয় বিদ্যালয় বন্ধ সুতরাং বিদ্যালয় সংক্রান্ত সমুদায় লোক স্থানান্তরিত থাকতেও সেদিন নাট্যলয়ে এত লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন যে. উপযুক্ত স্থানাভাব প্রযুক্ত অনেক দর্শককে দণ্ডায়মান থাকিতে হইয়াছিল। কিন্তু অভিনয় দেখিয়া কৌতূহলাক্রান্ত দর্শকবৃন্দের আশানুরূপ তৃপ্তি হইয়াছে কিনা. বলিতে পারি না। কারণ নীলদর্পণ যে যে কারণে এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে তাহা এবং নাটকোচিত গুণাবলী একই পদার্থ নহে। ফলতঃ নীলদর্পণে নাটকোচিত গুণচাতুর্য্য বড় অধিক দৃষ্ট হয় না। সুতরাং হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটরের অভিনেতৃগণ সবিশেষ যত্ন সহকারে অভিনয় করিয়াও দর্শকবৃন্দের আশানুরূপ তৃপ্তি সাধন করিতে পারেন নাই। নাটকের যে যে অংশে পামর নীলকরদিগের ভয়ানক দুর্ব্ব্যবহারাদি বিধৃত হইয়াছে. তাহাই স্বভাবিক সুতরাং তাঁহার অভিনয়ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। তদ্ভিন্ন নাটকের যে যে অংশ অস্বাভাবিক. অত্যুক্তি যা অন্যরূপ দোষপূর্ণ তাঁহার অভিনয় লোকের চিত্তামোদক না হইয়া বিরক্তিকরই হইয়াছে। গোলক বসুর উদ্বন্ধনে মৃত্যু অবধি করিয়া নাটকের সমস্ত

শেষাংশই দর্শকবৃন্দের অসন্তুষ্টি উৎপাদন করিয়াছিল। ইহা অভিনেতা বা অভিনেত্রীদিগের দোষ নহে, নাটকেরই দোষ।

গুণপনার তারতম্যানুসারে নীলদর্পণের অভিনেতৃবর্গকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে –গোলক চন্দ্র বসু, আই.আই, উড, তোরাপ এবং মোক্তার প্রথম শ্রেণীতে; সরলতা ক্ষেত্রমণি, আদুরী ও সাধুচরণ দ্বিতীয় শ্রেণীতে এবং অবশিষ্ট অভিনেতৃগণ তৃতীয় শ্রেণীতে পরিগণিত হইবার উপযুক্ত। গোলক বসুর নিরীহতা, নির্ব্বালীকতা ও গ্রাম্যোচিত ভীরুতা, অতি সুন্দর ও স্বাভাবিক হইয়াছিল। উডের ভাবভঙ্গী, ভাষা এবং নীলকরোচিত দুর্ব্ব্যবহারও অত্যুক্তকৃষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। তোরাপের প্রভুভক্তি, সত্যপ্রিয়তা ও বীরত্বে সকলেরই মন সবিশেষরূপে আকর্ষণ করিয়াছিল। মোক্তারের বক্তৃতা মক্কেলের সহিত চুপে চুপে কথোপকথন এবং আমলার সহিত ফুসফুসানী প্রদর্শনও উত্তম হইয়াছে। দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ অভিনায়ক এবং অভিনায়িকাদের মধ্যে সরলতার পত্যনুরাগ - কথোপকথন এবং মুমূর্ষু ভাসুরকে পশ্চাদ্দিকে রাখিয়া অবগুণ্ঠনাবস্থায় অবস্থান অনেকাংশে স্বাভাবিক হইয়াছিল। ক্ষেত্রমণির সতীত্ব রক্ষায় ব্যগ্রতা, পশুপ্রকৃতি রোগের আক্রমণে কাকুক্তি ও বীরত্ব এবং পরে প্রকম্পনও ভালই হইয়াছিল। আদুরী এবং সাধুচরণের অভিনয়ও মন্দ হয় নাই। অপরাপরের অভিনয় তাদৃক মনোরঞ্জন করিতে পারে নাই। রোগ এবং পদী-ময়রাণীর অভিনয় সর্ব্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট হইয়াছে। অবস্থোচিত ভাবভঙ্গী প্রদর্শনে উভয়েরই ত্রুটি হইয়াছে। পদীর ক্ষেত্রমণিকে লইয়া রোগের গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ সময়ে রোগের খট্টঙ্গোপরি জাগ্রতবস্থায় শয়ান থাকা এবং নবীন মাধব ও তোরাপ তাহাকে যৎপরোনাস্তি প্রহার করিতে আরম্ভ ও নির্ব্বাক এবং নিশ্চেষ্টাবস্থায় দণ্ডায়মান থাকা সাহেবদিগের স্বভাবোচিত হয় নাই। পদী-ময়রাণীর চপলতা শূন্য শান্ত ভাবও নিতান্ত অস্বাভাবিক হইয়াছে। পাড়ার বালকেরা তাহাকে হাতে তালি দিয়া ক্ষেপাইতে আরম্ভ করিলেও সে শান্ত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল ইহা স্বভাব বিরুদ্ধ। ফলতঃ ময়রাণীর সবিশেষ চাঞ্চল্য প্রদর্শন নিতান্ত আবশ্যক ছিল।

তৃতীয়াঙ্কের তৃতীয় গর্ভঙ্কটার অভিনয় সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। দুরাত্মা রোগ পদীময়রাণীর দ্বারা ক্ষেত্রমণিকে স্বভবনে লইয়া গিয়া তাহার সতীত্ব নাশে চেষ্টা করিলে নবীন মাধব ও তোরাপ বীরদর্পে আসিয়া রোগকে আক্রমণ পূর্ব্বক যখন পুনঃ পুনঃ তিরস্কার ও প্রহার করিয়াছিল, তখন এমন ব্যক্তি নাই যে সবিশেষ চমৎকৃত ও বিমোহিত না হইয়াছিলেন।

নীলদর্পণের অভিনেতৃগণের ভাষা সম্বন্ধে বক্তব্য এই - উড এবং রোগ উভয়েরই ইংরেজী উচ্চারণ উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। অপরাপরের মধ্যে কেহ কেহ যশোহরের এবং কেহ কেহ বা নদীয়ার তৎকৃষ্ট ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন কেন আমরা নিশ্চিতরূপে বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। কোন জেলার ঘটনা অবলম্বন করিয়া নীলদর্পণ রচিত হইয়াছে নাটকে তাহা সুষ্টরূপে উল্লেখিত হয় নাই। যাহা হউক হয় কৃষ্ণনগরে না হয় যশোহরে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব অভিনেতৃগণের সকলের হয় কৃষ্ণনগরে নয় যশোহরে দুইয়ের একরূপ কথা বলিলেই সঙ্গত হইত। সরলতা ভিন্ন প্রায়

কোন স্ত্রীলোকেরই স্বর স্ত্রীজনোচিত হয় নাই পুরুষ স্বরের ন্যায় অসঙ্গত মোটা ও কর্কশ হইয়াছে।

সীন, উপকরণ ও পরিচ্ছদ সম্বন্ধে আমাদিগের অনেক বক্তব্য আছে। হিন্দু ন্যাশনেল থিয়েটার কোম্পানী অভিনয়ের একখানি সীন অথবা একটা উপকরণও সঙ্গে করিয়া আনেন নাই। অত্রত্য রামাভিষেক নাটকাভিনয়ের সীন লইয়া নীলদর্পণাদির অভিনয় কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। এক নাটকের সীন অন্য নাটকে ব্যবহৃত হইলে সর্ব্বাংশে সুসঙ্গত হওয়া অসম্ভব। সুতরাং নীলদর্পণের অনেক অঙ্কেই সীনগুলি অযথা রূপে সমাবেশিত হইয়াছিল হইা বলা বাহুল্য। কার্যকারিদিগের অপটুতা বা অতি ক্ষিপ্রকারিতা নিবন্ধন অনেক স্থলেই সীনগুলি বক্রভাবে ও দোদুল্যমান অবস্থায় থাকাতে দর্শকগণের অতিশয় বিরক্তি উৎপাদন করিয়াছিল। যবনিকা অনেক সময়ে বাবহর্ত্তগণের অভিনয়ানুসারী না হইয়া স্বাধীনভাবে পতিত ও উত্থিত হইয়াছিল। অভিনয়োপযোগী উপকরণ না থাকাতে অনেক স্থলে অভিনীত ঘটনা গুলি পরিস্ফুটরূপে লোকের হৃদায়াধিকার করিতে পারে নাই।

পরিচ্ছদ ও বেশবিন্যাস এরূপ যৎসামান্য ছিল যে, তাহা প্রদর্শনযোগ্য নহে। প্রথমতঃ নাট্যস্থানীয় গাথক [গায়ক] যে বেশে যে পরিচ্ছদে রঙ্গভূমিতে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া কেহই মনে করিতে পারেন নাই, এ ব্যক্তি অভিনয় উপলক্ষে রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছে। তাহার ধুতি ও চাদর অতি সামান্য, পিরহানও অতি সাধারণ, অধিকন্তু তাহাতে বুতাম নাই। এরূপ সামন্য বেশ কি জননীস্থানীয়া দুঃখিনী ভারত ভূমির দুঃখ জ্ঞাপন মানসে না অসংস্থান প্রযুক্ত ধারণ করা হইয়াছিল, বলিতে পারি না। প্রথম কারণ প্রকৃত হইলে গাত্রে পিরহান না দিয়া কেবল উত্তরীয় ধারণ পূর্ব্বক দীন বেশ প্রর্দশন করিলেই ভাল হইত। সাহেবদিগের পোষাকও যথোপযুক্ত হয় নাই--অরো উৎকৃষ্ট পোষাক হওয়া আবশ্যক ছিল। অন্যান্য অভিনায়কদিগের পোষাক উত্তম হয় নাই বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের পরিচ্ছদ অতিশয় কদর্য্য হইয়াছিল। আমাদিগের সংস্কার ছিল, ঢাকার রামাভিষেকের নায়িকাদিগের অপেক্ষা কলিকতার নীলদর্পণ প্রভৃতির নায়িকারা পরিচ্ছদ বিষয়ে সবিশেষ উৎকর্ষ প্রদর্শন করিবেন, কিন্তু বাস্তবিক তদপেক্ষা অধিকতর অপকৃষ্ট তাই প্রদর্শিত হইয়াছে। পূর্ব্ব বাঙ্গালার স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় উৎকৃষ্ট রূপে দুই পেঁচ দিয়া কাপড় পরিলে অথবা মোট রকমে উৎকৃষ্ট শাঁটি পরিধান করিলে নীচে জাঙ্গিয়া পরিবার এবং তাহাতে লোকের বিরক্তি জমিবার কারণ ছিল না । ফলতঃ সামান্য যাত্রাওয়ালাদিগের অপেক্ষাও পরিচ্ছদ অপকৃষ্ট হইয়াছিল।

আমরা উপরে নীলদর্পণ নাটকাভিনয়ের গুণ অপেক্ষা দোষের ভাগ অধিক উল্লেখ করিলাম বলিয়া কেহ এরূপ মনে করিবেন না যে, উক্ত অভিনয় যারপরনাই অপকৃষ্ট হইয়াছে। বাস্তবিক ঢাকার রামাভিষেক, জামাই বারিক ও চক্ষুদান প্রভৃতির অভিনয় অপেক্ষা নীলদর্পণের অভিনয় অনেকাংশে উৎকৃষ্টতর হইয়াছে। সাধারণ রূপে ইহার অভিনেতৃগণ অনেকাংশে কৃতকর্ম্মা ও পরিপক্ক অতএব ভরসা করি সময়ে ইঁহারা উল্লিখিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষ সংশোধন করিয়া অধিকতর খ্যাতি প্রতিপত্তিলাভ করিতে পারিবেন।

সাধারণরূপে বিবেচনা করিলে গত বুধবাসবীয় সধবার একাদশী প্রভৃতির অভিনয়ও ভালই হইয়াছে। কিন্তু এক নিমচাঁদ ভিন্ন আর কাহারো অভিনয়ে সর্ব্বাঙ্গীণ পটুতা প্রদর্শিত হয় নাই। সধবার একাদশীর শেষভাগ আশানুরূপ সোদাহরণ উপদেশপূর্ণ নয় বলিয়া অনেকেই অতৃপ্ত হইয়াছেন। ...

২৫-৫-১৮৭৩

অভিনয়

গত পূর্ব্ব শনিবার হইতে এ পর্যন্ত এখানে অনেকগুলি নাটক এবং প্রহসনাদি অভিনয় হইয়া গিয়াছে। গত বারই প্রকাশ করা হইয়াছে কলিকাতা হইতে এখানে হিন্দু নাশনেল এবং থিয়েটর নামক দুই দল লোক অভিনয়ার্থ আগমন করিয়াছেন। হিন্দু ন্যাশনেল থিয়েটর কর্তৃক গত পূর্ব্ব শনিবার নবীন তপস্বিনী, গত সোমবার নীলদর্পণ, বৃহস্পতিবার জামাই বারিক ৮ ও গতকল্য কৃষ্ণকুমারী নাটক[৯] এবং ন্যাশনেল থিয়াটার কর্তৃক গত মঙ্গলবার নীলদর্পণ ও শুক্রবার নয়শো রূপেয়া[১০] নাটক অভিনীত ও সঙ্গে সঙ্গে আরো কিছু কিছু প্রদর্শিত হইয়াছ। হিন্দু ন্যাশনেল থিয়েটরের নবীন তপস্বিনী নাটকের অভিনয় সাধারণভাবে বিবেচনা করিলে ভালই হইয়াছে। প্রধান অভিনায়ক জলধর এতদূর উৎকৃষ্ট হইয়াছিল যে, তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর জলধর সম্ভবিতে পারে, কল্পনা দ্বারা অবধারণ করা কঠিন। ফলত সেদিনকার জলধরের তুলনা নাই। বিদ্যাভূষণ মল্লিকা এবং তপস্বিনী ভালই হইয়াছিল। মালতী কামিনী এবং জগদম্বাও নিতান্ত মন্দ হয় নাই। কিন্তু অপরাপর অভিনায়ক এবং অভিনায়িকারা ততদূর চিত্ত বিনোদন করিতে পারে নাই। বিজয় আর একটুকু বড় এবং কামিনী আর একটুকু ছোট হইলে সম্ভব মত হইত। নবীন তপস্বিনী নাটকের যে উদ্দেশ্য কি, তাহা নাটক রচয়িতাই জানেন। ইহাতে অনাবশ্যক অস্বাভাবিক এবং অপ্রাসঙ্গিক অংশও অনেক আছে। জলধরের অংশই ইহাতে সরস ও চিত্তাকর্ষক, অথচ জলধরের যাবতীয় অংশ পরিত্যাগ করিলেও এ নাটকে মূল প্রস্তাবন বিষয়ে কিছুমাত্র হানি লক্ষিত হয় না। মল্লিকা এবং মালতীর কার্যাকলাপ সরস বটে কিন্তু বিশুদ্ধ নহে। বোধ হয় না কোন ভদ্রলোক, নিজের স্ত্রীর তদ্রূপ ব্যবহার ভালবাসিবেন। বিজয় কামিনীর বালিকা বিদ্যালয়ে পরীক্ষা গ্রহণ এবং এতদুভয়ের সম্মিলন বিষয়ে সুরমার মধ্যবর্তিতা নিতান্তই অস্বাভাবিক। নবীন তপস্বিনীর অভিনয়ে যাহা কিছু দোষ লক্ষিত হইয়াছে তাহা প্রায় নাটকেরই, অভিনেতা বা অভিনেত্রীদিগের তত দোষ নহে।

গত সোমবারের নীলদর্পণের পুনরাভিনয় কোন কোন অংশে পূর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টতর হইয়াছিল সন্দেহ নাই।

মঙ্গলবার রাত্রিতে ন্যাশনেল থিয়েটর কর্তৃক পুনরায় নীলদর্পণ নাটক অভিনীত হয়। এতৎ সম্বন্ধে আমাদিগের কিঞ্চি সবিস্তার আলোচনা করা আবশ্যক। ইহাদিগের সীনগুলি উৎকৃষ্ট তদ্ব্যবহর্তৃগণের ক্ষিপ্রহস্ততা এবং পটুতাও বিলক্ষণ আছে, সমবেত বাদ্য এবং উপকরণাদিরও ত্রুটি নাই, কিন্তু অভিনয় সম্বন্ধে ইঁহারা তাদৃক উৎকর্ষ প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। প্রত্যুত সাধারণভাবে তুলনা করিলে হিন্দু ন্যাশনেল থিয়েটরের নীলদর্পণের অভিনয় অপেক্ষা ইঁহাদিগের উৎকৃষ্টতা নাই, অবচ্ছেদাবচ্ছেদে এরূপ বলা যাইতে পারে

না। ইহাদিগের রাইচরণ, রোগ, পদ্মাময়রাণী এবং সৈরিন্ধ্রী ও কবিরাজ অপেক্ষাকৃত ভালই হইয়াছে। তোরাপও পরিপক্ক অভিনায়ক। কিন্তু স্বরভঙ্গ হওয়াতে কিঞ্চিৎ ত্রুটি লক্ষিত হইয়াছে। সাধারণত ইহাদিগের অভিনেত্রীগণের পরিচ্ছদ উৎকৃষ্ট এবং স্বর অনেকাংশে স্বাভাবিক হইয়াছিল। কিন্তু ইহাদিগের নবীনমাধব অতিশয় অপকৃষ্ট ছিল। ভিতর হইতে উচ্চৈঃস্বরে বই কহিয়া না দিলে প্রায় একটী কথাও বলিতে পারে নাই এবং একবার যাবতীয় বক্তব্য সমাধা না হইতেই রঙ্গভূমি হইতে চলিয়া গিয়াছিল। তন্নিবন্ধন ইহার অভিনয় দর্শকবৃন্দের যারপরনাই বিরক্তি জন্মিয়াছিল। বোধ হয় নূতন ব্যক্তি বলিয়াই এরূপ দোষ ঘটিয়া থাকিবে। নীলদর্পণের অভিনয় সাঙ্গ হইলে যে দুইটি পরি প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহাতে সকলেরই নয়ন পরিতৃপ্ত এবং মন উৎফুল্ল হইয়াছিল সন্দেহ নাই। বৃহস্পতিবার হিন্দু ন্যাশনেল থিযেটার জামাই বারিক প্রহসন ও ভারত মাতার বিলাপ[১১] অভিনীত এবং পরিস্থান প্রদর্শিত হইয়াছে। জামাই বারিকের অভিনয়ও ভালই হইয়াছে। কিন্তু কয়েকটী অংশ সাধারণের তত তৃপ্তিকর হয় নাই জামাই বারিকের গাজীর গীত ও রামায়ণ কীর্ত্তণ ইত্যাদিতে লোকের তত চিত্তাকর্ষণ করিতে পারে নাই। সপত্নীদিগের কলহ ও স্বামি ভর্ৎসনা প্রভৃতি বিলক্ষণ স্বাভাবিক ও চিত্ত বিনোদক হইয়াছিল। এমনকি, রঙ্গভূমিস্থ লোক একবারে বিমোহিত হইয়াছিলেন। উক্ত অভিনয় দর্শন করিয়া শোক ক্রোধ বিষণ্নতা ও আত্মধিক্কার প্রভৃতি উপস্থিত হইয়া চিত্তকে জড়ীভূত করিয়া তুলিয়াছিল। তখন কেহই মুহুর্মুহুঃ অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। এই অভিনয় কার্য্যটি যদিও সংক্ষিপ্ত হউক, তথাপি ইহাতে ভারতবর্ষের দুরবস্থা সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। এরূপ অভিনয় নিতান্তই উপকারী। ইহাতে চিত্তবিনোদন ও উপকার সাধন উভয়ই সুসম্পন্ন হয়। পরিস্থান প্রদর্শন অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্ট হইয়াছিল।

গত শুক্রবার রাত্রিতে ন্যাশনেল থিয়েটারের নয়শো রূপেয়া নাটকের অভিনয় এবং রণক্ষেত্রে মাধবাচার্য্য মহম্মদ ঘোরি ও যবন ও সৈন্যগণ এবং পরিনগর প্রদর্শন হইয়াছে। সাধারণরূপে অভিনয় মন্দ হয় নাই। মাতুলাল বিলক্ষণ কৃতকার্যতা প্রদর্শন করিয়াছে। রামধন ও কবিরাজের অভিনয়ও উৎকৃষ্ট হইয়াছে। রঞ্জন, শশীর মা, সরলা এবং নবীন বাবুও নিন্দনীয় নয়। কিন্তু একটী কারণে শ্রোতৃবর্গ নিতান্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। অভিনেতৃগণের বক্তব্য অংশ সকল ভালরূপে অভ্যাস করা হয় নাই। তন্নিবন্ধন নেপথ্যের অভ্যন্তর হইতে বই বলিয়া দিতে হইয়াছিল। তাহা এতদূর উচ্চৈঃস্বরে বলা হইয়াছিল যে, তৎশ্রবণে সকলেরই 'কবিওয়ালী' দিগের 'বই কওয়ার' রীতি মনে পড়িয়া ছিল। অধিকতর ক্ষোভের বিষয় এই, ঐ রূপ বই বলিয়া দেওয়াতেও সকলে সত্বররূপে স্ববক্তব্য প্রকাশ করিতে পারেন নাই। যাহা হউক শেষাকার প্রদর্শন অতীব চমৎকার হইয়াছিল। শূন্য হইতে পরিগণের ভূতলে অবতরণ এবং মৃত মাধবাচার্য্যকে লইয়া পুনরায় গান করিতে করিতে শূন্যে উত্থান দর্শন করিয়া সকলেরই চিত্ত চমৎকৃত ও বিনোদিত হইয়াছিলেন।

গত রাত্রিতে হিন্দু ন্যাশনেল থিয়েটার কৃষ্ণকুমারী নাটকের অভিনয় হইয়া গিয়াছে। দর্শকের সংখ্যা যথেষ্ট হইয়াছিল। বোধহয় কৃষ্ণকুমারী নাটক অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট

বলিয়াই এরূপ হইয়াছিল। এতদ্দারা প্রতিপন্ন হইতেছে, ভাল ভাল নাটকের অভিনয় হইলে দর্শকের সংখ্যা অধিক হইবার সম্ভাবনা আছে। কৃষ্ণকুমারী নাটকের অভিনয়ও উৎকৃষ্ট হইয়াছে। মদনিকা, ধনদাস, কৃষ্ণকুমারী এবং ভীমসিংহের কার্য্য বিলক্ষণরূপে প্রকটিত হইয়াছে। অপরাপরে অভিনয়ও মন্দ হয় নাই। কিন্তু অভ্যাসের ত্রুটি নিবন্ধন মধ্যে মধ্যে অনেকেই কথাবার্ত্তায় একে আর হইয়াছে। মন্ত্রীর পরিচ্ছেদ এবং রাজা জগৎসিংহের হস্তে তরবারি ধারণ ভাল দেখায় নাই। যাহা হউক এতন্নিবন্ধন অভিনয়ের বিশেষ কিছু হানি লক্ষিত হয় নাই।

১ ৬-১৮৭৩

অভিনয়

হিন্দু ন্যাশনেল নট সম্প্রদায় গত পূর্ব্ব শনিবার বিধবাবিবাহ[১] নাটকের অভিনয় করিয়াছেন। আমরা এই অভিনয়ের আদ্যোপান্ত সবিশেষ মনোনিবেশ সহকারে দর্শন করিয়াছে। কিন্তু প্রশংসা করিব কি নিন্দা করিব, তাহা এখনও বুঝিতে পারিতেছি না। নাটকাভিনয়ের পূর্ব্বে আলুলায়িত কেশ মলিনবেশা ভারত বিধবা দর্শকগণের সম্মুখীনা হইয়া অতি করুণ কণ্ঠে একটী গান করেন। গানটী অপূর্ব্ব হইয়াছিল, কিন্তু ভারত বিধবাকে লক্ষ্য করিয়া সূত্রধার যে কবিতা পাঠ করেন, তাহা তাদৃক্ শ্রুতি মনোহর হয় নাই। করুণ রসের উদ্দীপন অভিলাষে বীরদর্প করা কণ্ঠ আপনা হইতে গদগদ হইয়া না আনিলেও বলপূর্ব্বক উহাকে গদগদ করিতে চেষ্টা করা, কখনই প্রীতিপদ হয় না। সূত্রধার গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছিলেন, বিধবা বিবাহের অভিনয় করিয়া দর্শকবৃন্দকে অশ্রুজলে ভাসাইয়া দিবেন। তাঁহার এই গর্ব্বোক্তি শারদ মেঘ নির্ঘোষের ন্যায় নিষ্ফল প্রায় হইয়াছে। দোষ কাহার ? আমরা যতদূর বুঝি দোষ অভিনয়ের নয়, কিন্তু নাটকের। বিধবাবিবাহ নাটকখানি বস্তুতই ভালো নাটক নহে। অনেক কবি প্রকৃতির অনুকৃতি প্রদর্শন করিতে গিয়া অবশেষে বিষম বিপাকে নিপতিত হইয়াছেন। বিধবাবিবাহ নাটকের রচয়িতার ও সেই দশা ঘটিয়াছে। তিনি নাটকের আরম্ভে ও মধ্যভাগে অজস্রধারে আদিরস ঢালি [য়া] সমাপ্তি সময়ে করুণ রসের ভালরূপ উদ্দীপন করিতে কৃতকার্য্য হন নাই। কিন্তু নাটকের দোষ গণনার বাহিরে রাখিলে, অভিনয়ের প্রশংসা না করিয়া ক্ষান্ত থাকা যায় না।

কীর্ত্তিরাম ঘোষ সুলোচনা, রসবতী ও তর্কালঙ্কারের সমস্ত অংশই অতি নিপুণতার সহিত অভিনীত হইয়াছিল। পাঠশালার বালকদিগের অভিনয়ও দর্শকবৃন্দের বিলক্ষণ চিত্তরঞ্জন করিয়াছিল। যিনি কীর্ত্তিরাম ঘোষের অংশ অভিনয় করেন তাহাকে আমরা রঙ্গভূমিতে অনেক মূর্ত্তিতে দর্শন করিয়াছি। আমরা তাঁহার সম্বন্ধে পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখন [এখনও] বলিতেছি, অভিনয় বিষয়ে তাহার তুলনা নাই।

উক্ত থিয়েটার কোম্পানী গত বৃহস্পতিবার রাত্রিতে পুনরায় নবীন তপস্বিনীর অভিনয় করিয়াছেন। নবীন তপস্বিনীর অভিনয় পূর্ব্ববার যেমন আশ্চর্য হইয়াছিল, এবারও ঠিক সেইরূপ হইয়াছে। নতুন কয়েকখানি পট প্রদর্শিত হওয়াতে এ অভিনয় বরং অভিনব সৌন্দর্য প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু সদাগরের অংশ এবারকার অভিনয়ে যারপরনাই অপকৃষ্ট হইয়াছিল। এইরূপ সদাগরকে আরব দেশেই প্রেরণ করা উচিত।

অন্যান্য অভিনয় বিবরণ আগামীতে প্রকাশ্য।

১৫-৬-১৮৭৩

কলিকাতার হিন্দু ন্যাশনেল ও ন্যাশনেল থিয়েটার

গত পূর্ব্ব সপ্তাহে ন্যাশনেল থিয়েটর কোম্পানীর লোকেরা এখান হইতে চলিয়া গিয়াছেন। শুনিলাম তাহারা অভিনয় কার্যেও অপেক্ষাকৃত অপটুতা প্রদর্শন করাতে কিঞ্চিৎমাত্র লাভবান হইতে পারেন নাই। প্রত্যুত অপরিণামদর্শিতা, অবিমৃষ্যকারিতা ও অপরিমিতব্যয়িতাদি নিবন্ধন সাতিশয় ক্ষতিগ্রস্তই হইয়াছেন। লোক বিপদে পড়িলে কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান শূন্য হয়, উক্ত কোম্পানী ইহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে বাকি রাখেন নাই, তাঁহারা বাজারে প্রায় ৩/৪ শত টাকা দেনা রাখিয়া পাওনাদারদিগের অজ্ঞাতসারে অকস্মাৎ পলায়ন করিয়াছেন। তন্নিমিত্ত কয়েকটা নালিসও উপস্থিত হইয়াছে। পরিচিত পূর্ব্ব কোন কোন ভদ্র সন্তান এই কোম্পানী সংসৃষ্ট ছিলেন বলিয়া এখানকার অনেকে ইহাদিগকে ধার দিয়েছিলেন। যাওয়ার সময় সেই ধার পরিশোধ না করিয়া যাওয়াতে সাধারণতঃ এতদঞ্চলীয় লোকের কলিকাতা অঞ্চলীয় লোকদিগকে যে 'বোম্বেটিয়া' বা 'জুয়া চোর' বলিয়া বিশ্বাস আছে, সেই বিশ্বাস আরো প্রগাঢ় হইবার কারণ হইয়াছে।

হিন্দু ন্যাশনেল থিয়েটর কোম্পানী আরো কয়েকখানি নাটকেব অভিনয় করিয়া গত মঙ্গলবার কলিকাতায় গমন করিয়াছেন। এক নবনাটকের[১৩] অভিনয় ভিন্ন প্রায় সমস্ত অভিনয়েই ইঁহারা সাধারণ রূপে খ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন। একমাত্র অভ্যাসের ত্রুটিই নব নাটকাভিনয়ে অকৃতকার্য্যতা প্রদর্শনেব কারণ। -যাহা হউক এই দলে কয়েকজন সুপরিপক্ক অভিনেতার সদ্ভব হেতু ইহারা যে কোন নাটকাভিনয়ে যত্ন করিলেই যে দর্শকবৃন্দের বিলক্ষণ চিত্তবিনোদন করিতে পারেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মাস্টার অর্দ্ধেন্দু শেখর মুস্তফী একজন অসাধারণ অভিনেতা। ইনিই নীলদর্পণের গোলক বসু, উড সাহেব, অন্যতর চাষা ও পাগলিনী, নবীন তপস্বিনীর জলধর, কৃষ্ণ কুমারীর ধনদাস ও ভীমসিংহ; বিধবাবিবাহের কীর্তিরাম ঘোষ ও তর্কালঙ্কার; সধবার একাদশীর নিমচাঁদ এবং জামাই বারিকের চোরও একজন জামাই সাজিয়া ছিলেন। ইনি যখনই যে মূর্ত্তিতে অভিনয় করিয়াছেন, সকলই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে, একবাক্যে সকলেই মুক্তকণ্ঠে ইঁহার প্রশংসা করিয়াছেন, ইঁনি বিভিন্নরূপ স্বর, নানা রূপ ভাষা এবং প্রয়োজনানুরূপ অশেষবিধ অঙ্গভঙ্গী প্রয়োগে এরূপ সুদক্ষ যে অনেকেই এ সকল বিষয় এরূপ সুপটু ব্যক্তি আর কখন দৃষ্টিগোচর করেন নাই, অকুণ্ঠিত ভাবে মুক্তকণ্ঠে এরূপ বলিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় – যিনি নীলদর্পণ নাটকাভিনয়ে তোরাপ, রাইচরণ ও নীলকরপক্ষীয় মোক্তার, নবীন তপস্বিনীতে বিদূষক ও বিদ্যাভূষণ; কৃষ্ণকুমারীতে জগৎসিংহ, বিধবাবিবাহে বিদ্যাবাগীশ, সধবার একাদশীতে কর্ত্তা এবং জামাই বারিকে অভয় কুমার সাজিয়াছিলেন, কোন কোন বিষয়ে ইনিও একজন উৎকৃষ্ট অভিনায়কের মধ্যেই পরিগণিত। দর্শকগণ যাহাকে নীলদর্পণ নাটকাভিনয়ে ক্ষেত্রমণি, গোলক বসুর মোক্তার ও রাইচরণ, নবীন তপস্বিনীতে মল্লিকা ও গুরুপুত্র কৃষ্ণকুমারীতে মদনিকা, বিধবা বিবাহে রসবতী, সধবার একাদশীতে সৌদামিনী এবং জামাই বারিকে

কামিনী মূর্ত্তিতে দর্শন করিয়াছেন. তাহার নাম অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়। চঞ্চলা নারীর প্রকৃতি প্রদর্শনে ইহার বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে। শান্ত প্রকৃতি. সুশীলা ও সুন্দরী স্ত্রীর প্রতিকৃতি প্রদর্শনে শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়েরও সবিশেষ পটুতা লক্ষিত হইয়াছে। ইনিই নীলদর্পণে সরলতা, নবীন তপস্বিনীতে কামিনী, কৃষ্ণকুমারীতে কৃষ্ণকুমারী; বিধবা বিবাহে সুলোচনা এবং জামাই বারিকে পাঁচী মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছিলেন। ইনিও একজন উৎকৃষ্ট অভিনায়ক বলিয়া গণনীয়। আর একজন অভিনেতার নাম আমরা এ পর্যন্ত উল্লেখ করি নাই, দলস্থ ব্যক্তিরা ইহাকে একজন প্রধান অভিনায়ক বলিয়া গণনা করেন। ইঁহার নাম বাবু নগেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়। ইঁনি নীলদর্পণ নাটকাভিনয়ে নিবন মাধব ও ডাক্তার, তপস্বিনীতে রাজা, কৃষ্ণকুমারীতে বলেন্দ্রসিংহ, বিধবাবিবাহে মন্মথ, গুরু মহাশয় ও বর; সধবার একাদশীতে অটল এবং জামাই বারিকে পদ্মলোচন, বৈরাগী ও একজন জামাই সাজিয়াছিলেন। সাধারণভাবে যদিও ইঁহার অভিনয়ে দোষ লক্ষিত না হউক, কিন্তু বিশেষ চিত্তরঞ্জনও হয় নাই দর্শকদের মধ্যে ইহা অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন। পাঠকগণ! আপনারা অনেক সময়ে এরূপ অনেক লোক দেখিয়াছেন, সৌন্দর্য বিষয়ে তাহার কোনও ত্রুটি নাই, প্রত্যুত বিশেষ বিশেষ অঙ্গ নিরীক্ষণ করিলে সুন্দরই লক্ষিত হয়, অথচ সাকল্যে তাহাকে একজন সুদৃশ্য পুরুষ বলিয়া প্রতীতি হয় না; নগেন্দ্র বাবুর অভিনয়ও ঠিক আমাদিগের নিকটে এইরূপ বোধ হইয়াছে। যদিও উহার বিশেষ ২ ত্রুটি লক্ষিত না হউক কিন্তু মোটের উপর জানি না কেন উহা তত ভীতিকর হয় নাই। অন্যান্য অভিনেতাদিগের অভিনয় তত উৎকৃষ্ট বোধ হয় নাই বলিয়া এ স্থলে তাহার উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ হইল না। যাহা হউক উপরে যে কয়েকজন অভিনায়কের কথা উল্লেখিত হইল, তাহাদিগের বিদ্যমানতা বশতই হিন্দু ন্যাশনেল থিয়েটার কোম্পানীকে বিলক্ষণ সম্বলবান বোধ হইয়াছে। কোম্পানী এই সম্বল বলে যে নাটক ইচ্ছা তাহারই অভিনয়ে কৃতকার্য্যতা প্রদর্শন করিতে পারেন. সংশয় নাই। কিন্তু ক্ষোভ এই, এই দীর্ঘকাল মধ্যে কোম্পানী এখানে যতগুলি নাটকের অভিনয় করিয়াছেন, তাহার একখানিও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ছিল না। এই নিমিত্তই যে কোম্পানী ঢাকা হইতে বাসনানুরূপ লাভবান হইয়া যাইতে পারেন নাই. ইহা বলা বাহুল্য। অতএব আমরা হিন্দু ন্যাশনেল থিয়েটার কোম্পানীকে অনুরোধ করি. যদি তাহারা ঢাকায় পুনরাগমন করেন* তাহা হইলে যেন কয়েকখানি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট নাটক ভালরূপ অভ্যাস করিয়া অসেন। কল্পনামূলক আধুনিক নাটক অপেক্ষা ঢাকায় পুরাণ ঘটিত উৎকৃষ্ট নাটকের সমাদার অধিক, তাহাদিগের যেন একথাটিও স্মরণ থাকে। পরন্ত যে যে কারণে আধুনিক কৃতবিদ্য প্রভৃতির নিকটে এদেশের সমান্য যাত্রা অপেক্ষা নাটকাভিনয় উৎকৃষ্টতর বলিয়া বোধ হয় তাহার যেন কিছুরই অভাব না থাকে।— অভিনয় সংক্রান্ত কোন ব্যক্তিরই যেন চরিত্র দোষ দৃষ্ট না হয়। বাস্তবিক অতঃপর সমস্ত বিষয়ে সুসম্পন্ন হইয়া না আসিলে বিড়ম্বিত হইতে হইবে সন্দেহ নাই।

* বাবু অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী শেষ অভিনয় দিবসে বঙ্গভূমি হইতে বিদায় গ্রহণকালে বলিয়াছেন. আগামী বর্ষে তাহাদিগের পুনরায় ঢাকায় আসিতে ইচ্ছা আছে।

২১-৬-১৮৭৩

অভিনয়ের হুজুক

কলিকাতা অঞ্চলে অভিনয়ের কি রূপ হুজুক পড়িয়াছে, পাঠকগণ অবগত থাকিতে পারেন। ইদানীং উহার প্রায় গলিতে গলিতে নাটকাভিনয় আরম্ভ হইয়াছে। কলিকাতা হুজুকের উতস স্বরূপ, তথা হইতেই উৎসারিত হইয়া অন্যান্য নগরোপনগর ও গ্রামাদিতেও উহা পরিব্যাপ্ত হয়। বর্ত্তমান অভিনয়ের হুজুকও যে মহানগরী কলিকাতা হইতেই সমুদ্ভূত হইয়া দূরবর্ত্তী নগরোপনগরাদি পরিভ্রমণ পূর্ব্বক সম্প্রতি গ্রামে গ্রামে—পল্লীতে পল্লীতে বিস্তারিত হইতেছে, ইহা বলা বাহুল্য, অন্য কোন নগর কি তদন্নর্ব্বতী গ্রামসমূহের এতৎ সংক্রান্ত বিবরণ আমরা বিশেষ করিয়া বলিতে পারি না বটে, কিন্তু ইহা নিশ্চয়, আমাদিগের ঢাকা এবং ইহার অন্তর্ন্নিবিষ্ট পল্লীসমূহে আজিকালি নাটকাভিনয়ের নিতান্তই ধুম পড়িয়াছে। নিজ ঢাকায়ই এ পর্যন্ত ৪/৫ দলের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রথমতঃ রামাভিষেক নাটকাভিনয়ের নিমিত্ত নানা স্থানীয় ব্যক্তিগণ দ্বারা এক প্রধান অভিনেতৃদলের সৃষ্টি হয়। তৎপরে বাঙ্গলা বাজারের কতিপয় ব্যক্তি স্বতন্ত্র দলবদ্ধ হইয়া 'প্রাণেশ্বর নাটক' ও 'একেই কি বলে সভ্যতা'[১৮] প্রহসনের অভিনয় করেন। তদনন্তর আর কয়েক ব্যক্তি সমবেতচেষ্টও হইয়া 'কক্স এন্ড কক্স' এবং 'চক্ষুদান' প্রহসনের অভিনয় করিয়া উৎসাহিত হন। ইতিমধ্যে আমলীগোলায় আর একদল হইয়া রামাভিষেক নাটকের পুনরাভিনয় করিয়াছেন, এবং সেদিন আবার কলেজের কতিপয় বালক রমণী গোপাল নামক অতি জঘন্য একখানি নাটকের অভিনয় করিয়া অনেকেরই বিরক্তি উৎপাদন করিয়াছেন। পরন্তু প্রথমোক্ত রামাভিষেক নাটকাভিনয়ের কয়েক ব্যক্তি পুনরায় নবনাটকের অভিনয় প্রদর্শনে সমুদ্যোগী হইয়াছেন, বোধহয় অচিরেই রঙ্গভূমিতে অবতরণ করিবেন। ওদিকে বিক্রমপুরের হাঁসাড়া, কালীপাড়া, পাওলদিয়া, শ্রীনগর ও বজ্রযোগিনী প্রভৃতি গ্রামেও অভিনয়ের বিলক্ষণ ধুম আরম্ভ হইয়াছে। ফলতঃ আজিকালি নাটকাভিনয় বিষয়ে নতুন হুজুক প্রিয় যুবকগণের উৎসাহ শিখা এরূপ ভয়ানক বেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে যে, ইহাতে দেশ আলোকিত কি দগ্ধীভূত হইবে, অবধারণ করা কঠিন। কেহ কেহ বলিতেছেন, এতদিন এদেশীয় লোক [ছেঁড়া] আমোদ-প্রমোদের অনুষ্ঠান দ্বারা বৃথা অর্থ ও সময় ব্যয় করিত, তৎপরিবর্ত্তে এই সভ্যজন সমাদৃত নাটকাভিনয় প্রথা সর্ব্বত্র প্রচলিত হইলে ঐ সমস্ত দূষিত আমোদ প্রমোদের ভাব বিদূরিত হইবার এবং তৎসঙ্গেই লোকের অসদ্রুচি নিবৃত্ত ও সদ্রুচি উদ্রিক্ত হইবার ভূয়সী সম্ভাবনা আছে। অধিকন্তু প্রচলিত কুনীতি প্রভৃতি অভিনয়চ্ছলে প্রদর্শন করিলে তৎসংশোধনে এবং অনুকরণীয় সুরীতি প্রভৃতি প্রদর্শন করিলে তৎপ্রবর্ত্তনের অনেক সুবিধা হইতে পারে। অতএব বাহুল্যরূপে নাটকাভিনয় প্রথা প্রচারিত হওয়া অন্যায় অথবা অপকারের নিমিত্ত নহে। অপরেরা বলেন, আমরা বুঝিতে পারি না, এদেশের প্রচলিত যাত্রার অপেক্ষা অভিনয় প্রথা কিসে উৎকৃষ্টতর হইল। লোকের হৃদয় আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত অভিনয়ে ঘটনার স্বাভাবিকতা রক্ষণে অনেক যত্ন করা হয় সত্য, কিন্তু বাস্তবিক কি তাহা

সর্ব্বদাই রক্ষা পাইয়া থাকে!' অনেক সময়েই কি অভিনেতৃগণের কার্য্যগুলি যাত্রার 'সঙ্গের' কার্য্য অপেক্ষাও অপকৃষ্টতর বলিয়া প্রতীতি হয় না? পক্ষান্তরে অনেক যাত্রার গানেও কি লোকহৃদয় অধিকতবরূপে সমাকৃষ্ট ও প্রীতিপূর্ণ হইতে প্রত্যক্ষ করা যায় না? তবে যাত্রার অপকৃষ্টতার কিসে? স্বীকার করি, যাত্রার ছোকরাদিগের অনেকেই অত্যল্প বয়ঃক্রম হইতে বদমাইশী শিক্ষা করিয়া থাকে, কিন্তু অভিনেতৃ দলেই কি তাহার অল্পতা লক্ষিত হয়? প্রত্যুত মাদকাদি সেবন বিষয়ে অভিনেতাদিগের আরো অধিকতর অর্থ অপব্যয়িতা হইয়া থাকে। অল্প বয়স্ক অভিনায়কদিগের মন দূষিত ও প্রাকৃতিক উচ্ছৃঙ্খল হইবারও ভূয়সী সম্ভাবনা রহিয়াছে। তবে কিসে অভিনয় উৎকৃষ্ট এবং যাত্রা জঘন্য হইল?

আমরা এতৎসম্বন্ধে মধ্যস্থ স্বরূপে কয়েকটী কথা না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। যাত্রা অপেক্ষা যে নাটকাভিনয় উৎকৃষ্টতর ইহা এক প্রকার সর্ব্বাদিসম্মত কথা। অভিনয় যে সভ্যতার পরিচায়ক, তাহাতে সন্দেহ নাই। এবং যথোচিত রূপে তাহা সুসম্পাদিত হইলে তদ্বারা পূর্ব্বকথিত রূপ ফল লাভের সম্ভাবনা আছে, ইহাও অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু একথাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, আজিকালি অধিকাংশ নাটকাভিনয় কার্য্য যেভাবে সম্পন্ন হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা দ্বারা প্রত্যাশানুরূপ ফললাভের সম্ভাবনা অতি অল্প। পরন্তু যে কারণে দেশীয় যাত্রার দূষণীয়তা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন অভিনয়েও তাহার অসদ্ভাব লক্ষিত হয় না, বরং কোন কোন অংশে বাড়াবাড়িই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। অতএব এরূপ নাটকাভিনয়ের গতিরোধ হওয়া বাঞ্ছনীয়ই বটে।

আমরা অবশ্য স্বীকার করিব, নবোৎসাহশীল যুবকগণ বিশেষতঃ যাহাদিগের মন নীরস বিদ্যা শিক্ষায় তাদৃক নিবিষ্ট নয়, তাহার কোন না কোন হুজুক ভিন্ন কালাতিপাত করিতে পারেন না। বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মসমাজের কি অন্যরূপ কোনরূপ সভায় সকলে সম্মিলিত হইয়া বিষয় বিশেষে তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনা করা অনেকের মতেই ছেলেমী বলিয়া বোধ জন্মিয়াছে—প্রেততত্ত্বের হুজুকও এখন একেবারে নিবিয়া গিয়াছে, সঙ্গতসভা এবং ব্রাহ্ম সঙ্কীর্ত্তনও পুরাতন পুরাতন বোধ হইয়া উঠিয়াছে, উন্নতিশীল ব্রাহ্মগণের বক্তৃতাদি বিষয়েও আজিকালি বিশেষ উচ্চবাচ্য নাই, অতএব এখন 'হুজুকে বাঙ্গলার, হুজুকপ্রিয় জনগণ কোথায় দণ্ডায়মান হইবেন? এক অভিনয় ভিন্ন আর তাঁহাদিগের দাঁড়াইবার স্থান দেখা যায় না। এরূপ অবস্থায় উৎসাহশীল যুবকগণ অন্যান্য বিষয় পরিত্যাগ করিয়া নূতন নূতন অভিনয়ামোদে ঝুঁকিয়া পড়িবেন ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের বিবেচনা করা আবশ্যক, এ বিষয়ে ভবিষ্যৎ কিরূপ ফল প্রসব করিবে। যাহারা বিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া কোনরূপ সাবকাশ কার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছেন, অথবা নিরুপলক্ষে বসিয়া আছেন, তাহারা দোষস্পর্শ শূন্য হইয়া এই আমোদে প্রবিষ্ট হন ক্ষতি নাই, কিন্তু যে সকল অল্পবয়স্ক বালক এখনও বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছে, ইহা নিরতিশয় আক্ষেপেরই বিষয়। আমরা যতদূর আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে এক প্রকার দৃঢ়তাসহকারেই বলিতে পারি, বিদ্যালয়ের যে সকল ছাত্র

একবার এই আমোদ সাগরে ঝম্প প্রদান করে, তাহাদিগের আর নিস্তার নাই। নিশ্চয়ই তাহাদিগকে তাহাতেই ডুবিয়া মরিতে হয়। সরস আমোদ ভোগ করিয়া মন এরূপ আমোদাসক্ত হইয়া উঠে যে, কষ্টসাধ্য অধ্যয়নাদিতে আর প্রবেশ করিতেই পারে না। অধিকন্তুত্ত নানাবিধ লোকচরিত্রের অনুকরণ ও বড় বড় লোকের সহিত ঘনিষ্ঠতা নিবন্ধন সহজেই নির্লজ্জতা ও জেঠামিটুকু অভ্যাস হইয়া উঠে। বিষয় বিশেষে বদভ্যাসও নাহয়, এরূপ বলা যাইতে পারে না। অতএব অন্ততঃ বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা নাটকাভিনয়ামোদে লব্ধ প্রবেশ না হয়, অভিভাবক ও শিক্ষক উভয়েরই এ বিষয়ে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

১৬-৭-১৮৭৩

অমৃতবাজার পত্রিকা থেকে

ঢাকা থিয়েটার কোম্পানী নব নাটকের অভিনয়।--গত বৎসর ঢাকা নগরীতে, কৃত বিদ্যগণের উদ্যোগে 'রামাভিষেক নাটক' অভিনীত হয়।...হিন্দু নেসনেল থিয়েটর নামক নট সম্প্রদায় আসিয়া যে অভিনয় দেখাইয়া গিয়াছেন তাহা আর আমরা ভুলিতে পারিব না। তাঁহাদিগের প্রথম দিবসের অভিনয় দেখিয়া বাস্তবিক চমৎকৃত হইলাম, এবং বলিতে লাগিলাম যে, পৃথিবীতে এইরূপ উৎকৃষ্ট অভিনয় থাকতে জঘন্য রামাভিষেকের অভিনয় দেখতে কার প্রবৃত্তি জন্মে? বাস্তবিক মহাশয় সেই অত্যুৎকৃষ্ট অভিনয় দর্শন করে ঢাকার অভিনয়ের প্রতি ঘৃণা জন্মিল...। এক রাত্রি নব-নাটক অভিনয় করিবেন বলিয়া বিজ্ঞাপন দেন ঢাকা থিয়েটর কোম্পানীর মেম্বরগণ ইহা শুনিয়া রাগান্বিত হইয়া বলিলেন যে, 'নবনাটক কখনও অভিনয় করিতে পারিবে না।'...যখন হিন্দু নেসনেল কেম্পানী এবং ঢাকা থিয়েটর কোম্পানী নাটকাভিনয় লইয়া গোলযোগ করেন সেই সময় শেষোক্ত কোম্পানী বলিয়াছিলেন জন্মাষ্টমীর সময় অভিনয় দেখাইবেন কারণ সেই সময় গ্রাম হইতে বিস্তর লোক তামাসা দেখিতে ঢাকা আগমন করে।...দর্শকমাত্রেই অসন্দিহান চিত্তে স্বীকার করিয়াছেন যে, ঢাকা কোম্পানীর নবনাটক অভিনয় হিন্দু ন্যাশনেল থিয়েটারের শতাংশের একাংশও হয় নাই, এমনকি কালেজিয়েট স্কুলের ছাত্রবর্গও ইহা হইতে ভাল অভিনয় করিয়াছে, এবং শ্রীনগর থিয়েটারের কতকাংশ ইহা হইতে উত্তম হইয়াছিল।—আমরা জন দশেক। ঢাকা।

৪-৯-১৮৭৩

[অমৃত বাজার পত্রিকা, উদ্ধৃত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১২১]

সংবাদ

গত পূর্ব্ব শনিবার পূর্ব্ববঙ্গ রঙ্গভূমিতে কলিকাতার ন্যাশনাল থিয়েটার কোম্পানী সতী নাটকের ১৭ অভিনয় করিয়াছেন। এক সতীর অভিনয় ভিন্ন আর কাহারও কার্য্য প্রশংস-নীয় হয় নাই। বিস্তারিত সমালোচনে স্থানাভাব প্রযুক্ত এবার আমরা এই মাত্র বলিয়াই ক্ষান্ত হইতেছি যে, এই দিবসীয় অভিনয় প্রায় কাহারও প্রীতিপদ হয় নাই। সতী নাটকে বাসনানুরূপ গুণাপনা লক্ষিত হয় না। সত্য. কিন্তু সবিশেষরূপে অভ্যাস করিয়া অভিনয় করিলে বোধহয় না উহার অভিনয় তত অপ্রীতিকর হইত। ৩-৫-১৮৭৩

সংবাদ

নবাব আব্দুল গণি[১৮] সি. এস. আইর নিমন্ত্রণে পার্সি নাটক কোম্পানী ঢাকা নগরীতে আসিয়াছেন। এই কোম্পানী গত দুই বৎসর যাবত নাটকাভিনয়, গান, বাদ্য এবং নানা প্রকার দৃশ্যের পরিপাট্যে, কলিকাতাস্থ সকল শ্রেণীর লোকদিগকে সন্তুষ্ট এবং আমোদিত করিয়াছেন। তাঁহারা গত রাত্রিতে পূর্ব্ববঙ্গ রঙ্গভূমিতে ঢাকাস্থ জনসমাজের নিকট ইন্দ্রসভার অভিনয় কার্য্যে বিশেষ নৈপুণ্য ও পরিপাট্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

পূর্ব্ববঙ্গ রঙ্গভূমি গৃহে আগামী কল্য সোমবার হইতে শনিবার পর্যন্ত প্রত্যেক রাত্রিতে অভিনয় ও গীত বাদ্য জনগণের মনোরঞ্জন করিতে চেষ্টা করিবেন। রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় রঙ্গভূমির দ্বার উদঘাটিত হইবে এবং ৯ ঘটিকার সময় সববেদ বাদ্যের সহিত অভিনয় আরম্ভ হইবে। প্রত্যেক রজনীতে নূতন নূতন গান এবং দৃশ্যাদি প্রদর্শিত হইবে। অভিনয় এবং গীতাদি সমুদায় হিন্দুস্থানী ভাষায় হইবে।

নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে টিকেটের মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

প্রথম শ্রেণী	৪ টাকা
দ্বিতীয় শ্রেণী	২।।.
তৃতীয় শ্রেণী	১।।.
চতুর্থ শ্রেণী	।।. আনা

টিকেট পাটুয়াটুলী কোম্পানীর বাসগৃহে এবং রঙ্গভূমির দ্বারদেশে প্রাপ্তব্য।

সন ১৮৭৬।

তাং ১২ই মার্চ।

১২-৩-১৮৭৬

অভিনয়

পার্সি 'গান ও নাটকাভিনয় কোম্পানী' নামক একদল বোম্বাইবাসী পার্সি অভিনেতা সংপ্রতি ঢাকায় আগমন করিয়াছেন। নবাব খাজে আবদুল গণি মিএগ্রা সাহেবের আমন্ত্রণই ইঁহাদিগের ঢাকায় আগমনের কারণ। ইঁহারা কলিকাতায়ও দীর্ঘকাল অভিনয় করিয়া তত্রত্য লোকদিগের সন্তোষোৎপাদন পূর্ব্বক বিলক্ষণ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন গত রজনীতে উক্ত কোম্পানী অত্রত্য পূর্ব্ববঙ্গ রঙ্গভূমিতে 'ইন্দ্র সভা'[১৯] নামক প্রসিদ্ধ হিন্দুস্থানী উপন্যাসের গীতাভিনয় ও আর একখানি প্রহসনের অভিনয় করিয়াছেন। এখানকার নাট্যশালান্তর্গত রঙ্গভূমির সমস্ত উপকরণই ইঁহারা পরিবর্ত্তিত করিয়া নূতন রূপে উপস্থাপিত করিয়াছে এবং উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট দৃশ্য [ছেঁড়া] অতীব চমৎকারজনক, এ পর্যন্ত কোনও অভিনেতৃদল, ঢাকায় এরূপ অত্যুৎকৃষ্ট সীণ ও সাজ পোষাক প্রদর্শন করেন নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইন্দ্রসভার অভিনয় দর্শনেও দর্শকবৃন্দ সন্তুষ্ট হইয়াছেন সন্দেহ নাই। তাহার স্থূল বিবরণ এই,—একদা ইন্দ্ররাজ সভার পরীগণ নৃত্যসহকারে বিবিধ গান করিতেছিল, ইতিমধ্যে সবজাপরী সভাস্থ অন্যতম দৈত্য কালাদেবকে বলে যে, 'অদ্য আমার আগমন কালে এক উদ্যান গুহে শায়িত একটা রাজপুত্রকে দেখিয়া

তৎপ্রতি আমার অনুরাগ সঞ্চার হইয়াছে, অতএব কোন কৌশল করিয়া তাহাকে তুমি আমার হস্তগত করিয়া দাও।' তদনুসারে কালাদেব উক্ত রাজপুত্রকে শূন্যপথে হরণ করিয়া এক নির্জ্জন গৃহে সবজাপরীর নিকটে আনিয়া দেয়। তখন রাজপুত্রের নিদ্রাভঙ্গ হইলে উক্ত পরী তাঁহার নিকটে তাহার মনোহভিলাষ পরিব্যক্ত করে। কিন্তু রাজা তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তৎপ্রতি অসন্তোষ প্রকাশ পূর্ব্বক তাহার পরিচয় ও ঐ রূপ নির্জ্জন গৃহে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। সবজাপরী তাহার পরিচয়াদি প্রদান করিলে, রাজপুত্র ইন্দ্রসভা দর্শনেচ্ছু হন এবং বলেন যে যদি পরী তাহাকে ইন্দ্রসভা দেখাইতে পারে, তবে তিনি তাহার অভিলাষ পূর্ণ করিবেন। পরী তাহাতে বিবিধ বিপদাশঙ্কা দেখাইয়া রাজপুত্রকে নিবৃত্ত করিতে চায়। [ছেঁড়া] অনন্তর ইন্দ্রসভায় পরীদিগের নৃত্যগীত আরম্ভ হইলে লালদেব নামক অপর দৈত্য ইন্দ্ররাজ সমীপে বলে যে, অদ্য এই সভায় কোন নিয়ম বিরুদ্ধ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে—কোন মর্তবাসী মরণশীল ব্যক্তি (মনুষ্য) এখানে আগমন করিয়াছে। তদনুসারে অনুসন্ধান আরম্ভ হয় এবং লালদেব লুক্কায়িত গোলফামকে প্রহার করিতে করিতে ইন্দ্ররাজ সমীপে উপস্থিত করে। ইন্দ্ররাজ তাহার পরিচয় ও তথায় আগমনের হেতু জিজ্ঞাসু হইলে গোল্‌ফাম সমস্ত বৃত্তান্ত পরিব্যক্ত করেন। ইন্দ্ররাজ তাহাতে অতিশয় ক্রুদ্ধ হন এবং সবজাপরীকে সবিশেষ তিরস্কার করিয়া তাহার পাখা বিচ্যুত করণান্তর সভা হইতে তাড়াইয়া দেন। রাজপুত্রকেও কূপে নিক্ষেপ করিতে আদেশ প্রদান করেন। অপমানিত পরী যোগিনী বেশে নানাস্থানে উক্ত রাজপুত্রের অনুসন্ধান ও নানারূপ বিলাপ করিতে আরম্ভ করে। কালাদেব তাহার সেই অবস্থা দেখিতে পাইয়া ইন্দ্ররাজ সমীপে তদীয় গুণগ্রামের প্রশংসা করিলে ইন্দ্ররাজ ঐ যোগিনীকে রাজ সভায় আনয়ন করিতে অনুমতি দেন। তখন সে নৃত্যগীত দ্বারা ইন্দ্ররাজকে বিমুগ্ধ করাতে তিনি তাহাকে বহুমূল্য পুরস্কার প্রদান করিতে চান। কিন্তু সে তৎপ্রতি আগ্রহে অসম্মত হইয়া বলে, যদি ইন্দ্ররাজ তাহার অভীপ্সিত বিষয় পূর্ণ করিতে অঙ্গীকার করেন, তবে সে তাহার অভিলাষ ব্যক্ত করিতে পারে। ইন্দ্র 'তথাস্ত' বলিয়া সম্মতি দান করিলে যোগিনী রাজপুত্রের গোলফামের উদ্ধার [ছেঁড়া] পরীর বেশে স্বকীয় পরিচয় দান করে। তখন ইন্দ্ররাজ ক্রোধপরবশ হইয়াও স্বসম্মান রক্ষার্থে প্রতিজ্ঞা পালনে পরান্মুখ হইলেন না। লালদেব রাজাজ্ঞানুসারে গোলফামকে উদ্ধার করিয়া রাজ সভায় আনয়ন করে, পরীও গোলফাম পরস্পর প্রেমালিঙ্গন করিলে যবনিকা পতন হয়।

উল্লিখিত বিবরণ অবলম্বন করিয়া যে গীতাভিনয় হইয়াছে, সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে তাহা অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অভিনয়ের প্রত্যেক অংশ ধরিয়া সমালোচনা করা যায়, তাহা হইলে দোষ মুক্ত বলা যাইতে পারে না। অস্বভাবিকতা অনেকস্থলেই লক্ষিত হইয়াছে। প্রস্তাব বাহুল্যভয়ে তৎসমুদায় প্রদর্শন করা হইল না। যাহা হউক এই কোম্পানী যে অভিনয় কার্য্য বিলক্ষণ সুশিক্ষিত ও উচ্চশ্রেণীস্থ বড় মানুষ দর্শকগণের দর্শনোপযোগী উপকরণ সম্পন্ন তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। প্রহসনের অভিনয়ও সাধারণের প্রীতিজনক হইয়াছিল। ভরাসা করি এই

অভিনয় কোম্পানি ঢাকা হইতে বিলক্ষণ প্রতিপত্তি ও অর্থলাভ করিয়া যাইতে পারিবেন। আগামীকল্য হইতে এক সপ্তাহ কাল পর্য্যন্ত প্রতি রাত্রিতে ইঁহারা অভিনয় করিবেন সঙ্কল্প করিয়াছেন।

১২-৩-১৮৭৬

সংবাদ

বিগত কল্য ন্যাশনেল থিয়েটার কোম্পানীর অভিনয়—দর্শকশ্রেণীর মধ্যে একটী বারাঙ্গনা দৃষ্ট হইয়াছে। অভিনেতৃদল কোন সাহসে ভদ্রদর্শক শ্রেণীতে একজন বেশ্যাকে গ্রহণ করিলেন, এবং দর্শকবৃন্দই বা কোন মুখে একটী বেশ্যাকে লইয়া একাসনে উপবিষ্ট হইয়া অভিনয় দর্শন করিলেন, আমরা ভাবিয়াও কিছু স্থির করিতে পরিলাম না। ব্রাহ্ম সমাজ কোন প্রাণে তাহার বক্ষের উপর দিয়া যে এই সকল ব্যভিচার স্রোত করিয়া দিতেছেন, বুঝিতে পরিতেছি না। পবিত্রতার দৃঢ়বন্ধন হইতে একবার পদস্খলন হইলে যে অপবিত্রার চরম সীমা পর্য্যন্ত উপনীত হইতে হয়, তাহাতে সন্দেহ কোথায়?

১০-৮-১৮৭৬

প্রাপ্ত

গতকল্য রাত্রিতে পূর্ব্ববঙ্গ রঙ্গভূমি গৃহে কলিকাতার ন্যাশনেল থিয়েটার কোম্পানী 'সতী কি কলঙ্কিনী'[২০] 'র গীতাভিনয় করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে 'চক্ষুদান' নামক প্রহসনেরও অভিনয় হইয়াছে। এই থিয়েটার কোম্পানীতে কয়েকটী বেশ্যা অভিনেত্রী আছে। বেশ্যা লইয়া নাটকাভিনয় দূষণীয় কিনা,—বারাঙ্গনাগণের নৃত্য, গীত ও অভিনয় দর্শন শ্রবণ করা, সুশিক্ষিত ভদ্রসন্তানগণের পক্ষে বৈধ কিনা,—বেশ্যার সহিত একসানে উপবেশন, সরুচিসম্মত কিনা, আমরা অদ্য এ স্থলে তৎসমন্ধে বাঙ্গনিস্‌সত্তি করিতে অভিলাষী নহি। উক্ত কোম্পানী গতকল্য যেরূপ অভিনয় করিয়াছেন,—কেবল তা সমন্ধেই দুই একটী কথা বলিতেছি। 'সতী কি কলঙ্কিনীর' গীতাভিনয় সাধারণতঃ ভালই হইয়াছে। প্রতিবেশী, বৃন্দা, যশোদা, জটিলা ও কুটিলার অভিনয় প্রশংসনীয়, কৃষ্ণের কালীরূপ ধারণ, জটিলা কুটিলার বিরোধ ও যশোদার ক্রন্দনাদি বিলক্ষণ হৃদয়াকর্ষক। অপরাপর অভিনেতা ও অভিনেত্রীর অভিনয়ে এমন কোন বিশেষ চমৎকারিত্ব ছিল না, তাহাতে দর্শকগণের চিত্ত আকৃষ্ট হইতে পারে। অভিনেতৃদলের অনেক বিষয়ে অসম্পূর্ণতাও রহিয়াছে। তাহাদের নিজের কোনও দৃশ্যপট দৃষ্ট হইল না; সেই রামাভিষেক নাটকের পুরাতন দৃশ্যপটগুলি দ্বারা কার্য্য সারিয়া লওয়া হইয়াছে। সমবেত বাদ্য চিত্ত প্রমোদক অপেরা দলের যেরূপ সঙ্গীত নৈপুণ্য থাকা আবশ্যক, ইহাদের সঙ্গীতে তদ্রূপ অধিকার আছে, বোধ হইল না। খেমটাওয়ালীরা সাধারণতঃ যে ধরনের গান করিয়া থাকে, ইহাদের গানও প্রায় সেই প্রকার। তবে দুই একটি অভিনেত্রীর গীতিক্ষমতা আছে বলিতে হইবে। চক্ষুদান প্রহসনের অভিনয় উৎকৃষ্টতর হইয়াছে। কর্ত্তা ও নাপতে বৌর অভিনয় বিলক্ষণ চিত্তাকর্ষক। রঙ্গভূমি মধ্যে স্ত্রীলোকের বেশ পরিবর্ত্তন, স্ত্রীজাতিসুলভ লজ্জাশীলতার ব্যাঘাতক ও শ্রেণী বিশেষের চরিত্র আক্রমণ পূর্ব্বক উপহাস অনুচিত বলিয়াই বোধ হইল। ফল কথা, এই কোম্পানীর একজন অভিনেতা ও একটী

অভিনেত্রীই ভিন্ন ভিন্ন বেশে রঙ্গভূমিতে আসিয়া দর্শকগণের সন্তোষ বিধান করিয়াছেন। ইঁহারাই উৎকৃষ্ট অভিনেতা ও অভিনেত্রী।

১০-৮-১৮৭৯

প্রাপ্ত

সংপ্রতি কলিকাতা হইতে ন্যাসনেল থিয়েটার কোম্পানি ঢাকায় নাটক অভিনয় করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন। তাহারা পূর্ব্ববঙ্গ রঙ্গভূমিগৃহ ভাড়া লইয়া নাটকাভিনয় আরম্ভ করিয়াছেন। উক্ত গৃহ পূর্ব্ব বাঙ্গলা ব্রাহ্ম সমাজেব পশাদ্ভাগে[পশ্চাৎভাগে] থাকাতে প্রথম হইতেই ঢাকা অভিনয় সমাজের সহিত এরূপ বন্দোবস্ত ছিল যে, উক্ত গৃহে কোন রূপ কার্য্য হইতে পারিবে না। এ পর্য্যন্ত তাহার কোন অন্যথাচারণ হয় নাই; সংপ্রতি ন্যাসনেল কোম্পানী নাকি কয়েকটী বারাঙ্গনা অভিনেত্রী লইয়া আসিয়াছেন, এজন্য তৎপ্রতি অনেকেরই অশ্রদ্ধার ভাব লক্ষিত হইতেছে। এ কার্য্যে কাহারও কোন রূপ সাহায্য করা উচিত কিনা তদ্বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য গত বৃহস্পতিবার নাটক গৃহে ছাত্র সভার এক অধিবেশন হয়। সভায় বহুতর ভদ্রশিক্ষিত লোক উপস্থিত ছিলেন। কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত মেঃ পোপ সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে ক্রমান্বয়ে কয়েক ব্যক্তি প্রতিপন্ন করেন যে, এই দুর্ভিক্ষ সময়ে নাটক গৃহে উক্ত কোম্পানীর বেশ্যাসহ অভিনয় হইতে দেওয়া উচিত নহে, বিশেষতর উহা নিতান্তই নীতি বিরুদ্ধ,—তাদৃশ অভিনয় দর্শন লোকের বিশেষতঃ ছাত্রদিগের রুচি বিকৃতির বিলক্ষণ সম্ভবনা আছে, যাহাতে সাধারণ তাদৃশ অনুচিত আমোদে যোগদান বা সাহায্য না করেন সকলেরই সে বিষয়ে যত্ন করা কর্ত্তব্য। অনন্তর তৎপোষকতায় বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ, মেঃ লিবিং স্টোন সাহেব, ডাক্তাব প্রসন্ন কুমার রায় প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তি বক্তৃতা করিলে, সভাপতি পোপ সাহেবও অশ্লীল ও অপবিত্র কার্য্য হইতে দেওয়া অনুচিত বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। যদিও কাহারো ২ বেশ্যা লইয়া অনভিমতি না থাকুক, কিন্তু অধিকাংশ লোকেরই তদ্বিরুদ্ধ মত।

ব্রাহ্ম সমাজ সংসৃষ্ট ব্যক্তিগণের এ বিষয়ে বিলক্ষণ আপত্তি আছে। ব্রাহ্ম সমাজে কোনরূপ অপবিত্র প্রবেশ করিতে না পারে তন্নিমিত্ত উক্ত সমাজের সভ্য মাত্রেরই সবিশেষ দৃষ্টি থাকা উচিত, পূর্ব্ব বাঙ্গলা ব্রাহ্ম সমাজের নিয়মাবলী পুস্তকের ৬ষ্ঠ ধারাতেও তাহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। আমরা শুনিলাম, ব্রাহ্ম সমাজের কোন ব্যক্তি নাটক গৃহ ভাড়া দিলে পর উল্লেখিত সভার অধিবেশন প্রস্তাব হয়। যাঁহারা ভাড়া দিয়াছেন তাঁহারাও ব্রাহ্ম সমাজে সংসৃষ্ট প্রধান ব্যক্তি, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহারা উপসনালয়ের পবিত্রতা রক্ষার দিকে কিছু মাত্র দৃষ্টি না রাখিয়া রুচি অনুসারেই কার্য্য করিয়াছেন। ইহাতে সাধারণ বিস্মিত হইয়াছেন, বলা বাহুল্য। কুসংস্কার প্রবেশ করিবে মনে করিয়া যে ব্রাহ্ম সমাজ খোল-করতাল লইয়া সংকীর্ত্তন করিতে দেন নাই—যে ব্রাহ্ম সমাজের সভ্যগণ উপাচার্য্য বাবু বঙ্গচন্দ্র রায়কে বেদী হইতে অপসারিত করিলেন সেই ব্রাহ্ম সমাজের সভ্যদের কোন ২ ব্যক্তি আজি ব্রাহ্ম সমাজ সংলগ্ন গৃহে বেশ্যাদের অভিনয় দেখাইতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না। বঙ্গ বাবুর দোষের কথা শুনিলে পাঠকগণ নিতান্ত

বিস্মিত হইবেন। কেশব বাবুর কন্যার বিবাহ উচিত কি অনুচিত হইয়াছে, বঙ্গবাবু সে বিষয়ে কোন মতামত প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হন। ইহাকেই যাঁহারা গুরুতর অপরাধ মনে করিয়াছিলেন, তাঁহারা সমাজ সংলগ্ন গৃহে বেশ্যাদিগের নাটকাভিনয় দূষণীয় মনে করিতেছেন না, ইহা কি সামান্য আক্ষেপের বিষয়? ইহা দ্বারা কি ব্রাহ্ম সমাজের কোন রূপ অবমাননা হইতেছে না? ব্রাহ্ম সমাজে কোন প্রকার অপবিত্র হওয়ার পূর্ব্বে লোপাপন্ন হইলেও ইহা অপেক্ষা দুঃখজনক হইত না। কয়েকজন সভ্যের মতানুসারেই যদি ব্রাহ্ম সমাজ এইভাবে অপমানিত হইতে থাকেন, তাহা হইলে ভবিষ্যতে আরও কি হইবে, বলা যায় না। ব্রাহ্ম সমাজের ক্ষমতাশালী সভ্যেরা আজি যে বিষয়ে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া অপবিতা পোষণ করিলেন ইহার পরে যে তাহারা এতদপেক্ষা কোনও গর্হিত কার্য্যে অনুমোদন করিবেন না তাহা কে বলিতে পারে?

আমরা সাধারণতঃ নাটকাভিনয়ের বিরোধী নহি,—যাহারা অহরহঃ পুংশ্চলীদিগের কুৎসিত হাবভাব ও নৃত্যগীতাদি দর্শন শ্রবণ করিয়া থাকেন, তাহাদিগের বেশ্যা বিমিশ্র অভিনেতৃদলের অভিনয় দর্শন শ্রবণের প্রতিরোধ করিতে চাই না, কিন্তু এই দারুণ দুর্ভিক্ষ সময়ে সাধারণের বিশেষতঃ ছাত্রদিগের অর্থ নাটকাভিনয়ে— বেশ্যাদিগের নৃত্যগীত ও বাক্যালাপশ্রবণে ব্যয়িত হয়, ইহা কাহারও অনুমোদিত নহে। ইহা ছাত্রদিগের— তদাভিভাবকগণের যথেষ্ট ক্ষতির বিষয়। অবশ্য ছাত্র প্রভৃতি দর্শকগণ নাটকাভিনয়ের সাহায্যার্থে যে অর্থ ব্যয় করিবেন, তাহা কোন দুর্ভিক্ষ নিপীড়িত দরিদ্রের উপকারার্থে দান করিবেন, এমত আশা করা যায় না। তথাপি যাহা তাহাদের সম্বন্ধে অনুচিত ও নীতি বিরুদ্ধ যথাসাধ্য তন্নিবৃত্তির চেষ্টা করা বিজ্ঞব্যক্তি মাত্রেরই কর্ত্তব্য। ন্যাসনেল কোম্পানী যদি বারাঙ্গনা লইয়া অভিনয় করিবার জন্য উপস্থিত না হইতেন, তাহা হইলেও আমরা উহা সময়োচিত বলিয়া স্বীকার করিতাম না। পার্সি থিয়েটার কোম্পানী যে অভিনয় করিয়া অর্থ লইয়া গিয়াছেন তাহাও সমুচিত হয় নাই। উহার পরক্ষণেই আবার এই বেশ্যামিশ্রিত কোম্পানি উপস্থিত হইয়াছে। ইহাদের দ্বারা অন্যবিধ অনিষ্টাশঙ্কা থাকুক, আর নাই থাকুক, বর্ত্তমান সময়ে আর এই কার্য্যার্থ সাধারণকে কপর্দ্দক ব্যয়ে উৎসাহিত করাও উচিত হইতেছে না। আমরা শুনিয়াছি, এই নাটক গৃহ স্থাপিত হইলে তাহার সভ্যগণ উক্ত গৃহে সাধারণের রুচি বিরুদ্ধ কোন অভিনয়াদি করিতে দিবেন না বলিয়া একটা নিয়ম করিয়াছিলেন, এক্ষণ কি তাহারা তাহা বিস্মৃত হইয়া বেশ্যাদিগকে নাটকাভিনয় করিতে দেওয়া উচিত বোধ করিয়াছেন? বিদ্যালয়ের ছাত্রগণই উক্ত প্রকার অভিনয়ের বিরোধী হইয়া সভাধিবিশনের উদ্যোগে করিয়াছিলেন, আমরা এ বিষয়ে ছাত্রদিগের প্রশংসা ভিন্ন নিন্দা করিতেছি না। কিন্তু যাঁহারা দেশের এবং ব্রাহ্ম সমাজের পরমহিতৈষী তাহাদিগকে এই বলিয়া অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা এ সময়ে ইত্যাকার অভিনয়ে আর যেন প্রশ্রয়দান না করেন।

১০-৮-১৮৭৯

প্রেরিত পত্র

মান্যবর শ্রীযুক্ত ঢাকা প্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! আপনাব গত ২৬শে শ্রাবণ তারিখের ঢাকা প্রকাশ পাঠ করিয়া কোন ২ বিষয়ে বিশেষ দুঃখিত এবং আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। বেশ্যাগণের নৃত্যগীতাদি শ্রবণ ও দর্শন উচিত কিনা, ভদ্রলোক ও ছাত্রগণ উক্ত ক[রূ]প দূষণীয় কার্য্যে যোগদান কিংবা উৎসাহ প্রদান করিবেন কিনা, তৎসম্বন্ধে নাটকগৃহে ছাত্র সাধারণ সভার যে একটী বৃহধিবেশন হইয়াছিল, (যে সভাতে ঢাকাস্থ অনেক শিক্ষিত এবং উচ্চপদস্থ ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া বেশ্যামিশ্রিত নাটক অভিনয়ের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন) দুঃখের এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঢাকা প্রকাশ চিরকাল সুনীতির পক্ষপাতী হইয়া সেই বৃহৎ সভার কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে সম্পাদকীয় স্তম্ভে কিংবা সংবাদাবলীতে কোন প্রকার মতামত প্রকাশ করা কর্ত্তব্য কার্য্য জ্ঞান করেন নাই। বেশ্যামিশ্রিত নাটক অভিনেতৃগণের সমর্থনকারী ব্যক্তিদিগের মনরক্ষার নিমিত্ত ঢাকা প্রকাশ স্বীয় বিরদ্ধমত গোপন রাখিয়াছেন অনেকের মনে এব্ধ [রূ]প সংস্কার জন্মিয়াছে এবং অন্যস্তম্ভে 'প্রাপ্ত' এক প্রস্তাব পাশ করিয়া দূষণীয় নাটকের বিরুদ্ধবাদীগণের কতক পরিমাণে মনোরঞ্জন করিতেও চেষ্টা করিয়াছেন। অনেকের এই অনুমান সঙ্গত কি অসঙ্গতই হউক ঢাকা প্রকাশের পক্ষে এই ব্ধ [রূ] প গুরুতর বিষয়ে মতামত প্রকাশে বিলম্ব করা কিংবা বিরত থাকা নিতান্ত দূষণীয় কার্য্য হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ঢাকাস্থ ভদ্রসমাজের পক্ষে সভ্যতার আবরণে লোকচরিত্র বিনাশকারী বেশ্যাগণের নাটকাভিনয় হইতে থাকিবে, পত্রিকা সম্পাদকগণ নীরব থাকিবেন ইহা সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ঢাকা প্রকাশ থিয়েটার কোম্পানীর অভিনয় বর্ণনা করা বিশেষ আবশ্যক কার্য্য মনে করিলেন, কিন্তু 'বেশ্যা লইয়া নাটকাভিনয় দূষণীয় কিনা' ইত্যাদি বিষয়ে 'আমরা অদ্য এস্থলে তৎসম্বন্ধে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে অভিলাষী নহি' বলিয়া ক্ষান্ত রহিয়াছেন। সম্পাদক মহাশয়! নাটক অভিনেতৃগণ ঢাকা পরিত্যাগ করিলে পর কি আপনার মত প্রকাশিত হইবে।

আপনি সংবাদস্তম্ভে লিখিয়াছেন যে, ব্রাহ্ম সমাজের বক্ষ দিয়া এই সকল ব্যভিচার স্রোতের পথ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আপনি ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্যনির্বাহক সভার একজন সভ্য হইয়া কেমন করিয়া এ ব্ধ [রূ]প কথা বলিলেন তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। গত ৭/৮ বৎসর হইতে ব্রাহ্ম সমাজের প্রাঙ্গণস্থ রাস্তা দিয়া আবশ্যক মতে সময় ২ নাটকগৃহে লোক যাতায়াত করিতে দেওয়া হইতেছে। ঐ ব্ধ [রূ] প রাস্তা দেওয়াতে যে অনেক সময় ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্যের অসুবিধা এবং অশান্তি উপস্থিত হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। এতকালের মধ্যে অসুবিধা দেখিয়াও কার্য্যনির্ব্বাহক সভা উক্ত রাস্তা রীতিপূর্ব্বক নুটিশ প্রদান করিয়া বন্ধ করিতে যে শিথিলতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অন্যায় হইয়াছে। অবশ্য বর্ত্তমান অসুবিধা অত্যন্ত গুরুতর। হঠাৎ নাটক কোম্পানি ঢাকায় উপস্থিত হইয়া নাটকগৃহ ভাড়া লইয়াছেন—বিশেষতঃ তাহাদিগের সহিত বেশ্যা আছে, এই বিষয় কার্য্যনির্ব্বাহক সভা অনুমাত্রও অবগত ছিলেন না। যদি ১০/১৫ দিবস পূর্ব্বে সমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা এই প্রকার দূষণীয় নাটক অভিনয়ের বিষয়ে জানিতে পারিতেন তাহা হইলে রাস্তা বন্ধ করিতে পারিতেন বটে কিন্তু নাটক গৃহের বেশ্যাসহ অভিনয় নিবারণ বিষয়ে তাঁহাদের কোন ক্ষমতা ছিল কি না , তদ্বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ

আছে। সমাজগৃহের অতি নিকটবর্ত্তী স্থানে নাটকগৃহ থাকাই সমাজের অশান্তির কারণ হইয়াছে। রাস্তা বন্ধ হইলেও যে সমাজ সম্পূর্ণ শান্তি লাভ করিতে পারিবে এমত বোধ হয় না।

বর্ত্তমান কার্য্যনির্ব্বাহক সভা তাঁহাদের গত ২৫শে শ্রাবণের সভায় স্পষ্ট এই স্থির করিয়াছেন যে, বেশ্যাগণকে সমাজের প্রাঙ্গণস্থবর্ত্ম দিয়া যাতায়াত করিতে দেওয়া হইবে না এবং তদনুসারে বাবু অভয়চন্দ্র দাস নাটক কোম্পানীর ম্যানেজারদিগকে কার্য্য করিতে আদেশ করেন এবং আমরা জানি সেই ৰু [রূ] প কার্য্য চলিতেছে। উক্ত দিবসের সভায় উহাও স্থির হয় যে, নাটক সম্বন্ধীয় কোন বিজ্ঞপনাদি পর্য্যন্ত সমাজগৃহে কিংবা সমাজের প্রাচীরে লাগাইতে দেওয়া হইবে না। আর পূর্ব্ববঙ্গ রঙ্গভূমি গৃহের সভাপতিকে ১৫ দিবসের মধ্যে রাস্তা বন্ধ করার বিষয়ে রীতিপূর্ব্বক নুটিশও দেওয়া হইয়াছে। কেবল ইহা নহে, সমাজগৃহের নিকটে নাটক সংসৃষ্ট লোকদিগের দ্বারা কোন প্রকার অবৈধ কার্য্য না হইতে পারে তদ্বিষয়েও সমাজের এবং নাটকগৃহের দ্বারবানদিগকে বিশেষ সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা এই সকল উপায় অবলম্বন করাতেও আপনি সমাজের বক্ষ দিয়া ব্যভিচার স্রোত চলিতে দেয়া হইতেছে, ইত্যাদি কথা কেন বলিলেন, বুদ্ধির অগম্য। পূর্ব্ব বাঙ্গলা ব্রাহ্ম সমাজের সভ্যগণের মধ্যে অনেকের স্বীয় দুর্ব্বলতা সত্তেও, যাহাতে ব্রাহ্মমন্দিরের এবং ব্রাহ্ম ধর্ম্মের পবিত্রতার কিছুমাত্র হানি না হয় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি আছে। যাহাতে সমাজ প্রাঙ্গণ দিয়া বেশ্যাদি গমনাগমন না করে এবং নাটকাভিনয় দ্বারা সমাজের পবিত্রতার কোন প্রকার হানি না হয় এবং অবিলম্বে সমাজের মধ্যস্থ রাস্তা বন্ধ করা হয়, তদ্বিষয়ে ২৫শে শ্রাবণ তারিখে পূর্ব্ব বাঙ্গলা ব্রাহ্ম সমাজের কতকটী সভ্য (যাঁহাদের মধ্যে অনেকের বঙ্গবাবুর বেদীচ্যুতির বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন) কার্য্যনির্ব্বাহক সভার নিকট যে আবেদন করিয়াছেন তাহাতে ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ পাইয়াছে যে, সভ্যগণ সমাজের পবিত্রতা রক্ষা বিষয়ে শিথিল নহেন। আপনার 'প্রাপ্ত' লেখক তাঁহাদিগের নামে অযথা দোষারোপেই করিয়াছেন।

৩০শে শ্রাবণ।
১২৮৬।

নিং
পূর্ব্ব বাঙ্গলা ব্রাহ্ম সমাজের
একজন সভ্য
১৭-৮-১৮৭৯

সম্পাদকীয়

পাঠকগণ ! অদ্যকার ঢাকা প্রকাশের প্রেরিত স্তম্ভে পূর্ব্ব বাঙ্গলা ব্রাহ্ম সমাজের জনৈক সভ্য স্বাক্ষরিত পত্রপাঠে অবগত হইবেন, পত্রপ্রেরক আমাদিগকে ভয়ানকরূপে আক্রমণ করিয়াছেন। আমরা বেশ্যামিশ্রিত অভিনেতাদিগের অভিনয় দর্শন ও শ্রবণের দোষাদোষ বিষয়ে স্বকীয় মতামত প্রকাশ করি নাই—উল্লিখিতরূপ অভিনয় দর্শনের প্রতিবন্ধকতা চরণার্থ ঢাকা ছাত্র সাধারণ সভা যে এক বৃহৎ অধিবেশন করিয়া উক্ত বিষয়ের আলোচনা

করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধেও কিছু উল্লেখ করি নাই, -ঢাকা ব্রাহ্ম সমাজের পক্ষ হইতে উক্ত দূষণীয় নাটকাভিনয়েব বাধা করা হয় নাই বলিযা ব্রাহ্ম সমাজের উপর অন্যায় দোষারোপ করিয়াছি,- একটা প্রাপ্ত প্রবন্ধ প্রকটন কবিয়া পূর্ব্ব বাঙ্গলা ব্রাহ্ম সমাজের অনুচিত নিন্দাবাদখ্যপন কবিয়াছি, ইত্যাদি উপাদান লইয়াই পত্র প্রেরক উক্ত সুদীর্ঘ পত্রখানির রচনা করিয়াছেন। পত্র প্রেরক যদি স্থূলভাবে না দেখিয়া সূক্ষ্মভাবে বিবেচনা করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়না, উল্লিখিত বিষয় লইযা আমাদিগকে এত আক্রমণ করিতে পারিতেন। বারাঙ্গনাদিগের কুৎসীত নৃত্যগীত দর্শন ও শ্রবণ দূষণীয় কিনা তাহা স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত না করিলেও ঢাকা প্রকাশের পাঠকগণ বোধ হয় এই অনুমানটুকু অবশ্যই করিতে পারেন যে, ঢাকা প্রকাশের তাদৃক বিষয়ে অভিমতি থাকা কদাচ সম্ভাবনীয় নহে। বিশেষতঃ প্রাপ্ত প্রবন্ধ প্রকটন দ্বারা উহা একপ্রকাব স্পষ্টাক্ষরেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। যাহা সম্পাদকের অভিমত নহে, কোন সংবাদপত্র প্রাপ্ত স্তম্ভে তাহার স্থান দিয়া থাকেন? পত্র প্রেরক যদি কিঞ্চিৎ ধীরতাসহকারে প্রণিধান করিতেন, তাহা হইলে প্রাপ্ত প্রবন্ধ পাঠ করিয়াই পরিতৃপ্ত হইতে পারিতেন,—ঢাকা প্রকাশ বেশ্যা বিমিশ্র অভিনয় সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করে নাই—ছাত্র সাধারণ সভা সম্বন্ধে কোন কথারই উল্লেখ করে নাই, বলিয়া বৃথা অনুযোগ দিতেন না। পরন্তু ঢাকা প্রকাশের পুরাতন ফাইল উদঘাটন করিলেও দেখিতে পাইতেন যে, বারাঙ্গনাদিগের দূষিত নৃত্যগীত শিক্ষিত সমাজের বিশেষতঃ ছাত্র বর্গের দর্শন ও শ্রবণ অকর্ত্তব্য বলিয়া ভূরি ভূরি স্থলে স্পষ্টাক্ষরে বিবৃত রহিয়াছে। তবে ঢাকা ছাত্র সভা অভিনয় দর্শনের যেরূপ বিরুদ্ধবাদী—সর্ব্বসাধারণকে তদ্দর্শনে বিরত রাখিতে যেরূপ অভিলাষী আমরা ততদূর নহি। যখন সাধারণভাবে ঘাটেপথে চলিতে ফিরিতেও বারবিলাসিনীদিগের রূপ দর্শন ও বাক্য শ্রবণ নিরোধ করিবার উপায় নাই,—দেশীয় লোকের রুচি অনুসারে আমোদজনক ব্যাপার মাত্রেই প্রায় বাই খেমটার নৃত্যগীত হইয়া থাকে, তখন 'বারাঙ্গনা দেখিবনা বা তাহাদিগের কথাবার্ত্তা কি গীত কবিতা শ্রবণ করিব না' বর্ত্তমান সমাজস্থ কোন ব্যক্তি এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়া থাকিতে পারেন? তবে অবশ্য আমরা একেবারের স্থলে শতবার স্বীকার করিব, সুকুমার মতি শিক্ষার্থী ছাত্রবর্গের উহা দর্শন ও শ্রবণ দ্বারা রুচি বিকৃত ও পাপ প্রবৃত্তির উন্মেষ হওয়া নিতান্ত সম্ভাবিত। সুতরাং তাহাদিগের পক্ষে এই প্রকার অভিনয় দর্শন সুদৃঢ়রূপে নিষিদ্ধ। অপিচ যে স্থলে ধর্ম্মালোচনা, ধর্ম্মালাপ ও ধর্ম্মানুষ্ঠান হইয়া থাকে, তাদৃক্ পবিত্রস্থলে ঐ রূপ অপবিত্রতার সংস্রব থাকাও নিতান্ত দূষণীয়। এজন্যই প্রাপ্ত প্রবন্ধে সাধারণভাবে ছাত্র সভার কার্য্যের অনুমোদন করা হইয়াছে এবং পূর্ব্ব বঙ্গালা ব্রাহ্ম সমাজ সংসৃষ্ট পূর্ব্ববঙ্গ রঙ্গভূমি গৃহে বেশ্যবিমিশ্র অভিনেতৃগণের অভিনয় হইবে,—ব্রাহ্ম সমাজের প্রাঙ্গণ দিয়া ঐ সকল বেশ্যা যাতায়াত করিবে, শুনিয়া যারপরনাই ব্যাকুলিত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া ব্রাহ্ম সমাজের কর্ত্তৃপক্ষগণকে তৎপ্রতিরোধে প্রযত্নপর হইতে অনুরোধ করা হইয়াছে। পত্র-প্রেরক বলিলেন, ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ উচিত সংবাদ পান নাই বলিয়াই ব্রাহ্ম সমাজের উপর দিয়া গতাগতির প্রতিরোধ করিতে পারেন নাই। আমরা এ কথার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। আমরা যতদূর জানি, তা হল

একপ্রকার নিশ্চয় করিয়াই বলিতে পারি, ব্রাহ্ম সমাজের কার্যনির্ব্বাহক সভায় থিয়েটার গৃহের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত একযোগে এরূপ নির্দ্ধারণ হইয়াছিল যে, থিয়েটার গৃহের কর্ত্তৃপক্ষ ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদককে পূর্ব্বে সংবাদ না দিয়া থিয়েটার গৃহে কোন অভিনয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করাইতে পারিবেন না। তদনুসারে কি এই বেশ্যা বিমিস্র নাটকাভিনয়ের সংবাদ ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদককে পূর্ব্বে জ্ঞাপন করা হয় নাই? যদি না হইয়া থাকে, তবে তিনি এই অনিয়মাচরণের প্রতীকার করিলেন না কেন? ব্রাহ্ম সমাজ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও দৃঢ়ব্রত হইয়া যদি উক্ত অভিনয়ের সহিত সমাজের সম্পূর্ণ অসংস্রব রাখিতে ইচ্ছা করিতেন,—তাঁহাদিগের সীমাস্থল অন্ততঃ বংশবৃদ্ধি দ্বারা আবদ্ধ করিয়া থিয়েটার গৃহকে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া দিতে চেষ্টাবান হইতেন, আমাদের বিশ্বাস যে তাহা হইলে অকৃতকার্য্য হইতেন না। যাহা হউক, পত্রপ্রেরক যখন লিখিয়াছেন, সমাজ গৃহের পবিত্রতা রক্ষার্থ ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা শিথিল প্রযত্ন না থাকিয়া বিবিধ কার্য্যানুষ্ঠান করিয়াছেন, অভিনেত্রী বেশ্যাগণকে সমাজ প্রাঙ্গণের উপর দিয়া যাতায়াত করিতে দেন নাই, তখন আমরা তাহা বিশ্বাস কবিয়া আশ্বস্ত ও সুখিত হইলাম এবং না জানিয়া ব্রাহ্ম সমাজের সভ্যগণকে অনুযোগ করা হইয়াছে বলিয়া অনুতপ্তও হইলাম। ভরসা করি, তাঁহারা সমাজের পথ ১৫ দিবসের মধ্যে বন্ধ করা হইবে বলিয়া যে বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছেন, তাহাও অবশ্য কার্য্যে পরিণত হইবে। প্রাপ্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে পত্রপ্রেরক আরও যে ২ কথা লিখিয়াছেন, প্রাপ্ত প্রবন্ধ লেখক যদি উচিত বোধ করেন, তবে তিনিই তাহার উত্তর দান করিবেন।

১৭-৮-১৮৭৯

প্রেরিত পত্র

মান্যবর শ্রীযুক্ত ঢাকা সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

আপনার ২রা ভাদ্রের ঢাকা প্রকাশের পূর্ব্ব বাঙ্গলা ব্রাহ্ম সমাজের জনৈক সভ্যের এক দীর্ঘ প্রেরিত পত্র পাঠে চমৎকৃৎ হইলাম। সভ্য মহাশয় তাহার পত্রের একস্থানে লিখিয়াছেন, 'হঠাৎ নাটক কোম্পানী ঢাকায় উপস্থিত হইয়া নাটক গৃহ ভাড়া লইয়াছেন, বিশেষতঃ তাহাদিগের বেশ্যা আছে এই বিষয় কার্য্যনির্ব্বাহক সভা অনুমাত্রও অবগত ছিলেন না' ইহাই কি প্রকৃত ঘটনা? নাটক কোম্পানী কাহার নিকট হইতে ঘর ভাড়া লইয়াছিলেন? পূর্ব্ব বাঙ্গলা ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভাপতি কি এই ঘর নাটক কোম্পানীকে ভাড়া দেন নাই? নাটক কোম্পানীর ঢাকায় উপস্থিত হওয়ার পূর্ব্বে কি কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভাপতি কিছুই জানিতেন না? পত্র প্রেরকের চমৎকার সত্যপ্রিয়তা!

কলিকাতার ন্যাশনেল থিয়েটার কোম্পানীর দলে যে বেশ্যারা অভিনয় করে, অনেকদিন হইতে সংবাদপত্রাদিতে তাহার প্রতিবাদ হইতেছে। ইহা কার্য্যনির্ব্বাহক সভার কেহই জানেন না, বড়ই আশ্চর্য্যের কথা।

... সম্পাদক মহাশয়! আমরা আপনার প্রাপ্ত স্তম্ভের প্রস্তাব বিশেষ ক [রূ] পে পাঠ করিয়াছি। ইহাতে যে প্রাপ্ত লেখক ব্রাহ্ম সমাজের সভ্যদিগের প্রতি অযথা কোন দোষারোপ করিয়াছেন, অথবা বঙ্গ বাবুর বেদীচ্যুতির কথা অপ্রাসঙ্গিক উল্লেখ করিয়াছেন,

আমাদের এইরূপ কোনও মতে বোধ হয় নাই। পত্র লেখক কি ইহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন যে, পূর্ব্ব বাঙ্গলা ব্রাহ্ম সমাজের কোন সভ্যই (যাহারা বঙ্গ বাবুর বেদীতে বসিয়া উপাসনা করাকে পাপ বলিয়াছিলেন) নাটক মিশ্রিত পণ্যাঙ্গনাদিগের ব্রাহ্ম সমাজ প্রাঙ্গণের মধ্য দিয়া গমনাগমন করা অনুমোদন করেন নাই? অথবা তাঁহাদেব মধ্যে কেহই কি বারাঙ্গনাদের অভিনয়ের সহায়তা করেন নাই? আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে, পূর্ব্ব বাঙ্গলা ব্রাহ্ম সমাজের সভ্যেরা (কেবল সভ্যেরা কেন ট্রস্টিরা পর্য্যন্ত) এই বারাঙ্গনা অভিনয়ের আনন্দিত মনে সহায়তা করিয়াছেন। অথবা ইহাও বলিতে পারি যে, 'প্রাপ্ত' লেখক বঙ্গ বাবুর কোনও বন্ধু নহেন। অথবা কোন প্রকারের আদেশ কিংবা সাধারণ নীতিবাদী' ব্রাহ্ম নহেন। পত্র প্রেরক নিজেই ব্যক্তি বিশেষকে অযথা আক্রমণ করিয়া অভদ্রোচিত কার্য্য করিয়াছেন। অধিক লেখা বাহুল্য।

৫ই ভাদ্র। ঢাকা প্রকাশের জনৈক
১২৮৬ সন। পাঠক

ঢাকা।

২৪-৮-১৮৭৯

সংবাদ

আমরা শুনিয়া দুঃখিত এবং ততোহধিক বিস্মিত হইয়াছি যে, শিক্ষক বিশেষের দৃষ্টান্তানুসারে ঢাকাস্থ কোন স্কুলের শিক্ষকগণ বেশ্যাবিমিস্ত্র ন্যাসনেল থিয়েটার কোম্পানীর অভিনয় দর্শনে অভিলাষী হইয়াছেন যাঁহারা ছাত্রদিগকে এ ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত রাখিতে উপদেশ দিতেছেন তাঁহারা স্বয়ং ইহাতে প্রবৃত্ত হইলে যখন ছাত্রগণ জিজ্ঞাসা করিবে 'আপনারা এব্ধ [রূ] প করিলে আমাদিগকে নিবারণ করিলেন কেন?' তখন কি সম্মান রক্ষা পাইবে? কোনও উত্তর দিবার উপায় থাকিবে? ফলতঃ কুদৃষ্টান্তের অনুসরণ ও প্রদর্শন শিক্ষাভিমানী শিক্ষকগণের পক্ষে নিতান্ত অসঙ্গত। আমাদের বিবেচনায় ইহাতে স্কুলের দুর্নাম এবং ক্ষতি হইবারও সম্ভাবনা আছে।

২৪-০৮-১৮৭৯

সংবাদ

আমরা শুনিলাম যে, ন্যাসনেল থিয়েটার কোম্পানী অনেক বাড়াবাড়ী করাতে এখানে বিলক্ষণ রূপে উত্তমমধ্যম লাভ করিয়াছেন। এ প্রকারও শুনা যায় যে, উক্ত কোম্পানী এখানে আসিয়া ঋণে আবদ্ধ হওয়াতে স্বচ্ছন্দে কলিকাতা গমন দূরে থাকুক, গোলযোগেই পতিত হইয়াছেন।

৭-৯-১৮৭৯

নাটকাভিনয়

প্রথম যখন এদেশে নাটকের বড় ধুমধাম আরম্ভ হয়, তখন অনেকেই মনে করিয়াছিলেন, নাটকাভিনয় আমাদিগকে সুখী করিবে, সদ্দৃষ্টান্ত দেখাইয়া, প্রকৃত অনুসরণীয় বুঝাইয়া দিয়া প্রবৃত্তির চঞ্চলতা, মনের আবিলতা এবং অসৎসঙ্গবাসেচ্ছা বিদূরিত করিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু তখনও অনেক মহাত্মার মনে ইহার ভবিষ্যনিহিত বিষময়ভাব সম্পাদিত

হইয়াছিল। তাঁহারা ভবিষ্যদ্বক্তার ন্যায় 'কালে ইহা দ্বারা সমাজের ইষ্ট না হইয়া অনিষ্ট হইবে' সাধারণের নিকট এরূপ বলিতেও ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু তখন তাঁহাদের সেই জ্ঞানগর্ভ সারোক্তিকে শুনিয়াছে? উহা প্রলাপোক্তিব ন্যায় সর্ব্বথা সাধারণের নিকট অবজ্ঞেয়ই হইয়াছিল। দিন দিন নাটকাভিনয়ের শ্রীবৃদ্ধি হইতে চলিল এবং ক্রমে তাহাতে অধর্ম্মের কুরুচির ব্যসনিমনো মুগ্ধকরচ্ছবি প্রতিফলিত হইয়া লোক চরিত্রে বিষম বিপর্য্যয় ঘটাইয়া উঠাইল। বর্ত্তমান সময়ে নাটক ও তদভিনয়ের যেরূপ ভাবগতি দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে বোধহয় কালে ইহা লোক যাত্রার একটা প্রবল•• পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইবে। দেখিতেছি উহা পৃথিবীতে না জন্মিলেই বরং ভাল ছিল।

প্রথমতঃ যাহারা নাটকাভিনয়ের পক্ষপাতী ছিলেন, তাহাদের যে বুঝিতে ভ্রম হইয়াছিল, বাস্তবিক তাহা নহে। লোক শ্রুতি হইতে দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারাই অধিক শিক্ষা পায়। যে সকল বিষয় পাঠকালে মর্ম্মস্পর্শী না হয়, লোক ব্যবহারে তাহা প্রত্যক্ষ করিলে হৃদয়ে সুদৃঢ় রূপে অঙ্কিত হইয়া থাকে। নাটকও দৃশ্যকাব্য, উহাতে যাহা দেখা যায়, নায়ক নায়িকাদিগের ব্যবহারে যাহা অনুষ্ঠিত হয়, তাহা লোকহৃদয়ে অনুপ্রবেশিত ও প্রতিবিম্বিত হইয়া ভিন্ন স্রোতে জীবন প্রবাহিত করিতে থাকে।

নাটকের প্রয়োজনীয়তাও এই এবং এই জন্যেই প্রথম নাটকের সৃষ্টি হয়। নাটক মনুষ্য হৃদয়ের আদর্শ যখন হৃদয়ের যেরূপ গতি, তৎকাল প্রচলিত নাটকেও তাহারই ছায়া প্রতিফলিত হইয়া থাকে। যে পর্যন্ত আর্য্য হৃদয়োত্থ আর্য্যভাবে নাটকের অঙ্গ প্রতঙ্গ পরিপূর্ণ ছিল, সেই পর্য্যন্ত ইহাতে কোনও বিকৃতরুচির প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয় নাই। দিন দিন বৈদেশিক অনুকরণে লোক রুচির অবস্থান্তরিত হইয়া প্রত্যেক আচার ব্যবহারেই তদনুকূল স্বভাবের পরিচয় দিতেছে। যাহা একসময়ে স্বর্গীয় চরিত্রের লাবণ্যময় সৌন্দর্য্যের বিলাস ভূমি ছিল, কালে ভিন্নরুচির মাহাত্ম্যে পৈশাচিক ভাব অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহার অধিকাংশকেই পিশাচের লীলাক্ষেত্র করিয়া তুলিয়াছে। ইদানীন্তন অনেক নাটক সেই ব্যভিচার স্রোতে নিমজ্জিত হইতেছে অপিচ অভিনেতৃদিগের স্বভাব দোষে ইহার বিকৃত অবস্থা [ছেঁড়া] বিকৃত হইয়া উঠিয়াছে।

ন্যাশনেল থিয়েটারের অভিনেতৃদল যেরূপ আয়োজন লইয়া অভিনয় কার্য্যে দীক্ষিত হইয়াছে, আর কিছুদিন তাহাদের এই আয়োজন লোকরঞ্জনে নিরত থাকিলে, শীঘ্রই যে লোকচরিত্রের বিষম বিপর্য্যয় ঘটিয়া উঠিবে, স্বর্গীয় স্বভাবস্রোতঃ কালিমায় কলুষিত হইতে থাকিবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। অভিনেতা নাটকোক্ত পাত্রের অনুকারক। তিনি যাহা বলিবেন, যাহা দেখাইবেন, নাটকোক্ত পাত্রকেই তথাবিধই কল্পনা করিতে হইবে। এই জন্যে অভিনেতাদিগের স্বভাব সর্ব্বথা পরিমার্জ্জিত থাকা উচিত, কারণ অভিনেতার শরীরে যে দোষ বিদ্যমান থাকে, নাট্যল্লিখিত পাত্রেও তাহারই ছায়া প্রতিবিম্বিত হয়। ন্যাসনেল থিয়েটারের অভিনেতাদিগের স্বভাব যেরূপ, তাহা সকলেই জানেন। বিশেষতঃ তাহারা আবার কতকগুলি বারাঙ্গানা লইয়া অভিনয় কার্য্য সম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। নাটকের ধর্ম্ম এই, যাহা রঙ্গভূমিতে প্রদর্শিত হয়। হৃদয় রঙ্গভূমিতেও তাহাই পুনঃ অনুস্মরিত হইয়া পাত্র চরিত্রের দর্শকের চরিত্রের আদর্শ করিয়া তুলে। যে অবিনয়ে

বেশ্যাচরিত্রে কুলবতী কামিনীর সরল চরিত্র অনুকৃত হয়. হৃদয়ের সারল্য প্রকাশনী দৃষ্টি এবং অঙ্গসঞ্চালনাদি বারবনিতার পরহৃদয়াকর্ষক কুটিল হাবভাবাদিতে অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে ভ্রষ্টার হৃদয় কেন না বিচলিত হইয়া উঠিবে? যখন একটী বিলাতি রমণীর চটুল কটাক্ষ বশীকরণোচিত অঙ্গচালনাদি প্রত্যক্ষীভূত ও সুদুর্লভ বাক্য পরম্পরাকর্ণিত [ছেঁড়া] তখন কেননা তাহার নবহৃদয় রাজ্যে বা [রা] ষ্ট্র বিপ্লব উপস্থিত হইবে না? ফলকথা, এই বেশ্যাবিমিশ্র নাটকদল দ্বারা যে, কালে দেশের দূরতিক্রমী দুর্দশা উপস্থিত হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। অবিশ্বস্ত প্রকৃতি দ্বারা যদি বিশ্বস্ত সৎপ্রকৃতির অনুকৃতি অসম্ভাবনীয় হয়, তবে বারবনিতা দ্বারা কিরূপে স্বর্গীয় সুসমাপূর্ণ সাবিত্রী দময়ন্তী প্রভৃতির অসামান্য চরিত্র প্রতিফলিত হইতে পারে। নাটকের প্রধান ধর্ম্ম, অশিক্ষিত হৃদয়ে শিক্ষাবিধান। অভিনেতা তাহার শিক্ষক। শিক্ষকের কি কি গুণ থাকা চাই, তাহা উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। জানি না গুলিখোর পাখীদলের লোক কিরূপে যুধিষ্ঠির হইতে পারে, পাপীয়সী বার-বিলাসিনী সতী সাধ্বীর চরিত্র কিরূপে দেখাইতে সমর্থ হয়!

অভিনয় দ্বারা লোক চরিত্র গঠন করা এই অভিনেতৃ দলের উদ্দেশ্য নয়। তাহাদের সকলেই সম্পন্ন পরিবারের হইলেও বিলাস পরায়ণ বলিয়া স্বেচ্ছা প্রবৃত্ত কুলভ্রষ্ট। কেবল আমোদ প্রমোদ করিয়া কাল কর্ত্তন করাই ইহাদের জীবনের প্রধান ব্রত। বেশ্যা সহবাসে জীবন স্রোত প্রবাহিত করাই প্রধানতম লক্ষ্য, অভিনয় প্রদর্শন অর্থানুকূল্যের উপলক্ষ মাত্র। এই দুশ্চরিত্র দল যাহাতে বদ্ধমূল হইতে না পারে, সাধারণের তদ্রুপ যত্ন করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। ইহাদের অভিনয় দর্শন করা ভদ্রগণমাত্রেরই বিধেয় নহে। যাহাতে সাধারণের রুচি বিকৃতির সম্ভাবনা, যাহাতে সুর-চরিত্র বিকৃত হইয়া পৃথিবীর পাপ স্রোত বর্দ্ধিত হইতে পারে, তাহার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করাও অন্যায় নহে। যেরূপে হউক, দেশের সেই শত্রুর উম্মূলন সর্ব্বথা করণীয়। বাঙ্গালীর হৃদয় নিতান্ত কোমল, অল্পতেই বিচলিত হইয়া উঠে, সুতরাং ইহাদের দুষ্কৃতির লক্ষ্যে পড়িয়া তাহাদের চরিত্রগত বিষম বিপর্য্যয় উপস্থিত হইবে, আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

এই অভিনেতৃদল অল্পদিন হইল ঢাকা পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। ইহাদের কার্য্যকলাপ আমরা কথঞ্চিৎ পাঠকবর্গকে জানাইয়াছি। কিন্তু আমরা জানিতাম না ইহাদের ব্যবহারগত অভদ্রতাও রহিয়াছে। ঢাকাতে ইহারা অনেক ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া উচিত ব্যবহার দূরে থাকুক একবার জিজ্ঞাসাও করে নাই। ছাত্রদিগের সঙ্গে অযথা শত্রুতা করিয়া অভদ্রতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছে। লাভের মধ্যে শেষকালে প্রহৃত হইয়া পাপের উচিত শাস্তি উপভোগ করিয়া গিয়াছে। অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যাওয়ার কিছুদিন পূর্ব্বে ইহারা অত্রত্য কতিপয় বস্ত্র ব্যবসায়ীর নিকট হইতে বস্ত্র ক্রয় করিয়া টাকা দিবে বলিয়া তাহাদিগকে তৎকালে বিদায় করে, পরে গোপনে স্থান ত্যাগের চেষ্টা করিতে থাকে। কাপড়িয়াগণ উহা জানিতে পারিয়া কতিপয় লোক সমভিব্যহারে তাহাদের নিকট আসিয়া টাকা চাহে। তাহারা টাকা পরে পাঠাইয়া দিবে বলে, কিন্তু কাপড়িয়াগণ তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া এক রাত্রি তাহাদিগকে পাহাড়া দিয়া রাখে। শেষকালে নাকি তাহারা কাপড় ফেরত দিয়া অব্যাহতি পাইয়া

গিযাছে। ইহারা যে কি প্রকৃতিব লোক, তাহা এই একটী ঘটনা দ্বারাই পাঠকগণ বুঝিয়া লইবেন।

১৪-০৯-১৮৭৯

সংবাদ

পূর্ব্ববঙ্গ রঙ্গভূমি নামে ঢাকাতে একটী নাট্যশলা আছে। যে সময়ে ঢাকার ধনী ও সম্ভ্রান্তগণ রামাভিষেক নাটকের প্রথম অভিনয় করিতে প্রবৃত্ত হন, তখন বহুতর টাকার সংগ্রহে ইহা সুনিশ্চিত হইয়াছিল। যাহাতে এই নাট্যশালায় বিশুদ্ধ ও পবিত্র আমোদ হইতে পারে; তাহাই উহার লক্ষ্য ছিল। পরে অনেক রাজনৈতিক সভা ও বৈজ্ঞানকি কার্য্য ইহাতে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এমনকি হিন্দু ধর্ম্মরক্ষিণী প্রভৃতি সভাও ইহাতে অধিবিষ্ট হইয়া সময়ে ২ কার্য্য করিতেছে। ঢাকার পণ্ডিত বহুলা সারস্বত সভারও অধিবেশন কার্য্য এই গৃহে সম্পাদিত হয়। কিন্তু কাল মাহাত্ম্যে সেই পবিত্র দেব মন্দিরে নরীনৃত্যমান! বারবিলাগীগণ, পাদবিন্যাসে দর্শকগণকে চরিতার্থ করিতেছে। এই গৃহের সৃষ্টি সঙ্কল্পে এই পাপানুষ্ঠান সংকল্পিত হয় নাই। বিশেষতঃ ইহা ঢাকার পূর্ব্ব বাঙ্গলা ব্রাহ্ম সমাজের সংলগ্ন ভূমি। ঢাকা-ব্রাহ্ম সমাজের ও রঙ্গ গৃহের কর্ত্তৃপক্ষও প্রায় এক; এমন অবস্থায় কর্ত্তৃপক্ষগণের উচিত হয় নাই যে, বেশ্যাদিগকে এই ঘরে অধিকার দেন। প্রায় দুই বৎসর গত হইতে চলিল ন্যাশনাল থিয়েটাব যখন অভিনেত্রী বার-বনিতাগণসহ, ঢাকায় উপনীত হইয়া এই নাট্যগৃহে অভিনয় করিতে ইচ্ছা করে তখন সভাতে বহুতর আপত্তি সত্ত্বেও তৎকালীন কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহাদিগকে অভিনয় করিতে আজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন। তদনুসারে প্রায় মাসান্ত ব্যাপিয়া সেই সদনুষ্ঠান (!) হইয়া যায়। সংপ্রতি পুনরায় কতকগুলি মুসলমান বেশ্যা (বাইজি) এই নাট্যগৃহে অভিনয় করিয়া উপার্জন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমরা এই সকল দেখিয়া ও শুনিয়া অবাক হইয়াছি। এই গৃহের পতনই অনেকের অভিপ্রেত। নতুবা এইরূপে কত পাপময় মূর্ত্তি ইহা প্রদর্শিত হইবে বলা যায় না। যদি এইরূপে অর্থোপার্জ্জন করিয়া নাট্যগৃহ রক্ষণ করিতে হয়, তবে আমরা কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করি, এই গৃহের আবশ্যকতা স্থির রাখিবার আর প্রয়োজন নাই। কলেজের প্রিন্সিপল মেঃ পোপ সাহেবের এই বিষয়ে একটুকু মনোযোগ আবশ্যক। ক্রমেই ছেলেদের মাথা খাওয়া হইতেছে।

২৮-১১-১৮৮০

সংবাদ

ঢাকা নবাবপুর এমেটিয়ার থিয়েটার কোম্পানী অভিনয় কার্য্যে সবিশেষ যশ আহরণ করিয়াছেন। নবাবপুরের সহিত ঢাকা তাঁতীবাজারের চির প্রতিযোগিতা। তাঁতীবাজার নবাবপুরের ঈদৃশ যশোভাগিতায় অসহিষ্ণু হইয়াই হউক, অথবা যে কারণেই হউক, ঢাকা কলেজের কোন এক পণ্ডিতকে অগ্রণী করিয়া শীঘ্রই একটি অভিনয় কার্য্যে ব্রতী হইতেছেন। তাঁহাদেরও সফলকাম হইবার সম্ভাবনা। বিশুদ্ধরূপে যত অভিনয় হয়, ততই ভাল। তাঁতীবাজারের বাবুরা অন্যান্য ভদ্র ও পদস্থ লোকদিগকেও তাঁহাদের অভিনয়ে যোগ দিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। কিন্তু নবাবপুরবাসীদিগকে অপরের সাহায্য করিতে হয় নাই এই তাঁহাদের বিশেষ প্রশংসা। শুনিতে পাই নবাবপুরের থিয়েটার দল.

প্রচলিত সংস্কৃত যাবতীয় নাটকেব অনুবাদ করিযা অভিনয় করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। ইহাদের সংকল্প অভিনয় কার্য্যের আর একটি পথ উদঘাটিত করিতেছে। ইহাও শুনিতে পাই, উত্তরচরিত, বিক্রমোর্ব্বশী, রত্নাবলী, বেনীসংহার নবাবপুরে গীতি নাট্যাকারে অনুবাদিত হইতেছে। শকুন্তলাব অনুবাদ ও অভিনয় দেখিয়া আমরা ভরসা করি নবাব-পুর এ বিষয়ে অবশ্য কৃতকার্য্য হইবে। যাহা হউক এ ব্যাপারে নবাবপুর তাঁতীবাজারের চিরন্তনী ঈর্ষা নিন্দনীয় প্রতিহিংসায় পরিণত না হয়। এই আমাদের বাসনা।

২৪-০৭-১৮৮১

প্রেরিত পত্র

মান্যবর শ্রীযুক্ত ঢাকা প্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু। 'কাব্য শাস্ত্র বিনোদন কালো গচ্ছভিধীমতাং' ঢাকা নবাবপুর 'এমেটিয়ার থিয়েটার কোম্পানীর' শকুন্তলাভিনয়[১১] দেখিয়া যারপরনাই প্রীতি লাভ করিয়াছি। কি সংগীত, কি কথাবার্ত্তা, কি অভিনয়, কি চিত্রপট সকলই মনোহর ও চিত্তাকর্ষক। ঈদৃশ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অভিনয় আমি কখনই দেখি নাই। অভিনেতৃগণের মধ্যে কাহাকে অগ্রে প্রশংসা করিতে হইবে, তাহার অবধারণাও কঠিন। সকলেই নিজে ২ পদের গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ অভিনয়ের অবতারণায় ভারত মাতার দুরবস্থা সংগীতে, চিত্রপটে এবং অভিনয়ে সম্যক প্রদর্শিত হইয়াছে। হৃদয়বান দর্শক মাত্রেই সেই দুরবস্থা দর্শনে ও শ্রবণে বিগলিত হৃদয় হইয়াছিলেন। চিন্তা করুন, সেই জীর্ণ পর্ব্বত কন্দরে সুকৃশা, সুমলিনা, সজলনয়না, কপোলন্যস্ত করা ভারত মাতা আসীনা চারদিকে মৃতপ্রায় সন্তানগণ পতিত, পথিক সন্ন্যাসী 'আহা! কোথা সে ভারত' বলিয়া রোদন কণ্ঠে সঙ্গীত করিতেছে। ইহা দেখিয়া শুনিয়া কাহার না অশ্রুপাত হইবে। এ স্থানেই গ্রন্থকার সংস্কৃত নাটকের ন্যায় কোথা সে ভারত বলিয়া প্রস্তাবনা করিয়া গিয়াছেন।

তৎপরেই রাজা আশ্রম মৃগের পশ্চাৎ শহস্তে ধাবিত। বৈখানস প্রভৃতি মুনিগণ 'মাবধ' বলিয়া উপস্থিত এই অভিনয়টি অত্যন্ত আনন্দপ্রদ হইয়াছিল। কিছুকাল পরে বল্কল পরিহিতা আহর্য্য শোভা পরিবর্জ্জিতা শকুন্তলা, প্রিয়ংবদা ও অনসূয়া গান করিতে ২ আলবালে জল সেচন প্রবৃত্তা। সেই রমণীয়রূপ মনোহরগীত এবং অভিনয় দর্শন করিলেই বোধহয়, ইহারা কালিদাসের চিত্রিত মূর্ত্তিই বটে। শকুন্তলাকে দেখিলে কালিদাসের সেই

'ইদং কিলাব্যাজ মনোহরং বপু
স্তপঃ ক্লমংসাধয়িতুং যে ইচ্ছভি
ধ্রুবংস লীলোৎপল পত্র ধারয়া
শমীলতাং ছেত্তু মৃযিব্যবস্যতি।'

মনে পড়িয়া যায়। এই সময় রাজার অনিমিষ নয়নে নিরীক্ষণ, তৎকালীন স্বভাবোচিত হইয়াছিল। প্রিয়ংবদা, প্রকৃত প্রিয়ংবদাই বটে, অনসূয়া মুগ্ধ স্বভাবী সরলা মুনিকন্যা। ইহাদের অভিনয় ও কথাবার্ত্তা আশাতীত আনন্দ প্রদান করিয়াছে, বলিতে কি, ইহারা প্রতি পদবিক্ষেপে ও স্ত্রী স্বভাব বিস্মৃত হয় নাই। স্ত্রী স্বভাব অনুকরণ ও অভিনয় করিতে

পুরুষেরা সম্যক কৃতকার্য্য হইতে পারেন না, এই বলিয়া আমাদের যে সংস্কার ছিল, ইহাদের অভিনয়ে সেই সংস্কার তিরোহিত হইয়াছে।

তবে পাঠক, এস দুস্মন্তকে স্মরণ করি। বঙ্গদেশের জলবায়ুর দোষে দুস্মন্ত ক্ষীণ কলেবর। অথবা চির পরাধীন বঙ্গদেশীয় রাজপদের গৌরব ও সংস্কার না থাকাতেই এই অভিনেতা, শরীরতঃ পাশ্চাত্য রাজ দুস্মন্তের অভিমান রক্ষা করিতে পারেন নাই। তথাপি, ইহার কথাবার্ত্তা কোনরূপেই নিন্দনীয় নহে। বিদূষক, বিদূষকই বটে। কণ্ব সেই ঋষি কণ্ঠকেই অনুকরণ করিয়াছে। তাহার গাম্ভীর্য্য ও ধৈর্য্যের অভিনয় চমৎকার হইয়াছিল। এ স্থলে শকুন্তলাকে স্বামীগৃহে বিদায়ের বিষয় মনে পড়িয়া গেল। আমাদের দেশে কন্যাকে স্বামীগৃহে প্রথম পাঠাইতে পরিবার ও আত্মীয়স্বজন-মধ্যে যে ঘটনা উপস্থিত, এই অভিনয়ে তাহার একবিন্দুও পরিত্যক্ত হয় নাই। বলিতে কি, এ স্থলে আমরা কষ্ট করিয়াও চক্ষের জল রাখিতে পারি নাই। ফলতঃ এ স্থানে, শকুন্তলার মুগ্ধ স্বভাবোচিত বিদায়কালীন রোদন এবং সখীদের নিকট 'আমার মাধবীকে দেখিও, হরিণটির ছানা হইলে সংবাদ দিও' ইত্যাকার উক্তি, অতীব হৃদয় পরিদ্রাবক হইয়াছিল। তৎকালে-বনদেব তার আশীর্ব্বাদসূচক আকাশ সংগীত, গ্রন্থাকারের অভি মতির অনুরূপই হইয়াছিল।

আমি সেই বর্ষীয়সী গৌতমাকে এখনও বিস্মৃত হইতে পারি নাই। তাহার সেই স্নেহস্নাত বিশদ উক্তিগুলি শ্রবণ করিয়া, কে না তাহাকে শতমুখে প্রশংসা করিয়াছেন? দেখুন, প্রত্যাখানের সময় কি শোকাবহ অভিনয়ই প্রদর্শিত হয়। তৎকালে গৌতমীর বাক্য, শকুন্তলার দুঃখ শার্ঙ্গরবের অসহমান উক্তি ও ক্রোধ, বিস্মৃত বশতঃ রাজার শকুন্তলা প্রত্যাখান, কতই হৃদয়স্পর্শী শেকাবহ ২ হইয়াছিল। আহ! পক্ষিকুল কলনাদিত কি প্রভাতই দেখিলাম, ইহা অপেক্ষা স্বভাবের আর কি অনুকরণ হইতে পারে? প্রিয়ংবদার মালা পরিগন্থন, কি চমৎকারই হইয়াছিল। আমি এই অভিনয়দর্শনে এত মোহিত হইয়াছি যে, এই সমালোচনাতেও [ছেঁড়া] লক্ষণ ক্রমবিপর্য্যয় ঘটিয়াছে! পাঠক। ইহাকে কিছু মনে করিবেন না। আহা। কি চমৎকার শিশুটি, দেখ ২ সিংহশাবকের সহিত ক্রীড়া করিতেছে। একদিকে অনিমেষ নয়ন দুস্মন্ত, স্নেহে বিগলিত হইয়া নিরীক্ষণ করিতেছে, অন্যদিকে বৃদ্ধ তাপসী তাহাকে তাড়না করিতে উদ্যতা। কিছুতেই শিশুর দৃকপাত নাই। দর্শক তোমার কি ইচ্ছা হইবে না, দুস্মন্তের ন্যায় ইহাকে ক্রোড় কর? এই ৬ষ্ঠ কি ৭ম বর্ষীয় বালকটিকে দেখিলে, অভ্রান্তরূপেই শকুন্তলার সন্তান বলিয়া তোমার প্রতীতি হইবে। আমরা আর কোন রঙ্গগৃহে বালকের ঈদৃশ আনন্দপ্রদ অভিনয় দেখি নাই।

এইবারই আমাদের শেষ পরিদর্শন। রাজা শকুন্তলার সম্মিলন এবং আকাশ হইতে গীতকণ্ঠে অপসরাগণের অবতারণ ও পরে নৃত্যগীতাদী অতীব চিত্তরঞ্জক হইয়াছিল। উপসংকারে বক্তব্য এই আমি বড় দুঃখিত রহিলাম যে, প্রস্তাবের কলেবর দীর্ঘ হয় বলিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচনা করিতে পারিলাম না। যাহা হউক, যাহাদের যত্নে ও সাহায্যে এই থিয়েটার কোম্পানীর সৃষ্টি, তাহারা সব্বথা [দা] ধন্যবাদের পাত্র।

আমি বিশ্বস্ত লোকের মুখে শুনিয়াছি, শ্রীযুক্ত ধরণীনাথ বসাক, রামচন্দ্র বসাক, প্রিয়নাথ বসাক, শ্যামবন্ধু বসাক, রাধিকা মোহন বসাক, ললিত মোহন (১) (২), বাম কুমার বসাক, সনৎকুমার বসাক, গিরিশ চন্দ্র বসাক, মোহন চাঁদ বসাক, দীনবন্ধু বসাক, মঙ্গল চাঁদ বসাক ও আনন্দ চন্দ্র বসাক, মাত্র এই চতুর্দ্দশজন বসাক পরিবারের যুবক দ্বারা এই এমেটিয়ার থিয়েটার কোম্পানীর সৃষ্টি হইয়াছে, এবং বড় সুখের কথা এই যে, ইহারই অভিনেতা, কি চিত্র, কি সংগীত, কি সমবেত বাদ্য, সকলই তাহাদের দ্বারা পরিচালিত। কোনরূপে কাহারও সাহায্য অপেক্ষা করে নাই। এমনকি অভিনীত নাটক ও ইহাদের দ্বারা রচিত ও সঙ্কলিত হইয়াছে। আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত সংগীত শাস্ত্র বিশারদ মদনমোহন বসাক এই কোম্পানীর অন্তর্ভুক্ত আছেন।

যাহা হউক, এই স্বতঃপ্রবৃত্ত ক্ষমতাশীল থিয়েটার দল যাহাতে দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া উত্তরোত্তর অভিনয় কার্য্যের উন্নতি বিধান করেন ইহাই প্রার্থনীয়। তবে, 'সর্ব্বথা ব্যবহার্ত্তব্যে কুতোহ্য রচনীয়তা' এই নিন্দুক কণ্ডুয়নে যেন কোম্পানি নিরুৎসাহিত না হইয়া পড়েন। কস্যচিত নাটক প্রিয় দর্শকস্য।

৪-৯-১৮৮১

সংবাদ

ঢাকা ইসলামপুরের 'সুলতান হাফেজিয়েন' মুসলমান কোম্পানীর অভিনয় ভালই হইয়াছে। উহাদের দৃশ্যপটগুলিও মনোহর। ঐ কোম্পানীর আর একটা প্রশংসার বিষয় এই যে, তাহারা নিত্য নূতন বিষয়ের অভিনয় করিয়া থাকেন।

১৫-০১-১৮৮২

ভারত মাতার গীতি নাটকাভিনয়

সংগীতে যেমন হৃদয় বিগলিত, তরঙ্গায়িত ও উদ্বেলিত হয়, এমন আর কিছুতে হয় না। এ জন্যেই পুরাকালে কি পুরাণ, কি উপাসনামন্ত্র কি কাব্য, কি ইতিহাস প্রায়ই স্বর সংযোগে সংগীত হইত। হোমর নিজ রচিত ঈলিয়ট কাব্য দ্বারে ২ গান দ্বারা প্রচার করিতেন। আমাদিগের দেশে রামায়ণ মহাভারতাদি অনেক কাল হইতে সংগীত হইয়া আসিতেছে। বাইবেল, বেদাদি ধর্ম্ম শাস্ত্র অনেক স্থলেই গানানুপ্রাণিত। মুসলমান, ইহুদী প্রভৃতি জাতিরা তাহাদের ধর্ম্ম পুস্তক সকল সুরসহকারে পাঠ করিয়া থাকেন। অধিক কি পশু পক্ষীরাও গানে মোহিত হয়। শত বক্তৃতায় উপদেশে কি রচনা পাঠে যে ফল উপজাত না হয়, একটী ভাবপরিব্যঞ্জক গানে তদপেক্ষা অনেক অধিক ফল হইয়া থাকে। এই কারণেই যুদ্ধস্থলে বীরপুরুষেরা গান দ্বারা সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিতেন। এখন এই ব্যবহারের অন্যাথা হয় নাই। 'গানাৎ পরতরং নহি' একথাটি সম্যক ফলদায়ক ও সারগর্ভ। সংগীতশাস্ত্র চারিভাগে বিভক্ত। নৃত্য, গীত, বাদ্য ও লাস্য। যদি চতুরঙ্গপূর্ণ সংগীতের অনুষ্ঠান হয়, তাহা হইলে হৃদয় উদ্দীপিত হইবেই হইবে।

গত সোমবার স্বায়ত্তশাসন উপলক্ষে ঢাকায় যে এক মহতী সভার অধিবেশন

হইয়াছিল. সেই সভায় অভিনীত হইবার জন্যই এই সময়োচিত গীতিনাটক সংরচিত হইয়াছে। বাবু রামচন্দ্র চক্রবর্তী ও বাবু কেদারনাথ ঘোষ ইহার রচরিয়া এবং বাবু গঙ্গাগোবিন্দ গুপ্ত ও বাবু মদন মোহন বসাক ইহার শিক্ষাদাতা। সভার দিন বহু লোকের সমাগম হেতু অভিনেতৃগণ অভিনয় প্রদর্শনে বিরত থাকেন। পরে গত বুধবার রজনীতে তাহার অভিনয় হইয়া গিয়াছে। ঈদৃশ্য হৃদয়োদ্দীপক অভিনয় আমরা অতি অল্পই দেখিয়াছি। পাঠকগণ! একবার নিজ নিজ অন্তঃকরণকে ভাবতের দুরবস্থায় চিন্তাময় করিয়া স্থিরভাবে রোদনশীলা, মলিনবেশা ভারতমাতাকে দেখুন, আর তাহার দেখামত তনলয় সহকৃত শোকপরিব্যঞ্জক গানটী শ্রবণ করুন।

ভারতমাতা হিমালয়, ভগীরথী [ও] ভারত সাগর এবং সন্তানগণকে লক্ষ্য করিয়া যে দুই চারিটী শোক ও দুঃখময় উক্তি করিয়াছিলেন এবং ভারত লক্ষ্মী যেভাবে গান করিয়া প্রবোধ দিয়াছিলেন, যদিও তৎসম্প্রদায়ের রচনা তত উৎকৃষ্ট না হউক, তথাপি সময়োচিতভাবে দর্শক ও শ্রোতৃবর্গের হৃদয় নিতান্তই বিগলিত হইয়াছিল।

ভারত লক্ষ্মী শক্তির উপদেশানুসারে ভারতমাতাকে প্রবোধ দিলেন। পরে শক্তি উপদেশ দিবাব [র] ভারতের শুভদিন উপস্থিত হইতেছে বলিবার জন্য ভারত সন্তানদিগকে আহ্বান করিলেন। সকলে উপস্থিত; এই সময়ে ভারত শক্তির উপদিষ্ট উপদেশসূচক ও সন্তানগণের জয়ধ্বনিসূচক সমতান গীতি ও আনন্দধ্বনি এতাদৃশ হৃদয়স্পর্শী ও উদ্বেলক হইয়াছিল যে, সহৃদয় শ্রোতৃবর্গমাত্রেই আহলাদে নাচিয়া উঠিয়াছিলেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সংগীতে হৃদয় উদ্বেলিত ও তরঙ্গায়িত হয়। এই ভারতমাতার সংগীতে সম্যকরূপে তাহা প্রতিপাদিত হইতেছে। এই অভিনয়ের উদ্দেশ্যও সম্যক্ সুফলিত হইযাছে। ঢাকার জনসাধারণ সভা, যে উদ্দেশ্যে ভারতমাতার[২২] অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন, আমরা কণ্ঠ খুলে বলিতে পারি, সেই সুদূরগত লক্ষ্য, অবশ্য ফল লাভ করিয়াছে ও করিবে। প্রত্যেক ভারত সন্তান চিন্তার সহিত এই অভিনয় দর্শন করুন। দেখিতে পাইবেন, ইহাতে কি ছবি চিত্রিত রহিয়াছে। সংগীত, কেবল বিলাসিতার সামগ্রী বলিয়া উপেক্ষা করিও না, একবার এস, দেখ, প্রপীড়িত ভারতমাতার দুঃখ, ঢাকার জনসাধারণ সভা কিরূপ অনুভব করিতে পারিয়াছেন। দাসত্বে কাহাদের অন্তঃকরণ ব্যথাশূন্যা হইয়া গিয়াছে, সেই চিররোগী ভারত সন্তানের পক্ষে ইহা স্বাস্থ্যজনক [ছেঁড়া]। তবে এখনও কি বলিবে, আমরা স্বায়ত্তশাসনের যোগ্য নহি। এখনও বলিবে, আমরা অন্ধকারে থাকিতে ভালবাসী। এখন দাঁত উঠিয়াছে ও চলিতে পার, যারতার নিকট নিলর্জ্জভাবে যাইয়া উদর পূর্ণ করিতে পার; কিন্তু জানিও মাতার স্তন্যের জন্য ঋণী রহিয়াছে। প্রভুর মুখ চাহিয়া নিজের মন ও প্রাণের বিরুদ্ধে চলিতে পার, কিন্তু জানিও একদিন না একদিন অবশ্য অভিশপ্ত হইবে। যাউক, মনের দুঃখে এদিক সেদিক দু'কথা বলিয়া ফেলিলাম; এই ভারতমাতার অভিনয়ই তাহা বলিতে বাধ্য করিতেছে।

উপসংহারে, এই অভিনয়ে অনুষ্ঠাতা জনসাধারণ সভার সভাপতি বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার

রায়কে আমরা সর্ব্বান্তকরণে ধন্যবাদ প্রদান করি। যাহাতে ইহা মুদ্রিত হইয়া স্থানে ২ অভিনীত হয়; সে বিষয়ে যেন, তাঁহার যত্ন, অক্ষুণ্ন থাকে।

৩০-৭-১৮৮২

সংবাদ

পূর্ব্ববঙ্গ রঙ্গভূমির গৃহের কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটি গত বুধবাবের সভায় অবধারণ করিয়াছেন যে, ৮০০০ টাকা চাঁদা সংগ্রহ করিয়া উক্ত গৃহের জীর্ণ সংস্কার করা হইবে এবং পুনরায় তথায় একখানি নাটকের অভিনয় হইবে। অভিনয়ার্থ উত্তর চরিত নাটক মনোনীত হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গ রঙ্গভূমি গৃহটী ঢাকার টাউন হল, অধিকাংশ সভা সমিতিই তথায় অধিবিষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং তাহার রক্ষা করার চেষ্টা হইতেছে বলিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইলাম।

২৭-৪-১৮৮৪

সংবাদ

গতকল্য রজনীতে পূর্ব্ববঙ্গ রঙ্গভূমিতে কলিকাতা ন্যাশনেল থিযেটাব কোম্পানীব শেষ অভিনয় হইয়া গিয়াছে। প্রচুর উপকরণাদির অভাব প্রযুক্ত হউক, অধিক সংখ্যক উৎকৃষ্ট অবিনেতা না থাকেতেই হউক অথবা শিক্ষার ও নাটক নির্ব্বাচনের ক্রটিবশতঃ অধিকাংশ অভিনয় সাধারণের তত প্রীতিপ্রদ না হওয়াতেই হউক, কিংবা পুনঃ পুনঃ অভিনয় দর্শনে অনেকের অপরাগ জন্মিতেই বা হউক, এবার উক্ত কোম্পানী ঢাকায় অভিনয় করিয়া বড় লাভবান হইতে পারেন নাই। অতএব ইঁহারা পুনরায় এখানে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, তাহার সম্ভাবনা অল্প। বোধহয় তাঁহাদিগের অন্তঃকরণে পুরনাগমনের আশা না থাকিতেই তাহারা গতকল্যকার অভিনয়ে ঢাকার কতিপয় ভদ্রলোককে রঙ্গভূমিতে অবতরণ করিয়া ইঙ্গিতক্রমে তাঁহাদিগের গ্লানি প্রদর্শন করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। অন্যাথা তাঁহাদিগকে এরূপ ভদ্রজন বিনিন্দিত ও ব্যবসায়ীজন রীতি বিরুদ্ধে কার্য্যানুষ্ঠানে কখনও তৎপর দেখা যাইত না। তাঁহাদিগের নিকটে ইঁহারা কোন বিষয়ে যাচ্ঞা করিয়া অকৃতার্থ হইয়াছিলেন এবং যাঁহারা ইঁহাদিগের ক্রটি বা দোষ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, কিংবা অন্য গোপনীয় কারণে যাঁহাদিগের উপর ইঁহাদিগের ক্রোধ বা বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল তাঁহাদিগকে রঙ্গভূমিতে আনয়ন করিয়া ঐ রূপ গ্লানি প্রদর্শন কি ভদ্রোচিত কার্য্য? আমরা সাহসসহকারে সুদৃঢ়রূপে বলিতে পারি, থিয়েটার কোম্পানী যেরূপ 'কৃপণধনী' প্রদর্শন করিয়াছেন, প্রকৃত প্রস্তাবে ঢাকায় তদ্রূপ কৃপণ কেহই নাই।

১৭-৫-১৮৮৪

সংবাদ

এখানকার কতিপয় সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য লোক পূর্ব্ববঙ্গ রঙ্গভূমি গৃহে পুনরায় নাটকাভিনয় করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। এবার উত্তররাম চরিত নাটক অভিনয় হইবে, অবধারিত হইয়াছে। ঢাকায় সাধারণ সভা সমিতির অধিবেশন করিতে হইলেই পূর্ব্ব বঙ্গভূমি গৃহের প্রয়োজন হয়। প্রতিষ্ঠাতৃদের অমনযোগ সংপ্রতি উহার বিলোপ দশা আসন্নবর্ত্তিনী পুনরায় নাটকাভিনয় উপলক্ষে যদি গৃহটির পুনঃসংস্কার হয়—দীর্ঘস্থায়িতার উপায় হইতে পারে তাহা হইলে নাট্যামোদের সঙ্গে সঙ্গে ঢাকার একটি মহোপকার হয়, বলা বাহুল্য।

২৮-১২-১৮৮৪

সংবাদ

কলিকাতা বিডন স্ট্রীটের বিখ্যাত স্টার থিয়েটার কোম্পানী অভিনয় জন্য ঢাকায় আসিয়াছেন। সম্ভবতঃ মঙ্গল বুধবার লাগাযেদ [নাগাদ] অভিনয় আরম্ভ করিতে পারিবেন। স্টার থিয়েটার কোম্পানীর সুখ্যাতির কথা কাহারই অবিদিত নাই। চৈতন্যলীলা, বুদ্ধচরিত, বিল্বমঙ্গল ঠাকুর, সীতার বনবাস, নল দময়ন্তী প্রভৃতি নাটক এবং বিবাহবিভ্রাট ও বেল্লিকবাজার প্রভৃতি প্রহসন দেখিয়া সাধারণে বিশেষ প্রীত আছেন। আশা করি ঢাকাবাসীগণের নিকট কোম্পানী বিশেষ উৎসাহ ও সহায়তা প্রাপ্ত হইবেন। আমরা কোম্পানীর সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল কামনা করি।

২১-৮-১৮৮৭

নাটকাভিনয়

গত সোমবার হইতে স্টার থিয়েটার কোম্পানী কর্ত্তৃক অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে. বৃহস্পতিবার ভিন্ন আর পাঁচ দিনই তাহারা অভিনয় উপলক্ষে আপনাদের কৃতিত্ব প্রদর্শন দ্বারা দর্শকবৃন্দকে বিমুগ্ধ করিয়াছেন। কয়দিনই অভিনয় ক্ষেত্রটি লোকে লোকারণ্য। সেই লোকারণ্যটি দিন দিন যেন নিবিড় হইতে নিবিড়তর হইয়া উপচীয়মান উৎসাহের এক-শেষ প্রকটনা করিতেছে। অভিনেতৃগণের কৌশলে অভিনয় বিষয়ের মাহাত্ম্যে কত নীরস প্রাণ দ্রবীভূত হইয়া যেমনি রসের উৎস চারিদিকে প্রবাহিত করিতেছে, অমনি সাগর তরঙ্গের ন্যায় প্রত্যাবর্ত্তন কালে লোকসমূহকে ভাসাইয়া আসিতেছে। সুতরাং দিন দিনই রঙ্গালয়ে জনতা বৃদ্ধি পাইতেছে।

প্রথমত ও তৃতীয় দিনে চৈতন্যলীলা বা নিমাই সন্ন্যাস অভিনীত হইয়াছে, চৈতন্যলীলা বিষয়টি কি অনেক পাঠক জানেন। মহামতি চৈতন্য ভক্তি ও উদারতার মহিমায় কিরূপে ভারতকে মাতাইয়াছিলেন, বাঙ্গালীকে প্রোৎসাহিত করিয়াছিলেন, বিধর্ম্মীর দৌরাত্ম্যে শুষ্ক মানবদেহে রসের ঢেউ খেলাইয়াছিলেন। প্রেমের সুধা ইতস্ততঃ বিকীর্ণ করিয়াছিলেন। পাঠক তাহা শুনিয়াছেন। আমরাও শুনিয়াছিলাম, কিন্তু ঐ দুইদিন তাহার অনেকাংশে আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আসল নয়, কিন্তু নকল দেখাইয়া আমরা প্রাণমন জুড়াইয়াছি; রসে ডগমগ হইয়াছি, ভাবে কান্দিয়াছি, বস্তুতঃই আমরা অনেক চেষ্টা করিয়াও সময় সময় চোখের জল রাখিতে পারি নাই। নিমাইর উদাসীনভাব ব্যঞ্জন অথচ প্রেমের উচ্ছ্বাস দেখিয়া, বালোচিত সরলতা অথচ সুমৃদুল বাগ্মিদগ্ধতা প্রত্যক্ষ করিয়া চমৎকৃত, প্রফুল্লিত ও ভাব গদগদ ন্যা হইয়াছেন, এমন দর্শক বোধ হয় রঙ্গভূমির গর্ভে প্রবেশ কষ্ট স্বীকার করেন নাই। প্রেম গদগদ নিতাইর উদারতার পরকাষ্ঠা দর্শনে স্তম্ভিত ও আশ্চর্য্যান্বিত না হইয়াছেন, সরম [মা] সঙ্গীত মাধুরীতে শরীরকে রসাবিষ্ট না করিয়াছেন; এমন দর্শক আমাদের চোখে পড়েন নাই। চৈতন্যলীলা দর্শনে উপকার বিলক্ষণ আছে। যে হরি নামের মহিমায় চৈতন্যদেব ভারতবাসীকে হরিপ্রেমে মাতাইয়াছিলেন জগাই মাধাইর ন্যায় পাপীজনকে পাপকার্য্যে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন, এ রঙ্গালয় হইতেও যেরূপ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। তাঁহাদের কথা আমরা যেন গাজুরি বলিয়া

বোধ করি। যাহারা অভিনয় ক্ষেত্রে গিয়া অভিনেতৃগণের কার্য্যে হাসেন, কাঁদেন, প্রত্যেক ভাবের পরিচয় দেন. তাঁহাদের পক্ষে ওরূপ কথার মূল্য নাই। অভিনয় জিনিসটি নকল বটে, কিন্তু ভালরূপ অভিনয় হইল তখন তাহাতে নকল বলিয়া বিশ্বাস থাকে না। যদি নকল বলিয়াই বিশ্বাস থাকিত, তবে তদাপি অভিনেতা দুঃখের নকলে চোখে জল পড়িত না, তাহাদের হাস্যোৎপাদক কার্য্যে রঙ্গস্থলে আছুরিতকময় হইত না, কোন রসেই কোন দর্শকের ভাবান্তর জন্মাইতে পারিত না। কিন্তু চিরকাল প্রত্যক্ষ হইয়া আসিতেছে, চিরকালই রঙ্গালয়ের নবরসে লোকে মজিয়া থাকে তৎকারে কাহারও তাহা তত নকল বলিয়া বিশ্বাস থাকে না। যদি এখন কেহ এই প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করেন। তবে তাহাকে ভ্রান্ত অথবা জন্মান্ধ অভিধানে অভিহিত না করিয়া পারি না।

চৈতন্যলীলা দর্শকের পাপকার্য্যে ঘৃণা ও হরিপ্রেমে মত্ততা জন্মে, ইহা প্রত্যক্ষ কথা, যাহারা রঙ্গস্থলে সেইমাত্র হরি প্রেমাদিত বিফল হইয়া আসিলেন; তাহারা রঙ্গালয়ের বাহিরে আসিয়া কিছু সে হরিপ্রেম বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। বিষয়ের উপকারিতা একবার হৃদয়ে লাভ করিলে, সহসা তাহাকে মুছিয়া ফেলান যায়ত্ত না। একবার যাহার উপকারিতা নির্ণয় হইয়াছে, যে পর্য্যন্ত তাহারা অপকারিতা প্রত্যক্ষ না হয়; ততকাল সে উপকারিতা বিস্মৃত হওয়া যায় না। অপকার সম্বন্ধেও এরূপ কথা। যাহারা সে উপকার স্মৃতি মুছিয়া ফেলে, বা মুছিযা ফেলিতে চায়, তাহাদেব মনুষ্যত্বের কোন স্বার্থকথা থাকে না। বড় দুঃখের বিষয় এই যে, কতিপয় ধর্ম্মধ্বজী এই মহৎকার্য্যের বিরুদ্ধাচরণ করাতে আমাদিগকে এ কয়টি কথা বলিতে হইল।

দ্বিতীয় দিনে নলদময়ন্তী, চতুর্থ দিনে ধ্রুবচরিত্র[২৩] নাটক ও ঝকমারীর মাশুল প্রহসন, পঞ্চম দিনে সীতাব বনবাস নাটক[২৪] ও বিবাহ বিভ্রাট প্রহসন এই কয়েকটির অভিনয় হইয়াছে। ইহার প্রত্যেকটিতেই আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। কয়টিতেই শিখিবার বিষয় প্রচুর আছে। নলদময়ন্তীতে নব্যগণের শিখিবার বিষয় অল্প থাকিলেও দুরদর্শীগণ বিলক্ষণ শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারেন। ধ্রুব চরিত্রে আর চৈতন্যলীলায় লোক শিক্ষার পার্থক্য বেশি নাই। উভয়ই মহান, উভয়ই পবিত্র, উভয়ই হৃদয়স্থল সংস্পর্শী কিন্তু ধ্রুব চরিত্রে অভিনয়ে কয়েকটি ত্রুটিও হইয়াছে। ঝকমারীর মাশুল খানির অভিনয়ে রঙ্গস্থল আচ্ছারাতকময় হইয়াছিল। বিবাহ বিভ্রাটের কথা অধিক বলিব কি, উদ্ধত যুবকদিগের পক্ষে এই একখানি পরম ঔষধ। সীতার বনবাসও ভালরূপ অভিনয় হইয়াছিল।

যে শিক্ষার কথা বলিলাম, তাহা নাটকের পক্ষে বেশি ভাগ। নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য আমোদ করা। সে আমোদ সবখানিতেই যথেষ্ট আছে। অভিনেতাদিগের গুণে একখানি কদর্য্য নাটকেও যথেষ্ট আমোদ হইতে পারে। স্টার থিয়েটার বঙ্গীয় নাট্য সমাজের অগ্রণী। ইহার পক্ষে তৎসম্বন্ধে অধিক কিছু বলা বাহুল্য। আমরা অভিনয়ের যথেষ্ট প্রশংসা করি, কিন্তু অভিনেয় নাটকগুলির একটি গুরুতর দোষ উল্লেখ না করিয়া পারি না। পরস্পর কথাবার্ত্তার মধ্যে ছন্দবদ্ধ থাকা নিতান্ত অস্বাভাবিক। নাটক-লোক চরিত্রের নকল কিছু নহে। লোকে যে ভাবে যাহা করে, তাহাই যথাযথরূপে নকল করা নাটকের

প্রধান কার্য্য। শকুন্তলাদি প্রথম শ্রেণীর নাটকে স্বাভাবিক কথাবার্তার অনুরোধ রাক্ষসী ভাষা পর্য্যন্ত প্রযুক্ত হইয়াছে। যেভাবে কথা ব্যবহার করে তাহার সুখে সেই ভাবের কথা প্রযুক্ত করাই [বিধেয়] নাটক গুলিতে সেই স্বাভাবিক ও নীতিসঙ্গত বিষয়ের ব্যভিচার দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছি।

২৮-৮-১৮৮৭

সংবাদ

গত সোমবার কতিপয় স্কুলের বালক মিলিয়া নর্থব্রুক হলে এক সভা করিয়াছিল। সভার উদ্দেশ্য কলিকাতা হইতে সমাগত স্টার থিয়েটারের অভিনয় কোন স্কুলের বালক না দেখে। ছাত্রদিগের পক্ষে তামাসা দেখিয়া বেড়ান, আমরাও বড় উচিত বোধ করি না, কিন্তু যে কারণ ধরিয়া স্টার থিয়েটার দর্শনে প্রতিরোধ করা হইয়াছে, সে কারণটি বড় সঙ্গত বোধ হয় না। অভিনয় ক্ষেত্রে পুরুষাদি রূপে বিকৃত বারাঙ্গনাগণকে ২/৩ দেখিলেই যাহার দুষ্প্রবৃত্তি হয়, তাহাদিগকে আমরা অসার মনে করি। স্ত্রীলোক মানেই তাহাদের পক্ষে অদ্রষ্টব্য। আরও কথা এই যে, এই সহরে বালকগণের বাইখেমটার নাচ দেখিয়া বেড়ানের সময় কথা হয় না, আর কলিকাতা হইতে থিয়েটার আসিলেই এত আড়ম্বব [র] করা, নিতান্ত দৃষ্টিকটু বোধ হয়। ইহার মধ্যে ব্রাহ্ম ভায়াদের কোনরূপ সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে হইতেছে। যেখানে উদ্ধত বালকের চরিত্র শোধন সম্ভব না, সেখানেই ভায়াদের টনক পড়ে।

২৮-০৮-১৮৮৭

সংবাদ

শ্রাদ্ধ অনেকদূর গড়াইল। স্টার থিয়েটার কোম্পানী ঢাকা আইসার পরেই অত্যত্র ছাত্রগণ কতিপয় ব্রাহ্মভায়ার সহায়তায় একটি সভা করিয়া যে সকল থিয়েটারাদি দর্শনে রীতিনীতি কলুষিত হয়, তাহা দেখিতে বিরত থাকিবার প্রস্তাব করেন [।] ছাত্রাবস্থায় কোন প্রকার আমোদ-প্রমোদ করা কি দেখাই আমরা উচিত বোধ করি না। ছাত্রগণ যদি বাইখেমটার নাচ দেখিয়া, অবৈধস্থলে গতিবিধি ছাড়িয়া, কি কোন প্রকার আমোদ-প্রমোদ ও বিলাসে না মজিয়া থাকিত, তবে আমরা আহলাদের পরাকাষ্ঠা দেখাইতাম, উক্ত সভা দ্বারা ও যদি এই সময় মধ্যে উহার কোন একটি হইত তবেও সভাকে আমরা ধন্যবাদ দিতাম। কিন্তু তাহার কিছুই হয় নাই, কেবল ব্রহ্ম ভায়াদের চক্ষুশূল স্টার থিয়েটার কোম্পানীর বিরুদ্ধে যথাবিহিত চেষ্টা হইয়াছে। শুনা যায়, ব্রাহ্ম সমাজ ও জগন্নাথ কলেজের দিক হইতে প্রত্যহ রঙ্গভূমিতে ডিল ছোড়া হয়। গত বুধবার রাত্রি ১১/১২ টার সময় ঐরূপ ঢিল ছোড়াতে থিয়েটার কোম্পানীর পক্ষীয় কতিপয় স্থানীয় মুসলমান নাকি দুইটি স্কুলের ছাত্রকে প্রহার করিয়াছে এবং পুলিশ ঐ মুসলমানগণের সহায়তা করিয়াছে, এই ছাত্রদ্বয় থিয়েটার কোম্পানী ও পুলিশের বিরুদ্ধে ফৌজদারীতে নালিস করিয়াছে। ছাত্রদ্বয় যদি নির্দ্দোষী হয় এবং মুসলমানগণ পুলিশের সহায়তায় তাহাদিগকে মারিয়া থাকে, তবে বিচারে দোষী শাস্তি হওয়াই উচিত। বিচারের ফলাফল, দেখিবার জন্য এখানেই সকলের [ছেঁড়া] উচিত ছিল, কিন্তু দেখিয়া দুঃখিত হইলাম [ছেঁড়া] জুবিলী

স্কুলের মাস্টার প্রসিদ্ধ ডনগীর বাবু পরেশ নাথ ঘোষ ও বাবু প্রসন্নকুমার গুহকে গ্রেপ্তার করিয়া গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে স্পেশিয়াল কনস্টেবল করা হইয়াছে। তাঁহাদের এই বিড়ম্বনা দেখিযা আমরা নিতান্ত দুঃখিত ও মর্ম্মাহত হইয়াছি। পরেশবাবু ও প্রসন্ন বাবু স্পেশিয়াল কনস্টেবল না হন, এজন্য শ্রীযুক্ত জজ সাহেবের নিকট মোশান করা হইয়াছে, আমরা সুবিচার দেখিতে উৎসুক রহিলাম। ঐ ঘটনা উপলক্ষে জগন্নাথ কলেজের প্রিন্সিপাল বাবু কুঞ্জলাল নাগ মহাশয়ের প্রতিও দোষারোপ হওয়ার আশঙ্কায় কুঞ্জবাবু তাঁহার কলেজ ৭টার পরে কেহ না যায়, এজন্য বিজ্ঞাপন দিয়াছেন।

৪-৯-১৮৮৭

সংবাদ

ঢাকার গণ্যমান্য সমস্ত সভ্রান্ত ব্যক্তি থিয়েটার দেখিতে যাইতেন। কতিপয় স্বার্থপর ব্যক্তি আপনাদের দলপুষ্টি ও ছাত্রগণ মধ্যে আধিপত্য বিস্তার জন্যে সব [র] ল বালকদিগকে হুজুগে মাতাইয়াছে ইহা জানিতে পারিয়াই সেই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ ছাত্রদিগের কোনরূপ সহায়তা করেন নাই। কতিপয় ছাত্র রাত্রি ১১/১২ টার সময় জগন্নাথ কলেজ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া থিয়েটার দর্শনার্থী ভদ্রলোকদিগের উপর প্রায়শঃ ঢিল ছুড়িত, তাহাদের দুইজনকে ধরিয়া প্রহার করাতে যে সমগ্র ছাত্রের অপমান হয়, সমগ্র ঢাকাবাসীর নাক কাটা যায়; এ জ্ঞান দুই একটি ঘোর স্বার্থপর ব্যক্তি ভিন্ন আর কোন বুদ্ধিমান ভদ্রলোকের হয় নাই। বলা বাহুল্য যে, স্বার্থপর ব্যক্তিগণের প্রবর্ত্তনায় সরল ও তরল মতি বালকগণ উহাকেই যে [ঘো] রতর অপমান জ্ঞান করিয়াছে সেই স্বার্থপর ব্যক্তিগণ এই সুযোগে বালকগণকে কিরূপ সর্ব্বনাশের পথে দাঁড় করাইতেছে তাহা ক্রমে প্রদর্শিত হইবে।

যে হউক, সুখের বিষয় যে, কতিপয় দেশহিতৈষী মুখপাতে সজ্জিত প্রচ্ছন্ন স্বার্থপর এইবার ভদ্রগণ সমক্ষে ধরা পড়িয়াছে। আজ তাহার [রা]এক যোগে পাঁচ হাজার বালককে হাত করিবার জন্য ঢাকার সমগ্র সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে ম[মূ]র্খ নির্ব্বোধ স্বার্থপর, বেশ্যাসক্ত প্রভৃতিরূপে পৃথিবীতে প্রতিপন্ন হইলেন, এখনও পৃথিবীতে তাঁহাদের নামে জয় জয় ডঙ্কা বাজিতেছে না? ধিক্ ধিক্ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ! আপনারা এখনও পোলার মুতে আছাড় খাইতেছেন না? আর সেই দেশহিতৈষী বিদ্বান, সুবোধ, পরার্থপ্রাণ ও অরুচবেশ্যা প্রভৃতির যশোগীতি গাইতেছেন!!

১৮-৯-১৮৮৭

সংবাদ

স্টার থিয়েটার কোম্পানী ঢাকা ছাড়িয়া গিয়াছেন। এখন ছাত্রদিগকে একটি কথা বলায় ক্ষতির কোন সম্ভাবনা নাই। আমরা ছাত্রদিগকে থিয়েটার দর্শন বা কোন প্রকার আমোদে যোগ দিতেই বরাবর নিষেধ করিয়াছি। তাহার উদ্দেশ্য এই যে, ছাত্রাবস্থায় আমোদ-আহলাদে মজিলে শিক্ষার ব্যাঘাতের সঙ্গে অর্থ ক্ষতি হয়, বাল্যকালে আমোদ-প্রমোদে মত্ত হইলে চিরদিনের জন্য তাহাতে অনেক লিপ্ত হইতে হয়। আমরা সেই আশঙ্কাতে সকল প্রকার আমোদ দেখিতে বালকগণকে নিষেধ করি। কিন্তু স্ত্রীলোকের থিয়েটার দেখিলেই যে ভাবী চরিত্র দোষ হইয়া পড়ে, এ নিতান্ত অসত্য কথা। কেবল আমরা এ

কথা বলি না। চিবকাল সকলে একথা বলিতেছে। যেমন আমাদেব আদর্শ কালীদাস ভবভূত প্রভৃতির সময় হইতে আমরা নটনটীর থিয়েটার দেখিয়া আসিতেছি; তেমন নব্যগণের আদর্শ ইউরোপীয়গণও নটনটির থিয়েটার দেখিয়া থাকেন। এমনকি স্টার থিয়েটারও অত্রত্য ইংরেজ ও দেশীয় শিক্ষক ও হাকিম প্রভৃতি কুতূহলের সহিত দেখিয়াছেন। ছাত্রদিগের কথাইবা বলিব কি? হিন্দু, মুসলমান, ইংরাজ প্রভৃতি শতমন্ত্রী পরিবৃত ঢাকার নবাব পর্য্যন্ত তাহার ছাত্রাবস্থা পুত্রকে থিয়েটার দেখিতে দিয়াছেন। ছাত্রগণ কি বলিবে, এ সকলই নির্ব্বোধ; আব মায়ের কোল ছাড়িয়াই সকলে বালক সুবোধ হইয়াছে। বলি ইহাতে কি ভয়ানক ধৃষ্টামি প্রকাশ পায় না? আর যাহারা এই ধৃষ্টামির প্রশ্রয় দেয় তাহাদের কি ঘোরতর স্বার্থপরতা ও নিব্বুদ্ধিতা প্রকাশ হয় না।

১৮-৯-১৮৭৭

সংবাদ

ঢাকাস্থ শিক্ষিত ও শিক্ষানুরাগী ভদ্রসমাজের নিকট বিনীত নিবেদন। বাঙ্গালা সাহিত্য সমাজে সুপরিচিত, সুপ্রসিদ্ধ কবি এবং ইদানীন্তন নাট্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ রায় স্বপ্রণীত প্রহলাদ চরিত্র প্রভৃতি ভক্তি রসপরিপূর্ণ, অভিনয় ও যারপরনাই উপাদেয় কতিপয় নাটকের অভিনয় প্রদর্শনের জন্য ঢাকায় সমাগত হইয়াছেন। যাঁহারা বাঙ্গলা সাহিত্যে অনুরাগী এবং ভক্তি অথবা ভাব বৈচিত্র্যের পক্ষপাতী আমরা ভরসা করি, সেই সমুদয় উদার চরিত, সহৃদয় ব্যক্তিরা ঢাকায় রাজকৃষ্ণ বাবুর সম্মান করিয়া সজাতীয় কবিও কাব্যের সম্মান করিবেন।

ঢাকা বান্ধব কার্য্যালয় — একান্ত বশংবদ
১২৯৪। ১২ই চৈত্র — শ্রী কালীপ্রসন্ন ঘোষ

২৫-৩-১৮৮৮

সংবাদ

কবির শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায়[২৫] তাহার বীণা থিয়েটার কোং সহ ঢাকায় আসিয়া গতকল্য রাত্রে তাঁহার প্রহলাদ চরিত্র নাটকের অভিনয় করিয়াছেন। কবি নিজে নিজের অভিপ্রায় অভিনয় করিলে তাহা যেরূপ সর্ব্বাঙ্গ প[স]ম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রাজকৃষ্ণ বাবু দ্বারা তাহা হইতেছে। কলিকাতার সকল সম্প্রদায়ের লোক ও সংবাদপত্রগণ এক বাক্যে তাঁহার অভিনয়ের ভূয়সী প্রশংসা করিতেছেন। আমরা প্রথম রাত্রে অভিনয় দর্শনে যদিও তাঁহাকে চূড়ান্ত সার্টিফিকেট দিতে পারিতেছি না, কিন্তু তাহাতেই বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছি। এবার আমরা অভিনয়ংশের কোন সমালোচনা করিতেছি না, তবে বঙ্গীয় সাহিত্য জগতে পূজ্য শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ[২৬] মহাশয়ের প্রচারিত একখানি আবেদনপত্র নিম্নে প্রকাশ করিয়া তাহার সহিতই আমাদের এবারের বক্তব্য শেষ করিতেছি।

২৫-৩-১৮৮৮

সংবাদ

বীণা নাট্য সম্প্রদায় আসিয়া অভিনয় আরম্ভ করিয়াছেন, ইহা পূর্ব্বেই পাঠককে জানাইয়াছি। অভিনয় সর্ব্বাংশে উত্তম হইতেছে। রাজকৃষ্ণ বাবুর যে প্রহলাদ চরিত্র

নাটকের অভিনয় তত করিয়া কলিকাতার বেঙ্গল থিয়েটার তেমন যশস্বী হইয়াছেন, এ ক্ষেত্রে বাজকৃষ্ণ বাবু স্বযং সেই নাটকের অভিনেতা। কবি আপনার মনের ভাব আপনি প্রকাশ কবিতেছেন; অভিনয়ে যতদূর সৌষ্ঠব হওয়া উচিত, তাহা হইতেছে।

আমরা শুনিযাছি, প্রথম রাত্রির অভিনয় [ছেঁড়া] হইয়াছিল না। কলিকাতা হইতে আসিবার পরদিনই অভিনয় করাটা আমরা প্রথম হইতেই ভাল বোধ করি নাই। নূতন স্থানে সেই পরিশ্রান্ত লোকদিগকে আনিয়া থিয়েটার গৃহের সাজ সজ্জার ক্রটি বহুল বর্ত্তমানেও অভিনয় জন্য দাঁড় করান প্রকৃতই ক্রটিজনক হইয়াছিল; কিন্তু তারপর কযদিন আমরা নিজে অভিনয় প্রত্যক্ষ করিয়া বাবুর দুর্গেশনন্দিনী নাটকের অভিনয় হইয়াছে। সবগুলির অভিনয়ই অতীব প্রশংসার সহিত করা হইয়া থাকে। কিন্তু ছিন ও ষ্টেজের দোষে সৌন্দর্য্যের ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। অত্যত্র নাটক গৃহটির পরিসর কম বলিয়া বড় বড় ছিনগুলি খাটান যায় না, আমরা এ অভাব অনেকদিন হইতে অনুভব করিতেছি। এবার রাজকৃষ্ণ বাবু একটি কাজ কবিয়া ভদ্র পরিবারের বিশেষ ধন্যবাদ ও আশীর্ব্বাদ লাভ করিতেছেন। পূর্ব্ববঙ্গ রঙ্গভূমিতে পূর্ব্বে ভদ্র পরিবারের দেখিবার উপযুক্ত স্থান ছিল না, রাজকৃষ্ণ বাবুর জন্য সে অভাব দূর হইল। এখন অসূর্য্যম্পস্যা ভদ্রমহিলাগণও অবাধে নাট্যামোদ উপভোগ করিতে সমর্থা হইতেছেন। শুক্রবার ভিন্ন প্রতি রাত্রেই অভিনয় কার্য্য চলিতেছে। আমরা ভরসা করি, রাজকৃষ্ণ বাবুর এই মনোহর চিত্তোৎকর্ষ সাধক নাট্যামোদ উপভোগ করিয়া, সকলে কষ্টময় সংসারের জ্বালা কতকাংশে উপশম করিয়া লইবেন।

৮-৪-১৮৮৮

সংবাদ

বিণা [বীণা] থিয়েটার কোম্পানি ঢাকা হইতে বিদায় হইয়া মুক্তগাছার জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাদাস আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়ের কন্যার বিবাহোপলক্ষে তথায় গিয়াছিলেন। সেখানে পূর্ব্বে দুই রাত্রি অভিনয়ের বন্দোবস্ত হয়; কিন্তু অভিনয় দেখিয়া দুর্গাদাস বাবু এরূপ পরিতুষ্ট হন যে, আরও দুই রাত্রি অভিনয় করাইয়াছিলেন। চুক্তির টাকা ব্যতীত অভীনয়কারীদিগের পুরস্কার স্বরূপ মূল্যবান বস্ত্রাদিও প্রদান করিয়াছেন। আমরা ঐ কার্য্যে দাতা ও গৃহীতা উভয় পক্ষেরই গুণ গৌরবের পরিচয় পাইয়া পরিতুষ্ট হইয়াছি।

২৯-৪-১৮৮৮

সংবাদ

নবাবপুরে পূর্ব্বে কয়বার নাটকাভিনয় হইয়াছে, তাহাতে কাহারও নিকট অর্থ গ্রহণ করা হয় নাই, কিন্তু এরূপ সদাব্রত চলা কঠিন। তাই এবার রীতিমত অর্থ গ্রহণ করা হয় নাই, কিন্তু এরূপ সদাব্রত চলা কঠিন। তাই এবার রীতি মত অর্থ গ্রহণ করিয়া অভিনয় প্রদর্শন হইতেছে। গত বুধ ও শনিবার বিল্বমঙ্গল ঠাকুর[১১] অভিনীত হইয়াছে। আমরা আগামীতে অভিনয়ের সমালোচনা করিতে ইচ্ছা রাখি। অভিনেতৃগণ ঐ আমোদটি স্থায়ী করিতে পারিলে আমরা সুখী হইব। এই কার্য্যে সাধারণের উৎসাহ দান একান্ত আবশ্যকীয়।

২২-৭-১৮৮৮

সংবাদ

গতবার দুর্গামণি খেমটাওয়ালীর প্রতি অত্যাচারের কথা উল্লেখ করিয়াছি; শুনিলাম ঐ কার্য্যের প্রধান নায়ক কীর্তিমান জগন্নাথ ওরফে জুবিলী স্কুলেরই একটি ছাত্র। দুর্গামণি হষ্টিটালে আছে; তাহার তত্ত্বাবার্ত্তা লইবার জন্য ছাত্র মহাশয়ে মাঝে মাঝে হাসপাতালে গিয়া থাকেন। উপযুক্ত স্কুলের উপযুক্ত ছাত্র বটে, কিন্তু বলিতে দুঃখ হয়, এই ছাত্রগণ দ্বারাই সেই ষ্টার থিয়েটার দর্শন বিরোধী সভার সৃষ্টি।

২৯-৭-১৮৮৮

সংবাদ

ঢাকা নবাবপুর 'ইলিশিয়াম থিয়েটার' নামক নট সম্প্রদায়ের ক্রিয়া প্রতি বুধবার ও শনিবার রাত্রিতে হইতেছে। তাহাদের নবরচিত 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' নামক নাটকখানি এ পর্য্যন্ত অভিনীত হইয়া আসিতেছে। আমরা এই নাটক ও ইহার অভিনয় প্রণালী দেখিয়া অতীব সুখলাভ করিয়াছি।

বিল্বমঙ্গল ঠাকুর নামক একখানি নাটক স্টার থিয়েটারে[২৮] অভিনীত হইয়া থাকে, এখানি তাহা হইতে স্বতন্ত্র। দুইখানিরই নায়ক বিল্বমঙ্গল ঠাকুর, নায়িকা চিন্তামনি; বিষয় ঘোর ইন্দ্রিয়াশক্তি হইতে গভীর ভগবৎ প্রেম, ও ভগবানের দর্শন লাভ। এই কয়টি বিষয়েও লোক বিশ্রুতির সঙ্গে উভয় নাটকেরই সামঞ্জস্য আছে, কিন্তু অবান্তর কথায় পরস্পর পরস্পরে বিস্তর প্রভেদ। স্টার থিয়েটারের বিল্বমঙ্গল ঠাকুর নায়ক নায়িকার চিত্রটি অধিকতর রূপে ফলান হইয়াছে, তৎসঙ্গে পাগলিনী, ধর্ম্মধ্বজী প্রভৃতির চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, লোক চরিত্রের সঙ্গে হাস্য ও বিস্ময় রসের অনেকটা অবতারণা করা হইয়াছে; আর ইলিশিয়ান থিয়েটারে অভিনীত বিল্বমঙ্গল ঠাকুরে মাতৃস্নেহও প্রণয়িনীর পতিপ্রাণতা সুন্দর রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে; যোগী সোমগিরির চিত্রও সুন্দররূপে অঙ্গিত হইয়াছে, ইহাতে করুণ রসের অধিক মাত্রা প্রযুক্ত ইহয়াছে। স্টার থিয়েটারের বিল্বমঙ্গল ঠাকুরে করুণ রসটিকে যে অস্বাভাবিক রূপে চাপিয়া রাখা হইয়াছিল, এখানে তাহার উৎস প্রবাহিত করা হইয়াছে। এখানকার অভিনয় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইতেছে, নূতন নূতন এক আধটুটু ক্রুটি হওয়া বিচিত্র নহে, কিন্তু অভিনেতৃগণ যেরূপ সাবধানতা অভ্যস্ত করিতেছেন, তাহাতে আমরা তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ না দিয়া পারি না। এখানে সর্ব্বাপেক্ষা বাহার দৃশ্যপট। এরূপ ছিনের সৌন্দর্য্য কোন থিয়েটার হইতেই পরিলক্ষিত হয় না।

৫-৮-১৮৮৮

সংবাদ

বীণা থিয়েটার ভাঙ্গিয়া দলস্থ লোকেরা আনন্দ নাট্য সমাজ নাম দিয়া যে নূতন দল সংগঠন করিয়াছেন, তাহা বীণার অধ্যক্ষ রাজকৃষ্ণ বাবুর পত্রেই আমরা যথাসময়ে প্রকাশ করিয়াছি। ঐ সংগঠিত সম্প্রদায় ইতিমধ্যে ঢাকায় আসিয়া কয়েকদিন অভিনয় করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে সুসার করিতে না পারিয়া কয়েকটি বারাঙ্গনা আনিয়া ফেলিলেন। যদি প্রথম হইতে বারাঙ্গনার দল হইত, তবে কোন দোষের কথা ছিল না,

কিন্তু বারাঙ্গনার নামে ঢাকাবাসীকে ভুলাইবার এই নূতন চেষ্টা দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম।

১৬-৯-১৮৮৮

সংবাদ

গত ৪ঠা আশ্বিন বুধবার কলিকাতা হইতে আগত বেশ্যা সংশ্লিষ্ট আনন্দ নাট্য সমাজের বিরুদ্ধে বেপটিষ্ট মিস্‌ন চার্চ্চ ময়দানে একটী সভা হয়, জগন্নাথ কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল নাগ এম, এ, ঢাকা কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত ন্যায়ালঙ্কার প্রভৃতি অনেক গণ্যমান্য লোকও উপস্থিত থাকিয়া বক্তৃতা প্রদান করেন। আরও ২/৩ বার এরূপ বক্তৃতা শুনিয়াছি। এরূপ সাময়িক হুজগের আমরা পক্ষপাতী নহি। যদিও আনন্দ নাট্য সমাজ কর্ত্তৃক বেশ্যাপ্রিয় লোকসমূহ আকর্ষণের নূতনতর ফন্দী দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি, তথাপি ইহা লইয়া ছাত্রদিগের আন্দোলন ভাল দেখায় না।

২৩-৯-১৮৮৮

সংবাদ

ঢাকায় আর একটী নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, দক্ষিণ মৈশুণ্ডীতে তথাকার শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন সাহা ও মণিমোহন সাহার উদ্যোগ ও অর্থব্যয়ে 'সনাতন নাট্যসমাজ' নামে ঐ নাট্যশালা গঠিত হইয়াছে। সম্প্রতি তথায় প্রহলাদ চরিত্র নামক একখানি নাটক বিরচিত হইয়া অভিনয় হইতেছে। আমরা ইতিমধ্যে ঐ অভিনয় দর্শন করিয়াছি। নবাব-পু প [র] থিয়েটার কোম্পানী অভিনয় দেখাইয়া আমাদিগকে যতদূর আহলাদিত করিয়াছিলেন, এই অভিনয় দর্শনে তদ্রূপ বা ততোধিক আহলাদিত হইয়াছি। কবিবর রাজকৃষ্ণ রায়ের প্রহলাদ চরিত্র দর্শনে আমরা যেরূপ সন্তুষ্ট হইয়া ছিলাম এতদ্দর্শনে তদপেক্ষা বিশেষ সন্তুষ্টি ও পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছি। যদিও ইহার দ্বিতীয় অঙ্কের চতুর্থ গর্ভাঙ্ক হইতে চতুর্থ অঙ্কের চতুর্থ গর্ভাঙ্ক পর্য্যন্ত রাজকৃষ্ণ বাবুর আদর্শ ধরিয়া প্রণীত হইয়াছে, তথাপি ইহা অভিনয়ের গুণে আদর্শকেও অতিক্রম করিয়াছে। হইলেও আমরা এরূপ অনুকৃতির তত প্রশংসা করি না। কিন্তু প্রথম ভাগে প্রস্তাবনা হইতে দ্বিতীয়াঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্গ পর্য্যন্ত এত সুন্দর ও বিচিত্র ভাবব্যঞ্জক হইয়াছে, যাহা দেখিয়া আমরা নাটককার ও অভিনেতাদের বিশেষরূপে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। সিন অভিনেতৃবর্গের সাজ সজ্জা ও রঙ্গমঞ্চ খুব সুন্দর হইয়াছে। বরাহের সাজটী ভাল হয় নাই। বাদক সম্প্রদায়ও উপযুক্ত গুণসম্পন্ন নহেন। অভিনেতাদের অধিকেই উপযুক্ত, বিশেষত যে বালকটী প্রহলাদ সাজিয়াছিল, সে রূপেগুণে বিশেষ প্রশংসার্হ।

৬-১-১৮৮৯

সংবাদ

ঢাকায় আর একটী থিয়েটার কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। অত্রত্য সুবর্ণ বণিক সম্প্রদায় —যাঁহাদের আদি নিবাস পশ্চিমবঙ্গে এবং এখনও তাঁহারা পশ্চিমবঙ্গের কথা-বার্ত্তাই ব্যবহার করেন, তাহাদের দ্বারাই উহা সম্পাদিত হইতেছে। ইহাদের মধ্যে অনেকেই শিক্ষিত ও পদস্থ ব্যক্তি। ইহারা পূর্ব্ববঙ্গ রঙ্গভূমিতে দক্ষযজ্ঞ নাটকাভিনয়

দেখাইতেছেন। গত বৃহস্পতিবার আমরা তাঁহাদের অভিনয় দেখিয়াছি। যদি প্রথম প্রথম কিছু ত্রুটি পরিলক্ষিত হওয়া অসম্ভব নহে, তথাপি আমরা তদ্দর্শনে সুখী হইয়াছে। সাজ ছিন [সীন] ও একতান [ঐকতান] বাদ্য খুব সুন্দর হইয়াছে। সঙ্গীতকারী আর একটু সুকণ্ঠ হওয়া উচিত।

১১-৮-১৮৮৯

সংবাদ

অত্রত্য সুবর্ণ বণিক সম্প্রদায়ের অলিম্পিয়ান থিয়েটারে দক্ষযজ্ঞ নাটক সুন্দর রূপ অভিনীত হইতেছে। প্রতি বুধ ও শনিবারে অভিনয় হইয়া থাকে।

২৫-৮-১৮৮৯

সংবাদ

ঢাকায় স্থায়ীরূপে আমোদ আহলাদের কোন বন্দোবস্ত ছিল না; কিন্তু কতকদিন হইতে নবাবপুরে অত্রত্য জজকোর্টের পেস্কার বাবু কৃষ্ণ কিশোর বসাকের ঐকান্তিক যত্নে একটি নাট্য সমাজ গঠিত হইয়া সাধারণকে নাট্যাভিনয় প্রদর্শিত হইতেছে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে ইঁহারা বিনামূল্যে ভদ্রলোকদিগকে অভিনয় দেখাইতেন, কিন্তু তাহাতে সাধারণের ইচ্ছানুসারে দেখা ঘটিত না। এখন রীতিমত টিকেটের মূল্য গ্রহণ করাতে যার যে দিন সুবিধা সে দিন সে দেখিতে পারিতেছে। এবার প্রভাস মিলন[২১] নামক রাধাকৃষ্ণের লীলা বিষয়ক নববিরচিত একখানি নাটকের অভিনয় হইতেছে। সেদিন অভিনয় দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। ইহার সাজসজ্জা ও দৃশ্যপটের পারিপাট্য অতীব মনোহর; অভিনেতারাও সুললিত কণ্ঠ ও সুনিপন [সুনিপুণ] তবে প্রথমবার তাহাদের যে কিছু কিছু ত্রুটি পরিক্ষত হইয়াছিল, তাহা অল্পকালেই সুধরিয়া যাইবার সম্ভাবনা। আমরা আশা করি এই নাট্য সমাজ যাহাতে সমুৎসাহসহকারে স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে, তৎপক্ষে যথোচিত প্রযত্ন হইবে।

১৭-৫-১৮৯১

সংবাদ

গত পরশু অত্রত্য ক্রাউন থিয়েটার রঙ্গভূমতে মনিপুরী স্ত্রীলোকদিগের রাম লীলার অভিনয় দেখিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছি। মনিপুর অসভ্য দেশ বলিয়া অনেকের ধারণা, কিন্তু অত্রত্য স্ত্রীলোকগণ কর্তৃক যে এরূপ তানলয় হাবভাবাদি সম্বলিত অভিনয় হইতে পারে, ইহা পূর্ব্ব সংস্কারের বিশেষ বিরোধী। প্রথম ২ বারের দৃশ্য সুন্দর হইলেও গান শুনিয়া এদেশের রুচিতে হরিভক্তি চট্ কয়া যায়; কিন্তু পরবর্ত্তী কয়েকবারের দৃশ্যে গানও এমন মনোহর হইয়াছিল যে, অত্রত্য উচ্চ শ্রেণীর ২/১টি বাই ভিন্ন গান ব্যবসায়ী অপর কোন স্ত্রীলোকের নিকটে তদ্রূপ তানলয় হাবভাবাদি সম্বলিত সঙ্গীত শ্রুত হয় না। চারিটি স্ত্রীলোকের পক্ষে সময় কণ্ঠে চৌতাল প্রভৃতি কঠিন কঠিন তালে গান ও [অস্পষ্ট] করা সহজ কাজ নহে। কৃষ্ণরূপী অনধিক দশ বর্ষীয় একটি বালক যেরূপ অভিনয় চাতুর্য্য প্রদর্শন করিয়াছে তাহা বঙ্গের বড় বড় অভিনেতাদিগের নিকটেও প্রশংসনীয়।

স্বভাবতঃ মনপুরবাসিনীদিগের ভাষা বাঙ্গালাদিগের বুঝিবার অযোগ্য; কিন্তু ঐ

অভিনেত্রীগণ অনেক স্থলে বাঙ্গালা ও সুমধুব ব্রজ বুলিতে কথোপকথন ও গান করিয়া থাকে। কথোপকথন অপেক্ষা গানই অধিক। গানেব কোন কোন অংশ পাহাড়ে রুচির অনুসারী হওয়ায় আমাদেব রুচিতে একটু কেমন কেমন বোধহয় কিন্তু ধ্রুপদ প্রভৃতি অনেকগুলি গানই এদেশীয় ওস্তাদি ধরনের ইহাদেব সাজ সজ্জ [া] অতি পরিপা [পা]টী। অভিনেত্রী রমণীদিগের বয়স বার বৎসরের কম নহে, কিন্তু উনিশ বৎসরেরও নাকি অধিক নহে। এক যোগে সুসজ্জিত অবস্থায় রাখাল বেশ ধায়ি [রি] নী বারটি যুবত [ী]কে ও কৃষ্ণ বলরাম বেশাধারী ৯/১০ বর্ষীয় দুইটি বালককে নৃত্যগীতাদি করিতে দেখিয়া বস্তুতই অতীব আনন্দ উপস্থিত হয়। নাগা বীরপুরুষদিগের যুদ্ধ এবং ঠিক মনিপুরী রমণীর বেশে মুনিপুরী লীলাতে সংগীত ল্যাসাদিও নূতন দৃশ্য। ইহাদের প্রধান দোষ সাজ সজ্জায় অধিক সময় অতিবাহিত করা এবং ঘন ঘন পট পরিবর্ত্তন করা। আশ্য করি, এ বিষয়ে একটু সুব্যবস্থা হইবে।

ঐ নাট্য সম্প্রদায় প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন দ্বারা জানাইয়াছেন যে, ঐ সকল অভিনেত্রী রমণী মনিপুর রাজ বংশীয়া। মনিপুরের সুরচন্দ্র সিংহের তত্ত্বাধানে এই নাট্য সম্প্রদায় গঠিত হইয়া পূর্ব্বে রাজ সংসারেই অভিনয় করিত; কিন্তু এখন আর সে মহারাজ [দি] গের আধিপত্য নাই, রাজকুল যে সামান্য বৃত্তি প্রাপ্ত হয়, তদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ হওয়া কঠিন। এ দিকে জি, সি, গাঙ্গুলী নামক বিক্রমপুরবাসী একটি মনিপুর প্রবাসী ভদ্রলোক ব্যায়ভার বহন পূর্ব্বক ইহাদিগকে কলিকাতা ও ঢাকায় অভিনয় জন্য আনিয়াছেন কলিকাতায় বড়লাট পত্নী প্রভৃতি অনেকেই ইহাদের অভিনয় দেখিয়াছেন।

২-৪-১৮৯৩

সংবাদ

ঢাকাস্থ ব্রাহ্মগণের আদর্শ বাবু রজনীকান্ত ঘোষের বাসায় গত মঙ্গলবার রাত্রিতে মণিপুর নর্ত্তকীদিগের শুভ তৌর্য্যত্রিক সুসম্পন্ন হইয়াছে। অনেক আদর্শ ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকা এই পবিত্র কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন। বিবাহ বিভ্রাট নাটকের জন্য যাহারা এদেশীয় নর্ত্তকীদিগের ওপর ভয়ানক চটিয়া তাহাদিগের মুখ দর্শন পর্য্যন্ত না করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে এই বৈদেশিক নৃত্যকারিণীদের মাহাত্ম্যে এবং সার্কাসের উলঙ্গিনীদিগের ক্রীড়া কৌশলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে দেখিয়া আমরা বড়ই সুখী হইয়াছি।

২৩-৩-১৮৯৩

সংবাদ

অত্রত্য পাটুয়াটুলিস্থ ক্রাউন থিয়েটার মধ্যযোগে চৈতন্যলীলা অভিনীত হইয়া পুনরায় পূর্ণচন্দ্র[৩৩] নাটক অভিনয় হইতেছে। সেদিন আমরা উহা দেখিতে যাইয়া অতীব প্রীতিলাভ করিয়াছি। উহাতে মনোহারিনী বারবনিতাগণ অভিনয় করে বলিয়া যাহারা আপত্তি করেন তাঁহারা এই নাট্যাভিনয়ের সুখ সৌন্দর্য্যে বঞ্চিত হইতে পারেন; কিন্তু সর্ব্ব সাধারণে যখন তাঁহাদের ভদ্র মহিলাগণের নৃত্যগীতাদি দর্শন শ্রবণে সমর্থ নহে; এবং তাহাদের পক্ষে ভদ্র মহিলা মনিপুরী নর্ত্তকীগণও নিত্য আসিয়া নাট্যাভিনয়ের সুখ প্রদানে সমর্থ নহে; অপিচ এই অভাববশতঃ লোককে যখন বাইখেমাটাওলার নৃত্যগীতে যোগ দিতেই

হয়; যখন তাহা অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ এই নাটকাভিনয় দর্শন আমরা কাহারও পক্ষে অন্যায় মনে করি না। ইহাতে অভিনেত্রী ভদ্রমহিলাদিগের আনাড়ীপনা ও অনভ্যস্ত বেসুরো সংগীত নাই বটে এবং বাইখেম্‌টার হাবভাব ক্রীড়া কৌতুকাদির সম্পূর্ণ অভাব আছে বটে, কিন্তু ঐরূপ ভদ্রমহিলাদের লজ্জাশীলতা, বাইওয়ালীদিগের সঙ্গীত চাতুর্য্য ও খেমটাওয়ালীদিগের ক্রীড়া সৌন্দর্য্যাদি যথেষ্ট আছে আর আছে, মনোহর সাজসজ্জা, সাধুত্বের উপদেশ, পাপের প্রতিফল প্রভৃতি। যদি আমোদ আহ্লাদ উপভোগ করা আবশ্যক হয়, তবে এরূপেই করা কর্ত্তব্য।

২১-৫-১৮৯৩

সংবাদ

অত্রত্য ক্রাউন থিয়েটারে প্রতি সোম, বুধ, শনিবার নাটকাভিনয় হইতেছে। কলিকাতার থিয়েটার কোম্পানীসমূহের অভিনয় অপেক্ষা ইহাদের অভিনয় কোন অংশই নিকৃষ্ট নহে, বরং কোন কোন অংশ উৎকৃষ্ট। অতঃপর পূর্ব্ব বঙ্গবাসী বিলাস রসিক বাবুগণকে নাট্যামোদ উপভোগ জন্য কলিকাতা যাইতে হইবে না দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম।

৩-১২-১৮৯৩

সংবাদ

অত্রত্য ক্রাউন থিয়েটার প্রতি শনিবার ও বুধবার নাটকাভিনয় হইয়া থাকে। গত বুধবার 'মীরাবাঈ' নাটকও বা [রা] জা বাহাদুর প্রহসন অভিনীত হইয়াছিল। উদয়পুরের নৃপচূড়ামণি রাজা কুম্ভের মহিষী মীরাবাঈ বিষ্ণুভক্তিতে একটি অসাধারণ রমণী ছিলেন। তাঁহার সাধনা মহিমায় স্বয়ং ভগবান তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইতেন। তাঁহার রচিত বৈষ্ণব সংগীত অদ্যাপি রাজপুতনা ও বৃন্দাবনাদিতে প্রচলিত আছে। এই ঐতিহাসিক মহিলার চরিত্র অবলম্বনে ঐ নাটকখানি প্রণীত রাজা বাহাদুর প্রহসন উপাধি বাতিকগ্রস্ত বাবুদিগের উপযুক্ত শিক্ষাস্থল। ইহাতে যদ্যপি উপহসিত ব্যক্তিকে পূর্ব্ব বঙ্গবাসী সাজাইয়া পূর্ব্ব বঙ্গবাসীর প্রতি একটু বিদ্রূপ করা হইয়াছে, কিন্তু তাহা প্রহসনের সৌন্দর্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্য বলিয়াই বোধ হয়। রাজা বাহাদুর অভিনয়ে এই থিয়েটার কোম্পানী বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

২৯-৪-১৮৯৪

সংবাদ

সম্প্রতি জগন্নাথ কলেজ গৃহে নলগোলাস্থ বণিক বাবুদিগের উৎসাহ উদ্যোগে নন্দ বিদায় নামক নাটকের অভিনয় হইতেছে। অভিনয় মন্দ হইতেছে না। নন্দবিদায় নাটক[৩১] খানিতেই যে কিছু ত্রুটি আছে, তাঁহার জন্য এবং নূতন প্রবর্ত্তনা বশতঃ অভিনয়ে মাঝে মাঝে ত্রুটি না হয়, এরূপও নহে। ঐকতান বাদক সম্প্রদায়কে প্রশংসা করিতে হয়। মঞ্চের কাজে বহু অর্থব্যয় করিয়া যাঁহা কর্ত্তৃক এই নাটক অভিনীত হইতেছে, তিনি বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

১৭-৬-১৮৯৪

সংবাদ

নবাব আসানুল্লা খাঁ বাহাদুর[৩] নাকি কলিকাতা হইতে ষ্টার থিয়েটার কোম্পানীকে আনাইয়া ঢাকাবাসীকে অভিনয় দেখাইবেন। নবাব সংসারের আমোদ-প্রমোদ অনেকদিন হইতে বন্ধ আছে। পুত্র ও তিনটি কন্যাব বিবাহ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু লোকে কোনই আমোদ উপভোগ করে নাই। যাহাতে লোকে বহু লক্ষ টাকা ব্যয় হইবার আশা করিয়াছিল, তাহাতেই কিছুমাত্র পরিলক্ষিত হয় নাই, তখন এ সময় ঐ সংবাদ রটনা হইবার কারণ বুঝিতেছি না।

২৭-১-১৮৯৫

সংবাদ

নবাব আসানুল্লা খান সি, আই, ই, বাহাদুর ঢাকাবাসীর এবং নিজ পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গের নিমিত্ত কলিকাতা হইতে ষ্টার থিয়েটার কোম্পানীকে বহু অর্থ ব্যয়ে আনয়ন করতঃ নিজ বাসভবনেই অভিনয় আরম্ভ করাইয়াছেন। নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকেরা অভিনয় দেখিয়া নবাব বাহাদুরকে ধন্যবাদ দিতেছেন। আমরাও তাহার ধন্যবাদ করিতেছি।

৭-৪-১৮৯৫

সংবাদ

জনৈক বন্ধু লিখিয়াছেন—গত সোমবার শ্রীযুক্ত নবাব সাহেবের আনীত 'ষ্টার থিয়েটার' দেখিতে গিয়াছিলাম। সেদিন উকীল দলের নিমন্ত্রণ, কাজেই কোম্পানীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিয়োগান্তক অভিনয় বঙ্কিম বাবুর 'চন্দ্রশেখর'[৩] অভিনীত হইয়াছিল। অন্যদিন কেমন হয় জানি না, কিন্তু সেদিনকার দর্শকমণ্ডলী গুণগ্রাহী বলিয়া বোধ হইল। অভিনয়ও বেশ ভালই হইয়াছিল। দুই একজন সামান্য অভিনেতার ত্রুটি ভিন্ন মূল অভিনেতৃগণ স্বীয় স্বীয় অংশ উত্তম রূপে অভিনয় করিয়াছিলেন। কিন্তু একটা কথা এই, বঙ্কিম বাবুর 'চন্দ্রশেখর' নাটকাকারে অভিনয়ের উপযোগী করিতে গিয়া ষ্টার কোম্পানী একটুকু 'মতিরায়ের' প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। আর এক কথা এই, চন্দ্রশেখর পড়িলে পাঠকের যে তৃপ্তি হইবে, এ অভিনয় দেখিলে কিন্তু ততদূর তৃপ্তি হইবে না। কারণ, অভিনীত দৃশ্যগুলিতে সে চন্দ্রশেখরের ও সে প্রতাপ মূর্ত্তি ঠিক্ অন্যরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রতাপের অসাধারণ স্বার্থত্যাগ এবং সেই সঙ্গে মর্ম্মস্থলের প্রেম বহ্নির তীব্র ক্রিয়া একস্থলে এক দৃশ্যে নাট্যকার দেখাইতে চেষ্টা করিয়াও ততদূর কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। শৈবলিনীর চরিত্রও বঙ্কিম বাবু যে আদর্শে নির্ম্মাণ করিয়াছেন অভিনয়ে তাহা হইতে একটু স্বতন্ত্র হইয়াছে। কিন্তু মোটের উপর অভিনয় যে ভালই হইয়াছে তাহার কোনও সন্দেহ নাই। ষ্টেজ ম্যানেজারের ক্ষিপ্রহস্ত প্রশংসনীয় হইয়াছিল।

১৪-৪-১৮৯৫

সংবাদ

শ্রীযুক্ত নবাব আসানুল্লা বাহাদুরের নিমন্ত্রণে গতপূর্ব্ব শনিবার ষ্টার থিয়েটারের অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। ঐ দিন কমিশনার মিঃ লট্মন জনসন প্রমুখ সাহেবগণ, সবরডিনেট জজ, মুন্সেফ ডিঃ মাজিষ্ট্রেট এবং বড় বড় জমিদারগণ নিমন্ত্রিত হইয়া

গিয়াছিলেন। নবাব বাহাদুর নিজে দণ্ডায়মান থাকিয়া সকলকেই সাদর সম্ভাষণ ও অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

১৪-৪-১৮৯৫

সংবাদ

নবাব গৃহে আনীত ষ্টার থিয়েটার কোম্পানী সপ্তাহকাল যাবৎ প্রত্যহ রাত্রিতেই অভিনয় করিতেছেন। ঢাকার সমস্ত ভদ্রলোককে একসঙ্গে নাটক দেখান অসম্ভব হওয়াতে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ভদ্রলোকদিগকে ভিন্ন ভিন্ন দিন অভিনয় দেখান হইতেছে। আমরা যে প্রথম একদিন গিয়াছিলাম, ঐদিন লায়লা মজনু[৩৪] নাটক ও বিবাহ বিভ্রাট[৩৫] প্রহসন অভিনীত হইয়াছিল। ষ্টার থিয়েটারের সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা ও অভিনেত্রীবর্গ যে নিজেদের চিরাভ্যস্ত অভিনয় দ্বারা দর্শকমণ্ডলীকে সুখী করিয়াছেন, তাহা বলা বাহুল্য। যদ্যপি লায়লা মজনু নাটকের মজনু ও আব্দুল্লার পাঠ ঢাকাস্থ ক্রাউন থিয়েটারের ন্যায় হয় না, ক্রাউনের মজনু ও আব্দুল্লার সমান সঙ্গীতে মনোমুগ্ধ করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের নাই, তথাপি ষ্টারের অভিনেত্রীদিগের পাঠ অনেক ভাল হয়। ষ্টারের সজ্জাও অধিক পরিষ্কার। বস্তুতঃ তাহাদের অভিনয় দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি এবং বহু সহস্র টাকা ব্যায়ে ঢাকাবাসীকে ষ্টারের অভিনয় প্রদর্শন জন্য নবাব আসানুল্লা খান বাহাদুরকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি।

১৪-৪-১৮৯৫

সংবাদ

স্টার থিয়েটার কোম্পানী নবাববাড়ী হইতে বিদায় লইয়া এক সপ্তাহ যাবৎ পাটুয়াটুলিস্থ নাটক ঘরে অভিনয় আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা দুই তিন দিন দেখিতে গিয়াছিলাম। প্রথম দিন তরুবালা নাটকের অভিনয় দেখিয়া অতীব আনন্দলাভ করিয়াছি। তরুবালা বর্ত্তমান সামাজিক উপন্যাস। ইহা নব্য সমাজের বিশেষ উপদেশজনক। শিক্ষার বাতিক বিশিষ্ট উদ্ধত নব্যযুবক আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক শিক্ষিতা সভ্যা রমণীর কৌশলে ভুলিয়া শেষে যে কিরূপে অনুতাপগ্রস্ত হয়, অখিলচন্দ্র দত্ত তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। সাধ্বী রমণী পতি কর্ত্তৃক অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াও কেমন বুক পাতিয়া সহ্য করিতে পারে, 'তরুবালা' তাহার প্রমাণ স্থানীয়া। সমাজ সংস্কারকগণ বিধবার কষ্টাপনোদন ছলে নিজ ভোগ লালসা চরিতার্থের নিমিতইকদৃশ অকার্য্য করিতে পারে তৎপক্ষে বেশী ঠিক সময়োচিত আদর্শ। আর, অল্পবয়সে বিধবা হইলেও সতী সাধ্বী ভদ্র কন্যারা তজ্জন্য কষ্টানুভব না করিয়াও প্রলোভনে না ভুলিয়া সমাজ সংস্কারকেও ভ্রমাপ‍নোদনে কতদূর সমর্থা, তাহার মহামহিমাময়ী উপমা 'শান্তা'। শান্তার চরিত্র ও হৃদয়ের তেজ ভদ্র হিন্দুর ঘরে প্রচুর বিদ্যামান থাকিলেও সংস্কারক যুবকবর্গ ও বৈদেশিক বিধর্ম্মী জাতিসমূহের বিশেষ লক্ষ্য স্থল। দ্বিতীয় দিন রামায়নোক্ত ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে অবলম্বন করিয়া প্রণীত ঋষ্যশৃঙ্গ নাটক ও বাবু নামক প্রহসন অভিনীত হইয়াছিল। ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন জন্য বেশ্যাদিগের সাহায্য লইতে হইয়াছিল। সুতরাং তাহাদের হাবভাব প্রয়োজন হইলেও সুরু চির চক্ষে ভাল দেখায় নাই। আর বাবু নামক প্রহসনে নব্যসম্প্রদায় বিশেষের চরিত্র ঠিক ষোলকলা সম্পন্নরূপে প্রকটিত হওয়াতে সেই সম্প্রদায়ের সঙ্গে যাহার কিছুমাত্র

সম্পর্ক আছে, তাহাকেই যে দগ্ধ হইতে হইবে. তাহা নিশ্চয়। সেই সম্প্রদায়ের চরিত্র দেখিয়া আমাদের যেমন ঘৃণা ও লজ্জা বোধহয়. তাহার অভিনয় দেখিলেও যে সেই ঘৃণা ও লজ্জা বোধ হইবে. তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। কিন্তু সেই সম্প্রদায়ের চরিত্র অন্য পক্ষেব কেমন লাগে, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত যে ঈদৃশ প্রহসন হওয়া আবশ্যক. তাহা ভাবিয়া এবং অভিনেতৃবর্গের অভিনয় চাতুর্য্য দেখিয়া সেই ঘৃণা ও লজ্জাকে কিছু কালের নিমিত্ত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম।

২৮-৪-১৮৯৫

সংবাদ

ষ্টার থিয়েটার কোম্পানী অদ্য ঢাকা পরিত্যাগ করিয়া নারায়ণগঞ্জ গিয়াছেন। গত মঙ্গলবার বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের অভিনয় দেখিয়া অতিশয় সুখী হইয়াছি।

৫-৫-১৮৯৫

সংবাদ

অত্রত্য ক্রাউন থিয়েটারে পুনবায় অভিনয় আরম্ভ হইযাছে। এবারে কলিকাতা হইতে কতিপয় অভিনেতা ও অভিনেত্রী আনয়ন করা হইয়াছে। শুক্রবার আবু হোসেন[৩৬] নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। অতি ত্বারাত্বরি কার্য্যারম্ভ হইয়াছে; এখনও অনেক ত্রুটি আছে, কিন্তু স্থানীয় লোকের উৎসাহ পাইলে ক্রমে ক্রমে ইহা উচ্চশ্রেণীস্থ থিয়েটারে পরিণত হইতে পারিবে। মধ্যে মধ্যে মন পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত এরূপ একটা রঙ্গালয় ঢাকায় স্থায়ী হওয়া অতি আবশ্যক আশাকরি, সকলে ইহাতে উৎসাহ দিবেন।

২-২-১৮৯৬

প্রেরিত পত্র

কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পত্রখানি এখানেই প্রকাশ করিলাম।

সম্পাদক মহাশয়

বিগত শনিবার রাত্রিতে আমি ক্রাউন থিয়েটারে আবু হোসেনের অভিনয় দেখিয়া পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি। দৃশ্য যেমন মনোহর, শ্রোতৃব্য বিষয়ও তেমনই শ্রুতিসুখকর হইয়াছিল। 'কলিকাতা প্রভৃতি অঞ্চলের লোক ভিন্ন অভিনয় নৈপুণ্য প্রদর্শন অন্যের পক্ষে বিবিধ কারণে অসম্ভব' এমন ধারণা অনেকের মনেই নিহিত আছে। আমিও সেই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না এমন বলিতে পারি না কিন্তু আবু হোসেনের অভিনয় সন্দর্শনে আমার সেই ধারণা আংশিক অপগত হইয়াছে। আবু হোসেন নাটকের আবু হোসেনই নায়ক, তাহার অঙ্গভঙ্গি চালচলন ও বাক-পটুতা অথবা কথা বলিবার প্রণালী অস্বাভাবিক সুতরাং অতি প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল। অভিনেতা আবু হোসেন বড় সুগায়কও বটেন ; যেমন তাঁহার মধুর স্বর, তেমনই তানলয় শুদ্ধি, আকৃতি যেমন সুন্দর পোষক পরিচ্ছদও তেমনই সময়োচিত ও অবস্থোচিত হইয়াছিল। সংসারে সচরাচর যাহা ঘটিয়া থাকে, আবু হোসেনেরও তাহাই ঘটিয়াছিল। যাহারা যৌবন ধন সম্পত্তিতে মুহ্যমান অবস্থায় সংসারে অপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, এ অভিনয়ে তাহাদের শিক্ষণীয় বিষয় অনেক আছে।

রসোনার অভিনয়ও বড় সুন্দর প্রীতি কর হইয়াছিল। স্ত্রী চরিত্রে যাহা কিছু প্রত্যাশা করা যাইতে পারে, রসোনার উক্তিতে এবং কার্য্যে তাহার কিছুরই অভাব সূচিত হয় নাই। সুকণ্ঠও প্রশংসনীয়। দৃশ্যপট দেখিবার জিনিষ বটে। আমি বিশ্বাস করি, সকলেই এ অভিনয় দেখিয়া সন্তোষ লাভ করিবেন।

ঐ দিবস একখানা প্রহসনও অভিনীত হইয়াছিল। প্রহসনে অশ্লীলতার আভাস পরিহার করিয়া বিচার করিতে গেলে তাহারও প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিনয় ভারী চমৎকার হইয়াছিল, তাঁহার অঙ্গভঙ্গি ও বাক্‌চাতুর্য্য দর্শকবৃন্দের সকলেই হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল। অভিনেতৃগণের মধ্যে ইহার আসনও অতি উচ্চ, ইনি অনেক ব্যাপারেই দর্শকগণের চিত্তরঞ্জনে সমর্থ হইয়াচিলেন। মুখুর্য্যা পত্নীর অভিনয় ভাল হইয়াছিল। তাহার হাসি ও কান্না উপমা নাই।

অভিনয় দোষ গুণেই হইয়া থাকে। উৎসাহ বর্দ্ধন না করিলে কাহারও হইতে অভিনব কিছু প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না।

শ্রীকালীকমল চট্টোপাধ্যায়

১৬-২-১৮৯৬

সংবাদ

অত্রত্য ক্রাউন থিয়েটারে এবার কিছু বেশী আয়োজনে অভিনয়কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। কলিকাতা হইতে কতিপয় প্রসিদ্ধ অভিনেতা ও অভিনেত্রী আনা হইয়াছে।

২৪-৫-১৮৯৬

সংবাদ

অত্রত্য ক্রাউন থিয়েটার কলিকাতা হইতে কএকটি সুদক্ষ অভিনেতা ও অভিনেত্রীকে আনয়ন করিয়া বেশী কিছু দক্ষতার সহিত নাটকাভিনয় হইতেছে। গত পূর্ব্ব শনিবার বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলার'[৩৭] অভিনয় দেখিয়া আমরা অতিশয় আহলাদিত হইয়াছি। যে অভিনেত্রী মতিবিবির অভিনয় করিতেছে, তাহার অভিনয় ও সঙ্গীতনৈপুণ্য বিশেষ প্রশংসনীয়।

৩১-৫-১৮৯৬

সংবাদ

প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী শ্রীমতি সুকুমারী দত্ত প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মিকা। নাটকাভিনয়ে সংগীতাদিতেও ইহার অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়া একটি ব্রাহ্ম ইহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি সেই সুকুমারী দত্তকে অত্রত্য ক্রাউন থিয়েটারে আনা হইয়াছে। শ্রীমতির অভিনয় দেখিয়া ও গান শুনিয়া লোকে ধন্য করিতেছে।

২-৬-১৮৯৬

সংবাদ

অত্রত্য ক্রাউন থিয়েটার কতককাল বন্ধ ছিল, আবার অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে। আমরা সেদিন স্বর্গরত্ন নামে একখানি নাটকের অভিনয় দেখিয়া সুখী হইয়াছি। ভীমদেবের অভিনয় খুব সুন্দর ও স্বাভাবিক হইয়াছিল। অন্যান্যের অভিনয়ও প্রশংসার যোগ্য।

ঢাকার ন্যায় একটা বহুজন পূর্ণ স্থানে এরূপ থিয়েটারের ন্যায় একটি আমোদস্থল থাকা এবং তাহাকে উৎসাহ দিয়া রাখা নিতান্ত আবশ্যক। আমোদ-প্রমোদ সর্ব্বদা মাতিয়া থাকা যেরূপ ক্ষতি জনক, সেইরূপ একেবারে আমোদশূন্য হইয়া থাকাও নিতান্ত ক্ষতিজনক। আমোদে মনে স্ফূর্তি থাকে। শরীর সুস্থ থাকে। ঐ হেতু সাহেবেরাও বহুব্যয় বিধান করিয়া ক্লাব ও নাট্যালয়দিতে গিয়া বহু আমোদ সন্তোপ করেন, তজ্জন্য এই বিদেশেও তাঁহাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় না; আমোদ প্রমোদহীন বাবুরা সর্ব্বদা অসুস্থ।

২১-২-১৮৯৭

সংবাদ

এখানে ক্রাউন থিয়েটার আছে। ক্রাউনের অধ্যক্ষেরা কলিকাতা হইতে যে কএকজন অভিনেতা আনিয়াছিলেন, মনান্তর হওয়াতে তাঁহারা ক্রাউন থিয়েটার পরিত্যাগ করিয়া এই অপরিচিত স্থানে একটা বিপদে পড়িয়াছিলেন। সেই বিপদে জগন্নাথ কলেজাধিকারী বাবু কিশোরীলাল রায় চৌধুরীর সাহায্য প্রার্থী হওয়াতে কিশোরী বাবু সাহায্য করিতে সক্ষম হইলেন। তাঁহারা থিয়েটার ব্যবসায়ী সুতরাং আর একটা নূতন থিয়েটার করার সঙ্কল্প জানাইলে কিশোরী বাবু তাহাতে কএকশত টাকা ধার দিয়াছেন; এ পর্য্যন্তই তাঁহার সঙ্গে থিয়েটারের সম্পর্ক সম্বন্ধ। এরূপ স্থলে টাকা ধার দেওয়া প্রশংসা ভিন্ন অপ্রশংসার কার্য্য মনে করা যাইতে পারে না।

১৯-১২-১৮৯৭

সংবাদ

এখানে ডায়মণ্ড নামে আর একটি থিয়েটার হইয়াছে। বাবু কিশোরী লাল রায় চৌধুরীর অর্থ সাহায্যে কলিকাতার কতিপয় কৃতী অভিনেতা দ্বারা রাজা বাবুর ময়দানের নূতন গৃহে অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে। ক্রাউন থিয়েটারের সঙ্গে প্রতিযোগিতাও খুব চলিয়াছে।

২৬-১২-১৮৯৭

সংবাদ

অত্রত্য ক্রাউন থিয়েটারে অদ্য রাত্রি হইতে এক অদ্ভুত দৃশ্য প্রদর্শিত হইবে। ব্রেডফোর্ড সিনেমেটোগ্রাফ কোম্পানী এরূপ সজীব চিত্র প্রদর্শন করিবেন যাহা দেখিয়া নিতান্ত বিস্ময় জন্মিবার সম্ভাবনা। গত বৎসর গ্রীক ও তুরস্কের যে ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছে তাহা ও অন্যবিবিধ আশ্চর্য্য বিষয় যেন ঠিক কার্য্যক্ষেত্র যাইয়া প্রত্যক্ষ করিতেছি বলিয়া নাকি বোধ হইবে। আমরা আগামীবার ইহার বিশেষ বিবরণ প্রকাশ করিব। আগামী বুধবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ রাত্রি ৮ হইতে এই ক্রীড়া প্রদর্শনের কথা হইয়াছে।

১৭-৪-১৮৯৮

সংবাদ

এখানে ডায়মণ্ড জুবিলী থিয়েটার নামে আর একটী স্থায়ী ব্যবসায়ী কোম্পানী হইয়াছে। ক্রাউন থিয়েটার কর্ত্তৃক কলিকাতা হইতে যে কত্রকটি ভাল অভিনেতাকে আনা হইয়াছিল, তাহারা আরও উপযুক্ত অভিনেতা আনিয়া এই পৃথক দলের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এবং ইসলামপুরে তাঁহাদের স্থায়ী ও সুদৃশ্য অভিনয় গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। জগন্নাথ কলেজের

অধিকারী জমিদার বাবু কিশোরী লাল রায় চৌধুরী এই দলের সাহায্যকারী হওয়াতে ইহা ভালরূপেই পরিচালিত হইবার আশা হইতেছে। আমরা একদিন কিছুকাল দুর্গেশনন্দিনীর অভিনয় দেখিয়া সুখী হইয়াছি।

৩-৭-১৮৯৮

সংবাদ

অত্রত্য নবগঠিত ডায়মণ্ড জুবিলী থিয়েটার খুব জমিয়াছে। দুর্গেশনন্দিনী, দেবী চৌধুরাণী বিজয় বসন্ত প্রভৃতির নাটকের অভিনয় খুব ভাল হইতেছে। দেবী চৌধুরাণীতে যিনি ভবানী পাঠক এবং বিজয় বসন্ত নাটকে যিনি বলবন্ত বর্ম্মা, তাহার অভিনয় ক্ষমতা অতিশয় প্রশংসনীয়। ম্যানেজার বাবু শশিভূষণ অভিনয়ে প্রশংসা-ভাজন হইলেও তাঁহার সুমিষ্টস্বর করুণরসে শোভা পাইলেও বীরাদিরসে ভাল মিলে না। দেবী চৌধুরাণী অথবা বিজয় যে বালিকাটীকে সাজান হয়, সেও অভিনয়ে অতিশয় প্রশংসনীয়া। উপন্যাসিক চূড়া [ড়া] মণি বঙ্কিমচন্দ্রের দেবী চৌধুরাণী নিজের গুণেই লোকের অনুরাগ আকর্ষণ করিয়া থাকে; কিন্তু বিজয় বসন্ত নাটকে দোষগুণ দুইটী অত্যন্ত বেশী পরিলক্ষিত হয়। অতিরিক্ত স্ত্রৈণতা ও রাজকার্য্যে অমনোযোগিতা প্রভৃতি বিষয়ে বিজয় বসন্ত নাটক লোক শিক্ষার অত্যন্ত উপযোগী ; বিজয় বসন্তের প্রতি স্ত্রৈণ পিতার ব্যবহার দেখিলে কঠিন প্রাণও বিষাদের দ্রবীভূত হয়। এসকল বিষয়ে বিজয় বসন্ত নাটকখানিকে আমরা প্রশংসা করি; কিন্তু শাস্ত্র শিক্ষককে যেভাবে সঙ্ সাজান হইয়াছে এবং রাণী দুর্জ্জয়ময়ীর চরিত্র যেভাবে গঠিত হইয়াছে, তাহা হিন্দু সমাজে অস্বাভাবিক অহিতকারী কুৎসাজনক মনে করি। ওরূপভাব নাটকে স্থান দেওয়া নিতান্ত অনুচিত হইয়াছে। যদ্যপি ইহা নাটক কর্ত্তার দোষ, তথাপি অভিনেতারা ইচ্ছা করিলে তাহা পরিত্যাগ করিতে পারেন। বিজয়ের প্রতি দুর্জ্জয়ময়ীর প্রণয়ের ভাব না আনিয়া কেবল প্রহারের অভিযোগ দিলেই চলিতে পারে। প্রথমাঙ্কের প্রথম দৃশ্যে রাজশ্যালকের বিরুদ্ধবাদীদিগকে উপস্থিত করিয়া কোন প্রয়োজন নাই; ও অংশ পরিত্যাগ করিয়া অভিনয়ের সময় সংক্ষেপ করা উচিত। যে হউক, পূর্ব্বই বলিয়াছি, ডায়মণ্ড জুবিলী থিয়েটারের অভিনয় খুব ভাল হইতেছে।

১৪-৮-১৮৯৮

সংবাদ

ডায়মণ্ড জুবিলী থিয়েটার গৃহে ভদ্র মহিলাদের সঙ্গে বেশ্যা নিয়া বসান সম্বন্ধে যে একটা গোলযোগ হইয়াছে, আশাকরি, এ বিষয়ে আর কিছু বলিতে হইবে না।

২৫-৯-১৮৯৮

সংবাদ

নবাবপুরে সকের নাটক অভিনয় দ্বারা অনেক কাল পূর্ব্ব হইতে অনেকবার ঢাকাস্থ ভদ্রমণ্ডলীর প্রীতি সম্পাদন করা হইয়াছে। এবারও উত্তর নবাবপুরে সকের থিয়েটার বুদ্ধদেব চরিতের[৮] অভিনয় হইতেছে। আমরা ঐ থিয়েটারে বুদ্ধদেব ও গোপার অভিনয় দেখিয়া অতিশয় সুখী হইয়াছি। যে গোস্বামী যুবক বুদ্ধদেব সাজিয়াছিলেন তাঁহার অভিনয় এত উৎকৃষ্ট হইয়াছিল যে, কোন ব্যবসাদার থিয়েটারেও সেরূপ অভিনয়

অল্পলোকে করিতে পারেন। অন্য কাহারও অভিনয় প্রশংসাযোগ্য নহে। কিন্তু চিত্রপটও অন্যান্য সজ্জা এত উৎকৃষ্ট হইয়াছে যে, অনেক নাটকেই সেরূপ পরিলক্ষিত হয় না। এই নাটকাভিনয় যাহাদের অর্থে হইতেছে, আমরা তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি।

২-১০-১৮৯৮

সংবাদ

অত্রত্য ডায়মণ্ড জুবিলী থিয়েটারের প্রমোদরঞ্জন[৩৯] নাটকের অভিনয় দেখিয়া আমরা আহলাদিত হইয়াছি। নাটকখানি অত্যন্ত হাস্যরস ও শান্তরস প্রধান, বিচিত্র সাজে সজ্জিতা বারাঙ্গনাদি দ্বারা সৌন্দর্য্যের সমাবেশ বাহুল্য করতঃ নব্য যুবকবৃন্দকে মাতাইবার প্রচুর আয়োজন থাকিলেও আমরা আর একটা ভাল উদ্দেশ্যের জন্য ইহার নিন্দা করিতে পারি না। এ বিষয়ের একটু বেশী আলোচনা বারান্তরে করিবার ইচ্ছা রাখি।

৮-১-১৮৯৯

সংবাদ

অত্রত্য ক্রাউন থিয়েটারে গত বুধবার একটা বিষম মারামারি হইয়াছে। জনরবে পুলিশের সঙ্গে স্কুল ছাত্রের স্ত্রীলোক ঘটিত গূঢ় মনোবাদের কথা শুনিয়া এবং পুলিশ কর্তৃক একটি ছাত্রের মাথা ফাটানের কথা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম।

২৯-১-১৮৯৯

সংবাদ

ডায়মণ্ড জুবিলী থিয়েটারে আলী বাবা[৪০] নামক নাটকের অভিনয় কতকাংশ দেখিয়াই আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। রাত্রি ৯টারও অনেক পরে অভিনয় আরম্ভ হওয়ায় ভদ্রলোকের পক্ষে দেখা সুবিধাজনক নহে। ৭টার পূর্ব্বে আরম্ভ করিয়া ১১টার মধ্যে শেষ করার বন্দোবস্ত হইতে পারে নাকি?

৫-২-১৮৯৯

সংবাদ

জীবন বাবুর নাট মন্দিরে[৪১] 'দি গ্রেট ইম্পিরিয়াল থিয়েটার ঢাকা' নামক সকের সম্প্রদায় কর্ত্তৃক 'জনা'[৪২] নামক নাটকের অভিনয় দেখিয়া আমরা অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। অভিনেতাদিগের মধ্যে ৭/৮ বর্ষীয় বালকগণ হইতে ৩০/৩২ বর্ষীয় যুবক পর্য্যন্ত সকলেই অভিনয়কার্য্যে ধন্যবাদের পাত্র। বুনিয়াদি বড়লোকের ঘর হইতে লাভ করাতেই বোধহয়, ইহাদের সাজ-সজ্জা বস্ত্রলঙ্কারগুলি অতিশয় মূল্যবান্ ও সুদৃশ্য। সঙ্গীত সম্বন্ধে এই নাট্য সমাজ অতিশয় প্রশংসাভাজন। এতগুলি সুকণ্ঠ সুগায়ক বালক ও যুবক বোধহয় আর কোন থিয়েটারে এ পর্য্যন্ত পরিলক্ষিত হয় নাই। অভিনয় আরম্ভের সময় সম্বন্ধে ত্রুটি কিছু কষ্টজনক। অধিকন্তু বসিবার পাত্রাপাত্র ভেদজ্ঞানের ত্রুটি সম্মানীলোক দিগের পক্ষে একটু বেশী দুঃখজনক। যখন ভদ্রলোকেরা জীবন বাবুর বাড়ী বলিয়া আহুত হয়েন, তখন ঐ বাড়ীর মধ্যে বাবু রসিক মোহন রায় প্রভৃতি প্রশংসিত প্রৌঢ় ব্যক্তিগণের এ বিষয়ে মনোযোগ রাখা কর্ত্তব্য মনে করি।

১২-৩-১৮৯৯

সংবাদ

ক্রাউন থিয়েটারের মধ্যে গোলমাল করিয়াছে বলিয়া স্কুল-কলেজের ছাত্র ও অপরাপর কতিপয় ব্যক্তির সহিত পুলিসের যে ঝগড়া হয় পুলিস বাদী হইয়া সেই জন্যে ফৌজদারীতে নালিস উপস্থিত করে। জয়েন্ট মাজিস্ট্রেট সাহেব বাহাদুর উক্ত মোকদ্দমা ডিসমিস করিয়া আসামী দিগকে খালাস দিয়াছেন। এই মোকাদ্দমা উপলক্ষে ব্রাহ্ম সহযোগিনী ইষ্ট কত কথাই না বলিয়াছিলেন। সহযোগিনী এখন কি বলেন?

২৬-৩-১৮৯৯

সংবাদ

কলিকাতার সর্ব্বপ্রধান নাটকাভিনেতা শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দু শেখর মুস্তফী মহাশয় অত্রত্য ক্রাউন থিয়েটারে আসিয়া যোগ দিয়াছেন। ঐ থিয়েটাব সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য আছে, আগামীতে বলিবার ইচ্ছা রাখি।

২-৭-১৮৯৯

সংবাদ

ক্রাউন থিয়েটারে আবু হোসেন নাটক অভিনয় দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। কিন্তু এবারও আর কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না।

৯-৭-১৮৯৯

সংবাদ

ঢাকায় বহুকাল যাবৎ শনিবার ও বুধবার ৪ সম্প্রদায় থ [থি]য়েটারে অভিনয় হইতেছে। ডায়মণ্ড জুবিলী ও ক্রাউন থিয়েটারে অর্থ লইয়া নাটক দেখান হয়. কিন্তু নবাবপুরে ও ডাইল বাজারে শকের অভিনয়েও যথেষ্ট প্রতিযোগিতা চলিতেছে। যাহারা নর্ত্তকী সম্বলিত ব্যবসায়ী থিয়েটরদ্বয়ে যাওয়া দোষজনক মনে করে তাহাদের পক্ষে উল্লিখিত শকের নাটক দুইটি অল্প আমোদের বিষয় নহে। বস্তুতঃ শকের বলিয়া ঐ থিয়েটরদ্বয়কে কোন গুণে নিকৃষ্ট বলা যায় না। আমরা সেদিন নবাবপুরে শকের থিয়েটারে মীরাবাঈ[৮৩] নাটকের অভিনয় দেখিয়া অতিশয় আহলাদিত হইয়াছি। ঐ স্থলে রাণাকুম্ভের অভিনয় খুব উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে; মীরাবাঈ প্রভৃতি অন্যান্যের অভিনয় নিকৃষ্ট নহে। সাজসজ্জা সম্বন্ধেও ঐ থিয়েটারকে ব্যবসায়ী থিয়েটার অপেক্ষা হীন বলা যায় না। সুতরাং বিনা পয়সায় এরূপ থিয়েটার দেখা আমরা অনেকের পক্ষে যথেষ্ট লাভজনক মনে করি। যদ্যপি সঙ্গীত সম্বন্ধে এ স্থানে নবাবপুরের সুনাম রক্ষা হইতেছে না; নবাবপুরের প্রসিদ্ধ সঙ্গীতবেত্তাগণ ইহাতে যোগ না দিয়া নিতান্ত অন্যায় করিতেছেন, তথাপি এই থিয়েটার যাঁহাদের দ্বারা চলিতেছে, তাঁহাদিগকে আমরা ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। মীরাবাঈ নাটকে একটী গুরুতর ঐতিহাসিক ভ্রম রহিয়াছে। ঐ নাটকে আছে, মীরবাঈর হরিগুণ বিষয়ক গান শুনিয়া স্বয়ং দিল্লীশ্বর আকবর বাদসাহ মোহিত হইয়াছিলেন; এবং তিনি প্রসিদ্ধ গায়ক তানসেনসহ সন্ন্যাসী বেশ ধরিয়া চিতোরের দেবমন্দিরে মীরাবাঈকে দর্শন করিয়াছিলেন। এই কথাগুলি চিতোর রাজ-বংশীয়গণের ইতিহাস রাজস্থানের সম্পূর্ণ [?],

যেকালে রাণাকুম্ভ ও রাণী মিরাবাঈর আবির্ভাব, তখন আকবর সাহ কেন, তাহার পিতামহ বাবরের জন্ম হইয়াছে কিনা সন্দেহ। রাণাকুম্ভের মৃত্যুর পরে উদোর রাজত্ব তৎপরে রায়মল্লের রাজত্ব, রায়মল্লের মৃত্যুর পরে তৎপুত্র সংগ্রাম সিংহের রাজত্ব আরম্ভ হয়। এই সংগ্রাম সিংহের রাজত্বকালে মহাপরাক্রম বাবর সাহ মধ্যএসিয়া হইতে আসিয়া দিল্লীর সম্রাটকে পরাজয় করেন। ...সুতরাং সেই আকবর কদাপি তাঁহার অতিবৃদ্ধ পিতামহের সমকালীয় রাণাকুম্ভের মহিষী মীরাবাঈর নিকটে সন্ন্যাসী বেশে গিয়াছিলেন না। অতএব মীরাবাঈ নাটকে ঐ ঐতিহাসিক ভ্রমের সংশোধন হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

৬-৮-১৮৯৯

সংবাদ

অত্রত্য ডায়মণ্ড জুবিলী এবং ক্রাউন থিয়েটারে বেশ্যাদ্বারা নাটকাভিনয় হয়। ইহাতে ব্রাহ্ম সম্প্রদায় অনেকদিন হইতে আপত্তি করিতেছেন। যদ্যপি বিবাহ বিভ্রাট নাটকে কোন কোন ব্রাহ্মের চরিত্রে ইঙ্গিত করার পূর্ব্বে বেশ্যার থিয়েটারে ব্রাহ্মগণ আপত্তি করেন নাই; যদ্যপি অন্যান্য সম্প্রদায়ের থিয়েটর যে সকল রমণী দ্বারা অভিনীত হয়, তাঁহাদের অনেকের চরিত্র সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তথাপি বেশ্যাভিনয়ের বিরুদ্ধে এখন অনেকে আন্দোলন উপস্থিত করিতেছেন। যুবক ছাত্রদিগের পক্ষে অভিভাবকের অর্থনাশ করিয়া অভিনয় দেখা আমরাও নিতান্ত দোষজনক মনে করি। কিন্তু সে অভিনয় ছাড়িয়া যাহারা থিয়েটার দেখিলেই চরিত্র দোষ হয় বলিয়া প্রকাশ করেন, তাঁহাদের কথার কোন মূল্যই আমরা স্বীকার করি না। বরং যে ডায়মণ্ড জুবিলী থিয়েটরে ইদানীং তরুবালা নাটকের অভিনয় হইতেছে; তাহা দেখা সমস্ত যুবক এবং প্রোঢ়দিগেরও কর্ত্তব্য মনে করি। বেশ্যা সহবাস কি ভীষণ মূর্খতা, তাহা তরুবালা নাটকাভিনয় দেখিয়া লোকের মনে যেভাবে দৃঢ়বদ্ধ হইতে পারে, সহস্র ব্রাহ্ম সমাজ ও সংবাদপত্রের আন্দোলনে তাহার এক তিলও হইতে পারে না। সুতরাং চরিত্র দোষ হয় বলিয়া যাহারা নাটক দেখার বিরোধী, আমাদের বিবেচনায় তাঁহাদের নিজের এক একবার তরুবালা নাটকাভিনয় দেখিয়া শিক্ষালাভ করা উচিত।

৬-৮-১৮৯৯

সংবাদ

বিশ্বস্তরূপে অবগত হইলাম, অত্রত্য ডায়মণ্ড জুবিলী থিয়েটারে অত্রত্য পুলিশের কোন সবইনস্পেক্টর অত্যন্ত অত্যাচার করিয়াছেন। তাঁহাকে বসিবার বিশেষ আসন দিতে একটু বিলম্ব হইয়াছিল, এ জন্য তিনি পুলিশ দ্বারা বহুক্ষণ অভিনয় বন্ধ রাখিয়াছিলেন এবং ভয় প্রদর্শনের সঙ্গে কুৎসিত গালি দিতেও নাকি ক্রটি করেন নাই। তাঁহার কতকগুলি কুৎসিত ব্যবহার সম্বন্ধে আমরা যে একখানি সুদীর্ঘ পত্র পাইয়াছি, তাহা এবার প্রকাশ করিলাম না।

১৩-৮-১৮৯৯

সংবাদ

কমিশনের মিঃ স্যাভেজ বাহাদুরকে ধন্যবাদ দিয়া জানাইতেছি যে, ছাত্রগণ

যাহাতে থিয়েটারে রঙ্গ তামাসা দেখিতে না পারে, তজ্জন্য তিনি আদেশ প্রচার করিয়াছেন।

২০-৮-১৮৯৯

সংবাদ

অত্রত্য ক্রাউন থিয়েটারে 'প্রফুল্ল'৪৪ নাটকের অভিনয় কতকাংশ দেখিয়াই সন্তুষ্ট হইয়াছি। এই নাটকখানি বর্ত্তমান সমাজের বড়ই হিতকর। নাটক দর্শনে যাহারা উপকারের আশা না করিয়া অনিষ্টের আশাঙ্কা করে, এরূপ নাটক দেখিলে নিশ্চয়ই তাহাদিগের ভ্রান্তিদূর হইতে পারে।

২৪-৯-১৮৯৯

সংবাদ

অত্রত্য ডায়মণ্ড জুবিলী থিয়েটারে 'স্ত্রী' নাটকের অভিনয় দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। যদ্যপি 'স্ত্রী' নাট্যকারের কতকগুলি গুরুতর ক্রুটি কলিকাতাস্থ সংবাদপত্র সম্প্রাদকগণ না দেখিলেও আমাদের চক্ষে অত্যন্ত বাঝিয়াছে, যদ্যপি ঐ থিয়েটারে স্ত্রীর অভিনেত্রী স্ত্রীর পক্ষে ভাল শোভা পায় না, তথাপি অন্য সমস্ত অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের দ্বারা স্ত্রী নাটকের অভিনয় দেখিবার জিনিস হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে ঢাকার ডায়মণ্ড জুবিলী থিয়েটার কলিকাতার থিয়েটারসমূহ অপেক্ষাও কৃতী অভিনেতৃগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে। কলিকাতার সর্ব্বপ্রধান নর্ত্তকরূপে প্রসিদ্ধ রানু বাবু অনেক পূর্ব্ব হইতেই এই ডায়মণ্ডে আসিয়াছেন। সম্প্রতি আসিয়াছেন; কলিকাতার সমস্ত অভিনেতৃগণের গুরুস্থানীয় স্বয়ং সুপ্রসিদ্ধ অর্দ্ধেন্দু শেখর মুস্তফী। ইনি পূজার পূর্ব্বে অত্রত্য ক্রাউন থিয়েটারে আসিয়াছিলেন। কিন্তু ক্রাউন দলবল ইঁহার উপযুক্ত না হওয়ায় ইনি সম্প্রতি ডায়মণ্ডে আসিয়াছেন। ডায়মণ্ডের অন্যান্য অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ সকলেই কলিকাতা নিবাসী ও কলিকাতার থিয়েটারসমূহে লব্ধ প্রতিষ্ঠ। এ অবস্থায় ঢাকার ডায়মণ্ড থিয়েটার যে কলিকাতার সমস্ত থিয়েটার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিবে' ইহাতে বোধ হয় আর কাহারও সন্দেহ নাই।

২৮-১-১৯০০

সংবাদ

অত্রত্য ডায়মণ্ড জুবিলী থিয়েটরের মালিকের নাম শ্রীযুক্ত দ্বারাকানাথ চক্রবর্ত্তী। লোকে অন্যরূপ কথা রটাইতেছে বলিয়াই এ কথাটা বলিতে হইল।

৪-২-১৯০০

সংবাদ

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, ঢাকা ডায়মণ্ড জুবিলী থিয়েটারের প্রপ্রাইটার আগামী বুধবার তাঁহাদের সর্ব্বজন প্রশংসিত স্ত্রী নাটক অভিনয় করিয়া যত টাকা উপার্জ্জিত হইবে, তৎসমস্তই ট্রান্সভাল যুদ্ধে হত ও আহত সৈনিক পুরুষদিগের স্ত্রী, পুত্র, কন্যাগণের সাহায্যার্থে প্রদান করিবেন। আশা করি, ঢাকাস্থ জনসাধারণ রাজভক্তি প্রদর্শনের এই সুবিধা কখনও পরিত্যাগ করিবে না।

১১-২-১৯০০

সংবাদ

অত্রত্য ডায়মণ্ড জুবিলী থিয়েটরের স্বত্বাধিকারী মহাশয় ট্রান্সভাল যুদ্ধে হত সৈন্যদিগের পরিবারের সাহায্যার্থে এক রাত্রিতে অভিনয় করাইয়াছিলেন। ঐ অভিনয় লব্ধ ৮২॥৯ টাকা শ্রীযুক্ত কমিশনার সাহেবের হস্তদ্বারা এ বিষয়ের সাহায্য ভাণ্ডারে প্রদান করা হইয়াছে। শুনিতেছি দুর্ভিক্ষ পীড়িতের সাহায্যার্থেও ঐ থিয়েটার আর একদিন অভিনয় করিবেন। এরূপ অভিনয়ে সাহেব ও বড় লোকদিগের যোগ দেওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য।

১-৪-১৯০০

সংবাদ

অত্রত্য ডায়মণ্ড থিয়েটার সুপ্রসিদ্ধ দীনবন্ধু মিত্রের নবীন তপস্বিনী নাটকের অভিনয় দেখিয়া আমরা অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছে। নটকুল চূড়ামণি অর্দ্ধেন্দু শেখর মুস্তফী মহাশয় জলধর মন্ত্রীর পাঠ এমনই ভাবে অভিনয় করিতেছেন, যাহা দেখিয়া কেহ হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলে আমরাও তাহাকে পুরস্কার দিতে প্রস্তুত আছি। অন্যান্যের অংশও প্রশংসিত ভাবে অভিনীত হইতেছে।

২২-৪-১৯০০

সংবাদ

অত্রত্য ডায়মণ্ড থিয়েটার সম্প্রতি [শ্রী] কৃষ্ণ নাটকের অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে। ভগবান বৃন্দাবনে যে সকল অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে যম [?] জ্জুন নামক দুইটি বৃহৎ বৃক্ষ ভঞ্জন, কালীয় সর্পের মস্তকে চড়িয়া দলন, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক অপহৃত গো বৎসাদি পুনঃ সৃজন প্রভৃতি কএকটি বিষয় ঐ নাটকে প্রদর্শিত হইতেছে।

৬-৫-১৯০০

সংবাদ

অত্রত্য ডায়মণ্ড থিয়েটারে আগাবাবা [আলীবাবা?] নাটকের কতকাংশ অভিনয় করিতে দেখিয়া অত্যন্ত সুখী হইয়াছি। নাটকখানি অতিশয় হাস্যরস প্রধান। দুর্লোভ দুরাত্মাদিগের পরিণাম যে ভীষণ প্রতিফলজনক, ইহাতে সে বিষয়ও শিখিবার কথা আছে।

৩-৬-১৯০০

সংবাদ

ডায়মণ্ড থিয়েটারে প্রসিদ্ধ অর্দ্ধেন্দু শেখর মুস্তফী প্রভৃতি কৃতী অভিনেতৃগণ কর্ত্তৃক প্রভাস মিলন প্রভৃতি নাটক অভিনীত হইতেছে।

২৪-৬-১৯০০

সংবাদ

অত্রত্য ডায়মণ্ড জুবিলী থিয়েটার শ্রীকৃষ্ণ নাটকের সঙ্গে 'বাবু' নামক প্রহসনখানিও অভিনীত হইতেছে। বাবু প্রহসনে নব্য সমাজের শিক্ষিতব্য অনেক কথা আছে। সকলের দেখা কর্ত্তব্য।

২২-৭-১৯০০

সংবাদ

অত্রত্য ডায়মণ্ড থিয়েটারে বিল্বমঙ্গল ঠাকুর নাটক সুন্দররূপে অভিনীত হইতেছে। ভণ্ড সন্ন্যাসীর অংশটা প্রসিদ্ধ অভিনেতা অর্দ্ধেন্দু শেখর মুস্তফী নিজে অভিনয় করিতেছেন। পাগলিনীর অংশ অভিনয় করিতেছে একটি বিড়াল হরি।

৯-১০-১৯০০

সংবাদ

শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুশি [শে]খর মুস্তফী মহাশয় কলিকাতায় যাইয়া একটি সভার আহ্বান করিয়াছিলেন। তাহার উদ্দেশ্য, এদেশীয় ব্যবসায়ী নাটকওয়ালাদিগের ইতিহাস জ্ঞাপন করা। ২৭ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় অর্দ্ধেন্দু বাবু প্রভৃতিই এই নাটকাভিনয় দ্বারা ব্যবসায়ের পথ খুলিয়াছেন, এই কথাটি জ্ঞাপন করাই সম্ভবতঃ ঐ সভার উদ্দেশ্য, কিন্তু ঐটি যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে কলিকাতা সম্বন্ধে অর্দ্ধেন্দু বাবুর প্রাথমিক দাবী স্থির হইলেও ঢাকা সম্বন্ধে নহে। কলিকাতায় তিনি ব্যবসায়ী নাট্য সম্প্রদায় করিবার পূর্ব্বে ঢাকায় পূর্ব্ববঙ্গ বঙ্গভূমি প্রতিষ্ঠিত হইয়া নাটকাভিনয়ের ব্যবসায় আরম্ভ করা হইয়াছিল। বাঙ্গালা ১২৮০ সনে আমরা ঢাকায় টিকেট কিনিয়া এলোকেশী নাটকের অভিনয় দেখিয়াছিলাম। এলোকেশী নাটকাভিনয়ের পূর্ব্বে যে রামাভিষেক প্রভৃতি নাটকাভিনয় হইয়াছিল তাহা আমরা ব্যক্তিগত ভাবে দেখি নাই, কিন্তু ঢাকা প্রকাশ আমাদের পূর্ব্বে যাহারা সম্পাদন করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন। অতএব কলিকাতায় অর্দ্ধেন্দু বাবু কার্য্যারম্ভ করিবার অন্ততঃ একপূর্ব্বে ঢাকায় ঐ কার্য্যারম্ভ হইয়াছিল।

১৬-১২-১৯০০

সংবাদ

অত্রত্য ডায়মণ্ড থিয়েটারে নন্দদুলাল নামক নূতন নাটকের অভিনয় অতিশয় যোগ্যতাসহকারে হইতেছে। প্রসিদ্ধ নর্ত্তক রানু বাবুর হিজরা ও গোয়ালার অভিনয় অত্যন্ত আমোদজনক হইতেছে। কলিকাতা হইতে কতকগুলি নূতন অভিনেত্রী আনীত হওয়ায় রসিক নব্য যুবকদিগের যে জন মাতিতেছে ইহাতে আমরা সন্তুষ্ট না হইলেও কাল ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কিছু বলা বৃথা। তবে ইহা বলিতে পারি, যাহারা নিজের ঘরে সুন্দরী স্ত্রী ফেলিয়াও শুধু গান শ্রবণের সুখ মেটাইবার জন্য বেশ্যা গৃহে যায়, রঙ্গালয়ে এরূপ গান শুনিবার পরে বেশ্যা গৃহে গমনের প্রবৃত্তি অবশ্যই তাহাদের কমিবার সম্ভাবনা।

৩০-১২-১৯০০

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. 'রামাভিষেক নাটক'-এর রচয়িতা হলেন মনোমোহন বসু। নাটকটি প্রকাশিত হয়েছে ১৮৬৭ সানে। পরের বছর কলকাতার 'বহুবাজার' নাট্য সমাজ নাটকটি মঞ্চস্থ করে। ঢাকায় 'রামাভিষেক' মঞ্চস্থ হয় ১৮৭২ সনে এবং এর পরও বহুবার এই নাটকটি ঢাকার মঞ্চে এসেছে।

মনোমোহনের জন্ম ১৮৩১ সনে যশোরে। বাংলা নাট্যজগতে তিনি এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। উনিশ শতকের থিয়েটার সম্পর্কে তার কিছু মতামত ভেবে দেখবার মতো। মনে হয় ঐ সময়ের নাটক মঞ্চায়নের সমস্যা তিনি কিছুটা অনুধাবন করেছিলেন। তিনি একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন—...'দুইটি বিষয়ে উল্লেখ করা আপাততঃ অত্যন্ত আবশ্যক বোধ করিতেছি। তাহার প্রথমটি গীতের প্রসঙ্গ। আমাদের আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকের এরূপ সংস্কার আছে যে, নাট্যাভিনয় গানের বড় আবশ্যক করে না। যে দেশে সকল সময়ে সকল স্থানে সকল কার্য্যেই গান নইলে চলে না—আনন্দের কার্য্য দূরে থাকুক, মুমূর্ষু ব্যক্তিকে গঙ্গার ঘাটে লইয়া যাইবার সময়ে সুস্বরের সঙ্গে হরিনাম সংকীর্ত্তন যে দেশে বহু কালের প্রথা সে দেশের হাড়ে হাড়ে যে সংগীতের রস প্রবিষ্ট হইয়া আছে তাহাও কি আবার অন্য উপায়ে বুঝাইয়া দিতে হইবে? ...আমি এখন বলিতেছি না. যে যাত্রাওয়ালারা যেমন কথায় কথায়, অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বক্তৃতার পর কেবলই গানের আধিক্য করিয়া থাকে, নাটকেও তদ্রূপ হউক। আমার অভিপ্রায় এই যে, স্বভাবোক্তির পর যেখানে যেখানে গান ঘটিতে পারে, তাহা উক্ত স্বাভাবিক নিয়মে সংখ্যায় যতই হউক না কেন ফলত যে কয়টি গান হইবে, সে কয়টি যেন উত্তম রূপে গাওয়া হয়। ফল কথা, আমরা মধ্যস্থ মানুষ; আমরা চাই, দেশে পূর্ব্বে যাহা ছিল, তাহার ধ্বংস না করিয়া তাহাকে সংশোধিত করিয়া লও। ... এ দেশে কুলদা কামিনীকে অভিনেত্রীরূপে প্রাপ্ত হওয়া এককালেই অসম্ভব, স্ত্রী অভিনেত্রী সংগ্রহ করিতে গেলে কুলটা বেশ্যাপল্লী হইতেই আনিতে হইবে। ভদ্র যুবকগণ আপনাদের মধ্যে বেশ্যাকে লইয়া আমোদ করিবেন, বেশ্যার সঙ্গে একত্রে সাজিয়া রঙ্গভূমিতে রঙ্গ করিবেন, বেশ্যার সঙ্গে নৃত্য করিবেন ইহাও কি কর্ণে শুনা যায়? ইহাও কি সহ্য হয় ?...'

ঢাকায় অভিনেত্রী আনায় কেন বারবার প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়েছে তা ঐ যুগের একজন প্রখ্যাত নাট্যকারের জবানবন্দীতেই বোঝা যায়। ১৯১২ সনে মনোমোহন পরলোক গমন করেন। তিনি মোট আটটি নাটক রচনা করেছেন 'রামাভিষেক' যার মধ্যে প্রথম।

বিস্তারিত বিবরণের জন্যে দেখুন; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মনোমোহন বসু, *সাহিত্য সাধক চরিতমালা ৫১*, কলকাতা। ১৩৬৩।

২. কলকাতার ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রবেশ্য মূল্য ছিল ঐ সময়
প্রথম শ্রেণী ঃ ১ টাকা
দ্বিতীয় শ্রেণী ঃ ।৷. আনা

৩. 'নীলদর্পণ' মঞ্চস্থ করার মাধ্যমে কলকাতার প্রথম পাবলিক থিয়েটার ন্যাশনাল থিয়োটারের আবির্ভাব। ১৯৭২ সনে ডিসেম্বর মাসে নীলদর্পণ অভিনীত হয়। নাট্যজগতের ইতিহাসে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৮৭৩ সনে সদস্যদের মধ্যে মনোমালিন্যের দরুন ন্যাশনাল থিয়েটার বিভক্ত হয়ে হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার জন্ম নেয়। গিরিশচন্দ্র ছিলেন প্রথমটির কর্ণধার, দ্বিতীয়টির অর্দ্ধেন্দু শেখর, অমৃতলাল। হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটারে প্রথম অভিনয় হয় ১৮৭৩ সনে। বিস্তৃত বিবরণের জন্য দেখুন, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধায়, *বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস*, কলকাতা, ১৩৬৮।

৪. দীনবন্ধু মিত্রের (১৮৩০-৭৩) 'নীলদর্পণ' বাংলা নাটকের ইতিহাসে একটি মাইলস্টোন বিশেষ। আর কোন নাটক উনিশ শতকে এত আলোড়নের সৃষ্টি করেনি 'নীলদর্পণ' যা করেছিল। নাটকটির পুরো নাম 'নীলদর্পণং নাটকং'। প্রকাশিত হয় প্রথম ২ আশ্বিন ১৭৮২ শকাব্দে, (১৮৬০) পৃঃ ৯০। শুদ্ধিপত্র ২ পৃষ্ঠা 'নীলদর্পণের আখ্যাপত্র'- নীলদর্পণং নাটকং নীলকর বিষধর দংশন কাতর-প্রজানিকর।
ক্ষেমস্করেণ কেনচিৎ পলিকেনাভি প্রণীতং। ঢাকা শ্রী রামচন্দ্র ভৌমিক কর্তৃক বাঙ্গলা যন্ত্রে মুদ্রিত। শকাব্দ ১৭৮২। ২ আশ্বিন।' 'নীলদর্পণ প্রকাশ করার আগে অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছিল। রাধামাধব কর স্মৃতি চারণা করতে গিয়ে এ প্রসঙ্গে বলেছেন
'........ দীনবন্ধু মিত্র তখন ঢাকায় ডাকঘরের ইনস্পেক্টর। আমার পিতা ঠাকুর ছিলেন সহকারী ডাক্তার [দুর্গদাস কর] ... দীনবন্ধু বাবুর সঙ্গে বাবার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। ঢাকার একটি ছাপাখানায় [বাঙ্গলা যন্ত্রে; এখান থেকেই 'ঢাকা প্রকাশ' মুদ্রিত হতো] 'নীলদর্পণ' মুদ্রিত হইতেছিল। প্রত্যেহ রাত্রি ৯/১০ টার সময় দীনবন্ধু বাবু আমাদের বাসায় আসিতেন; বাবা তাঁহাকে লইয়া তাঁহার নিজের শয়ন ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া দু'জনে নীলদর্পণের প্রুফ সংশোধন করিতেন। ...' [বিপিন বিহারী গুপ্ত, পুরাতন প্রসঙ্গ, কলকাতা ১৩৭৩, পৃঃ ২৫১] কিছুদিন আগে অধ্যাপক রণজিৎ গুহ 'নীলদর্পণ' এর সম্পূর্ণ ভিন্ন মূল্যায়ন করেছেন। 'নীলদর্পণ' নিয়ে এতো হৈচৈ হওয়ার কারণ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন—

৯ The answer is simply that it was the Europena planters' reaction to the play that triggered the baboos response to it. For, it is indeed curious that although Neel Darpon was published in september 1860, it was not until May 1861 that the calcutta intelligentsia began to take any serious notice of it. During these eight months a number of things happened due to an appiarently accidental lapse in communication between the lieutenant Governor of Bengal and the secretary to the Government of Bengal on what was indeed a routine administrative matter and culminated in the planters as against the bad

English men (planters). And thus Neel-darpan became the instrument-one could almost say pretest-for the fabrication of a nice little middle class myth about a liberal Government a kind hearted christian priest, a great but impoverished poet and a rich intellectual who was also pillar of society-a veritable league of power and piety and poetry-standing up in defence of the poor ryat. Coming when it did, this myth did more than all else to comfort a bhadrlok conscience unable to reconcile a borrowed ideal decision to make the play a cause for libel. It was as this point that the literati of Bengal came to realize, that the defence of Neel darpan could be made to look like the defence of the peasantry without anyone risking his head at the hands of the planters' lathials. So when James long inspired equllay by his concern for the ryots and his eagerness to shield the Lieutenant governor from embarrasment, stepped out to receive the day's crown of thorns, the leading lights of Calcutta rallied behind the good Englishmen (missionaries and officials) of liberty with a sense of its own helplessness and cowardice in the face of peasant revolt.'

বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন

Ranajit Guha : Neel Darpan. The image of a Peasant Revolt in a Liberal Mirror, The Journal of Peasant Studies Vol. No. I. oct. 1974.

৫. এই সংবাদটি খানিকটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে। কারণ 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নয়, 'হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার'ই ঢাকায় আগে এসেছিল। অনবধানতার জন্যেই বোধহয় এই ভুল হয়েছে।

৬. 'সধবার একাদশী' লেখেন দীনবন্ধু মিত্র। প্রকাশিত হয় ১৮৬৬ সনে। 'বাগবাজার এ্যামেচার থিয়েটার' [পরবর্তীকালে যা 'ন্যাশনাল থিয়েটারে' পরিণত হয়] ১৮৬৮ সনে কলকাতায় নাটকটি মঞ্চস্থ করে। 'ন্যাশনাল থিয়েটার' গঠিত হওয়ার পর, 'সধবার একাদশী' আবার মঞ্চস্থ হয়।

৭. 'নবীন তপস্বিনী নাটকও লিখেছেন দীনবন্ধু মিত্র। কৃষ্ণনগর থেকে ১৮৬৩ সনে গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়। ব্রজেন্দ্রনাথের তথ্য অনুযায়ী ১৮৭০ সনের ১৭ জুলাই কৃষ্ণনগর কলেজে 'নবীন তপস্বিনী' প্রথম মঞ্চস্থ হয়।

৮. 'জামাই বারিকও দীনবন্ধু মিত্রের লেখা। ১৮৭২ সানে নাটকটি প্রকাশিত হয়। 'জামাই বারিক'-এর আখ্যাপত্রে লেখা আছে—'জামাই বারিক/প্রহসন/শ্রী দীনবন্ধু মিত্র প্রণীত /of, all the blessings on earth the best is a good wife; A bad one is the bitterest curse of human Life' কলিকাতা। নূতন সংস্কৃত যন্ত্র /সংবৎ ১৯২৯/১৮৭২ সনে ন্যাশনাল থিয়েটার 'জামাই বারিক' মঞ্চস্থ করে।

৯. 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' লিখেছেন মদুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)। নাটকটি প্রকাশিত হয় ১৮৬১ সনে। কৃষ্ণকুমারী প্রসঙ্গে মধুসূদন রাজনাবায়ণ বসুকে লিখেছেন—
'...I am not at all dissatisfied with your criticism on kissen kumari, but I flatter myself you will think more highly of her as you grow more acquainted with the piece. I have certain Dramatic nations of my own, whicah' I follow invariably....'
[উদ্ধৃত হয়েছে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *মধুসূদন দত্ত*, কলকাতা, ১৩৮০, পৃঃ ৪৫]
জোড়াসাঁকো থিয়েটরে কৃষ্ণকুমারী প্রথম মঞ্চস্থ হয়। ১৮৭৩ সনে ন্যাশনাল থিয়েটার নাটকটি মঞ্চস্থ করে।
১৮৭১ সনে মধুসূদন ঢাকা এসেছিলেন। ঢাকাবাসীর তরফ থেকে তখন তাঁকে সম্বর্ধনা দেয়া হয়। সংবর্ধনার উত্তর তিনি দিয়েছিলেন কবিতায় - 'নাহি পাই নাম ৩০ বেদে কি পুরাণে কিন্তু বঙ্গ অলঙ্কার তুমি যে তা জানি পূর্ব্ববঙ্গে। শোভ তুমি এ সুন্দর স্থানে ফুলবৃন্তে ফুল যথা, রাজাসনে রাণী। প্রতি ঘরে বাঁধা লক্ষ্মী (থাকে এইখানে) নিত্য-অতিথিনী ৩০ দেব বীণাপানি। পীড়ায় দুর্ব্বল আমি তেঁহ বুঝি আনি, সৌভাগ্য, অর্পিলা মোরে (বিধির বিধানে) তব করে, হে সুন্দরী ! বিপজ্জাল যবে বেড়ে কারো, মহৎ যে সেই তার গতি। কি হেতু মৈনাক গিরি ডুবিলা অর্ণবে? দ্বৈপায়ন হ্রদতলে কুরুকুল পতি? যুগে যুগে বসুন্ধরা সাধেন মাধবে, করিও না ঘৃণা মোরে, তুমি ভাগ্যবতি!'

১০. 'অমৃত বাজার প্রত্রিকা'র প্রতিষ্ঠাতা, শিশির কুমাব ঘোষ (১৮৪০-১৯১১)-এর তৃতীয় গ্রন্থ 'নয়শো রুপেয়া'। এই প্রহসনটি প্রকাশিত হয় ১৮৬৩ সনে। ন্যাশনাল থিয়েটার ঐ বছরেই প্রহসনটি অভিনয় করে।

১১. এই রূপক নাট্যটি লিখেছেন কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৭৩ সনে। ঐ বছরেই ন্যাশনাল থিয়েটার কর্তৃক 'ভারত মাতা' অভিনীত হয়।

১২. 'বিধবা বিবাহ নাটক' প্রকাশিত হয় ১৮৫৬ সনে, যখন বিধবা বিবাহ নিয়ে বাংলাদেশে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। নাটকটি লিখেছিলেন উমেশচন্দ্র মিত্র। ১৮৫৯ সনে কলকাতার ' মেট্রোপলিটান' থিয়েটারে নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয়।

১৩. 'ঢাকা প্রকাশ' এ সংবাদ দিতে গিয়ে হয়তো একটু অতিরঞ্জিত করেছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে অর্দ্ধেন্দু শেখর বলেছিলেন [ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১২৬]—
'সেখানে তাঁহাদের [ন্যাশনাল থিয়েটারে] চার পাঁচ রাত্রির অধিক অভিনয় করিতে হয় নাই এবং যে সকল অভিনেতা গিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশ জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া কাহাকেও না জানাইয়া হঠাৎ কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। সুতরাং অধ্যক্ষেরা ঋণগ্রস্ত হওয়ায় আমাদের নিকট ষ্টেজ ও পোষাক রাখিয়া চলিয়া আসেন। আমরাই অগত্যা ঋণপরিশোধে বাধ্য হইলাম। দু'একজন অভিনেতা আমাদের সঙ্গে রহিয়া গেলেন।'

১৪. 'নবনাটক'-এর রচিয়তা হলেন রামনারায়ণ তর্করত্ন (১৮২২-৮৬)। ১৮৬৬ সনে 'নবনাটক' প্রকাশিত হয়। জোড়াসাঁকো নাট্যশালার অনুরোধে রামনারায়ণ নাটকটি রচনা করেন এবং দুশো টাকা পারিতোষিক লাভ করেন। ১৮৬৭ সানে জোড়াসাঁকোতেই নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয়।

'নবনাটক'-এর আখ্যাপত্রে লেখা আছে 'বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা বিষয়ক নবনাটক। শ্রী রামানারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত। কলিকাতা। বহুবাজারস্থ ১৭২ সংখ্যক ভবনে স্ট্যানহোপ যন্ত্রে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোম্পানি কর্তৃক মুদ্রিত। শতাব্দ ১৭৮৮। মূল্য এক টাকা।'

১৫. ১৮৬০ সানে মধুসূদন দত্ত 'একেই কি বলে সভ্যতা' রচনা করেন। কলকাতার 'শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েটরিক্যাল সোসাইটি' ১৮৬৫ সনে প্রহসনটি প্রথম মঞ্চস্থ করে।

১৬. রামনারায়ণ তর্করত্নের লেখা 'চক্ষুদান' প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ সনে 'বন্ধুদিগের বিতরণার্থে'। ১৮৭০ সনে পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়ে প্রহসনটি প্রথম অভিনীত হয়।

১৭. ১৮৭৩ সনে মনোমোহন বসুর 'সতী নাটক' প্রকাশিত হয়। ১৮৭৪ সনে 'বহুবাজার বঙ্গনাট্যালয়ে' তা প্রথম অভিনীত হয়।

১৮. ঢাকার বিখ্যাত ব্যকসায়ী গণি মিয়াই, ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে নবাব এবং 'নাইটহুড' উপাধি পান। বলা যেতে পারে, তাঁর সময় থেকেই ঢাকার নবাব পরিবারের শুরু। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, নবাব আবদুল গণির পূর্বপুরুষরা কাশ্মীর থেকে সিলেটে মাইগ্রেট করেন এবং সেখানে থেকেই একটি শাখা ঢাকায় চলে আসে। এবং ব্যবসা ত্যাগ করে তারা জমিতে টাকা খাটানো শুরু করেন ও অচিরেই পূর্ববঙ্গের প্রধান ভূম্যধিকারী হিসেবে পরিগণিত হন। ঢাকার উন্নতিকরণে নবাব পবিবারের অবদান অবশ্যই স্বীকার্য। নসবাব আব্দুল গণি থেকে শুরু করে নবাব সলিমুল্লাহ পর্যন্ত-এই তিন পুরুষ, এককথায় বলা চলে ঢাকার সমাজ, রাজনীতি সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেছেন।

১৯. 'ইন্দ্রসভা' সম্পর্কে সত্যেন সেন লিখেছেন [প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৪২], "ইন্দ্রসভা নাটকে অনেক চমকপ্রদ ঘটনার সমাবেশ ঘটত।.যেমন ধরুন পরী আর দৈত্যদানবরা উড়তে উড়তে মঞ্চের উপর এসে নামত। ইন্দ্রসভা মঞ্চস্থ করতে হলে যথেষ্ট কারিগরি দক্ষতার প্রয়োজন হতো। অর্থ ব্যয়ও হতো প্রচুর।' সত্যেন সেন অবশ্য বিশ শতকে কি ভাবে ইন্দ্রসভা মঞ্চস্থ হতো তার বর্ণনা করেছেন। 'ইন্দ্রসভা' ঐ আমলের জনপ্রিয় উর্দু নাটক। এবং ঐ সময়ও নিশ্চয় মোটামুটি এভাবেই অভিনয়ের চেষ্টা করা হতো।

২০. ১৮৭৪ সনে প্রকাশিত হয় নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সতী কি কলঙ্কিনী বা কলঙ্ক ভঞ্জন'। ঐ বছরই 'গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা কোম্পানী' এবং 'বেঙ্গল থিয়েটার' মিলিতভাবে নাটকটি মঞ্চস্থ করে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইংলিশম্যান থেকে এর বিজ্ঞাপনটি সংকলিত করেছেন—

BENGAL THEATRE ! . BENGAL THEATRE !

The Evening, Saturday the 6th February 1875, at 8-30. with the united strength of borh the Great National Opera and Bengal Theatre Companies.

opera !! opera !! opera !!

SATI ("Chaste of Unchaste") Ki KALANIKNI

Dancing and Singing Throughout ! Wonderful Transformation! Wonderful Transformation!

Synopsis in English.

২১. খুব সম্ভব অন্নদা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'শকুন্তলা'ই বোধহয় অভিনীত হয়েছিল। ১৮৬৫ সনে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় এবং সে সময়ই কয়েকবার অভিনীত হয়। ব্রজেন্দ্রনাথ লিখেছেন—'হিন্দু পেট্রিয়ট এই পুস্তকখানিকেই বাংলা ভাষায় প্রথম অপেরা (গীতাভিনয়) বলিয়াছেন।'

২২. 'ঢাকা প্রকাশ'— এ জনসাধারণ সভা সম্পর্কে একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল (২৭-৪-১৮৭৩) যাতে আমরা এই সভা সম্পর্কে কিছু জানতে পারি—"অত্রত্য কতিপয় দেশ হিতৈষী মহোদয়ের যত্নে গত ১২৭৮ সনের ১৯শে মাঘ বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে এই সভার সূত্রপাত হয় শাসনকর্ত্তা প্রজাবর্গের মধ্যে দিন দিন অসৌহার্দ্দ এবং অসদ্ভাব অঙ্কুরিত হইতেছে। রাজা ও প্রজা উভয়ে উভয়ের [অস্পষ্ট] ভাব ও অভিপ্রায় উপযুক্ত রূপে হৃদ্বোধ করিতে পারিতেছেন না। রাজপুরুষগণ প্রজাবৃন্দের ও [অস্পষ্ট] স্থানভিজ্ঞ, রাজার কার্য্য প্রণালী প্রজাপুঞ্জ কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না, এজন্য পরস্পরের মধ্যে যে বিশ্বাস ও সহানুভূতির অভাব লক্ষিত হইতেছে তাহ নিরাকরনোদ্দেশ্যেই এই সভা প্রথমতঃ সজ্ঘটিত হয়। কর্ত্তৃপক্ষগণ সেই সময় অসাধারণ ক্ষিপ্রকারিতা সহকারে দিন দিন নব নব বিধান প্রচলন—বহুবিধ কর স্থাপন—শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম্ম বন্ধনের মূলোৎপাটন ভূতপূর্ব্ব শাসন কর্ত্তৃগণের অঙ্গীকার ভঙ্গ সূচক নানা নিয়ম স্থাপন এবং দেশের আয়-ব্যয় সম্বন্ধে নিতান্ত অপরিবেদনার কার্য্য করিয়া দেশীয়দিগকে যেরূপ ভীত ও সঙ্কুচিত করিতেছিলেন, বৈধ ও রাজনৈতিক উপায় দ্বারা তন্নিবারণ এই সভা স্থাপনের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। প্রজাবর্গের বিনীত প্রতিবাদ ও ক্রন্দনধ্বনি কর্ত্তৃপক্ষগণের কর্ণকুহরে প্রবেশোপায় বিরহে যে উপরোক্ত অসুবিধা সমুদয় ভোগ করিতে হইতেছে, তাহা পর্যালোচনা করিয়াই এই সভা স্থাপনোদ্‌যোগী মহাশয়গণ আপনারা প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া রাজনীতি বিষয়ে প্রজাবর্গের মতামত যাহাতে শাসনভার প্রাপ্ত রাজপুরুষগণের নিকট ব্যক্ত করিতে পারেন, গবর্ণমেণ্টের, রাজনৈতিক কার্য্য প্রণালী দেশ ও সমাজের বর্ত্তমান অবস্থোপযোগিণী করণার্থ যাহাতে ব্যবস্থাপক ও কার্য্য কারকগণের সাহায্য করিতে পারেন; এবং কর্ত্তৃপক্ষগণের অভিপ্রায় ও কার্য্য প্রণালী যথাযথ এবং বিশদরূপে যাহাতে দেশে বিজ্ঞাপিত ও প্রস্তাবিত করিতে পারেন, সভা স্থাপনের তাহাই প্রকৃত উদ্দেশ্য।'

২৩. ১৮৫৮ সনে কালিদাস স্যান্যালের 'নলদময়ন্তী' প্রকাশিত হয় এবং ১৮৭১ সনে বাগবাজার মদনমোহন তলায়' প্রথম অভিনীত হয়। 'ধ্রুব চরিত্র'-এর রচয়িতা হলেন নিমাইচাঁদ শীল। নাটকটি প্রকাশিত হয় ১৮৭২ সনে।

২৪. ১৮৬৬ সনে প্রকাশিত হয় উমেশচন্দ্র মিত্রের 'সীতার বনবাস' এবং ভবানীপুরে ঐ বছরই প্রথম অভিনীত হয়।

২৫. রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৪৯-৯৪) শুধু নাট্যকারই ছিলেন না, পত্রিকা সম্পাদকও ছিলেন। বিভিন্ন সময় তিনি 'সমাজ দর্পণ' 'বীণা' 'গল্পকল্পতরু' সম্পাদনা করেন। অভিনয়ের দিকেও তাঁরা ঝোক ছিল। এবং তাই ১৮৮৭ সনে ধনধনিয়ায় 'বীণা রঙ্গভূমি' স্থাপন করেন। ১৮৯০ সনে এই নাট্যাসংস্থা অর্থাবাবে বন্ধ হয়ে যায়। রাজকৃষ্ণ রায়ের প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর সংখ্যা ৭০।

২৬. 'বান্ধব' সম্পাদক, ঢাকার কালীপ্রসন্ন ঘোষ (১৮৪০-১৯১০) তৎকালে পূর্ববঙ্গের একজন প্রধান বুদ্ধিজীবী ছিলেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ১২।

২৭. গিরিশচন্দ্র ঘোষের একটি জনপ্রিয় নাটক 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুব'। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। ঢাকায় অভিনীত তাঁর অপর একটি নাটক চৈতন্যলীলা। প্রকাশকাল ১৮৮৬।

২৮. স্টার থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা করেন গুরুমুখ রায় নামে এক পাঞ্জাবী ১৮৮৩ সনে। গিরিশচন্দ্র, বিনোদিনী অমৃতলাল প্রমুখ এই থিয়েটারে যোগ দিয়েছিলেন। ১৮৮৭ সনে গুরুমুখ রায়ের মৃত্যুর পর অমৃতলাল বসু, অমৃতলাল মিত্র প্রমুখ কয়েকজন রঙ্গমঞ্চটি ক্রয় করেন। পরে অর্থাভাবের দরুণ নামটুকু ছাড়া রঙ্গমঞ্চটি বিক্রয় করতে বাধ্য হন। ১৮৮৮ সনে, নতুন উদ্যমে আবার স্টারের যাত্রা শুরু হয়।

২৯. বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় (১৮৪০-১৯০১) রচিত 'প্রভাসমিলন' প্রকাশিত হয় ১৮৮৭ সনে।

৩০. 'পূর্ণচন্দ্র' লিখেছেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৮৮৮ সনে।

৩১. অতুলকৃষ্ণ মিত্র (১৮৫৭-১৯১১) রচিত 'নন্দবিদায়' প্রকাশিত হয় ১৮৮৮ সনে। একই বছর বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় রচিত 'নন্দদুলাল' নামেও একটি নাটক প্রকাশিত হয়। ঢাকায় কোনটি অভিনীত হয়েছে তা সঠিক বলা গেল না।

৩২. নবাব আবদুল গনির পুত্র এবং নবাব সলিমুল্লাহর পিতা নবাব আহসানউল্লাইও ঢাকার সমাজ জীবনে বেশ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

৩৩. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস, 'চন্দ্রশেখর' প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ সনে। সত্যেন সেন লিখেছেন—'এখানে অভিনীত চন্দ্রশেখর নাটকে পরবর্তীকালের শিশির ভাদুড়ীব 'সীতা' নাটকে বাল্‌সিতীর ভূমিকায় প্রখ্যাত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য চন্দ্রশেখরের ভূমিকায় অভিনয় করেন। মনোরঞ্জন ভট্টচার্য ছিলেন ঢাকা জেলার কামার খাড়া গ্রামেব অধিবাসী। তিনি এখানকার কংগ্রেস আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর পেশা ছিল অধ্যাপনা। ক্রাউনে তিনি চন্দ্রশেখরের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন তখন পর্যন্ত তিনি কোন পেশাদার থিয়েটার দলে যোগ দেননি।'

৩৪. অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯)র 'বিবাহ বিভ্রাট' প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ সনে।

৩৫. ১৮৯১ সনে প্রকাশিত হয় রাজকৃষ্ণ রায়ের (১৮৪৯-১৮৯৪) 'লায়লা মজনু'।

৩৬. গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'আবু হোসেন' ঐ সময়ে একটি জনপ্রিয় নাটক। প্রকাশিত হয় ১৮৯৩ সনে।

৩৭. বঙ্কিমচন্দ্রের (১৮৪৮-৯৪) 'কপালকুণ্ডলা' প্রকাশিত হয় ১৮৬৬ সনে।

৩৮. 'বুদ্ধদেব-চরিত'ও গিরিশ ঘোষের লেখা। নাটকটি প্রকাশিত হয় ১৮৮৭ সনে।

৩৯. 'প্রমোদ রঞ্জন' লিখেছেন ক্ষিরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৪-১৯২৭)। প্রকাশ কাল ১৮৯৮।

৪০. 'আলিবাবা'ও ক্ষিরোদ প্রসাদের লেখা। প্রকাশিত হয় ১৮৯৭ সনে।

৪১. পূজার নাটমণ্ডপই পরে এখানে নাচঘরে রূপান্তরিত হয়। জীবনবাবুর নাটমন্দির বা নাচঘরের মালিক ছিলেন গোকুল রায়। তাঁর পিতা গৌরচন্দ্র রায় ঢাকায় ঢপ কীর্তন প্রবর্তন করেছিলেন।

৪২. গিরিশ ঘোষের 'জনা' প্রকাশিত হয় ১৮৯৪ সনে।

৪৩. রাজকৃষ্ণ বায়ের মীরাবাই প্রকাশিত হয় ১৮৮৯ সনে।

৪৪. 'প্রফুল্ল' প্রকাশিত হয় ১৮৮৯ সনে। লেখক গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

নির্ঘণ্ট

নির্ঘণ্ট

(ঢাকা : ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ দলিলপত্র)

নির্ঘণ্ট
(উনিশ শতকে ঢাকার থিয়েটার)